কাঁটায়-কাঁটায়

নারায়ণ সান্যাল

পি. কে. বাসু—কাঁটা সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনী

কাঁটায়-কাঁটায়

কাঁটায়-কাঁটায়

কাঁটায়-কাঁটায়

কাঁটায়-কাঁটায়

তৃতীয় খণ্ড

কৌতূহলী কনের কাঁটা 11

যাদু এ তো বড় রঙ্গ-র কাঁটা 133

রিস্তেদারের কাঁটা 255

কৌতূহলী কনের কাঁটা

রচনাকাল : 1992
প্রথম প্রকাশ : জুলাই, 1993
প্রচ্ছদশিল্পী : অঞ্জন দত্ত
উৎসর্গ : শ্রীমতী অলকা ত্রিবেদী
শ্রীযুক্ত অনন্তপ্রসাদ ত্রিবেদী

ইন্টারকমে ভেসে এল রানী দেবীর কণ্ঠস্বর, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছে।

বাসু-সাহেব একটি এফিডেবিটের ড্রাফট সংশোধন করছিলেন। ইন্টারকমেই জানতে চান, 'চাইছে' বললে যখন, তখন নিশ্চয় অল্পবয়সী। ছেলে না মেয়ে?

— দ্বিতীয়টা।

— বিবাহিতা না কুমারী?

— চাবিটা তো তোমার বাঁ-দিকের ড্রয়ারে আছে।

— চাবি! কিসের চাবি?

— আচ্ছা, আসছি আমি।

একটু পরেই হুইল-চেয়ারে পাক মেরে রানী এ ঘরে চলে আসেন। মানে, ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর খাশ-কামরায়। উনি ইনভ্যালিড-চেয়ারেই সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ান। কারণ তিনিই ব্যারিস্টার-সাহেবের রিসেপশনিস্ট তথা জীবনসঙ্গিনী।

রানী দরজা খুলে এ ঘরে এলেন। অটোমেটিক ডোর-ক্লোজারের অমোঘ আকর্ষণে একপাল্লার ফ্লাশ-পাল্লা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। বাসু জানতে চান, চাবির কথা কী বলছিলে? চাবি তো হারায়নি কিছু?

রানী মুখে আঁচল চাপা দেন। হাসির দমক একটু কমলে বলেন, একে ব্যারিস্টার, তায় গোয়েন্দা! চাবির রহস্যটা ধরতে পারলে না? সাক্ষাৎপ্রার্থিনী আমার সামনেই বসে আছে। তার নাকের ডগায় বসে কোন আক্কেলে বলি, শুধু বিবাহিতা নয়, সদ্য বিয়ের জল পাওয়া কনে! অষ্টমঙ্গলা পার হয়েছে কি হয়নি!

বাসু-সাহেব পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করতে করতে বলেন, কীভাবে এ সিদ্ধান্তে এলে?

— ওটা বোঝা যায়, বোঝানো যায় না।

— তবু?

— রাতে ভালো ঘুম হয়নি, মুখটা ফুলো ফুলো — বাঁ হাতের অনামিকায় যে আংটি পরেছে সেটায় অভ্যস্ত হয়নি, বারে বারে ডান হাতের আঙুল দিয়ে পাকাচ্ছে। সিঁথিতে সিঁদুর পরার ঢংটা দেখেও বোঝা যায়, অভ্যস্ত হাতের কাজ নয়। তাছাড়া ও পুরুষমানুষ বুঝুক না বুঝুক, আমরা দেখলেই বুঝতে পারি।

— কী নাম?

— শিখা দত্ত।

— কী চায়?

— সে কথা শুধু তোমাকেই বলতে চায়। কী-সব লিগ্যাল অ্যাডভাইস।

— ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও। কৌশিক আর সুজাতা কোথায়?

— ওরা দু'জনেই বেরিয়েছে। আচ্ছা, মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তে-চাকা গাড়িতে পাক মেরে রানী চলে গেলেন পাশের ঘরে। যেটাকে গৌরবে বলা হয় রিসেপশান কাউন্টার। শুধু বাসু-সাহেবের নয়, ও পাশের উইং-এ 'সুকৌশলী'-র রিসেপশান অফিসও ওইটাই।

একটু পরে দরজায় কেউ নক করল।

— ইয়েস। কাম ইন, প্লিজ।

ভিতরে এল মেয়েটি। সপ্রতিভভাবে নমস্কার করল। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। আহা-মরি সুন্দরী কিছু নয়, তবে স্বাস্থ্যবতী, যৌবনের চটক আছে। দীর্ঘাঙ্গী। দেহসৌষ্ঠবও ভালো। লালচে রঙের একটা মুর্শিদাবাদি পরেছে, ম্যাচ-করা ব্লাউজ। খুব সম্ভব রানী দেবীর অনুমান নির্ভুল : সদ্যোবিবাহিতা। কিন্তু ওর চোখে কুমারী মেয়ের ভীরু সরলতা। হাত তুলে নমস্কার করল বটে, চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

— বোস ওই সোফাটায়। বল শিখা, কী তোমার সমস্যা?

বসল। কিন্তু এখনও চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। আঁচলের প্রান্তটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে, আজ্ঞে না, সমস্যাটা আমার নয়, আমার বন্ধুর, মানে বান্ধবীর—

— আই সী! কী সমস্যা তোমার বন্ধুর, মানে বান্ধবীর?

— আমার বান্ধবীর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল। অনেকদিন আগে। শুনেছি, 'লিগ্যাল ডেথ' বলে একটা কথা আছে — মানে, যখন ওই রকম নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে আইনত মৃত বলে ধরা হয়—সেটা কত বছর?

বাসু-সাহেব সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেন, বয়স কত?

— কার? আমার বান্ধবীর?

— না। তোমার?

শিখা একটু নড়ে চড়ে বসল। হ্যান্ডব্যাগটা এতক্ষণ রাখা ছিল ওর কোলের ওপর। এবার সেটাকে সোফার পাশে নামিয়ে রাখল। তারপর বলল, সাতাশ।

— তুমি যে বিবাহিতা তা তো দেখতেই পাচ্ছি, আমার সেক্রেটারির অনুমান : তুমি সদ্যোবিবাহিতা। কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমার?

এতক্ষণে মেয়েটি চোখে চোখে তাকায়। বলে, প্লিজ স্যার, আমার প্রসঙ্গ থাক। আমার নাম, বয়স, ইত্যাদি সব কিছুই ফালতু কথা। আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে, আমার এ সাক্ষাৎকার আমার এক বান্ধবীর তরফে। সে নিজে আসতে পারছে না বলেই আমাকে পাঠিয়েছে।

বাসু বললেন, রানু — মানে আমার সেক্রেটারি — বাই দ্য ওয়ে, উনি আমার বেটার-হাফও বটেন — এসব বিষয়ে সচরাচর ভুল করে না। ও বলছিল, তোমাদের অষ্টমঙ্গলা হয়েছে-কি-হয়নি।

তোমরা হানিমুনে যাওনি কোথাও? মধুচন্দ্রিমায়?

মেয়েটি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দেড়-মুহূর্ত নীরবে নিজেকে সংযত করল। তারপর একেবারে নিরুত্তাপকণ্ঠে বলতে থাকে, আমার বান্ধবীর স্বামী হরিদ্বার থেকে বদ্রিনারায়ণ যাচ্ছিল। অনেকদিন আগে। যাত্রীবাহী বাসটা খাদে পড়ে যায়। পুলিশ রিপোর্টে জানা যায় যে, পেট্রল ট্যাঙ্কে আগুন ধরে বহু লোক জীবন্ত দগ্ধ হয়। বহু যাত্রীর দেহ শনাক্ত করা যায়নি। কিন্তু যাত্রীর তালিকায় — মানে অফিসে যে টিকিট বিক্রি হয়েছিল তার কাউন্টার ফয়েলে — আমার বান্ধবীর স্বামীর নাম ছিল। তারপর আর তাকে কেউ দেখেনি...

— কতদিন আগে?

— বছরসাতেক।

— এই সাত বছরের মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবিত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি? কেউ কখনও তাকে দেখেনি, বা তার চিঠি পায়নি?

— হ্যাঁ, তাই।

— তোমার বিয়ে হয়েছে কবে?

— প্লিজ, স্যার — আমাকে রেহাই দিন! আপনাকে বারে বারে একই কথা শোনাতে আমারই বিরক্ত লাগছে, আপনারও নিশ্চয় তাই। আবার বলি, আমি এসেছি আমার বান্ধবীর তরফে।

—আমার মনে হচ্ছে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির কিছু জীবনবীমা করা ছিল, আর তার স্ত্রী ইনসিওরেন্স কোম্পানি থেকে টাকাটা আদায় করতে পারছে না, যেহেতু সে 'ডেথ সার্টিফিকেট' দেখাতে পারছে না। তাই কি?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ তাই। সেটাও একটা সমস্যা।

— একটা সমস্যা! তাহলে মূল সমস্যাটা কী?

— আমার বান্ধবী জানতে চায়, সাত বছর যখন অতিক্রান্ত তখন সে কি আইনত বিধবা নয়? সে কি আবার বিয়ে করতে পারে? আইনত?

— ঠিক কতদিন আগে বাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

— সাত বছরের চেয়ে দু-তিন মাস বেশি। অবশ্য সে যখন...

মাঝপথেই মেয়েটি থেমে যায়। বাসু-সাহেব ওর অসমাপ্ত বাক্যের শব্দদুটি পুনরুচ্চারণ করেন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের লেজুড় জুড়ে দিয়ে, 'অবশ্য সে যখন...?'

— সে যখন এই নতুন ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত হয়...মানে, যাকে সে এখন বিবাহ করতে চাইছে...অর্থাৎ সে যদি আইনত বিধবা হয়...

বাসু নীরবে পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, তোমার বান্ধবীর আর কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য নেই?

— আছে...মানে, সে একটা আইনের লব্‌জ্‌-এর প্রকৃত অর্থটা জানতে চায়...আমাকে জেনে যেতে বলেছে...অবশ্য নিছক কৌতূহল...

— 'আইনের লব্‌জ্‌'? কী কথাটা?

— Corpus delicti...কথাটার মানে কী?

বাসু-সাহেব সোজা হয়ে বসলেন। কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তোমার বান্ধবী হঠাৎ ওই ল্যাটিন শব্দটার অর্থ জানতে কৌতূহলী হলেন কেন?

— না, মানে...আসলে সে জানতে চেয়েছে...এটা কি আইনের নির্দেশ যে, হত্যাপরাধে কাউকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করতে হলে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের অস্তিত্বটা প্রসিকিউশনকে প্রমাণ করতে হবে?

— সেটাই বা তোমার বান্ধবী জানতে চাইছেন কেন?

— একটা গোয়েন্দা গল্পে তাই লেখা হয়েছে। কথাটা কি ঠিক?

বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, বুঝলাম। তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে, তোমার বান্ধবী চাইছেন তাঁর মৃত স্বামীর দেহের অস্তিত্বটা প্রমাণিত হোক, যাতে এক নম্বর : তিনি ইনসিওর করা টাকাটা আদায় করতে পারেন, দু-নম্বর : সদ্যোপরিচিত পাণিপ্রার্থীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন, এবং, একই সঙ্গে, তোমার বান্ধবী চাইছেন, যেন তাঁর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর মৃতদেহের অস্তিত্বটা পুলিসে না প্রমাণ করতে পারে, কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে স্বামীহত্যার মামলা দায়ের করা যেতে পারে। মোদ্দা ব্যাপারটা তো এই?

মেয়েটি যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। সোজা হয়ে উঠে বসে বলে, এসব কী বলছেন আপনি?...বাঃ! 'Corpus delicti' কথাটার মানে তো সে জানতে চেয়েছে অ্যাকাডেমিক্যালি, মানে একটা গোয়েন্দা গল্পে...

বাসু একটা হাত তুলে ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। বললেন, একটা কথা বুঝিয়ে বলো তো? তোমার বান্ধবী কি আমার স্ত্রীর মতো হুইল-চেয়ারব্যবহার করেন? তিনি কি প্রতিবন্ধী?

— না, তা হতে যাবে কেন?

— তাহলে তাঁকে বল, আমার সেক্রেটারির সঙ্গে টেলিফোনে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিজেই চলে আসতে। দেখ শিখা, Corpus delicti শব্দের অর্থ তোমার বান্ধবী না জানলেও তাঁর ক্ষতি নেই; কিন্তু প্রতিটি মানুষের জানা উচিত যে, ডাক্তারের কাছে রোগের উপসর্গ আর সলিসিটারের কাছে সত্য ঘটনা গোপন করতে নেই। তাঁর সমস্যার কথা তিনিই যেন স্বয়ং এসে আমাকে সরাসরি জানান।

মেয়েটি রুখে ওঠে, কিন্তু কেন? আমি তার প্রতিনিধি, তার তরফে আমি জানতে এসেছি — সেই আমাকে পাঠিয়েছে। এক্ষেত্রে...

— ক্লায়েন্টের নামধাম না জেনে আমি কখনও কাউকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস দিই না। তোমার বান্ধবী ইনভ্যালিড নন একথা তুমি বলেছ। আশা করি তিনি পর্দানসিনও নন। তাঁকে স্বয়ং আসতে বল, কেমন?

মেয়েটি কী একটা কথা বলতে গেল। বলল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। অপমান, অভিমান, না উত্তেজনায় বোঝা গেল না। কোনো কথা না বলে গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বাসু-সাহেবের মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়নি। তিনি প্রতিমুহূর্তেই আশা করছিলেন, মেয়েটির সুবুদ্ধি হবে, সে থমকে দাঁড়াবে। ফিরে আসবে। তা সে এল না। একবার পিছন ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। মাথা খাড়া রেখেই সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল।

বাসু-সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বিষণ্ণভাবে তিনি আপন মনেই মাথা নাড়লেন। দু-হাতের কনুই গ্লাসটপ টেবিলে রেখে দু-হাতে মুখটা ঢাকলেন।

— কী হল? এত তাড়াতাড়ি শিখা চলে গেল যে?

চোখ তুলে দেখলেন, নিঃশব্দে কখন রানী প্রবেশ করেছেন ঘরে।

— ও কিছুতেই স্বীকার করল না, সমস্যাটা ওর নিজের। ভেবেছিলাম, ও ভেঙে পড়বে, মন খুলে সব কথা বলবে। আমি ওর বাবার বয়সী, কিংবা তার চেয়েও বড়ো। কিন্তু মেয়েটা আমার কাছে মন খুলে সব কথা বলল না। ভারি জেদী মেয়ে। আত্মসম্মান জ্ঞানটা প্রখর।

— ও যে বিয়ের কনে এখনও, অন্তত সেটুকু স্বীকার করেছে?

— না! কেন করবে? সমস্যাটা যে ওর 'বান্ধবী'র। ওর কথা যতবার তুলতে গেলাম ততবারই বাধা দিল। ওর নাম যে 'শিখা দত্ত' নয় এটা নিশ্চিত। নাম ভাঁড়িয়ে ও এসেছিল, কিছু আইনের ব্যাখ্যা জেনে যেতে। ভেবেছিল সেটুকু হাতিয়ার দখলে পেলে ও নিজেই ওর প্রথম পক্ষের স্বামীর সঙ্গে লড়তে পারবে! কিন্তু ওভাবে কোনও ক্লায়েন্টকে আমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে দিতে পারি না—মেয়েটা সে কথা বুঝল না!

— ওর প্রথম পক্ষের স্বামী? ও বলেছে?

— ও বলবে কেন? সেটা তো এখন সূর্যোদয়ের মতো স্বয়ংপ্রকাশ! সাত বছর আগে ওর প্রথম

পক্ষের স্বামী একটা বাস-অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় — অন্তত এটাই ছিল ওর ধারণা! সেই বিশ্বাসে ও বোধকরি ভালোবেসে সম্প্রতি বিয়ে করেছে — সাত বছরের বৈধব্য জীবন অতিক্রম করে। আর তার পরেই ও জানতে পেরেছে ওর প্রথম পক্ষের স্বামী জীবিত।

— তাহলে? এ সব কথা সে বলেনি?

— কিছুই বলেনি। এ সবই আমার অনুমান। ও তো শুধু ওর বান্ধবীর কথা শোনাতে এসেছিল।

ব্যাকুলকণ্ঠে রানী জানতে চান, তুমি যা অনুমান করছ তার ফলে কী হবে?

— তা কেমন করে জানব রানু। প্রথম কথা, সাত বছর ওর স্বামী আত্মগোপন করে রইল কেন? অ্যামনেশিয়া? মানে স্মৃতিভ্রংশ? নাকি, সে প্রতীক্ষায় ছিল কতদিনে মেয়েটি আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় — কারণ তারপর থেকেই যে তার ব্ল্যাকমেলিঙের খেলা শুরু করতে পারবে।

— কিসের ব্ল্যাকমেলিং?

— বাঃ! প্রথম স্বামী জীবিত আছে এটা প্রমাণিত হলেই তো তার দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ! ভালোবেসে যদি বিয়ে করে থাকে তাহলে বাকি জীবন তাকে গহনা বেচে বেচে প্রথম পক্ষের স্বামীকে টাকা জুগিয়ে যেতে হবে!

— কী সর্বনাশ! তাহলে তোমার ক্লায়েন্ট...

— কে আমার ক্লায়েন্ট? ওই একগুঁয়ে জেদী মেয়েটা? যার নাম পর্যন্ত আমি জানি না? যে আমাকে বিশ্বাস করে মন খুলে তার সমস্যার কথা বলতে পারল না? বাপের বয়সী...

বাধা দিয়ে রানী বলে ওঠেন, 'শিখা দত্ত' ওর নাম হোক না হোক, সে তোমার ক্লায়েন্ট তো বটেই। ওই নামেই তো রসিদটা কেটেছি আমি!

এবার বাসু-সাহেবের ইলেকট্রিক শক খাবার পালা।

ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি : কী? কী বললে? রসিদ? রিসিট? তুমি কি ওর কাছ থেকে কিছু রিটেইনার নিয়েছ? টাকা নিয়েছ?

— হ্যাঁ। মেয়েটি নিজে থেকেই একটা একশো টাকার নোট আমার টেবিলে রেখে দিয়ে বললে, এটা রাখুন। আমার রিটেইনার! আমি ওঁর কাছ থেকে কিছু লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে এসেছি!

— মাই গড! দেন...দেন শী ইজ মাই ক্লয়েন্ট! অগ্রিম টাকা দিয়ে সে আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিল। আর আমি তাকে নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ করেছি, তার আত্মাভিমানে আঘাত করে...ছি! ছি! ছি!

অশান্তভাবে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত একবার পদচারণা করেই থমকে থেমে পড়েন। বলেন, ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। ও প্রচণ্ড বিপদে পড়েছে। ওকে রক্ষা করা আমার ধর্ম...

প্রৌঢ় মানুষটি প্রায় ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলেন ঘর ছেড়ে।

প্রায় ধাক্কা লাগার মত অবস্থা। সেদিক থেকে ঘরে ঢুকছিল কৌশিক। বললে, কী ব্যাপার? কাকে খুঁজছেন?

— একটি মেয়ে। রানী-কালারের মুর্শিদাবাদি শাড়ি — অ্যারাউন্ড পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি — বয়স সাতাশ—

— হ্যাঁ, সে চলে গেছে। আমি যখন গেট খুলে ঢুকছি, তখনই। একটা ফোর-ডোর মারুতি-সুজুকি চালিয়ে। মেয়েটি অবশ্য জানে না যে, একজন অ্যামেচারিশ গোয়েন্দা তাকে ফলো করছে...

— তুমি কি করে জানলে?

— গোয়েন্দাটা ছিল ওই মিষ্টির দোকানের কাছে। একটা জিপে। আপনার ক্লায়েন্ট মারুতিতে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও জিপটা চালু করে। মেয়েটির পিছন পিছন সেও চলে গেল—প্রায় বিশ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে।

— এটা একটা কোয়িন্সিডেন্সও তো হতে পারে।

— না পারে না। মেয়েটিকে দেখার আগে — ইন ফ্যাক্ট, সে আপনার চেম্বার থেকে বের হবার

আগেই ওই জিপের ড্রাইভারটিকে আমার নজরে পড়ে। তখন আমি বাড়ি থেকে প্রায় ত্রিশ মিটার দূরে। লোকটার হাতে একটা বাইনোকুলার ছিল। দৃষ্টি আপনার ঘরের দিকে। মেয়েটি আপনার ঘর ছেড়ে বার হওয়া মাত্র সে বাইনোটা ঝোলা ব্যাগে ভরে নেয়।

— সে লোকটা কি জানে যে, তুমি তাকে লক্ষ্য করেছ?

— জানি না, কিন্তু এটুকু তার বিশ্বাস আছে যে, ভবিষ্যতে তাকে আমি শনাক্ত করতে পারব না। কারণ ওর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গোঁফ, টুপি, গগ্‌ল্‌স সব কিছুই টিপিক্যাল অ্যামেচারিশ গোয়েন্দার ছদ্মবেশ!

* * *

কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে বাসু-সাহেব ফিরে এলেন তাঁর চেম্বারে।

নজরে পড়ে, রানী তাঁর চাকা-দেওয়া চেয়ারে বসেই মেঝে থেকে কী একটা জিনিস তুলবার চেষ্টা করছেন। পারছেন না।

— কী করছ তুমি?

রানী সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, তোমার ক্লায়েন্ট একটা ব্যাগ ভুলে ফেলে গেছে।

এতক্ষণে নজরে পড়ে। যে ভিজিটার্স-সোফায় মেয়েটি বসেছিল তার পাশে পড়ে আছে একটা লেডিজ-ব্যাগ। কৌশিক সেটা সাবধানে তুলে আনে। বাসু-সাহেবের হাতে দেয়। বাসু নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। একটা প্যাড আর ডট পেন রানীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, লেখ—

— কী লিখব?

— ইনভেন্ট্রি। লেডিজ হাতব্যাগে কী কী পাওয়া গেল তার তালিকা।

সাবধানে ব্যাগ থেকে একটি একটি করে গচ্ছিত সম্পদগুলি তাঁর গ্লাসটপ টেবিলে সাজিয়ে রাখতে রাখতে ঘোষণা করতে থাকেন : একটা লেসবসানো লেডিজ রুমাল, একটা পার্স — তাতে নোট আর খুচরোয় মিলিয়ে দুশো বাহাত্তর টাকা আশি পয়সা, লিপস্টিক একটা, কম্প্যাক্ট একটা। একটা ওষুধের শিশি — ভিতরে সাদা রঙের ট্যাবলেট। ওষুধের নাম 'ইপ্রাল'। একটা বড় হাতলওয়ালা চিরুনি, টেলিগ্রামের খাম একটা। টেলিগ্রামের প্রাপক সি রায়, একুশের-এক বেণীমাধব সরকার লেন। টেলিগ্রামের বক্তব্য : 'শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা হচ্ছে সময়ের শেষসীমা — কমলেশ'...হঠাৎ মুখ তুলে বলেন, আজ কী বার?

— আজই তো শুক্রবার। — কৌশিক জবাবে জানায়।

বাসু আবার ব্যাগের ভিতর হাত চালিয়ে দেন। তোয়ালে জড়ানো ভারী কী একটা ব্যাগের তলা থেকে উদ্ধার করে আনেন। সাবধানে তোয়ালের পাক খুলে বলে ওঠেন : দ্যাখো কাণ্ড!

তাঁর হাতে একটি ঝকঝকে ছোট্ট রিভলভার!

রানী আঁৎকে ওঠেন : কী সর্বনাশ!

বাসু নির্বিকার। বলে চলেন, লিখে নাও — পয়েন্ট থ্রি টু ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক। নাম্বার : থ্রি-সেভেন-ফাইভ-নাইন-সিক্স-টু-ওয়ান। ম্যাগাজিন চেম্বারে ছয়টা স্টিল-জ্যাকেট বুলেট। ব্যারেল সাফা। বারুদের গন্ধ নেই। ছ'টা বুলেটই তাজা।

প্রতিটি বস্তু নিজেই রুমাল দিয়ে সাফ করে অর্থাৎ আঙুলের ছাপ মুছে নিয়ে আবার ভরে রাখলেন। শুধু টেলিগ্রামখানা ভরে নিলেন নিজের পকেটে।

রানী বলেন, রিভলভার নিয়ে ঘুরছে কেন?

বাসু বলেন, খুনি বলে যখন আশঙ্কা করা যাচ্ছে না, তখন আত্মরক্ষার্থে নিশ্চয়।

কৌশিক বলে ওঠে, কলকাতা শহরে কেউ আত্মরক্ষার্থে রিভলভার নিয়ে ঘোরাফেরা করে না।

বাসু বলেন, তাহলে বোধহয় টিফিন বক্স নিতে গিয়ে ভুল করে রিভলভারটা ব্যাগে ভরেছিল।

রানী ধমক দেন, রসিকতা থাক। রিভলভার নিয়ে ঘোরাফেরা করার হেতু নিশ্চয় আছে। মেয়েটি জানে, তার সামনে প্রচণ্ড বিপদ আসতে পারে!

বাসু প্রসঙ্গটা অন্য দিকে মোড় ঘোরালেন, রানু, দেখতো মেয়েটি রেজিস্টারে নিজের কী ঠিকানা লিখেছে।

ব্যারিস্টার-সাহেবের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে — অর্থাৎ ক্লায়েন্ট হিসাবে — তাদের একটা রেজিস্টারে নাম-ধাম স্বহস্তে লিখতে হয়। স্বাক্ষরও করতে হয়।

সেই রেজিস্টার দেখে রানী বললেন, নামধাম ও যা লিখেছে তা হল : 'শিখা দত্ত, একশ বত্রিশ নসিরাম পতিতুণ্ড সেকেন্ড বাই লেন।'

বাসু কৌশিকের দিকে ফিরে জানতে চান, চেন?

— শিখা দত্তকে?

— আরে না রে বাপু। কলকাতা শহরে নসিরাম পতিতুণ্ডের নামে কোনও রাস্তা?

কৌশিক নেতিবাচক মাথা নেড়েই থামে না। বইয়ের র‍্যাক থেকে কলকাতা শহরের পথনির্দেশিকা দেখে নিয়ে বলে, 'সেকেন্ড বাই লেন' দুরঅস্ত! ও নামে কোনও রাস্তাই নেই!

— অলরাইট! আমি একটু বেরুচ্ছি! একফোঁটা একটা মেয়ে এভাবে তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে যাবে! ওকে খুঁজে বার করতেই হবে।

রানী বলেন, পৌনে তিনশো টাকার মায়ায় না হলেও ওই রিভলভারটার জন্য ওকে ফিরে আসতেই হবে।

বাসু-সাহেব পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দূলের মতো ঘরময় পায়চারি করছিলেন। রানীর কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, আসবে না! লিখে দিতে পারি। ভারি জেদী মেয়ে। ও জানে, আমার চেম্বারে ওর রিভলভারটা থাকাও যা, ব্যাঙ্ক ভল্টে থাকাও তাই। কিন্তু হতভাগিটা নিরস্ত্র হয়ে গেল যে—

কৌশিক প্রশ্ন করে, আপনি কোথায় যাবেন খোঁজ নিতে?

— সে কথা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি বরং লালবাজারে চলে যাও আমার গাড়িটা নিয়ে। রবিকে ধরো, রবি বোস, পুলিস ইন্সপেক্টর। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। তার মাধ্যমে দেখ, ওই রিভলভারটার লাইসেন্সি কে! ভালো কথা, গাড়ি দুটোর নম্বর নোট করে নিয়েছিলে?

— জিপের নম্বরটা টুকেছি ; কিন্তু মারুতির নম্বরটা...

— টোকনি! কারণ সেটাই যে আমার বিশেষ প্রয়োজন!

— কী আশ্চর্য! আপনি খামোকা রাগ করছেন। দু-দুটো গাড়ি হুস-হুস করে বেরিয়ে গেল নাকের ডগা দিয়ে। ন্যাচার‍্যালি আমি শুধু পিছনের গাড়ির নম্বরটা টুকে নেবার সুযোগ পেয়েছি...আর তাছাড়া আমি কেমন করে জানব যে, আপনি আপনার ক্লায়েন্টের নাম-ধাম জানেন না?

বাসু-সাহেব ওর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

দুই

বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা ট্যাক্সি। পাড়ারই। বাসু এগিয়ে এসে বললেন, কী যেন নাম তোমার?

— রসিদ আলি, স্যার।

— ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রসিদ! তা তুমি বেণীমাধব সরকার লেন চেন?

— জী হাঁ, নজদিগই। কেতনা নম্বর?

— একুশের-এক। বাড়িটার থেকে কিছু দূরে ট্যাক্সিটা থামিও। অপেক্ষা করতে হবে। আমি ওদের জানাতে চাই না যে ট্যাক্সি করে এসেছি। বুঝলে? নাও এটা ধরো, এটা তোমার মিটারের উপর।

প্রয়োজন ছিল না। পাড়ার ট্যাক্সি। বাসু-সাহেবকে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভালো করেই চেনে। সে কোনও উচ্চবাচ্য করল না। নোটখানা নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে পকেটে রাখল।

মিটারে দশ টাকাও ওঠেনি — ঘ্যাঁচ করে কার্ব-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সিটা। ড্রাইভার বললে, বাঁয়ে তরফ বিশ নম্বর কোঠি, সা'ব!

বাসু নেমে গেলেন। একুশ নম্বর একটা গম ভাঙানোর কল। তার পাশেই একটা একতলা পুরনো বাড়ি। নম্বর-প্লেট বসানো : একুশের-এক। কল-বেল-এর বালাই নেই। অগত্যা সদর দরজার কড়া ধরে জোরে-জোরে নাড়লেন বারকয়েক।

দরজা খুলে মুখ বাড়ালেন একটি মহিলা।

বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। সাদা থান নয় — তবু বিধবা বলেই মনে হল ওঁর। অম্লানবদনে বাসু-সাহেব হাঁকাড় পাড়েন : টেলিগ্রাম! সি. রায়। এ বাড়িই?

ভদ্রমহিলা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন খামের উপর লেখা নাম-ঠিকানা।

বললেন, হ্যাঁ, দাও।

— এখানে একটা সই দিন আগে। — পকেট থেকে নোটবই আর ডটপেন বার করে মহিলার দিকে বাড়িয়ে ধরেন।

এতক্ষণে মহিলাটি ভালো করে টেলিগ্রাফ-পিয়নের দিকে তাকিয়ে দেখেন। বলেন, আপনাকে তো আগে কখনও দেখিনি টেলিগ্রাম নিয়ে আসতে?

একটু আগে মহিলা ওঁর দিকে না তাকিয়েই 'তুমি' সম্বোধন করেছিলেন।

অভ্যাসবশত। 'টেলিগ্রাম' হাঁক শুনে, প্রতিবর্তী প্রেরণায়। এখন উনি একটু ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। স্যুটেড-বুটেড টেলিগ্রাম-পিয়ন ইতিপূর্বে দেখেননি বলে।

বাসুর চট জলদি জবাব : আমি পোস্ট-মাস্টার। এদিকেই আসছিলাম, তাই ; নিন, সই করুন।

এমন পোস্ট-মাস্টার মশাইও বোধ করি ওঁর দেখা নেই। যিনি ডাক-পিয়নের কাজ স্কন্ধে তুলে নেন 'এদিকেই আসার' সুবাদে। কিন্তু টেলিগ্রামটা নিতে হলে খাতায় সই দিতে হয় — স্যুটেড ভদ্রলোক অন্যায় কিছু দাবি করেননি। ফলে ভদ্রমহিলা ওঁর হাত থেকে পকেট বুকটা নিয়ে সই দিলেন : সি. রায়।

বাসু কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বললেন, আপনিই 'সি. রায়'?

— না, তবে ওর টেলিগ্রাম আমিই বরাবর নিয়ে থাকি।

— ও! তাহলে আপনি ওই 'সি. রায়' কথাটার উপর লিখে দিন 'ফর অ্যান্ড অন বিহাফ অফ', আর নিচে আপনার সই দিন।

— আগে তো কখনও তা করিনি।

— টেলিগ্রাফ পিয়নগুলো সব অকর্মার ধাড়ি। কেবল কাজে ফাঁকি দেয়। সেটাই পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের নিয়ম।

ভদ্রমহিলা যুক্তির সারবত্তা অনুধাবন করেন। নোটবইটা নিয়ে নির্দেশ মতো লিখে ফেরত দিলেন। বাসু দেখলেন লেখা আছে 'সি. রায়'-এর তরফে শুভ্রা চৌধুরি।' এবার মহিলা টেলিগ্রামখানা গ্রহণ করতে হাতটা বাড়িয়ে দেন।

বাসু তার আগেই নোটবুক আর টেলিগ্রামখানা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এবার বললেন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল শুভ্রা দেবী। ঘরে চলুন। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এসব কথা আলোচনা করা ঠিক নয়।

গটগট করে গলিপথটা অতিক্রম করে তিনি সামনের বৈঠকখানায় ঢুকে একখানা চেয়ার দখল করে জমিয়ে বসলেন। যেন গৃহকর্তা, অম্লানবদনে বলেন, আসুন, ভিতরে এসে ওইখানে বসুন। আমি আপনার কাছ থেকে 'সি. রায়'-এর বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে এসেছি।

ভদ্রমহিলা ওঁর পিছন পিছন ঘরে ঢুকেছেন বটে, তবে বসেননি। তাঁর বিস্ময়ের ঘোরটা কাটেনি।

বলেন, আপনি...আপনি আসলে কে?

বাসু-সাহেব হিপ পকেট থেকে টেলিগ্রামখানা আবার বার করলেন। সেটা শুভ্রা দেবীর নাকের ডগায় মেলে ধরে বলেন, লুক হিয়ার, শুভ্রা দেবী, এটা একটা পুরনো টেলিগ্রাম। গতকাল সকালে এটা এই ঠিকানাতেই বিলি করা হয়। কেউ একজন 'সি. রায়'-এর নাম দিয়ে সেটা গ্রহণ করেছে। এখন মিসেস রায় অভিযোগ করছেন — তাঁর নাম ভাঁড়িয়ে কেউ তাঁর টেলিগ্রাম হাতিয়ে নিচ্ছে। সেজন্যই এন্‌কোয়ারিতে এসেছি আমি। টেলিগ্রাম পিয়নের কাজ ভাগ করে নিতে নয়।...এখন বলুন, কাল সকালে কি আপনি এই টেলিগ্রামখানা 'সি. রায়'-এর তরফে নেননি?

— নিয়েছিলাম। তারই অনুরোধে — আর তাকেই দিয়েছিলাম।

— কিন্তু টেলিগ্রাম পিয়নের খাতায় আপনি তো নিজের নাম লেখেননি। তাছাড়া আপনি তাঁকে টেলিগ্রামখানা দিলে তিনি আপনার নামে কমপ্লেন করবেন কেন?

— ছন্দা তা করতেই পারে না!

— তাহলে আমার পকেটে এ টেলিগ্রামখানা কী করে এল, বলুন?

— তাই তো ভাবছি আমি!

— ভাবাভাবির দরকার নেই, আপনি মিসেস ছন্দা রায়কে ডাকুন।

— সে এখানে থাকে না।

— কোথায় থাকে? তার ঠিকানা কী?

— আমি জানি না।

— এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ছন্দা কোথায় থাকে তা আপনি জানেন না, অথচ তার সই জাল করে তার টেলিগ্রাম আপনি হাতিয়ে নিচ্ছেন?

— সই জাল করে হাতিয়ে নিচ্ছি?

— নয়? এর আগে কি আপনি পোস্টাল-পিয়নের খাতায় লিখেছিলেন 'ফর অ্যান্ড অন বিহাফ অব ছন্দা রায়'? নিজের নামটাও তো সই করেননি। আমি সব কাগজপত্র দেখে নিয়ে তারপর এন্‌কোয়ারিতে এসেছি। 'আ-য়াম' সরি। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমার সঙ্গে একবার আপনাকে থানায় যেতে হবে।

— থানায়! বাঃ! কেন? কী আমার অপরাধ?

— বাঃ! অপরাধ নয়? আপনি মিসেস ছন্দা রায়ের সই জাল করেছেন। সে এখানে থাকে না, তবু আপনি তার টেলিগ্রাম রিসিভ করেছেন।

— কিন্তু আমার কী দোষ? সে তো ছন্দারই অনুরোধে। ও বললে, ও একজনকে এ বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে। তার চিঠিপত্র এলে বা টেলিগ্রাম এলে আমি যেন রেখে দিই। ও সময় মতো এসে নিয়ে যাবে।

— এই টেলিগ্রামখানা আপনি কাল কখন পেয়েছেন? আর কখন মিসেস রায়কে হস্তান্তরিত করেছিলেন?

— গতকাল সকাল ন'টা নাগাদ ওটা পাই! আমি হাসপাতালে যাই এগারোটা নাগাদ। তার আগেই ছন্দা ফোন করে জানতে চায়, তার কোনও চিঠিপত্র এসেছে কিনা। আমি বলি, একখানা টেলিগ্রাম এসেছে। সে হাসপাতালে এসে দুপুরবেলা আমার সঙ্গে দেখা করে আর ওটা নিয়ে নেয়।

— কোন্ হাসপাতালে?

— শরৎ বোস রোডের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতালে।

— আপনি নার্স?

— হ্যাঁ।

— ট্রেইনড নার্স?

— হ্যাঁ, দু'জনেই পাস করা নার্স।

— ছন্দা তার নিজের ঠিকানায় টেলিগ্রাম নেয় না কেন?

— তার...মানে, কিছু অসুবিধা আছে!

— 'অসুবিধা' মানে তো তার স্বামী? এরই মধ্যে স্বামীর কাছ থেকে লুকোবার মতো ব্যাপার ঘটেছে?

— 'এরই মধ্যে' মানে?

— কেন, তা আপনি জানেন না — ওদের বিয়ে হয়েছে এই সেদিন?

— আপনি কেমন করে জানলেন?

— ছন্দা দেবী নিজেই এসেছিলেন পোস্ট-অফিসে। কমপ্লেন করতে। দেখেই মনে হল ও এখনও সদ্য বিয়ের কনে। কদ্দিন বিয়ে হয়েছে ওর?

— দিন দশেক।

— ওর স্বামীর নাম কী?

—আমি জানি না।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে। ছন্দা রায় কোথায় থাকে তা আপনি জানেন না, তার স্বামীর নাম কী তা জানেন না, অথচ তার সই জাল করতে জানেন। তা আমার অত কথায় কী দরকার? যা বলার থানায় গিয়ে বলবেন। মিসেস রায় কমপ্লেন করেছেন বলেই...

— ছন্দা আমার নামে কমপ্লেন করতেই পারে না।

— পারে না? তাহলে আমি কেন এসেছি?

— সেটাই তো তখন থেকে ভাবছি আমি। আমার মনে হয়, আপনি পোস্ট-অফিস থেকে আদৌ আসেননি। কায়দা করে ছন্দার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। তাই নয়?

— আপনি ঠিকই ধরেছেন, শুভ্রা দেবী। আমি ডাক-বিভাগের কেউ নই। আমি ছন্দার একজন শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু ছন্দা নিজেই সে কথা জানে না। আমি জানতে পেরেছি, ছন্দার একটা ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে কিন্তু সেকথা ওকে জানাতে পারছি না। ওর বর্তমান ঠিকানাটা জানি না বলে। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

জবাবে ভদ্রমহিলা যা বললেন তা একেবারে ভিন্ন খাতে।

— আপনাকে আমার ভীষণ চেনা-চেনা লাগছে। আপনার ছবি আমি কোথাও দেখেছি। আপনি কি টি. ভি. সিরিয়ালে অভিনয় করেন?

— না! সম্ভবত আপনি খবরের কাগজে আমার ছবি দেখেছেন।

হঠাৎ শুভ্রা বলে ওঠেন, এতক্ষণে চিনতে পেরেছি! আপনি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু?

— ঠিকই চিনেছেন। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, আমি ছন্দার শুভাকাঙ্ক্ষী। সব কথা খুলে বলুন এবার।

— বলব। সব কথাই বলব। কিন্তু তার আগে বলুন কী খাবেন? চা, না কফি?

— কী আশ্চর্য! আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছি। আমার নানান জরুরি কাজও আছে। সংক্ষেপে বলুন, ছন্দা রায় সম্বন্ধে আপনি কতটুকু কী জানেন? কেমন করে তার সন্ধান পেতে পারি?

শুভ্রা দেবী আর কোনও সংকোচ করলেন না। সব কথাই খুলে বলেন: না, ছন্দা রায়ের ঠিকানা উনি সত্যিই জানেন না। এমনকি তার স্বামীর নামটাও ওঁর অজানা। না, বিয়েতে শুভ্রা দেবীর আমন্ত্রণ ছিল না। সম্ভবত রেজিস্ট্রি-বিয়ে হয়েছে, কলকাতাতেই। অথচ ছন্দা আর শুভ্রা দু'জন দু'জনকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন। এই বাড়িতে শুভ্রার সঙ্গে বিয়ের আগে ছন্দা বিশ্বাস — হ্যাঁ, বিয়ের আগে কুমারী অবস্থায় ওর পদবি ছিল বিশ্বাস — চার-পাঁচ বছর বাস করে গেছে। দু'জনেই পাস করা নার্স, যদিও বয়সে ছন্দা দশ-বারো বছরের ছোটো। অবশ্য দু'জনের কর্মস্থল ছিল ভিন্ন। ছন্দা কাজ করত একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছাকাছি। সব কিছুই সে গোপন করতে চাইত। তার অতীত ইতিহাসে এমন কিছু আছে যাতে সে নিজের কথা কিছুই বলতে চাইত না। এমন কী, সে যে ঠিক কোন্ নার্সিং হোমে

চাকরি করত — চার পাঁচ বছর একই ছাদের তলায় বাস করেও — শুভ্রা তা জানতে পারেননি। হঠাৎই সে একদিন এসে জানায় যে, সে একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। কাকে, কী বৃত্তান্ত কিছুই স্বীকার করেনি। তীব্র অভিমানে শুভ্রাও বিস্তারিত জানতে চাননি। প্রায় মাসখানেক আগে ওর জিনিসপত্র নিয়ে ছন্দা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। দিন-সাতেক আগে আবার হঠাৎ এসে জানায় যে সে ইতিমধ্যে জনৈক মিস্টার রায়কে বিবাহ করেছে। আরও জানায় যে, তার কিছু চিঠি অথবা টেলিগ্রাম এই ঠিকানায় আসবে। শুভ্রা যেন তা সংগ্রহ কয়ে রাখেন। সময় মতো ছন্দা তা নিয়ে যাবে। এরপর প্রত্যেকদিন সকালেই ছন্দা একবার করে ফোনে জেনে নিত তার কোনও চিঠিপত্র এসেছে কিনা। গতকালও সে ফোন করেছিল।

বাসু বললেন, আবার যদি সে ফোন করে তাহলে তাকে বলবেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আজ সকালেই সে এসেছিল আমার চেম্বারে। আর যাবার সময় ভুল করে একটা হ্যান্ডব্যাগ ফেলে গেছে। ওই ব্যাগের ভিতর অত্যন্ত দামি কিছু আছে...

— অত্যন্ত দামি কিছু? কী তা?

— সেটা আমি আপনাকে জানাতে পারছি না, শুভ্রা দেবী। প্রফেশনাল এথিক্‌সে বাধছে। তবে ছন্দা নিশ্চয় এতক্ষণে সেটা টের পেয়েছে। হয়তো সে মনে করতে পারছে না — ব্যাগটা ঠিক কোথায় খুইয়েছে। আপনি বললেই ওর মনে পড়ে যাবে। ও বুঝতে পারবে অথবা...

— অথবা?

— অথবা হয়তো ওর মনে পড়েছে সব কথা। কিন্তু দুরন্ত অভিমানী মেয়েটা জেদ করে ফিরে আসছে না। কারণ সে জানে, আমার হেফাজতে ও জিনিস নিরাপদেই আছে।

শুভ্রা বললেন, তাও হতে পারে। ছন্দা অত্যন্ত অভিমানী।

— আপনি ওকে বলবেন তো?

— নিশ্চয় বলব। তবে একটা শর্ত আছে।

— শর্ত! কী শর্ত?

— আপনার ব্লাড শুগার আছে? ডায়াবেটিস?

— গুড গড! না! কিন্তু সে কথা কেন?

— তাহলে আপনি একটু বসুন। পাঁচ মিনিট। আমি সামনের দোকান থেকে দুটো কড়াপাক সন্দেশ নিয়ে আসি। খুব ভালো বানায়। আপনি একটা কিছু মুখে না দিলে আমার...

— অল রাইট! যান, নিয়ে আসুন।

— শুভ্রা ড্রয়ার খুলে একটা নোট নিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাসু তৎক্ষণাৎ টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ওঁর বাড়িতে ডায়াল করলেন। ধরলেন রানী দেবী : কী খবর?

— সুজাতা ফিরেছে?

— না।

— সুজাতা ফিরে এলেই বলবে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি অঞ্চলে চলে যেতে। কাছে-পিঠে প্রতিটি নার্সিং হোমে গিয়ে সে যেন খোঁজ নেয় : নার্স ছন্দা বিশ্বাস সেখানে কাজ করে কি না। ইন ফ্যাক্ট — ছন্দা রায় মাসখানেক আগে 'বিশ্বাস' পদবিতে ওই অঞ্চলের কোনও নার্সিং হোমে কাজ করত, এখন করে না। তবে প্রশ্নটা ওইভাবে পেশ করাই শোভন। যদি কেউ বলে, আগে এখানে কাজ করত, এখন করে না, তখন তার বর্তমান ঠিকানা সংগ্রহের নানান চেষ্টা যেন করে। বুঝলে?

— বুঝলাম। কিন্তু নার্স ছন্দা রায়টি কে?

— যার হাত থেকে একখানা একশো টাকার নোট হাতিয়ে তুমি আমাকে দ'য়ে মজিয়েছ!

— আমি? না তুমি নিজে ওকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে...

— সারেন্ডার! সারেন্ডার! হ্যাঁ, সব দোষ আমার। আরও নোট করে নাও — আমি ফোন করছি একুশের-এক বেণীমাধব সরকার লেন থেকে। এই নম্বরটা হচ্ছে ৪৬-৫৩২২। মিনিট দশেক পরে এখানে রিং কর। যিনি ধরবেন তাঁর নাম শুভ্রা চৌধুরি। তাঁকে বলবে — তুমি যা হয় একটা নাম বলে নিজের পরিচয় দিও — শুভ্রা দেবীকে বলবে, তুমি কমলেশের বান্ধবী। ছন্দা রায়ের জন্য একটা জরুরি খবর দিতে চাও। ছন্দা যেন তোমাকে ফোন করে। তোমার নাম্বারটা শুভ্রাকে দিয়ো।

— তারপর ছন্দা যখন ফোন করবে?

— তখন তাকে নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে বলবে সে যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জানিয়ো, নিজের ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত।

— বুঝলাম। আর কিছু?

— রিভলভারের লাইসেন্সির পাত্তা পাওয়া গেছে?

— এখনও না। কৌশিক কোনও ফোন করেনি এখনও।

— আপাতত এই পর্যন্ত। জানলা দিয়ে দেখছি এক জোড়া কড়াপাকের সন্দেশ এগিয়ে আসছে।

— একজোড়া কড়াপাকের সন্দেশ! তার মানে?

বাসু নিঃশব্দে ধারকযন্ত্রে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। পরমুহূর্তেই সন্দেশের প্যাকেট হাতে শুভ্রা ফিরে এলেন।

* * *

ট্যাক্সিতে উঠে বললেন, এবার চল রাজা রামমোহন রায় সরণীতে। শেয়ালদা ফ্লাইওভার হয়ে। ভিড় কম হবে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের জংশনে নেমে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন। ওঁর গন্তব্যস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কারণ ছিল। এবার উনি যে কাজটা করতে চলেছেন সেটা বে-আইনি! এমন ক্রিয়াকাণ্ডে উনি অভ্যস্ত। ওঁর মতে 'এন্ড জাসটিফাইজ দ্য মীনস' — অর্থাৎ মূল লক্ষ্যটা যদি 'সত্য-শিব-সুন্দর'-মুখী হয়, তাহলে প্রতিটি পন্থাই নীতিধর্মের অনুসারে। প্রতিপক্ষদল — অর্থাৎ সমাজবিরোধীরা — কোমরের নিচে ক্রমাগত আঘাত হানবে আর শান্তিকামী ব্যক্তিরা যে-কোনওভাবে ওদের মোকাবিলা করতে পারবে না — ওটা কোনও যুক্তি নয়। তাই উনি ট্যাক্সি-চালককে জানাতে চান না ওঁর গন্তব্যস্থলটা।

ছোট্ট একটা প্রেসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামনে বসে একজন কম্পজিটার টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় কাজ করছিলেন। চোখের উপর চশমা তুলে বললেন, কাকে খুঁজছেন স্যার?

— গোরা আছে? গৌরাঙ্গ জানা?

— আজ্ঞে না। গোরা কন্টাই গেছে। মানে, দেশের বাড়িতে। ছাপাখানার কাজ করাতে চান কিছু?

— তা তো চাই, কিন্তু গোরা না হলে তো তা হবে না!

— কেন স্যার? গোরাকে বাদ দিয়েই তো ছাপাখানা দিব্যি চলছে।

বাসু জবাব দিলেন না। হঠাৎ ভিতর থেকে এক বৃদ্ধ হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। খেটো ধুতি, গলায় কণ্ঠি, ফতুয়া গায়ে, চোখে নিকেলের চশমা। হাত জোড় করে বলেন, স্যার! আপনি?

— আমাকে আপনি চেনেন?

— বিলক্ষণ! আপনাকে চিনব না? আপনি না থাকলে সেবার যে গোরার মেয়াদ হয়ে যেত। আমি গোরা, মানে গৌরাঙ্গের বাপ, প্রভুচরণ জানা, আজ্ঞে। আসুন, ভিতরে আসুন—

নিজের চেয়ারটা কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে নিয়ে বসতে বললেন। বাসু-সাহেবের নজর হল, অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ ওঁদের লক্ষ্য করছে। বললেন, জানামশাই, কিছু গোপন কথা ছিল। কোথায় বসে হতে পারে?

প্রভুচরণের কোনও ভাববৈকল্য হল না। যেন নিত্যি ত্রিশদিন তিনি এমন গোপন কথা শুনে থাকেন।

বলেন, তাহলে, স্যার, ওপরে চলুন। দোতলায় আমার বাসা!

কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে দ্বিতলে উঠে আসেন। নিম্নমধ্যবিত্তের অভাবের সংসার। একজন অবগুণ্ঠনবতী — বোধকরি গৌরাঙ্গের গর্ভধারিণী — একটি বেতের মোড়া পেতে দিয়ে গেলেন। প্রভুচরণ ভিতর থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলেন, এবার বলুন। গৌরাঙ্গ দেশে গেছে। তাতে আটকাবে না। কী কাজ, বলুন?

বাসু মোড়ায় বসে একটু ভূমিকা করতে গেলেন, জানামশাই, সেবার গোরা যেমন বিনা অপরাধে জেল খাটতে যাচ্ছিল এবার তেমনি এক নিরপরাধীকে বাঁচাতে আমি একটু বেআইনি...

প্রভুচরণ দু'হাত দু'কানে চাপা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনি দেবতুল্য মনিষ্যি। আমারে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন না। কী করতে হবে — শুধু সেইটুকু বলুন।

— আমাকে খানকতক — ধরুন পাঁচখানা — ভিজিটিং কার্ড বানিয়ে দিতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

— এ আর কী এমন শক্ত কাজ। গোরা নেই তো নেতাই আছে — ওই গোরারই ছোটো ভাই। প্রেসের সব কাজই জানে। কম্পোজ করে নিজেই ছাপিয়ে আনবে। আপনি শুধু কী লিখতে হবে বলেন।

বাসু তাঁর পকেট নোটবুক থেকে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে ইংরেজি হরফে লিখে দিলেন :

Charu Chandra Roy, B. Sc.
Real Estate Agent & Govt.
Authorised Agent of N.S.C.,
C.T.D., Unit Trust, R.D.
21/4 Benimadhab Naskar Lane
Calcutta 700026

প্রভুচরণ বললেন — ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে, স্যার।

— তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।

— আজ্ঞে না, ইঞ্জিরি হরফ, প্রুফটা আপনাকেই দেখে দিতে হবে। আমি বরং আপনার জন্য কিছু চা-মিষ্টির যোগাড় দেখি—

আগেই বলেছি, উদ্দেশ্য সৎ হলে মিথ্যা বলতে ওঁর বাধে না। আপাতত ওঁর উদ্দেশ্য নিজের উদর এবং অপরের আত্মাভিমানকে বাঁচানো। অম্লানবদনে বললেন, না, জানামশাই, একটু অ্যাসিডিটি মতো হয়েছে — ওই অম্বল আর কী। বরং দেখুন, কাছে-পিছে ঠাণ্ডা 'লিম্‌কা' পাওয়া যায় কিনা, অথবা ডাব।

ডাবই পাওয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ওই সদ্যমুদ্রিত ভিজিটিং-কার্ডগুলি নিয়ে বাসু-সাহেব রওনা দিলেন।

*

বাসু-সাহেবের কর্মপদ্ধতি ছকবাঁধা।

পরবর্তী দৃশ্য মধ্য কলকাতার একটি বড়ো ডাক ও তার ঘর।

কমলেশ নামধারী এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি দু'দিন আগে এই ডাকঘর থেকে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিল জনৈক সি. রায়কে : 'শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা হচ্ছে সময়ের শেষ সীমা।'

আজই সেই শুক্রবার। নির্দিষ্ট সময়ের শেষ সীমান্তে উপনীত হতে আরও ঘণ্টাছয়েক বাকি। উনি নিজে এই মর্মান্তিক বার্তাটা জেনেছেন ঘণ্টাতিনেক আগে। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে জানতে পেরেছেন 'সি. রায়' হচ্ছে ছন্দা রায়। একটি আতঙ্কতাড়িতা সদ্যো-বিবাহিতা। বোধকরি যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি — দীর্ঘ সাত বছর — সে ছিল বিধবা। এখন সে তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে। আর সেই শুভ মুহূর্তেই অজ্ঞাতবাস থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে ওই কমলেশ। তার পুরো নামটা জানেন না — কিন্তু আন্দাজ করেছেন, ওই ভিরু কপোতীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সে এক হিংস্র শ্যেনপক্ষী! হয়তো — হ্যাঁ, এমনও হতে পারে — সাত-সাতটি বছর সে স্বেচ্ছায় অজ্ঞাতবাসে ছিল : কখন তার পত্নী নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়! তখনই শুরু হবে তার খেলা : ব্ল্যাকমেলিং!

প্রথম স্বামী জীবিত থাকাকালে — তার সঙ্গে ডিভোর্স না হলে — দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ। অর্থাৎ ওই অজ্ঞাত পরিচয় 'কমলেশ' যে মুহূর্তে জনবহুল ট্রাম রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে হাঁকাড় পাড়বে 'অয়ম অহম্ ভো' — তৎক্ষণাৎ ওই সদ্যোবিবাহিতার সাতমহলা স্বপ্নের প্রাসাদ হাড়গোড় ভেঙে হুড়মুড়িয়ে উল্টে পড়বে। এই হচ্ছে আইনের অনিবার্য নির্দেশ! সেই দুর্দৈব ঠেকাবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়েছেন অভুক্ত প্রৌঢ় মানুষটি। প্রথামতো যাঁর কাজ আদালত চৌহদ্দি থেকে ল' লাইব্রেরির ভিতর সীমিত হবার কথা।

ডাকঘরে ঢুকেই নজরে পড়ল এনকোয়ারির পাশেই খাম-পোস্টকার্ড আর ডাকটিকিট বিক্রি হচ্ছে। সেদিকটায় চাপ ভিড়। বাসু সেদিকে গেলেন না। এক ফাঁকামতো কাউন্টারে গিয়ে কর্মরত করণিককে বললেন, শুনছেন? কিছু এন. এস. সি. কিনব। কার কাছে যাব?

মন্ত্রের মত কাজ হল তাতে। ইউনিট ট্রাস্টের নানান সুবিধাজনক স্কিমের চাপে লোকে আজকাল আর ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনতে উৎসাহী নয়। অথচ এগুলি বিক্রয় করতে নানান কারণে পোস্টাল কর্মচারীরা উৎসাহী। ছেলেটি বললে, গলিপথে একটা দরজা আছে — ওইদিকে। তাই দিয়ে ভিতরে চলে আসুন। ওই কোণায় যে টাকমাথা ভদ্রলোক বসে আছেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। ওঁর নাম : অরিন্দমচন্দ্র ঘোষাল।

গলিপথে খিড়কি-দরজা দিয়ে বাসু ওই বৃদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ভিতরের গলিপথে ছেলেটি ইতিপূর্বেই ঘোষাল-মশাইকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথাটা জানিয়ে দিয়েছে। একটি টুলও কোথা থেকে যোগাড় করে এনেছে।

অনুরুদ্ধ হয়ে বাসু টুলে বসলেন। অরিন্দম প্রশ্ন করেন, এন. এস. সি. কিনবেন? কত হাজার?

বাসু সেকথার জবাব না দিয়ে বললেন, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো, ঘোষালমশাই? আপনি কি কখনও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন?

হা হা করে হেসে ওঠেন অরিন্দম। বলেন, আরে না মশাই! কলেজে আর পড়ার সুযোগ পেলাম কোথায়? বাবামশাই ছিলেন পোস্ট-মাস্টার। ম্যাট্রিকটা পাশ করার পর একটা টুলে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সে আমলে সেসব সুবিধে ছিল। তেত্রিশ বছরে ঘষতে ঘষতে এতদূরে এসে পৌঁছেছি। ডিসেম্বরে রিটায়ার করব।

— কিন্তু আপনাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন? আপনারও তাই লাগছে না কি?

অরিন্দম বাসু-সাহেবকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, আজ্ঞে না। তবে আমার চেহারাটা টিপিক্যাল কেরানির। আপনি হয়তো অন্য কোনও করণিকের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

ইতিমধ্যে ও পাশের আর একটি মহিলা করণিক একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললে, ঘোষালদা, এইখানে একটা সই দিন।

নির্দেশিত স্থানে স্বাক্ষর দিয়ে অরিন্দম আবার বাসু-সাহেবের দিকে মন দিলেন, খগেন বলছিল, আপনি নাকি কিছু এন. এস. সি. কিনতে এসেছেন।

খগেন তার সিটে ফিরে গেছে। বাসু ইতিমধ্যে গোটা পোস্ট-অফিসটা দেখে নিয়েছেন। না, কেউ ওঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেই। পি. কে. বাসু-হিসাবে কেউ তাঁকে চিহ্নিত করেনি। তাই হাসতে হাসতে বললেন, না ঘোষালমশাই। আমি জাতে ময়রা। সন্দেশ খাই না।

— ময়রা? সন্দেশ খান না? মানে? কিন্তু খগেন যে বলল...

বাসু-সাহেব সদ্যলব্ধ ভিজিটিং-কার্ড একখানা নামিয়ে রাখলেন ঘোষাল মশায়ের টেবিলে। উনি সেটা পড়তে যখন ব্যস্ত তখন বাসু বলতে থাকেন, আমার কাজ কারবার ছিল এতদিন দক্ষিণ কলকাতায়। কিন্তু আমার ছেলে অফিস থেকে এ পাড়ায় কোয়ার্টার্স পেয়েছে। তাই বেণীমাধব নস্কর লেন ছেড়ে সামনের মাসে এ-পাড়ায় উঠে আসছি। তা সিজনে পাঁচ-সাত লাখ টাকার বিজনেসও পাই। আপনি

তো জানেনই যে, কোন পোস্ট-অফিসে এন. এস. সি. জমা পড়ল তা নিয়ে ক্লায়েন্টের কোনও পক্ষপাতিত্ব থাকে না — কিন্তু এজেন্টদের থাকে।

বলে, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বাম চক্ষুটি নিমীলিত করলেন।

ঘোষাল অনুচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, ও-পাড়ায় যেসব ফেসিলিটি পেতেন, এখানেও তাই-তাই পাবেন। মাসে পাঁচ-সাত লাখ?

— না, মাসে বলিনি। সিজন টাইমে মাসে আট লাখও হয়েছে ইয়ার বিফোর লাস্ট। যাহোক, এ পাড়ায় এসে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব!... ও ভালো কথা, আর একটি কাজ আছে ঘোষাল-মশাই। আমার একটা উপকার করতে হবে।

— অত সংকোচ করছেন কেন? বলুন বলুন?

— আমার এক মক্কেল — কমলেশবাবু — কলকাতায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে চায়। ও দর দিচ্ছে সাড়ে সাত, আর মালিক হাঁকছে আট লাখ...

অরিন্দম বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আদার ব্যাপারিকে ওইসব জাহাজের গপ্পো কেন শোনাচ্ছেন চারুবাবু?

বাসু পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করে বললেন, দিন-তিনেক আগে কমলেশবাবু এই ডাকঘর থেকেই আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। আজ সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে শেষ দর জানাবার কথা। কিন্তু ওঁর ঠিকানা লেখা ভিজিটিং কার্ডখানা আমি হারিয়ে ফেলেছি। এই টেলিগ্রামের মাথায় যেসব সাঙ্কেতিক নম্বর-টম্বর লেখা আছে তা থেকে কি জানা যায়, কমলেশবাবুর ঠিকানাটা?

— নিশ্চয় যায়। টেলিগ্রামের ফর্মে প্রেরক নাম-ঠিকানা লিখে দেয়। স্বাক্ষরও করে। এ তো মাত্র তিনদিন আগেকার। এখনি দেখে বলে দিচ্ছি। বি-কা-শ! একটু শোনো তো ইদিকে।

বিকাশ, অর্থাৎ টেলিগ্রাফ-প্রেরক করণিক এগিয়ে আসে।

অনতিবিলম্বেই শ্যেনপক্ষীর নীড়ের সন্ধান পাওয়া গেল ; কমলেশ ঘোষ, মা সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টস, ১৩ বি, তারাতলা রোড।

বাসু বলেন, অ্যাপার্টমেন্টস্ মানে তো মস্ত বাড়ি। অথচ নম্বর-টম্বর তো কিছু নেই।

— তাই তো দেখছি।

বাসু জানতে চান, আর্জেন্ট টেলিগ্রামে জবাব পাঠালে আজ সন্ধ্যা ছয়টার আগে সেটা তারাতলা পৌঁছাবে?

বিকাশের চট জলদি জবাব, অসম্ভব। পরশুর আগে নয়। গোটা পঞ্চাশ আর্জেন্ট টেলিগ্রাম জমা হয়ে আছে।

বিকাশকে বিদায় করে ঘোষালমশাই নিম্নকণ্ঠে বাসু-সাহেবকে বলেন, সাত-আট লাখ টাকার বিজনেস! আপনার কমিশন কোন্ না দশ-বিশ হাজার টাকা হবে? আপনি মশাই একশ'টি মুদ্রা খরচ করতে পারবেন? তাহলে একঘণ্টার মধ্যে টেলিগ্রাফ তারাতলায় বিলি হয়ে যাবে।

— কী ভাবে?

— আমাদের টেলিগ্রাফ-পিয়ন যদুনাথ ট্যাক্সি করে যাবে, বাসে করে ফিরবে। টেলিফোনে তারাতলা পোস্ট-অফিসে আমি জানিয়ে দিচ্ছি। ট্যাক্সি আর বাসভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা, বাকি সত্তর নানান লোককে খুশি করতে — সোজা হিসাব।

বাসু এককথায় রাজি। টেলিগ্রাফে লিখে দিলেন : ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট নেসেসিটেট্স ইনডেফিনিট পোস্টপোনমেন্ট এএএ কলিং ইন পার্সন টু এক্সপ্লেন [অনিবার্য ঘটনাচক্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাপারটা মুলতুবি রাখতে বাধ্য হচ্ছি। সাক্ষাতে সব কথা বুঝিয়ে বলব] — সি. রায়।

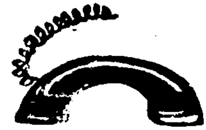

তিন

ডাকঘর থেকে বাইরে এসে ওঁর মনে হল দু-দুটো অসঙ্গতি রয়ে গেল। এক নম্বর — যেটা উনি বলেই ফেলেছিলেন ঘোষাল মশাইকে — 'অ্যাপার্টমেন্টস' কথাটার মানে অনেকগুলি ফ্ল্যাট। সেক্ষেত্রে 'দুই-এর তিন' বা 'তিনের পাঁচ' ইত্যাদি একটা নম্বর ঠিকানায় থাকার কথা, যাতে বোঝা যায় 'কয়'তলায় এবং কত নম্বর চিহ্নিত দরজা। কমলেশ সেটা উল্লেখ করেনি। কেন? সে কি পুরো ঠিকানাটা জানাতে চায় না? সেক্ষেত্রে গোটা ঠিকানাটাই তো তার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত হতে পারে — যেমন হয়েছিল কল্পিত শিখা দত্তের লেখা 'নসীরাম পতিতুণ্ড সেকেন্ড বাই লেন।' দ্বিতীয় প্রশ্ন, তারাতলা রোড-এর বাসিন্দা বেহুদ্দো এতদূর এসে মধ্য কলকাতার একটি পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিস থেকে টেলিগ্রাফটা করবে কেন? অবশ্য তার অনেক অজ্ঞাত কারণ থাকতে পারে। হয়তো ওর কর্মস্থল এ-পাড়ায়। যাই হোক, ওঁকে একবার তারাতলা অঞ্চলে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। হয়তো 'বুনো-হাঁসের' পিছনে এ দৌড়াদৌড়ি অহেতুক। কিন্তু উপায় নেই — 'শিখা দত্ত' ওর নাম না হওয়া সত্ত্বেও যে মেয়েটি ওঁকে দ-য়ে মজিয়েছে সে ওঁর ক্লায়েন্ট।

সামনেই একটা বড় ওষুধের দোকান। বাসু-সাহেব ঢুকে পড়লেন। মধ্য-দিনে তেমন ভিড় নেই। কাউন্টারের বিপরীত থেকে একজন অল্পবয়সী ডিসপেন্সিং কর্মচারী প্রশ্ন করে, বলুন স্যার?

বাসু জানতে চান, ইপ্রাল আছে।

লোকটা নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

— ওষুধটা কোথায় পাব বলতে পারেন?

— আমি ওর নামই শুনিনি।

বাসু জানতে চান, আপনাদের এখানে কোনও ডাক্তারবাবু বসেন?

— বসেন। সকালে আর সন্ধ্যায়। এখন নেই।

হতাশ হয়ে উনি পিছন ফিরছিলেন। কে যেন ওঁর ও-পাশ থেকে বললে, 'ইপ্রাল' কলকাতার বাজারে পাবেন না। পেটেন্টেড ওষুধ। প্রেসক্রিপশনটা সঙ্গে আছে?

বাসু ঘুরে দাঁড়ালেন। বছর পঁয়তাল্লিশের একজন প্রৌঢ়। সাফারি সুট পরনে। জানতে চান, আপনি নিশ্চয় ডাক্তার। বলতে পারেন, ইপ্রাল কী জাতের ওষুধ? মানে কোন অসুখে...

— ওটা বিষ নয়!

— 'বিষ নয়'! এটা বিষ, তা তো আমি বলিনি।

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আজ্ঞে না স্যার, আপনি বলেননি, আপনার বলার কথাও নয়, ব্যারিস্টার-সাহেব! ওটা তো বলবে পাবলিক প্রসিকিউটার? যখন আমি হতভাগার পেট চিরে বলব, 'অত্যধিক পরিমাণে কেউ একে 'ইপ্রাল' খাইয়েছে — সেটাই মৃত্যুর কারণ।'

বাসু এতক্ষণে হেসে ফেলেন। বলেন, এইবার আপনাকে চিনেছি। আপনি অটোপ্সি-সার্জেন ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ সান্যাল।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেসটা কী, স্যার?

— না, মরেনি কেউ। পুলিস একজনের মেডিসিন-ক্যাবিনেট সার্চ করে যেসব ওষুধ পেয়েছে তার মধ্যে ছিল এক শিশি 'ইপ্রাল'। শাদা শাদা ছোটো ছোটো ট্যাবলেট। ওটা কীসের ওষুধ তা জানা থাকা ভালো। তাই, জিজ্ঞাসা করছিলাম।

— 'ইপ্রাল' একটা 'হিপনটিক' — এক রকমের 'ঘুম-পাড়ানিয়া'। বিদেশী ওষুধ। এখানে পাওয়া যায় না। আমরা তার বদলে 'কাম্পোজ', অ্যাট্রিভান, বা অন্য জাতের ওষুধ প্রেসক্রাইব করি। ইপ্রালের বৈশিষ্ট্য এই যে, ঘুমটা খুব গাঢ় হয়। কিন্তু পরদিন ঘুম ভাঙার পর কোনও 'আফটার-এফেক্ট' থাকে না। মাতালের যেমন খোঁয়াড় ভাঙতে বিলম্ব হয়, ইপ্রালে তা হয় না। ঘুম ভাঙলেই খুব ঝরঝরে লাগে।

মার্কিন মুলুকে ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের চিকিৎসায় এর ব্যাপক ব্যবহার।

— যদি কাউকে 'ইপ্রাল' এর ওভারডোজ খাওয়ানো হয়?

— ঘুম পাড়ানিয়ার ওভারডোজ-এর মতো কাণ্ড ঘটবে। তার ঘুম ভাঙবে না, আর আমার ঘুম ছুটে যাবে—

— আপনার?

— নয়? আমি তো অটোপ্সি-সার্জেন। মরাকাটা ঘরে আমাকেই তো পেট চিরে বলতে হবে : ইটস এ কেস অব ওভারডোজ অব স্লিপিং ট্যাবলেটস!

— থ্যাঙ্কু ডক্টর!

— য়ু আর ওয়েলকাম। ধন্যবাদ তো আমিই দেব। পুলিশের পক্ষে সাক্ষী দিতে উঠে বরাবর আপনার ধমক খেয়েছি। আজ প্রশ্নোত্তরের সময় আপনি কিন্তু একবারও ধমকাননি স্যার!

বাসু-সাহেব হা হা করে হেসে ওঠেন।

ডক্টর সান্যাল নমস্কার করে বিদায় হলেন।

বাসু-সাহেব এবার দোকানের মালিকের দিকে ফিরে বলেন, একটা টেলিফোন করতে পারি।

— শ্যিওর! করুন, স্যার।

বোধকরি ওঁদের কথোপকথন কিছুটা শুনেছেন তিনি। টেলিফোনটা দোকানের একান্তে। নিম্নকণ্ঠে কথোপকথন করলে দোকানের আর কেউ শুনতে পাবে না। ঘড়িটা দেখলেন একবার ; বারোটা কুড়ি। তার মানে শুভ্রা দেবীর বাড়ি থেকে ফোন করার পর দু' দুটি ঘণ্টা কেটে গেছে। ইতিমধ্যে কৌশিক কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে কি না জানা দরকার।

দু'বার রিঙিং টোন হতেই রানী লাইনে এলেন : হ্যালো?

— কৌশিক কি কোনও পাত্তা পেল? ওই লাইসেন্সটার ব্যাপারে?

— কোন লাইসেন্স?

— আরে বাপু, আমিই বলছি। লাইসেন্স নাম্বার ; থ্রি-সেভেন-ফাইভ নাইন-সিক্স-টু-ওয়ান!

ওঁকে কোনও ডায়েরি বা-পকেট-বুক দেখতে হল না — নম্বরগুলো পরপর ওঁর মস্তিষ্কে 'গ্রে সেল'-এর খাঁজে খাঁজে সাজানো। কিন্তু রানীদেবী চটজলদি তাঁর খাতা দেখে মিলিয়ে নিয়েছেন। বলেন, হ্যাঁ পেয়েছে। লাইসেন্স হোল্ডারের নাম ডক্টর পি. সি. ব্যানার্জি' — প্রতুলচন্দ্র — এম. আর. সি. পি.। পাম অ্যাভিন্যু যেখানে বন্ডেল রোডে পড়েছে তার কাছাকাছি একটা নার্সিং হোম। অনেক ডাক্তার বসেন। উনিই মালিক। নাম — 'সানিসাইড নার্সিং হোম'।

— এত কথা লাইসেন্সে লেখা থাকে?

— না, থাকে না। কিন্তু কৌশিক টেলিফোনে যখন জানায় যে, ওই যন্ত্রটার লাইসেন্সি ডাক্তার পি. সি. ব্যানার্জি, তখন সুজাতা এখানে ছিল। ঠিকানাটা নিয়ে ও তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যায়। তার ফোনও পেয়েছি। ডক্টর ব্যানার্জিকে সে ধরতে পারেনি ; কিন্তু একথা জানতে পেরেছে ওই নার্সিং হোমেই মাসখানেক আগে ছন্দা বিশ্বাস চাকরি করত। বর্তমানে সে ছন্দা রায়। তার স্বামীর নামটা জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে যে সে অত্যন্ত বড়লোকের একমাত্র পুত্র — মানে, রিয়েল মালটি-মিলিয়নেয়র ধনকুবের! ওদের ঠিকানাটা জানা যায়নি, তবে জাতীয় গ্রন্থাগারের পিছনে আলিপুর রোডে অথবা...

— অলরাইট! অলরাইট! তোমরা কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছ দেখছি। সুজাতা বা কৌশিকের ভেতর কেউ কি ফিরে এসেছে?

— দু'জনেই এখন এখানে।

— দু'জনকেই বেরিয়ে পড়তে বল। জাতীয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র হিসাবে ধরে নিয়ে ম্যাপের উপর এক মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্ত টানলে কলকাতা শহরের যতটা ভূভাগ বৃত্তের ভিতর আসবে তার মধ্যে

কোনায় শুধু সেই ঘরের বাইরের দিকের জানলায় গ্রিল বসানো। ঘরে চৌকি, বিছানা পাতা। টেবিল-চেয়ার কিছু। টেবিলে টেলিফোন, কিছু নকশা ছড়ানো। এক পাশে নানান গৃহ-নির্মাণের সরঞ্জাম স্তূপাকার করে রাখা। স্যানিটারি পাইপ, কমোড, ওয়াশ-বেসিন। গ্যালভানাইজড জলের পাইপ। আরও কীসব সরঞ্জাম বড়ো বড়ো ক্রেটে বাক্সবন্দী করা। বাসুর দিকে একটি চেয়ার বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা তাঁর মুখোমুখি বসল। বাসু জানতে চাইলেন হাইকোর্টের অর্ডারে নাকি এ বাড়ির নির্মাণ-কাজ বন্ধ আছে?

— হ্যাঁ, মাস-দুয়েক। কর্পোরেশনের মতে বেআইনি কাজ হয়েছে।

— আপনি কি কেয়ার-টেকার, মিস্টার ঘোষ?

— সর্ট অফ! এন্টারপ্রেনার আমার বন্ধু। আমি এখানে থাকায় তাকে দারোয়ান রাখতে হয় না। আমিই দেখভাল করি।

— যদি দলবেঁধে ডাকাত আসে?

কমলেশ টেবিলের টানা-ড্রয়ার খুলে একটা কালোমতো যন্ত্র বার করে দেখাল। বললে, আপনি যে বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছেন সে কথাই বলুন। ছন্দা রায়ের কী প্রস্তাবের কথা বলতে চান?

— আমি তো বলতে আসিনি কমলেশবাবু, শুনতে এসেছি।

— এই যে বললেন, ছন্দা রায়ের কাছ থেকে এসেছেন?

— সে তো বটেই। ওই পরিচয় না দিলে আপনি দোর-গোড়া থেকেই আমায় বিদায় দিতেন, তাই নয়? কিন্তু আমি তো বলিনি যে, তার কাছ থেকে কোনও প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

— অ! তার মানে আপনার কিছু বলার নেই?

— সেটাও ঠিক নয়। আমার কিছু বলার আছে। এক নম্বর কথা, ছন্দা রায় মেয়েটি খুব ভালো। তার জীবনে কোনও অশান্তি বা বিড়ম্বনা আসে, এটা আমি চাই না।

— আমিই কী সেটা চাইছি? আমি তার শত্রুপক্ষ নই।

— বটেই তো! আইনত আপনিই যখন ছন্দা রায়ের স্বামী!

লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, বুঝেছি। কাজটা ছন্দা ভালো করেনি। আপনাকে সব কথা বলে ফেলা...

— ফর ইওর ইনফরমেশান, ছন্দা রায় আদৌ বলেনি যে, 'কমলেশ ঘোষ' তার প্রথম পক্ষের স্বামী।

— তাহলে কে বলেছে সে কথা?

— আপনি। এইমাত্র! ছন্দা আমার কাছে এসেছিল তার বান্ধবীর জন্য কিছু লিগাল অ্যাডভাইস নিতে। সে একবারও বলেনি যে, তার প্রথম পক্ষের স্বামী সাত বছর নিরুদ্দেশ ছিল। ওটা আমার আন্দাজ। আপনি এইমাত্র সেটা কনফার্ম করলেন।

লোকটা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকল পুরো একটা মিনিট! তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, ছন্দা যদি আপনার মাধ্যমে কোনও প্রস্তাব না পাঠিয়ে থাকে তাহলে আপনি অনুগ্রহ করে যেতে পারেন।

বাসু জবাব দেবার আগেই কলিং-বেলটা বেজে উঠল। একবার দু'বার।

— কমলেশ জানতে চায়, আপনি কি একা এসেছেন? না গাড়িতে আর কেউ আছে?

— আমি একাই এসেছি। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছি।

— তাহলে কলিং-বেল বাজাচ্ছে কে?

— আপনার কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থী। আমি কেমন করে জানব?

কমলেশ টানা-ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা হিপ-পকেটে ভরে নিল। বলল, আপনাকে একটু কষ্ট দেব, মিস্টার বাসু। আপনাকে এখানে একা ছেড়ে রেখে আমি যেতে পারব না। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে।

— অল রাইট। চলুন।

বাসুকে অগ্রবর্তী করে কমলেশ নিচে নেমে এল। দ্বার খুলে দিল। বাইরে একজন ডাক-পিয়ন। বললে : টেলিগ্রাম! কমলেশ ঘোষ? আছেন?

— আমারই নাম। দাও।

টেলিগ্রাম-পিয়ন খাতায় সই নিয়ে টেলিগ্রামটা হস্তান্তরিত করে চলে গেল। কমলেশ খামটা ছিঁড়ে টেলিগ্রামটা পড়ল। মুখ তুলে বলল, ছন্দারই টেলিগ্রাম। কিন্তু সে তো আপনার আসার সম্ভাবনার কথা কিছু লেখেনি।

— ন্যাচারালি। সে জানে না যে, আমি এখানে আসছি। ইন ফ্যাক্ট, সে আপনার নাম বা ঠিকানা কোনওটাই আমাকে জানায়নি।

— তাহলে আপনি কেন এসেছেন আমার কাছে? শুধু জানাতে যে, ছন্দা একটা লক্ষ্মী মেয়ে, অথবা তার বান্ধবীর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?

— না, মিস্টার ঘোষ। আমি এসেছি ছন্দার বর্তমান ঠিকানার সন্ধানে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা জরুরি দরকার ; কিন্তু সে কোথায় থাকে তা আমি জানি না।

— এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ছন্দা আপনার ক্লায়েন্ট, অথচ আপনি তার ঠিকানা জানেন না?

বাসু জবাব দেবার আগেই দ্বিতলে টেলিফোনটা বেজে উঠল। কমলেশ বলল, আপনার বক্তব্য বলা নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে। এবার আসুন আপনি।

— না, মিস্টার ঘোষ। আমার আরও কিছুটা বলার আছে। কিছুটা শোনারও আছে। আপনি বরং টেলিফোনের ঝামেলাটা প্রথমে মিটিয়ে নিন।

— অল রাইট। তাহলে আপনি আমার সামনে সামনে চলুন।

— কোন প্রয়োজন নেই, কমলেশবাবু। আপনি সার্চ করে দেখে নিতে পারেন আমি নিরস্ত্র। আপনার চেয়ে বয়সে আমি না-হোক পঁচিশ বছরের বড়ো। আপনার হাতে রিভলভার। অত ভয় পাচ্ছেন কেন?

— ভয় আমি পাইনি।

— পেয়েছেন। অন্য কারণে। গিল্টি কনশিয়েন্স। যা হোক। চলুন — উপরে চলুন। আচ্ছা আমিই না হয় আগে আগে যাচ্ছি।

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে আসেন।

টেলিফোনটা তখনও একনাগাড়ে বেজে চলেছে : ক্রিরিং...ক্রিরিং...

চার

বাসু-সাহেব তাঁর চেয়ারে যতক্ষণ না স্থির হয়ে বসলেন ততক্ষণ কমলেশ টেলিফোনটাকে বাজতে দিল। তারপর তুলে নিল যন্ত্রটা। নিজে বসল না। যন্ত্রটার কথা-মুখে — না, 'হ্যালো' ও বলল না, নিজের নামও ঘোষণা করল না — নিজের টেলিফোন নম্বরটা ঘোষণা করল শুধু।

ওর স্থিরদৃষ্টি বাসু-সাহেবের দিকে। নজর হল, তিনি চোখ দুটি বন্ধ করেছেন। আন্দাজ করতে পারল না হেতুটা — বাসু-সাহেব তখন তাঁর মস্তিষ্কের একটি ফোকরে পর্যায়ক্রমে ছয়টি গাণিতিক সংখ্যা গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

ওপক্ষের কথা শুনে নিয়ে কমলেশ বললে, এ-কথা তো টেলিগ্রামেই বলেছ তুমি, তাহলে কখন আসছ!...কী? ন্যাকা সাজবার চেষ্টা কোরো না, তুমি ছাড়া কে এই টেলিগ্রামখানা পাঠাবে?...ঠিক আছে, পরে কথা হবে...না, না, বললাম তো এখন আমি ব্যস্ত আছি। আমার ঘরে ভিজিটার আছে...কী?...সেটা তো তুমি জানই...আয়াম সরি...

বাসু-সাহেব মাঝপথেই উঠে দাঁড়ান। বলেন, লাইনটা ছেড়ো না। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে...

কমলেশ গর্জে ওঠে : সিট্ ডাউন!

নিঃশব্দে টেলিফোনটা রিসিভারে বসিয়ে দেয়।

বাসু-সাহেব ধীরে ধীরে বসে পড়েন নিজের চেয়ারে।

কমলেশ বলে, বলুন, আর কী বলতে চান।

— ছন্দাই ফোন করছিল তো?

— অবান্তর কথা বলবেন না, মিস্টার বাসু। আর আমার প্রাইভেট লাইফে অহেতুক নাক গলাতেও আসবেন না। আপনার যদি কিছু বলার থাকে বলে ফেলুন ; না থাকে বিদায় হন—

— আমার অনেক কিছুই জানবার আছে, মিস্টার ঘোষ।

— তাহলে শুরু করুন। আমাদের দুজনেরই সময়ের দাম আছে।

— এক নম্বর প্রশ্ন : আপনার উপাধি 'ঘোষ', অথচ আইনত যিনি আপনার 'স্ত্রী', তাঁর উপাধি 'রায়' — ইতিপূর্বে ছিল 'বিশ্বাস'। এটা কেমন করে হল?

— সেটা আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জেনে নেবেন। আর কিছু?

— গত সাত বছর আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেননি কেন? তাকে নতুন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ দিতে?

— লুক হিয়ার, মিস্টার বাসু! আমি কিছু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নেই যে, আপনি ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাবেন, আর আমি জবাব দিয়ে যাব। এটা আপনি আশা করেন কোন আক্কেলে? আমার একটিমাত্র কথা বলার আছে : আমি বেআইনি কাজ কিছু করছি না। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের কোনও ধারাই আমি লঙ্ঘন করতে চাইছি না। ফলে আপনার কিছু করণীয় নেই। আপনি ফুটুন!

— 'ফুটুন?'

— মানে, মানে-মানে কেটে পড়ুন।

— আই সী! আপনার ওই শব্দপ্রয়োগে — 'ফুটুন' কথাটাতে আমার বাকি যেটুকু জানবার ছিল, তা জানা হয়ে গেছে। 'ফোটো' কথাটা যে সম্মানার্থে-আপনাদের ক্লাসের মানুষ 'ফুটুন' বলে থাকেন, তা আমার ঠিক জানা ছিল না।

উঠে দাঁড়ান উনি। দ্বারের দিকে দু-একপদ গিয়ে ফিরে দাঁড়ান। বলেন, ছন্দা তোমার ঠিকানা আমাকে জানায়নি কমলেশ, আমি নিজেই তা খুঁজে বার করেছি। আর,...ও হ্যাঁ, ও টেলিগ্রামটাও ছন্দা রায় তোমাকে পাঠায়নি ওটাও আমিই পাঠিয়েছি...

— কোন্ টেলিগ্রাম?

— ওই যেটা আমার উপস্থিতিতে তুমি ডেলিভারি নিলে — 'ইম্পর্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট নেসেসিটেট্স্ ইনডেফিনিট পোস্টপোনমেন্ট' এট্সেটেরা এটসেটেরা...

কমলেশ বুকপকেট থেকে টেলিগ্রামখানা বার করে পড়ে দেখল। ওর চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল। বললে, ইজ দ্যাট সো? তা আপনিই বা আমাকে অমন একখানা টেলিগ্রাম পাঠালেন কেন? সি. রায়ের নাম ভাঁড়িয়ে?

বাসু বললেন, জবাবে আমিও তো ওই কথা বলতে পারি, কমলেশ! ওই যেটা তুমি এখন আমাকে শোনালে? পারি না?

— কী কথা?

— 'লুক হিয়ার, মিস্টার ঘোষ! আমি কিছু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নেই যে, আপনি ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাবেন আর আমি জবাব দিয়ে যাব!'

কমলেশ হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে।

বাসু বলেন, হয় আমরা পরস্পরের কাছে প্রশ্ন পেশ করব এবং জবাব শুনব, অথবা তুমি তাতে রাজি

না থাকলে, আমি আপাতত 'ফুটব' এবং পরে এমন ব্যবস্থা করব, যাতে তুমি ফুটন্ত ডেকচিতে 'ফুটবে'!

কমলেশ শান্ত স্বরে বললে, বসুন। অলরাইট! আমরা একের পর একজন প্রশ্ন করব এবং অপরপক্ষের জবাব শুনব। একবার আমি, একবার আপনি। পর্যায়ক্রমে। আপাতত বলুন, আমার শেষ প্রশ্নটার কী জবাব?

— তোমার শেষ প্রশ্নটা ছিল, সি. রায়ের নাম ভাঁড়িয়ে? আমার জবাব হচ্ছে ; সি. রায় আমার ক্লায়েন্ট! সলিসিটার ক্লায়েন্টের তরফে চিঠি লিখলে বা টেলিগ্রাম করলে আইনত তাকে নাম ভাঁড়ানো বলে না।

— সে কথা আমি বলতে চাইনি, আমার প্রশ্ন...

— আই নো, আই নো! কিন্তু শেষ প্রশ্নটা তোমার ওই রকমই ছিল। আমি তার জবাব দিয়েছি। তোমার সার্ভিস নেট-এ আটকে গেছে। এবার আমার সার্ভিস করার কথা। তুমি রিটার্ন দেবে। তাই না? শর্ত হয়েছে দুপক্ষই পর পর প্রশ্ন করব। সুতরাং এবার বলো, কেন তুমি সাত বছর আত্মগোপন করে প্রতিক্ষা করেছিলে?

— আমি..আমি আত্মগোপন করেছিলাম না মোটেই। বাস-অ্যাকসিডেন্ট-এ আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যায়, — ওই যাকে বলে অ্যামনেশিয়া — হঠাৎ আমার পূর্বস্মৃতি ফিরে এসেছে!

বাসু হাসলেন। বললেন, সুন্দর জবাবটা দিয়েছ, কমলেশ। তোমার একটিই ভুল হয়েছে—কর্তৃবাচক পদটির দ্বিত্বপ্রয়োগ! বুঝলে না? কৈফিয়ৎটা তোমার সড়গড় হয়নি। তোমার বলা উচিত ছিল, 'আমি আত্মগোপন করে ছিলাম না মোটেই।'

— তাই তো বলেছি আমি!

— না, তা বলোনি। বলেছ : 'আমি...আমি আত্মগোপন করেছিলাম না মোটেই।' প্রথম 'আমি'র পর যে সামান্য বিরতি দিয়ে দ্বিতীয়বার 'আমি' বললে, ওটাই প্রশ্নকর্তাকে বুঝিয়ে দিল : এটা মিথ্যা অজুহাত। সে যা হোক, এবার তোমার প্রশ্ন করার পালা। সার্ভ করো।

— আপনার ক্লায়েন্ট...

— সরি, ফর ইন্টারাপ্টিং য়ু। এই পর্যায়ে আমার পক্ষে জানিয়ে রাখা শোভন যে, আমার ক্লায়েন্ট 'ছন্দা' নয়, তার স্বামী মিঃ রায়। ইয়েস, বলো কী জানতে চাইছ?

— আপনি তো এতক্ষণ বলেননি যে, 'ছন্দা' নয়, 'ত্রিদিবনারায়ণ'ই আপনার ক্লায়েন্ট! কেন?

— তার হেতু তুমি তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হচ্ছিলে না। দোর থেকেই আমাকে 'ফোটাতে' চাইছিলে। এখন শর্ত হয়েছে দুজনেই প্রশ্ন করব এবং উত্তর শুনব, তাই।

— সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন—

— সরি, কমলেশ! এবারও তোমার সার্ভিস নেটে আটকে গেছে! ডাব্‌ল্ ফল্ট্। তোমার প্রশ্ন তুমি পেশ করেছ এবং আমি তার জবাব দিয়েছি। এবার আমার প্রশ্ন করার পালা : তুমি কি জান যে, ত্রিদিবনারায়ণ রায়ও জানতে পেরেছে যে, তার স্ত্রীর প্রথমপক্ষের স্বামী জীবিত এবং সে ব্ল্যাকমেলিং-এর ধান্দায় আছে?

কমলেশ স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় আত্মগতভাবে বললে, ইম্পসিব্‌ল!

— কোন্‌টা ইম্পসিব্‌ল্? ত্রিদিবনারায়ণ জানে না ছন্দার প্রথম স্বামী জীবিত থাকার তথ্যটা? না কি ব্ল্যাকমেলিং করবার কথাটা?

— কে ব্ল্যাকমেলিং করতে চাইছে? সে প্রশ্ন তো এখনও ওঠেনি?

— না, ত্রিদিবের বিশ্বাস তার স্ত্রীকে ব্ল্যাকমেলিং করতে চাইছে একজন তৃতীয়পক্ষ — একজন প্রফেশনাল ব্ল্যাকমেলার — যে, ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছে ধনকুবের ত্রিদিবনারায়ণের স্ত্রী অন্যপূর্বা!

কমলেশের বোধকরি গুলিয়ে গেল খেলার আইনটা। এক-একবার সার্ভ করার কথা। কে কাকে

প্রশ্ন করছে আর কে কাকে জবাব দিচ্ছে তার হিসাবটার কথা তার মনে রইল না।

কমলেশ বললে, তৃতীয়পক্ষ! তা হতেই পারে না। তৃতীয়পক্ষ কোথা থেকে আসবে? আর ত্রিদিব এমন গবেট...

— না, কমলেশ! তুমি ত্রিদিবকে যতটা গবেট ভাবছ, ততটা সে নয়!

— কেন? তার 'অতিবুদ্ধির' কী পরিচয় পেয়েছেন আপনি?

— তা পেয়েছি বইকি কিছুটা। তার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়নি যে, সে আলালের ঘরের দুলাল।

— তাহলে বলব, মানুষ চেনার ক্ষমতা আপনার আদৌ নেই!

— কিন্তু এ কথা তো ঠিক — একটু আত্মশ্লাঘা হয়ে যাচ্ছে — ত্রিদিব খুঁজে খুঁজে জব্বর উকিলকেই কেস্‌টা দিয়েছে। একটা ফেরেব্বাজ টাউটের পাল্লায় পড়ে রক্তচোষা বাদুড়ের খপ্পড়ে পড়েনি—

কমলেশ বাধা দিয়ে বললে, তার কারণ অন্য কিছুও হতে—

ওকে বাধা দিয়ে বাসু বলে ওঠেন, তা অবশ্য হতে পারে, মানে তুমি যা বলছ...

— আমি আবার কী বললাম?

— অর্থাৎ ত্রিদিব আমাকে নিজে নির্বাচন করেনি। সে ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল বটে। কিন্তু আমাকে নির্বাচন করেছেন তার স্বনামধন্য পিতৃদেব!

— আমি মোটেই সে কথা বলিনি। ত্রিবিক্রমনারায়ণ কিছুই জানেন না এখনও।

— তুমি বলতে চাও যে, ত্রিদিব যে একটি হাসপাতালের নার্সকে বেমক্কা বিয়ে করে বসে আছে সে খবরটাও ধনকুবের ত্রিবিক্রমনারায়ণ রায় জানেন না?

হঠাৎ কী খেয়াল হয় কমলেশের। সে আচমকা উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনি ক্রমাগত আমার পেট থেকে কথা বের করে নিচ্ছেন। অথচ নিজে থেকে কিছুই বলছেন না।

— আমিও তো তোমাকে বলছি, কমলেশ। বলছি, সাবধান হও!

— সাবধান হব! কেন? কী করেছি আমি?

— সেটা তুমিও জান, আমিও জানি। সেটা আলোচনা না করা দুপক্ষেরই মঙ্গল। তোমার সঙ্গে আমার যেমন কোনও দোস্তি নেই, তেমনি কোনও শত্রুতাও নেই। আমি শুধু আমার ক্লায়েন্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আর সেটা যদি বিনা রক্তপাতে হয়...

— 'বিনা রক্তপাতে' মানে?

— তুমি তো গবেট নও, কমলেশ! ত্রিবিক্রমনারায়ণ তাঁর পারিবারিক সুনাম রক্ষার জন্যে কতদূর যেতে পারেন...

— আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন?

— আমার স্বার্থ?

— আপনার ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টের স্বার্থ জড়িত আছে বইকি।

— তার মানে ধনকুবের ত্রিবিক্রমনারায়ণের পারিবারিক সুনাম নষ্ট করতে তুমি বদ্ধপরিকর?

— তেমন কথা আমি আদৌ বলিনি!

— বলনি। ইঙ্গিত করেছ, যদি তোমার স্ত্রী টাকাটা না মিটিয়ে দেয়।

দুর্ভাগ্য! নিতান্ত দুর্ভাগ্য! এই মুহূর্তে আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা।

কথার মারপ্যাঁচে সাক্ষীকে পেড়ে ফেলাই ওঁর পেশা ও নেশা। সেই কায়দাতে শুভ্রার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন ওঁর ক্লায়েন্টের নাম। এখানেও সেই একই কায়দায় কমলেশের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁর ক্লায়েন্টের স্বামী ও শ্বশুরের নাম। কথাবার্তা আর একটু চালাতে পারলে ছন্দা রায়ের ঠিকানা অথবা টেলিফোন নাম্বারটা ঠিক সংগ্রহ করা যেত। অথচ ওই ব্রাহ্মমুহূর্তেই ক্রিরিং-ক্রিরিং করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। যেন সম্মোহনের একটা ঘোর থেকে জেগে উঠল কমলেশ। যন্ত্রটা তুলে

নিয়ে এবার আর নাম্বার বলল না, বলল—

কমল বলছি...বলো?...না, ওয়েট! একটু লাইনটা ধরো...

যন্ত্রটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। বাসুসাহেবের দিকে ফিরে শান্ত স্বরে বললে, প্লিজ মিস্টার বাসু! এবার আসুন আপনি।

— ছন্দাই আবার ফোন করছে?

— গর্জে উঠল কমলেশ, দ্যাটস্ নান্ অব ইয়োর বিজনেস! প্লিজ গেট আউট!

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। শান্তস্বরে বললেন, তুমি অহেতুক রাগারাগি করছ কেন কমলেশ? আমি তো তোমার শত্রুপক্ষ নই!

কমলেশ হিপপকেট থেকে তার আত্মরক্ষার অস্ত্রটা বার করে বলল, লুক হিয়ার মিস্টার বাসু। আমি আপনার ক্লায়েন্টের মতো আলালের ঘরের দুলালও নই, গবেটও নই! ফ্যাঙ্কি-পাইলের মাঙ্কিটার দুম-দুম শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

শেষ প্রশ্নটা আপাত-অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তার মর্মগ্রহণে অসুবিধা হল না বাসু-সাহেবের। অদূরেই কোনও বাড়িতে পাইল-বনিয়াদ্ বানানোর জন্য সাত-সেকেন্ড পর পর একটা 'দুম্' শব্দ হচ্ছে। সেটার কথাই বলছে। কমলেশ সেই অপ্রাসঙ্গিক কথাটা অর্থবহ করে তুলল তার পরবর্তী কথায় : ঠিক ওই শব্দটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফায়ার করলে ত্রিসীমানায় কেউ বুঝতে পারবে না, বাসু-সাহেব তাঁর মানবলীলা এই অসমাপ্ত প্রাসাদের ভিতর সংবরণ করলেন। আর বিলিভ ইট অর নট—এ বাড়ির পিছনে প্লিন্থ ভরাট করানোর জন্য বিরাট বড়ো বড়ো গর্ত খোঁড়া আছে। লাশ পাচার করতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না।

বাসু বলে ওঠেন, এসব কী বলছ, কমলেশ?

মারণযন্ত্রটা উঁচু করে জবাবে ও বলল, আমি তিন গুণব। তার মধ্যে আপনি যদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু না করেন...আই মিন, না 'ফোটেন'...

— অলরাইট, অলরাইট! ওটা নামিয়ে রাখো...ওটা লোডেড...

পায়ে-পায়ে উনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন। কমল দেখা গেল অত্যন্ত সাবধানী। বাসু-সাহেবের পিছনে পিছনে সে নিজেও নেমে এল নিচে। দরজা খুলে বৃদ্ধকে আক্ষরিক অর্থে পথে নামিয়ে ইয়েল-লক দরজা বন্ধ করে দিল। বাসু ঘড়ি দেখলেন। অনেক বেলা হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে কিছু প্রাইভেট-কার যাতায়াত করছে বটে, খালি ট্যাক্সির কোনও চিহ্নমাত্র নেই। কী করবেন স্থির করতে গিয়ে প্রতিবর্তী প্রেরণায় ডান হাতটা চলে গেল পকেটে, পাইপ-পাউচ-এর সন্ধানে। দুর্ভাগ্য সবদিকেই। অনেকক্ষণ খচর্-খচর্ করেও লাইটারটা জ্বালাতে পারলেন না। সম্ভবত জ্বালানি ফুরিয়েছে। রি-ফিল করতে হবে। আপাতত সমাধান : একটি দেশলাই খরিদ করা। নজর গেল গলি রাস্তার ওপারে—যে পান-বিড়ির দোকানে সংবাদ নিয়েছিলেন প্রথমে। লোকটার গালে এখনও পান-ঠাসা। দোকানের সামনে একটি মাত্র খদ্দের। মটোর সাইকেলে বসে কী যেন বলছে। লোকটার মাথায় হেলমেট, চোখে সানগ্লাস—চেনা মুশকিল। বাসু গুটিগুটি সেদিকপানে এগিয়ে গেলেন।

পানওয়ালা তখন বলছে, আজ্ঞে না বাবু, আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন। এই গলিতে আমি হাফ-প্যান্ট পরে মার্বেল খেলেছি, এ পাড়ার সব্বাইকে চিনি। 'দত্ত-মজুমদার' নামে কেউ এ গলিতে থাকেন না।

বাসু এসে দাঁড়ালেন। মোটর-বাইকের আরোহীর বয়স সাতাশ-আঠাশ। নিম্নাঙ্গে জীন্‌স্, ঊর্ধ্বাঙ্গে উইন্ড-চিটার। অত্যন্ত বলিষ্ঠগঠন যুবাপুরুষ। বাসু-সাহেবকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে তাঁকেই প্রশ্ন করে, আপনি কি এপাড়ায় থাকেন, দাদু?

বাসু বললেন, না দাদু, থাকি না। তবে অনেক অনেক দত্ত-মজুমদারকে চিনি। কেউ এ পাড়ার, কেউ বে-পাড়ার। বাই এনি চান্স, তুমি কি কমলেশ দত্ত-মজুমদারকে খুঁজছ?

লোকটা পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য সিগ্রেট-কেস বার করে ঠোঁটে একটা সিগ্রেট চেপে ধরে লাইটার

জ্বালিয়ে সেটাকে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কমলেশ নয়, কমলচন্দ্র দত্ত মজুমদার...

— বাসু হাত বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে লাইটারটা চেয়ে নিয়ে নিজের পাইপটা ধরিয়ে বললেন, সরি। তাহলে সে অন্য কমল। আমি বলছিলাম কুলীন-কমলের কথা।

ছেলেটি উৎসাহ দেখাল, কী কমল? 'কুলীন' কমল মানে?

— কুলীনরা সেকালে অনেক অনেক বিয়ে করত শোননি? আমি যে কমল-এর কথা বলছি সে ছিল তেমনি বিবাহ-বিশারদ কমল। কমলচন্দ্র নয়, কমলেশ...

ছেলেটা তার বাহনকে স্ট্যান্ডের উপর দাঁড় করায়। ঘনিয়ে এসে বলে, আপনি যার কথা বলছেন, আমিও বোধহয় তার কথাই বলছি...

— বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, রোগা, মুখে বসন্তের দাগ?

— এগ্‌জ্যাক্টলি। কোথায় থাকে জানেন?

— জানি। এ পাড়ায় নয়।

— পানওয়ালা ওপরপড়া হয়ে বলে ওঠে, দেখলেন? এ পাড়ার নাড়ি-নক্ষত্র আমার নখদর্পণে।

ছেলেটি বলে, তবে কোথায়?

বাসু বললেন, এসো, ওই দোকানে গিয়ে একটু চা পান করা যাক। তোমার মটোর-সাইকেলটা এখানেই থাক।...কী বল!

শেষ প্রশ্নটা পান-বিড়ি-ওয়ালাকে। সে স্বীকৃত হল।

চায়ের দোকানে দূরতমপ্রান্তে দুজনে গিয়ে বসলেন। এই পড়ন্ত বেলায় আর কোনও খদ্দের ছিল না। দোকানদারও ঝিমোচ্ছিল। ঢুলু-ঢুলু চোখে জানতে চায়, কী দেব, স্যার?

— দু-কাপ চা।

— ঠিক আছে, বসুন। একটু দেরি হবে কিন্তু। আঁচটা নেমে গেছে।

বাসু বললেন, 'উঁচু করো। আমাদের তাড়া নেই।

ছেলেটি বসল দেয়াল-ঘেঁষে। রাস্তার দিকে মুখ করে, যাতে বাহনটাকে নজরে রাখা যায়।

বাসু জানতে চান, কমলকে খুঁজছ কেন? আগে সেটাই বল?

— সে অনেক কথা, দাদু! আপনি তার বর্তমান ঠিকানাটা জানেন?

— জানি। তোমাকে জানাতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটি কৌতূহল মেটাতে হবে। প্রথম প্রশ্ন : তুমি যাকে খুঁজছ সেই কমল যাকে ফাঁসিয়েছে সে মেয়েটি তোমার কে?

ছেলেটি একটু অবাক হল। বলল, আপনি যে গণৎকার ঠাকুরের মতো ভেল্‌কি শুরু করলেন, দাদু! কেমন করে জানলেন যে, আমি যে কমলকে খুঁজছি সে একটি মহিলাকে ফাঁসিয়েছে?

বাসু বললেন, দেখ ভাই। আমি খোলা কথার মানুষ। এভাবে উলটো-পালটা প্রশ্নোত্তর করলে আমার চলবে না। তুমি যদি আমার সাহায্য চাও তাহলে আমাকে সাহায্যও করতে হবে। তুমি না চাও কথোপকথন বন্ধ করে আমরা দু-জনেই যে যার বাড়ি পানে হাঁটা ধরতে পারি। আর যদি আমার মাধ্যমে কমলের বর্তমান ঠিকানাটা জানতে চাও...

ছেলেটি বাধা দিয়ে বলে, বুঝেছি, বুঝেছি। বলুন, কী জানতে চান?

বাসু পকেট থেকে তাঁর নামাঙ্কিত একটি কার্ড ওর সামনে টেবিলে রেখে বলেন, প্রথম প্রশ্ন, তোমার নাম ও ঠিকানা।

ছেলেটা ওঁর কার্ডখানার দিকে তাকিয়েও দেখল না। ফেরত দেবার জন্য বাড়িয়ে ধরে বললে, মাপ করবেন, দাদু, আমি তে-তাস খেলার আসরে প্রথমে তিন ডীল ব্লাইন্ড খেলি।

বাসু নির্বিবাদে ওঁর নিজের নামাঙ্কিত কার্ডখানি তুলে নিয়ে বললেন, তাহলে ওই প্রশ্নটার জবাব দাও, যে মেয়েটিকে কমল ফাঁসিয়েছে সে তোমার কে?

— আমার ক্লায়েন্ট।

— যেহেতু এটা সেকেন্ড ডিল তাই বোধহয় আমার প্রশ্নটা করা সমীচীন হবে না — মেয়েটি তোমার ক্লায়েন্ট হল কোন সুবাদে — ডাক্তারি, ওকালতি, ঘটকালি...

— আজ্ঞে না, ওর একটাও নয়। আমি কমিশন নিয়ে কার্যোদ্ধার করি। আমার ক্লায়েন্টের বিশ হাজার টাকা মেরে দিয়ে ওই হারামজাদা গা-ঢাকা দিয়েছে। টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে আমি কমিশন পাব টোয়েন্টি-ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ পাঁচ হাজার নেট!

— নেট? অর্থাৎ তোমার খরচ-খরচা ছাড়া?

— আজ্ঞে হ্যাঁ! এক্সপেন্সেস্ পৃথক। কিন্তু এত বিস্তারিত জানতে চাইছেন কেন?

— একই হেতুতে। আমিও ওই বিবাহ-বিশারদ কমলকে খুঁজছি একই কারণে। তাই ভাবছি, তোমাকে কমিশনে কাজটার দায়িত্ব দেওয়া যায় কি না?

— কেন যাবে না! আমার রেট বাঁধা। টোয়েন্টি-ফাইভ। আপনার আত্মীয়ার কত খোয়া গেছে? কত দিন আগে?

— আমার মনে হচ্ছে থার্ড ডিল খেলা হয়ে গেছে। এখন তোমার নাম পরিচয়টা...

— আজ্ঞে না। আপনি যে পুলিশের লোক নন, তার প্রমাণ এখনও আমি পাইনি।

— আমার ভিজিটিং কার্ড তো তুমি দেখতেই চাইলে না।

— ভিজিটিং কার্ড-এ কিছু প্রমাণ হয় নাকি? সঙ্গে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে? কিংবা পাসপোর্ট?

একটি বাচ্চা ছেলে দু-কাপ চা নামিয়ে রাখল। তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বাসু উঠে পড়লেন। তাঁর ভিজিটিং কার্ডখানা এই অজ্ঞাতনামা যুবকটির দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, হিম্মতে যদি কুলায় তাহলে ওই ঠিকানায় কাল সকালে আটটার সময় আমার সঙ্গে দেখা কর। আমার ড্রাউভিং লাইসেন্স আর পাসপোর্ট দুটোই দেখাব। তবে হ্যাঁ...তোমার আইডেন্টিফিকেশনের সন্দেহাতীত প্রমাণটা নিয়ে যেও, ব্রাদার।

ছেলেটি বাধা দেয়, শুনুন, স্যার! আচ্ছা সব কথা বলছি...

বাসু রাজি হলেন না। বললেন, সরি! য়ু হ্যাভ মিস্ড্ য়োর বাস্। কাল সকাল আটটায়। আমার চেম্বারে।

ছেলেটি উবুড়-করা কার্ডটা এবার চিত করে দেখল। কোন উচ্চবাচ্য করল না। রাস্তা পার হয়ে মটোর বাইকে সওয়ার হল। পাড়া কাঁপিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল পুবমুখো।

বাসুও রাস্তা পার হলেন। লক্ষ্য হল পানওয়ালা দুলে দুলে বিড়ি বানিয়ে চলেছে বটে কিন্তু ওঁদের দু-জনকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে নজর করছে। বাসু ওর কাছে ঘনিয়ে এসে বললেন, একটা দেশলাই দেখি।

লোকটা 'নিক্কথায়' একটা টেক্কামার্কা চতুষ্কোণ ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরল। বাসুও হিপ-পকেট থেকে ভারি ওয়ালেটটা বার করে তার গর্ভ থেকে বার করে আনলেন একটা বিশ টাকার নোট। এবার লোকটা পানের পিক্ ফেলতে বাধ্য হল। একটু ধমকের সুরে বললে, দেশলাই কিনে কি বিশ টাকার নোট ভাঙানো যায়, বাবু?

— না, যায় না!

— তাহলে? খুচরো দিন?

— না! গোটা নোটখানাই তোমার। ভাঙানি দিতে হবে না তোমাকে।

লোকটার গালে ঠাসা পান। তবু মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

বাসু পাদপূরণ করলেন, তুমি এ পাড়ায় হাফপ্যান্ট পরে ড্যাংগুলি খেলেছ। সবাইকে চেন। তোমাকে বেশ চালাক-চতুরও মনে হচ্ছে আমার। তাই তোমার কাছে আমি কিছু সাহায্য চাইব। ও বিশ টাকা

জিনিস আছে...

— জানি, জানি, কিন্তু শুভ্রাদির নাম্বারটা...

— তোমাকে আরও জানাই, মিস্টার পি. কে. বাসু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমার পাশেই তিনি বসে আছে। তুমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলবে?

— আর কোনও অলটারনেটিভ্ রেখেছেন আপনারা? দিন!

বাসু ওঁর হাত থেকে টেলিফোন-যন্ত্রটা নিয়ে তার কথামুখে বললেন, অনেক ভুগিয়েছ ছন্দা, এবার এসে মুখোমুখি বসে সব কথা বলবে?

— তার আগে একটা কথা বলুন, আপনি কি ওকে একটা টেলিগ্রাম করেছেন?

— 'ওকে' মানে? তোমার বান্ধবীর স্বামী নিরুদ্দিষ্ট কমলেশ ঘোষকে? হ্যাঁ, করেছি।

— আপনি ওর নাম-ঠিকানা জানলেন কীভাবে?

— ঠিক যেভাবে তোমার এবং তোমার স্বামী ত্রিদিবনারায়ণ রাওয়ের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। কিন্তু সে-সব কথা টেলিফোনে আলোচনা করতে চাই না। তুমি কি একবার আসতে পার?

— না! আপনি ইতিমধ্যেই সর্বনাশ যা করার তা করেছেন! আর না!

— তাহলে আমিই তোমাদের আলিপুরের বাড়িতে...

— সর্বনাশ! না, না, সে চেষ্টাও করবেন না।

— তাহলে? একটা কিছু তো করতে হবেই। উই মাস্ট সিট অ্যাক্রস্ দ্য টেব্‌ল্ সাম্‌হোয়্যার!

— অল রাইট। আমিই আসছি। আধঘণ্টার মধ্যে।

— এস। তবে তোমার মারুতি গাড়িতে নয়। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা ফ্লাইং-ট্যাক্সি ধরে।

— কেন বলুন তো?

— তুমি কি এখনও টের পাওনি যে, তোমাকে একজন 'ফলো' করছে?

— না তো? কে? কেন? আমার পিছু নেওয়ার কী উদ্দেশ্য?

— সেটা তো তুমিই আমাকে বলবে, ছন্দা।

* * *

আধঘণ্টার মধ্যে এল মেয়েটি।

ওঁর একান্ত কক্ষে বসলেন দু-জনে।

ছন্দা মুখ খোলার আগেই উনি একনিশ্বাসে বললেন, আ'য়াম সরি, ছন্দা। আমি জানতাম না, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগেই রানুকে একটা রিটেইনার দিয়ে এসেছিলে!

ছন্দা অবাক হয়ে বলে, তাতে কী হল?

— তাতে এই হল যে, রানু 'রিটেইনার' গ্রহণের মুহূর্ত থেকে তুমি আমার ক্লায়েন্ট। তুমি জান না, এথিক্যাল কারণে ক্লায়েন্টের জন্যে আমি জান-কবুল। তাই সারা দিনে তোমার নাম, স্বামীর নাম, স্বশুরের নাম, মায়, তোমার প্রথম স্বামীর নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে ফেলেছি।

— আপনি জানেন না, এইভাবে আপনি আমার কী সর্বনাশ করে বসে আছেন!

— না, তা নয়। সে যাই হোক, তুমি কমলেশের সঙ্গে সন্ধ্যা পাঁচটার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে পারলে না কেন?

— কারণ আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

— কমলেশ কেন দেখা করতে বলেছে? সে কী চায়?

— এখনও বোঝেননি? টাকা।

— কত?

— কাল সকালে ব্যাঙ্ক খোলার আগে দুই হাজার। এ সপ্তাহের ভিতর দশ হাজার।

— অত টাকা তোমার আছে?

— না নেই। ধার করতে পারি।

— কেন? তুমি তো বড়োলোকের বউ। তোমার স্বামী তো কোটি কোটি টাকার ওয়ারিশান।

— সে-কথা আপনি কেমন করে জানলেন?

— সে-কথা মুলতুবি থাক না, ছন্দা। আমি কি ভুল বলেছি?

— না, ভুল নয়। তবে স্বামী বর্তমানে কপর্দকহীন। তাছাড়া তার টাকা আমি নেব কেমন করে, কেন নেব?

— ঠিক কথা। ত্রিদিব কি জানে কমলেশের কথা?

— না!

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। নীরবতা ভেঙে ছন্দাই প্রশ্ন করে, এত কথা আপনি কী করে জানলেন বলবেন না?

— সে অনেক কথা। সে-সব তোমার না জানলেও চলবে। বরং আমি যা জানতে চাই তা জানাও। ডাক্তার পি. সি. ব্যানার্জি কে?

ছন্দা একটু সময় নিল জবাবটা দিতে। গুছিয়ে নিয়ে বললে, আমার এক্স-এমপ্লয়ার। তাঁর নার্সিং-হোমে আমি নার্স হিসাবে চাকরি করতাম, মানে এই বিয়ের আগে।

— ত্রিদিব কি তার কথা জানে?

— হ্যাঁ, ডাক্তার ব্যানার্জিকে সে চেনে বইকি। তাঁর নার্সিং হোমেই তো ও ভর্তি হয়েছিল। সেখানেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি তার নাইট নার্স ছিলাম।

একটু চুপচাপ। তারপর ছন্দা জানতে চায়, আপনি তো সব কথাই জানতে পেরেছেন। এখন একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন?

— কী কথা?

— একটা মানুষ যদি সাতটা বছর নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে, তাহলে আইনের চোখে সে কি মৃত নয়? সাত-সাতটা বছর স্বামী তাকে দেখভাল করেনি, মুখের অন্ন, পরিধেয় বস্ত্র জোগায়নি, সে যে বেঁচে আছে, শুধু আড়ালে লুকিয়ে আছে তা পর্যন্ত জানায়নি। আর সাত-সাতটা বছর জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যদি সেই তথাকথিত 'বিধবা' নতুন করে সংসার পাততে চায় তাহলে আইন তাকে সে অধিকার দেবে না?

— দেবে। সাত বছর ধরে কেউ যদি নিরুদ্দেশ থাকে তবে আইনের চোখে সে তথাকথিত মৃত। বিধবা পত্নী — বলা উচিৎ তার পরিত্যক্তা পত্নী, যদি নতুন করে কাউকে বিয়ে করে তবে সে বিবাহ সিদ্ধ।

ছন্দার মুখটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রথম সূর্যের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োটা যেমন ধীরে ধীরে ঝলমল করে ফুটে ওঠে। একটা দমবন্ধকরা শ্বাস — হয়তো কয়েক মাস ধরে এই দীর্ঘশ্বাসটা তার বুকে আটকে ছিল — ত্যাগ করে বলল, এই কথাটাই আজ সকালে আমি জানতে এসেছিলাম। আপনি আমাকে বাঁচালেন।

বাসু-সাহেবের মুখটা বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তিনি ধীরে ধীর নেতিবাচক ভঙ্গিতে দু-দিকে মাথা নাড়ছিলেন।

ছন্দা জানতে চায়, কী 'না'?

— আই অ্যাম সরি, ছন্দা। সাত বছর নিরুদ্দিষ্টের পত্নী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে এবং সে বিবাহ আইনত সিদ্ধ একটা বিশেষ শর্তসাপেক্ষে। প্রোভাইডেড্ ওই নিরুদ্দিষ্ট প্রথম স্বামী সশরীরে কোনদিন ফিরে না আসে। যে মুহূর্তে সে রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করবে, সেই মুহূর্তেই ওই দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ : 'নাল্ অ্যান্ড ভয়েড!'

ব্যাখ্যাটা দিতে ওঁর দু-মিনিটও লাগেনি, কিন্তু মনে হল পুরো দিনটাই কেটে গেছে। সূর্য নেমে গেল

অস্তাচলে — কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্রশিখরের রক্তিমাভা ঢাকা পড়ে গেল কালো আবরণে। ঘনিয়ে এল অন্ধকার।

ছন্দা ওঁর দিকে দু-চোখ মেলে তাকাল। তার ডাগর দুটি চোখ জলে ভরে এল। সে সংকোচ করল না, আঁচল দিয়ে চোখ দুটি মুছল না। ওর দু-গাল দিয়ে অশ্রুর দুটি ধারা নেমে এল। অস্ফুটে বলল, বেচারি।

— বেচারি? কার কথা বলছ?

— ত্রিদিব। আমার স্বামী।

বাসু ওর পিঠে একখানি হাত রাখলেন। বললেন, ওর সব কথা আমাকে বুঝিয়ে বল, ছন্দা? কেন সে 'বেচারি'? কমলেশ অর্থমূল্যে তোমাকে ডিভোর্স দিতে পারে। তাহলে ত্রিদিবের সঙ্গে তোমার বিবাহটা...

— তা হবার নয়, স্যার! ত্রিবিক্রমনারায়ণ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে, আমি আইনত তাঁর পুত্রবধূ নই...

— তাই বা কেন? তাঁকে অস্বীকার করে ত্রিদিব তো তোমাকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে...

— তাই তো বলছি, 'বেচারি ত্রিদিব'! আপনি ওর সব কথা জানেন না।

— বল, সব কথা আমাকে বুঝিয়ে বল।

— বললেও আপনি বুঝবেন না। কেউ কোনও দিনই ওকে বুঝবে না। আর সেটাই ওর ট্র্যাজেডি! ওর বাড়ির কেউ, এমনকি ওর বাবাও ওর সমস্যাটা বুঝতে পারেননি, বুঝতে পারবেন না।

— কিন্তু ওর মা?

— শৈশবেই ও মাতৃহারা, বিমাতার কাছে মানুষ।

— কিন্তু ওর সমস্যাটা কী? ওর চরিত্রের কোন্ জটিলতাটা কেউ বুঝতে পারবে না বলতে চাও? যা, একমাত্র তুমিই বুঝেছ?

— না, স্যার! তেমন দাবি আমি করিনি। আমিও বুঝিনি, তবে বোঝবার চেষ্টা করেছি। আমিই প্রথম। বোধকরি তার আগে সাইকিয়াট্রিস্ট।

— কী সেটা?

— ও একটা অবসেশনে ভুগছে। ও একা নয়, সবাই। গোটা রাও পরিবার। ওর বাবা ত্রিবিক্রমনারায়ণ তো বটেই। ওদের ধমনীতে নাকি বইছে রাজরক্ত। ওরা রানা প্রতাপের বংশধর, সংগ্রাম সিংহের অধঃস্তন পুরুষ। ওদের ধমনীতে সেই রাজরক্ত। যে রক্ত বইতো ফ্রম রাজসিংহ ব্যাক টু—হেভেন নোজ—কোন্ এক 'গায়েব-গায়েবী'।

— বেশ তো তাই না হয় বইছে। তাতে কী?

— আপনাকে কেমন করে বোঝাব? তাই এরা যখন হাঁটে তখন ওদের ঠ্যাঙজোড়া এই ধূলিময় ধরণীর স্পর্শ পায় না, তার বিঘৎখানেক উপর দিয়ে ওরা চলে — হোভারক্রাফ্ট-এর মতো!

— হোভারক্রাফট? শব্দ প্রয়োগটা তোমার, না তোমার স্বামীর?

— আমারই। আমার তাই মনে হয়েছে ওরা সবাই অতীত আঁকড়ে জীবনযাপন করে, বর্তমান ওদের কাছে ছায়া-ছায়া। তাতে আর কার কী ক্ষতি হয়েছে জানি না, ত্রিদিব হয়ে গেছে যন্ত্রমানব। ওর বাবা ওকে পঁচিশ বছর ধরে 'স্পুন-ফিডিং' করিয়েছেন — চামচেটা অবশ্য সোনার!

— ও কি তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো?

— হ্যাঁ, সেটাও একটা হেতু, আমাকে পুত্রবধূ বলে মেনে না নেবার। তবে সেটা পরোক্ষ হেতু। মূল কারণ আমার ধমনীতে কোন নীল রক্ত বইছে না।

— বিয়ের পরে তোমার শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি?

— আগেও নয়, পরেও নয়। তাঁকে আমি চোখে দেখিনি। ও তাঁকে না জানিয়েই আমাকে রেজিস্ট্রি

বিয়ে করেছে। টেলিগ্রাম করে বাবাকে জানিয়েছিল। তিনি টেলিগ্রামে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। ব্যাস!

— ওর সঙ্গে তোমার কোথায় প্রথম আলাপ?

— বললাম যে — হাসপাতালের কেবিনে, নার্স হিসাবে। ও যে মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী এটা ও আজকাল বুঝতে শিখেছে। জীবনযুদ্ধে পরাজয়টা ভুলতে কিছু ইয়ারদোস্ত যে পথটা বাতলায় ও সে পথেই এগিয়ে চলছিল। এভাবেই ও ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ে। তারপর নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। ডক্টর ব্যানার্জির পেশেন্ট হিসাবে। সেখানেই আমার সঙ্গে ওর আলাপ... আমার কাছে ও সব কথা স্বীকার করেছিল, বলেছিল যে, তার বাড়ির লোকেরা যদি জানতে পারে যে, সে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া ওর বাঁচবার কোনও পথ থাকবে না।

— আত্মহত্যা করে বাঁচা?

— হ্যাঁ! ওরা যে রানা প্রতাপের বংশধর। ওদের বংশে পদ্মিনী নারীরা জহর ব্রত পালন করে দিব্যজীবন লাভ করত — আপনি শোনেননি?

— বুঝলাম। তোমার প্রথম বিয়ের কথা বল। ওই কমলেশের কথা!

ছন্দার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। কোনওক্রমে বলল, সে জীবনের কথাটা আমি ভুলে থাকতেই চাই, স্যার।

— কেন? যা ফ্যাক্ট, যা সত্য, তাকে ভুলে থাকলেই কি তার জের মেটে? কেন ভুলে থাকতে চাও সে জীবনটাকে?

— ছেলেমানুষ ছিলাম তখন। ছেলেমানুষের মতো নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি। কড়ায়-গণ্ডায় তার মাসুলও দিয়ে এসেছি অবশ্য।

— তবে আর কী? ছেলেবয়সে মানুষে পাকা মাথার পরিচয় দেয় না। দ্যাট্‌স্ ন্যাচারাল। তুমিও দিয়েছ। সো হোয়াট? বেশ তো, সে জীবনটার স্মৃতি যদি তোমার বর্তমান জীবনকে বিড়ম্বিত করে, তবে তাকে সাময়িক ভাবে জাগ্রত মনের আড়ালে সরিয়ে রাখ, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু প্রয়োজনে যেন সেই জীবনের প্রতিটি ঘটনা মনে করতে পার, সেটাও দেখতে হবে। কারণ ওগুলো ফ্যাক্ট! আজ সেই রকম একটি লগ্ন এসেছে। আমার জানা দরকার — আই মাস্ট নো — কবে, কোথায় তুমি কমলেশের সাক্ষাৎ পেয়েছিলে? কী কারণে তাকে বিয়ে করেছিলে? কেমন ছিল তোমাদের দাম্পত্যজীবন, এট্‌সেটরা, এটসেটরা!

ছন্দা নতনেত্রে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। ওঁর টেবিলে একটা কাচের রঙিন কাগজচাপা নিয়ে কিছুক্ষণ অহেতুক নাড়াচাড়া করল। তারপর মনস্থির করে বল, হ্যাঁ, বলব, আপনার জানা থাকা দরকার, অ্যাজ্ মাই অ্যাটর্নি! কী জানেন? চরম উত্তেজনায় মুহূর্তের সুযোগ পেলে আমি ওই লোকটাকে খুন করে ফেলতে পারি! কিন্তু বিশ্বাস করুন, স্যার, তেমন কোনও পূর্ব-পরিকল্পনা আমার মাথায় নেই! ওই দুর্ঘটনা যদি আদৌ ঘটে, তবে দ্যাট উড বি জ্যাস্ট আ কালপেব্‌ল্ হোমিসাইড, নট আ ডেলিবারেট মার্ডার! খুন করার পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক নয়, ওর উস্কানিতে উত্তেজিত হয়ে, প্রচণ্ড রাগে...অথবা ঘৃণায়...

মাঝপথেই ও থেমে যায়। অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করে না। বাসুসাহেব ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ছন্দা আত্মস্থ হয়ে নিশ্চুপ বসেই রইল। পড়ন্তবেলার রোদ পশ্চিমের জানলা দিয়ে মেঝেতে গ্রিল-এর একটা সিলুয়েট-আলপনা এঁকেছে — সেইদিকে তাকিয়ে ও দীর্ঘসময় ধ্যানমগ্ন হয়ে রইল। তারপর যেন সেই ভাবের ঘোর থেকে বাস্তবে ফিরে এল। হাসল। বলল, না! তেমন দুর্ঘটনা ঘটবে না, কিছুতেই ঘটবে না। আমার ঘরে, জানেন, এককালে ভারি ইঁদুরের উপদ্রব ছিল। আমি ইঁদুর-কল পেতে ওদের ধরে, দূরের মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসতাম। মাঠে লক্ষ্য করে দেখতাম, কাকগুলো ঘুর-ঘুর করত খাঁচায় ইঁদুর দেখে। তাই আমি ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ইঁদুর-কলের ঢাকনাটা খুলে দিতাম...

বাসু বললেন, তাহলে তোমার হাত-ব্যাগে লোডেড রিভলভার থাকে কেন?

আবার আত্মস্থ হয়ে যায়। হাসে। বলে, সে কথা থাক!

— থাকবে কেন? সব কথাই তো খুলে বলতে রাজি হয়েছ?

— না স্যার! সব কথা নয়। আমার জীবনের এ জটিলতার দিকটা আপনাকে জানাতে পারব না — সরি। রাওয়ের কথা বলব, বিশ্বাসের কথা বলব, কিন্তু...

— বিশ্বাস! 'বিশ্বাস' কে?

— আমার প্রথম পক্ষের স্বামী : কমলেন্দু বিশ্বাস!

— আই সী! বল?

ছয়

শৈশবেই বাবা মাকে হারিয়েছে ছন্দা সেন, হ্যাঁ, কুমারী জীবনে সে ছিল সেন। কাকিমার কাছে মানুষ। তাও নিজের কাকিমা নয়, সম্পর্কে কাকির বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করতে থাকে। সাবালিকা হবার পর বাবার ইন্সিওরেন্সের টাকাটা কাকার কাছ থেকে পায়। কাকা কিন্তু বিচক্ষণ মানুষ। টাকাটা ওকে নগদে দেন না। ওর নামে ফিক্সড-ডিপোজিট কিনে নিজের কাছেই রাখেন, যাতে ওর বিয়ের সময় কাজে লাগে। ওর বয়স যখন উনিশ তখন কমলেন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপ। বেচারি দুনিয়াদারির কিছুই বুঝত না। কমলেন্দু ওর চেয়ে পনেরো বছরের বড়ো। কিন্তু চৌত্রিশ বছর বয়সেও তার ছিল একটা দুর্নিবার আকর্ষণী ক্ষমতা। একাধিক মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল। তার ভিতর ছিল ওর খুড়তুতো দিদি, রমা। কাকা-কাকি সেটা টের পেয়ে গেলেন। পাত্র হিসাবে তাঁরা কমলেন্দুকে আদৌ পছন্দ করেননি। ফলে ওদের বাড়িতে কমলেন্দুর আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল।

রমার সঙ্গে প্রেম করলেও ছন্দাকে সে উপেক্ষা করেনি। আড়ালে আবডালে দু-জনের দেখা হোত। সত্যি-সত্যি ভালোবেসে, নাকি দিদির উপর টেক্কা দিতে — এখন আর ঠিক মনে পড়ে না — কমলেন্দুর হাত ধরে একরাতে গৃহত্যাগ করল ছন্দা। কমলের বাড়িতে কে আছে, সে কতদূর লেখাপড়া জানে, কী করে, কোথায় থাকে — এসব কিছুই না জেনে। চেনাঘাটের নোঙর তুলে অচেনা গাঙে নৌকাকে ঠেলে দিল দুঃসাহী কুমারী মেয়েটি! সঙ্গে শুধুমাত্র একটা সুটকেস। তাতে ওর পোশাক-আশাক, মায়ের ফটো অ্যালবাম, আর বাল্যের কিছু স্মৃতি। প্রথমেই ওরা এল কালীঘাটে। কমলেন্দু ওর সিঁথিতে সিঁদুর দিল, হাতে পরিয়ে দিল নোয়া-শাঁখা। এসে উঠল বেলেঘাটার একটা বস্তিতে। বারো ঘর এক উঠান। এক কামরার সংসার। পিঠামূলি ছ্যাঁচা-বাঁশের দেওয়াল — গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে নিকানো। ঝাঁপের জানলা-দরজা। গোবরজলে নিকানো মেঝে। ছন্দার কিন্তু খারাপ লাগেনি। এ ঘরখানা ওর, ওর নিজের — না, ওদের দু জনের।

প্রায় সাত মাস ছিল টালির ঘরে। লক্ষ্মীর পট পেতেছিল। বৃহস্পতিবারে পাঁচালি পড়ত। একা একাই। কমলেন্দু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় কাক-ডাকা ভোরে, ফেরে রাত করে। হপ্তাবারে মদ্যপান করে। কিন্তু ওপাশের ঘরের নেতাই-এর মতো হপ্তাবারে বউ ঠ্যাঙানোর বদভ্যাস নেই। ছন্দা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল অভ্যাসটা ছাড়াবার। পারেনি। ওর ফুলশয্যা হয়নি — মানে, ফুলে-ঢাকা-শয্যায় কুমারী জীবনের শেষরাত্রি থেকে সীমন্তিনীর সৌভাগ্যে উত্তরণ। কে পাতবে ফুলশয্যা? তা বলে যৌবরাজ্যে উপনীত হওয়াটা কি থেমে থাকবে? তা যদি বল, তাহলে ছন্দার বিয়ে দু দুবার। ওই কমলেন্দুর সঙ্গেই। হ্যাঁ, শুধু কালীঘাটের বিয়েতে কমলেন্দুর মন ওঠেনি। একদিন আবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে সই দিয়ে বিয়ে করতে হল। ছন্দা বলেছিল, কী দরকার?

কমলেন্দু শোনেনি, বলেছিল, এটা তোমার নিরাপত্তার জন্যে। কেউ না ভবিষ্যতে বলতে পারে — তুমি আমার বিয়ে করা বউ নও!

কমলের চটকলের দু-জন মজুর বিয়েতে সাক্ষী দিতে এল। তাদের কমলেন্দু প্রকাশ্যে — মানে ছন্দার উপস্থিতিতে — মিষ্টি খাইয়েছিল, আড়ালে বেগুনি-ফুলুরি চাঁটযোগে কালীমার্কা বোতলের অমৃত।

বিয়ের পরের মাসেই দু-জনে একটি জীবনবীমা করে। ওই যে দুই বন্ধু ওদের রেজিস্ট্রি-বিয়েতে সাক্ষী ছিল তাদেরই একজনের আগ্রহে। সে ছিল ইন্সিওরেন্স এজেন্ট। কমল প্রথমটায় কিছুতেই রাজি হয়নি, ছন্দার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়। পলিসিটা হল 'জয়েন্ট' নামে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর যৌথ জীবনবীমা। দুজনেই দু-জনের নমিনি। যে কোনও একজনের মৃত্যু হলে অপর জন টাকাটা পাবে। বিপত্নীক হলে পাবে কমল, বিধবা হলে ছন্দা! পাক্কা দশ হাজার টাকা।

সাত মাসের দাম্পত্য জীবনে সে লজ্জায় কাকা-কাকি বা খুড়তুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। রমাদিকে টেক্কা দিয়ে সে যে খুব কিছু জিতেছে তাও তখন মনে হতো না। রমাদির বিয়ে হয়ে গেল সুপাত্রের সঙ্গে। গাড়ি-বাড়ি-টেলিফোন না থাক, পাকা ভাড়াটে বাড়ি, ভদ্র পরিবেশ, বাড়িতে টিভি! সরকারি কেরানি! পরম্পরায় খবর পেল। বিয়েতে এক-গা গহনাও পেয়েছে রমা। আর ছন্দার হয়েছে উলটো দশা।

কমলের পরামর্শে চার গাছা চুরি, গলার মালা আর কানের দুলটা খুলে রাখতে হয়েছে। সুটকেসে তালাবন্ধ করে। এগুলো ছন্দার মায়ের। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গৃহত্যাগের রাত্রে গায়েই ছিল। কিন্তু এই বেলেঘাটার বস্তিতে সোনার গহনা পরে ঘোরাফেরা করার রেওয়াজ নেই। ছিন্তাই পার্টির দৌরাত্ম্যে। কমল অবশ্য ওকে কাঁচের চুরি, নক্‌লি সোনার দুল আর মঙ্গলসূত্র কিনে দিয়েছিল। এ পরিবেশে সেটাই স্বাভাবিক। সোনার গহনা সব রাখা ছিল সুটকেসে।

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন — শুধু ঈশ্বর একাই নন, কমলও। সে এক-এক পাতা কী যেন ট্যাবলেট নিয়ে আসত। দৈনিক একটা করে খেতে হতো। তার ফলে ওদের এক-কামরার খুপরিতে অবাঞ্ছিত তৃতীয় মানবশিশুর আবির্ভাব ঘটেনি।

তারপর একদিন ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

ভর দুপুরবেলা। কে যেন ওর ঘরে টোকা দিল। এখানে এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। সোমত্ত মেয়েরা তাই হুট করে দরজার হুড়কো খোলে না। আগে জানলা দিয়ে দেখে নেয়, আগন্তুক পরিচিত মানুষ কি না — আবার শুধু পরিচিত হলেই চলবে না। চেনা-জানা লোকও এই নিঝুম ভরদুপুরে—যখন মরদেরা যে-যার ধান্দায় বস্তিছাড়া—তখন সোমত্ত-মেয়ের দোর খোলা পেলে দ্যাখ-না-দ্যাখ কাঁচাখেগো রাক্ষস হয়ে ওঠে। ছন্দা নজর করে দেখল — না, ভয়ের কিছু নয়। বাড়িউলি মাসি।

এই বারোঘর-এক-উঠানের মালকিন। কর্তা-মশাই ˚গঙ্গা পেয়েছেন। এই বিধবাই ওদের অভিভাবিকা। ছন্দা দোর খুলে দিয়ে বললে, কী মাসি? এই ভরদুপুরে?

— একটা প্রেয়জনে তোর কাছে এলুম, বৌমা। তোর ভাতারের কোনও ফটক আছে তোর কাছে?

— ফটক? মানে, ফটো? না তো! কেন গো মাসি?

— ওমা আমি কনে যাব! কালীঘাটে বে-করে সবাই যে জোড়ে ফটক তোলে। তোরা তুলিস্‌নি?

ছন্দার মনে হল কথাটা ঠিক। ওদের একটা যুগলে ফটো তোলানো উচিত ছিল। আশ্চর্য! কমলেন্দুর কোনও ফটো যে ওর কাছে নেই, এই অভাববোধটার সম্বন্ধেও সে সচেতন নয়। কেন হবে? গোটা মানুষটা যার মুঠোয় বন্দি, সে কেন দৌড়াবে তার ছায়ার পিছনে? কিন্তু ওর ফটোর সন্ধান কেন করছে বাড়িউলি-মাসি? প্রশ্ন করে সেই মর্মে।

প্রৌঢ়া আর এক খিলি পান তার টোব্‌লা গালে ঠেসে দিয়ে বল্‌লে, সে আর এক বেত্তান্ত। তোর শুনে কাজ নেই! যা, ঘরে গে খিল দে...

ছন্দার নজর হল, একটু দূরে একজন মাঝবয়সী মহিলা বাঁশের খুঁটিটা ধরে ওকেই দেখছেন, একদৃষ্টে। বছর চল্লিশ বয়স হবে তাঁর। সধবা না বিধবা ঠাওর হচ্ছে না, মাথায় সিঁদুর নেই, চোখে চশমা। চেহারার একটা আভিজাত্য আছে, যা এই বস্তিতে অপ্রত্যাশিত।

ছন্দা প্রশ্নটা না করে পারে না : উনি কে, মাসি?

মাসি পিছন ফিরে দেখল। বাঁশের খুঁটি ধরে যে মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি এক-পা এগিয়ে এলেন। মাসি তাঁকে ধমক দেয়, আপনি আবার এখানে এসে জুটলে কেন গো বাছা? বললুম তো, আমি শুধিয়ে এসে তোমারে বলব নে। তা তর্ সইল না?

মহিলাটি ততক্ষণে ওর দোরগোড়ায়। মাসিকে তিনি পাত্তাই দিলেন না। ছন্দাকে বললেন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা গোপন কথা ছিল!

— আমার সঙ্গে? কী কথা?

শেষ প্রশ্নটা উপেক্ষা করে উনি শুধু বললেন, হ্যাঁ, আপনারই সঙ্গে। আপনার এবং আমার স্বার্থে। ভিতরে আসব?

ছন্দা স্তম্ভিত হয়ে যায়। সাত মাসে তার দুনিয়াদারীর অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে। এই বস্তিতে নানান ঘটনা ঘটতে দেখে। অচেনা-অজানা কোনও মানুষকে, সে পুরুষ-স্ত্রী যাই হোক, হঠাৎ ঘরের ভিতর ঢুকতে দিতে নেই। কমল ওকে একথা পাখিপড়া করে শিখিয়েছে। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাটিকে সে প্রত্যাখ্যান করে কীভাবে?

ছন্দা জানতে চাইল, আপনি কি একাই এসেছেন?

— না, আমার একজন পুরুষ 'এস্কর্ট' সঙ্গে এসেছেন। তবে এটা মেয়েলি ঘরোয়া ব্যাপার তো, তাই বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছেন। আপনারই নাম ছন্দা বিশ্বাস তো?

— হ্যাঁ! কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন?

— বলব ভাই, সব কথাই খুলে বলব। কিন্তু জনান্তিকে। প্রাইভেটলি!

ছন্দা মনস্থির করে। বাড়িউলি মাসির দিকে ফিরে বলে, ঠিক আছে মাসি। তুমি এস এখন। শুনি, এ ভদ্রমহিলা আমাকে কী বলতে চান। তবে, একটু সজাগ থেকো। ডাকলে যেন সাড়া পাই।

মাসির বামগণ্ড স্ফীত ছিলই। পান ঠাশা। ধীরেসুস্থে আঁচলের খুঁট খুলে জর্দার কৌটটি বার করল। আপনমনে বললে : গুপন কতা। ভদ্দর মইলা। বেলেঘাটার বস্তিতে।

তারপর জর্দার টিপ্‌টা রক্তরাঙা মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করে একটি 'শোলক' শুনিয়ে দিল, 'দেক্‌চি কত দেক্‌ব আর। চিকার গলায় চন্দ্রহার।'

বোঝা গেল, চার দশক বেলেঘাটা বস্তিতে বাস করে কলকাত্তাইয়া লব্‌জে রপ্ত হলেও হেইপার-বাঙলার বাল্যস্মৃতি একবারে মুছে যায়নি মাসির।

মহিলাটি ভিতরে এলেন। ছন্দা একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলল, বসুন।

মহিলাটি সাবধানী। দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়ে বসলেন। বললেন, তোমাকে 'তুমিই' বলছি ভাই, কিছু মনে কর না। প্রথমে এক গ্লাস জল খাওয়াও।

ছন্দা বললে, তাই তো বলবেন, বয়সে আপনি কত বড়ো।

বেচারির ঘরে বাতাসা ছাড়া আর কিছু ছিল না। দু-খানা বাতাসা পেতলের রেকাবিতে সাজিয়ে জল দিল। উনি নিঃসঙ্কোচে বাতাসা মুখে দিয়ে ঢকঢক করে জলটা খেলেন। মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, তোমার স্বামীর ছবি দেখতে চাওয়ায় তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, তাই না, ছন্দা?

ছন্দা বলল, তাই তো হবার কথা। কেন দেখতে চাইছেন?

— না, ছন্দা। আমি তোমার সংসার ভাঙতে আসিনি। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। কিন্তু তুমি সত্য কথা বললে আমার অপরিসীম উপকার হবে। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

ছন্দা বুদ্ধিমতী। বললে, তার আগে আপনার পরিচয় দিন। আপনি কে? হঠাৎ এমন ভরদুপুরে

একজনের ঘরে চড়াও হয়ে তার স্বামীর ফটো দেখতে চাইছেনই বা কেন?

— সঙ্গত প্রশ্ন। বেশ আমি সব কথা খুলে বলছি। সব শুনে তুমি আমাকে বল, নিজের ক্ষতি না করে আমাকে সাহায্য করতে রাজি আছ কি না।

— বলুন?

ভদ্রমহিলার নাম শকুন্তলা দত্ত। বি. এ., বি. টি.। বরিশা-বেহালায় নিস্তারিণী সেকেন্ডারি গার্লস স্কুলের অঙ্কের মাস্টারনি। অ্যাসিস্টেন্ট হেডমিসট্রেস। ওই স্কুলের কাছেই একটা দু-কামরার ভাড়াবাড়িতে থাকেন। মাত্র দুটি প্রাণী। উনি আর ওঁর ছোটো বোন, অনসূয়া — বিবাহিতা। কিন্তু স্বামীত্যক্তা। বয়সে ওঁর চেয়ে ষোলো বছরের ছোটো ; নিজেরই বোন। বাবা-মা মারা যাবার সময় উনি নিজে ছিলেন বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী। অনসূয়া স্কুলে পড়ত। প্রায় মেয়ের মতো অনুকে মানুষ করেছেন। কিন্তু ওঁর মতের বিরুদ্ধে পালিয়ে গিয়ে এক অজ্ঞাতকুলশীলকে বিয়ে করে বসল অনু। দু বছর বিবাহিত জীবনের পর আবার কাঁদতে কাঁদতে একদিন ফিরে এলো দিদির কাছে। ওর স্বামী ওর সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে — নগদ টাকাকড়ি গহনা সব কিছু নিয়ে — ওকে ফেলে পালিয়ে গেছে। সে আজ বহু বছর আগেকার কথা। মেয়ের মতো এতদিন মানুষ করেছেন ওকে। ফেলতে পারলেন না। আবার লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অনু উৎসাহ পেল না। ইতিমধ্যে একটি ছেলে ওর প্রেমে পড়েছে—ওই যে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে উনি আজ এসেছেন বরিশা-বেহালা থেকে এই বেলেঘাটার বস্তিতে। কিন্তু প্রথম বিবাহটার বিচ্ছেদ না হলে ওরা বিয়ে করতেও পারে না। আইনে বলে সাত-সাতটা বছর নাকি অপেক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ ওদের আরও দুটি বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এমন সময় খবর পেলেন — অনুর পলাতক স্বামী বেলেঘাটার বস্তিতে একটি মেয়েকে নিয়ে থাকে। সংবাদদাতা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে। অনসূয়ার স্বামী কমলাক্ষ করকে সে দেখেছে, আবার বেলেঘাটা বস্তিতে ছন্দার স্বামীকেও দেখেছে। দু-জন নাকি হুবহু একরকম দেখতে। অঙ্কের দিদিমণি জানেন দুটো বাহু সমান হলেই দুটি ত্রিভুজ অভিন্ন হয় না। তাদের অন্তর্নিহিত কোণটাও সমান হওয়া দরকার। তাই যাচাই করতে এসেছেন ছন্দার গৃহকোণে। না, ছন্দার সংসার ভাঙতে নয়, কোনও ক্ষতি করতে নয় — যদি দেখা যায় যে, ছন্দার স্বামী আর অনসূয়ার স্বামী একই ব্যক্তি — অভিন্ন — তাহলে তাকে বাধ্য করতে হবে অনসূয়াকে ডিভোর্স দিতে। ব্যস্। আর কিছুই না। টাকা বা গহনা চুরির দায়ে ওকে দায়ী করতে চান না শকুন্তলা দেবী। তিনি শুধু ভিক্ষা করছেন তাঁর কন্যাপ্রতিম ভগ্নির মুক্তি।

শুনতে শুনতে ছন্দা পাথর হয়ে গেল। কোনওক্রমে বলল, কিন্তু দিদি, ওঁর কোনও ফটো তো আমার কাছে নেই।

— না থাক। আমার কাছে আছে আমার ভগ্নিপতির ছবি। তুমি দেখে বল একে চেন?

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে উনি একটি ফটো মেলে ধরলেন ছন্দার দৃষ্টির সম্মুখে।

ছন্দা কোনও জবাব দিল না। প্রয়োজনও ছিল না। তার মুখের দিকে একনজর দেখে নিয়ে শকুন্তলা বললেন, তোকে বার বার বলছি, ছন্দা, আমি তোর কোনও ক্ষতি করতে চাই না। 'দিদি' বলে ডেকেছিস, আমি আশীর্বাদ করছি, তুই তোর স্বামী নিয়ে সুখে সংসার কর। কিন্তু আমার বোনটাকেও মুক্তি দে! শোন্! কমল ফিরে এলে আমার কথা বলবি না। সে যেন টের না পায়। আজ শুক্রবার। কাল বাদে পরশু কাকডাকা ভোরে আমি আসব। আমার একটি ছাত্রীর স্বামী ক্যালকাটা পুলিসের ইন্সপেক্টার। তাকে সঙ্গে নিয়ে আসব। য়ুনিফর্ম পরিয়ে। ডিভোর্স পিটিশানও নিয়ে আসব। হাতে-নাতে ধরতে পারলে ওর আর পালাবার পথ থাকবেনা। তুই ওকে কিছুই বলবি না, বুঝেছিস? যাতে তোকে না সন্দেহ করে। তাহলে আক্রোশটা তোর উপর গিয়ে পড়বে। আজ আমি চলি। কেমন?

ছন্দা কোনও কথাই বলতে পারেনি। টেরও পায়নি কখন সেই ভদ্রমহিলা চলে গেছেন। ও বিকালে উঠোনে-মেলা শুকনো কাপড় জামা গুছিয়ে তুলল না, চুল বাঁধল না, গা ধুলো না, রান্না করল না, উদাস দৃষ্টি মেলে শুধু বসেই রইল।

চমক ভাঙল কমলেন্দুর ডাকে : কী ব্যাপার? এমন খোলা দোরের সামনে ঠ্যাঙ মেলে উদাসনেত্রে বসে আছ? কার কথা ভাবছ? আমার? না কি...

ছন্দা সামলে নেয়। গায়ে মাথায় কাপড় তোলে। বলে, কটা বাজে?

— সাড়ে সাত। চায়ের জল বসিয়ে দাও একটু। মাসি বলছিল দুপুরে তোমার সঙ্গে কে নাকি দেখা করতে এসেছিল। কে গো?

ছন্দা চটজল্দি জবাব দিল, উনি একজন সমাজকর্মী। নারী সমিতির তরফে একটা নৈশ স্কুল খুলতে চান। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে।

— কী নাম? কোন মহিলা সমিতি?

— দাঁড়াও দেখাচ্ছি। লিফলেট রেখে গেছেন...ওঁদের লিটারেচার...

অনেক খুঁজেও সেসব কাজপত্র পাওয়া গেল না। তবে বোধহয় কাগজগুলো ভুল করে নিয়েই গেছেন। কিন্তু সেই কাগজগুলো খুঁজতে খুঁজতে ভদ্রমহিলার কল্পিত নাম, তাঁদের মহিলা সমিতির নাম ইত্যাদি মনে মনে ছকে ফেলেছে ছন্দা। কিন্তু সেসব দিকে কমল প্রশ্ন করল না। বলল, বাড়িউলি মাসি বলছিল, সে নাকি আমার ফটো আছে কি না জিজ্ঞাসা করছিল। কেন? আমার ফটো তার কী দরকার?

এবারও চটজলদি জবাব দিল : হ্যাঁ, তোমার নাম শুনে বললেন ওঁর এক ছোটো ভাইয়ের বন্ধুরও ওই নাম। তাই দেখতে চাইছিলেন, তুমিই ওঁর ভাইয়ের সেই বন্ধু কি না।

— অ! তা তুমি দেখালে আমার ফটো?

— তোমার ফটো আমার কাছে আছে নাকি?

— নেই বুঝি? ঠিক আছে, চায়ের জল বসাও!

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর ছন্দা দেখল পাশের বিছানাটা খালি। ওর স্যুটকেসটাও স্বস্থানে নেই। সারা দিন সারা রাত কমলেন্দুর পাত্তা নেই। অবশ্য তার পরদিন রবিবার ভোরবেলা বোঝা গেল ব্যাপারটা। পুলিশ সার্জেন্ট যখন জানতে চাইল, আপনার চুড়ি, মালা আর দুল মিলিয়ে ক-ভরি হবে? চার-পাঁচ?

— তা হবে।

— তা হলে তিনি আর ফিরে আসবেন না কোনওদিন।

* * *

ডবল-বেড চৌকি আর মীট-সেফটা কয় মাস বাকি-ভাড়ার বাবদে মিটিয়ে প্রায় এক কাপড়ে ফিরে এল কাকা-কাকিমার কাছে। দোর খুলে দিয়ে কাকা যেন ভূত দেখলেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তিনি বিচক্ষণ মানুষ। চেঁচামেচি, হইচই কিছুই করলেন না। ছন্দার প্রণাম সারা হলে বললেন, আয়, ভিতরে আয়। না, না, বৈঠকখানায় নয় ; আমার শোবার ঘরে।

অর্গলবদ্ধ গৃহে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে যা বললেন তা ন্যায্য কথাই।

— আমার দু-দুটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া এখনও বাকি আছে, ছন্দা। এই সাত মাস তুই কোথায় ছিলি, কী করেছিস্ কিছুই জানি না — জানতে চাইও না। তুই সাবালিকা — একটাই জীবন তোর, যেভাবে সে জীবন কাটাতে চাস্, কাটাবি ; কিন্তু আমার জীবনের পথে কোনও বাধার সৃষ্টি না করে, তাই না?

ছন্দা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, তুমি ঠিক কথাই বলেছ, কাকু। আমার অন্যায় হয়েছে কিছু চিন্তাভাবনা না করে হঠাৎ এভাবে তোমার কাছে চলে আসা...

— বস্! মনে হচ্ছে দারুণ একটা বিপদে পড়েছিস। তাই কি?

— হ্যাঁ, তাই!

— আমাকে সব কথা খুলে বল দেখি। যদি সঙ্কোচ হয় তো বল্ তোর কাকিকে ডাকি। সে এখনও জানে না তুই এসেছিস।

ছন্দা বলেছিল, না কাকা তোমাকে সবকিছু খুলে বলতে আমার কোনও সঙ্কোচ হবে না। যাবার আগে কাকিমাকেও প্রণাম করে যাব। শোন :

বিগত সাত মাসের অভিজ্ঞতা অকপটে বিবৃত করেছিল তারপর।

কাকা সব শুনে বলেছিলেন, তুই কি এটুকু বুঝতে পারছিস, ছন্দা, যে ওই শকুন্তলা দেবী হুট করে না এসে পড়লে দু-চার মাসের মধ্যেই তুই খুন হয়ে যেতে বসেছিলি?

ছন্দা চম্‌কে উঠে বলে, মানে? ও আমাকে খুন করত?

— সেটাই তো ছিল ওর পরিকল্পনা। তাই কালীঘাটের বিয়ের ভরসায় না থেকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে...

— বুঝলাম না।

— দশ-হাজার টাকার জয়েন্ট ইন্‌শিওরেন্স করেছিলি, মনে নেই? দুর্ঘটনাটা কীভাবে ঘটবে এটুকুই স্থির করা বাকি ছিল। এর মধ্যে আচমকা শকুন্তলা দেবী এসে পড়ায় ও ওই ক-ভরি গহনা হাতিয়ে পালিয়ে গেছে।

ছন্দা প্রতিবাদ করতে পারেনি। বুঝতে পারে, গহনা খুইয়ে সে জীবন পেয়েছে।

কাকা বললেন, কী করবি ঠিক করেছিস?

— কী বলব? আমি তো পথের ভিখারী!

— কে বল্‌লে? দাদার পলিসিটা ম্যাচিওর করার পর তোর নামে ফিক্সড-ডিপজিট করেছিলাম মনে নেই। সুদে-আসলে এখন তা প্রায় পনেরো হাজার টাকা। সে টাকা তো তোর। আমার কাছে গচ্ছিত আছে — নিয়ে যা, নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা কর!

ছন্দা একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, না কাকু টাকাটা আমি নেব না!

— কেন রে? এ তো তোরই টাকা...

— সেজন্যে নয়। বিচার করে দেখ, তোমার বাড়িতে আমার থাকা চলে না। সমাজে তোমার মাথা হেঁট হবে — রেবা-রেখার বিয়ে দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। ফলে আমাকে পথে নামতেই হবে। তুমি তো জানোই কাকু — নিজের দেহটাকে বাঁচাতেই আমার জান নিকলে যাবে — তারপর ওই বোঝার উপর এই শাকের আঁটি আমার সইবে না।

— তাহলে তুই কি করতে চাস?

ছন্দা একেবারে আচমকা একটা প্রস্তাব দিল। সে কোনও নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হবে। কোনও ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে অর্থাৎ ভদ্র নিরাপদ পরিবেশে থাকবে। ওর থাকা-খাওয়া-ট্রেনিং-এর যাবতীয় খচর যোগাবেন কাকু, ওই পনেরো হাজার টাকা থেকে। মাস মাস কিছু হাত খরচাও নেবে। ট্রাম বাস-ভাড়া, জামা-কাপড় ইত্যাদি বাবদ।

কাকা ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। কাকিমাও চোখের জলে ভেসে ওকে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন। রেবা-রেখার সঙ্গে ও দেখাই করেনি।

পাশ করে বের হবার আগেই শুভ্রার সঙ্গে ওর আলাপ হয়। পাশ করার পর তার রুমমেট হয়ে পড়ে। শুভ্রা তার অতীত জীবনের বিষয়ে কিছুই জানতে পারেনি। ও কাজ করত ডাক্তার ব্যানার্জির নার্সিংহোমে। কী বিচিত্র ঘটনাচক্র! সেখানে একদিন এক মানসিক রোগীর নার্সিং করতে করতে সব-কিছু গুলিয়ে গেল ওর। কোটিপতি বিজনেসম্যানের একমাত্র পুত্র যখন ওর হাত দুটি ধরে বলেছিল, সে ওকে জীবনসঙ্গিনী করতে চায় — বাবাকে না জানিয়ে রেজিস্ট্রি মতে — তখন ছন্দার সে কথা বিশ্বাসই হয়নি! অথচ সেই সুখের সপ্তমস্বর্গেই অনায়াসে পৌঁছে গেল সে।

আর ঠিক তখনই ফিরে এল ওর জীবনের শনিগ্রহ : কমল।

নামটা সে বারে বারে বদলেছে, নতুন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার আগে ; কিন্তু বদলেছে শুধু পদবীটা। এমনভাবে, যাতে আচম্‌কা কেউ পিছন থেকে ওকে নাম ধরে ডাকলে কারও সন্দেহ হবে না : কমলেন্দু,

কমলাক্ষ, কমলেশ — সবারই ডাক নাম কমল ! যেমন বলা যায় : হলাহল, জহর গরল, কালকূট যেটাই সেবন কর ; ফল হবে এক : বিষক্রিয়া! মৃত্যু!

সাত

পরদিন। শনিবার। বাইশে জুন, সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রতিদিনের মতো বাসু-সাহেব প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছিলেন। সচরাচর উনি মর্নিং-ওয়াক সেরে ফিরে এলে সবাই জমায়েত হয় প্রাতরাশের টেবিলে। আজও ফিরে এসে দেখলেন বাড়িশুদ্ধ ডাইনিং-টেবিলে উপস্থিত। কিন্তু কেউই মুখ তুলে তাকাল না। সবাই হুমড়ি খেয়ে ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজগুলো ভাগাভাগি করে পড়ছে। বাসু বলেন, কী ব্যাপার? কাগজে জব্বর খবর কিছু ছাপা হয়েছে মনে হচ্ছে?

রানু মুখ তুলে তাকালেন। বলেন, হ্যাঁ, কাল মাঝ রাতে কমল খুন হয়ে গেছে!

— কে? কমল? মানে...

— হ্যাঁ তাই। ছন্দার প্রথম পক্ষের স্বামী।

বাসু ধীরে ধীরে বসে পড়েন একখানা চেয়ারে। অস্ফুটে বলেন, এমন একটা আশঙ্কা অবশ্য ছিলই...কিন্তু এত তাড়াতাড়িই যে...

অন্যমনস্কভাবে হাতটা পকেটে চলে যায় পাইপ-পাউচের সন্ধানে।

সচরাচর প্রাতরাশান্তে কফির কাপে চুমুক দেবার আগে উনি পাইপ ধরান না। আজ তার ব্যতিক্রম হল।

ভিতরের দরজা দিয়ে বিশে উঁকি মারল। রানু আর সুজাতার মাঝে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে ছুঁড়ে দিল তার প্রশ্নটা : টেবিল লাগার? টোস্ট হয়ে গেছে।

সুজাতা বলল, একটু পরে।

— না, একটু পরে কেন? লাগা! — বললেন বাসু। সুজাতার দিকে ফিরে বললেন, কমলেশ, কমলাক্ষ, কমলেন্দু—নাম যাই হোক, হতভাগাটা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। আর তার অভাবে দুনিয়ায় কেউ এখন কাঁদছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। অহেতুক গরম টোস্ট ঠাণ্ডা করব কেন? দাও কাগজটা দাও—

প্রথম পাতায় নিচের দিকে খবরটা ফলাও করে লেখা হয়েছে : 'রাতের অতিথির ডান্‌ডায় সমাজবিরোধী ঠাণ্ডা'।

"তারাতলার অসমাপ্ত প্রাসাদ মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্ট-এর মেজানাইন ফ্লোরে গতকাল মধ্য রাতে এক নৃশংস নাটক সংঘটিত হয়ে যায়, যার ফলে প্রকাণ্ড প্রাসাদের একমাত্র বাসিন্দা কমলেশ বিশ্বাস নিজ গৃহে খুন হয়েছেন। কর্পোরেশন আপত্তি করায় আদালতের আদেশে এই বহুতল-বিশিষ্ট প্রাসাদটি দীর্ঘদিন অসমাপ্ত হয়ে পড়ে ছিল। কমলেশবাবু ছিলেন সেই নির্জন প্রাসাদ-কঙ্কালের রক্ষক। তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁরই ঘরে। পুলিশ মৃতদেহ শনাক্ত করেছে। কমলেশ একজন বিবাহ-বিশারদ সমাজবিরোধী। বস্তুত সে চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র মসিয়ে ভার্দুর প্রেরণায় তার জীবিকা বেছে নিয়েছিল কি না বলা কঠিন ; তবে তার উপার্জনের কাঠামোটা ছিল প্রায় একই রকম। কমলেশ বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিচয়ে একাধিক বিবাহ করেছে। কখনো কুমারী, কখনো বিধবা, কিন্তু তারা একেবারে নিঃস্ব নয়। দু-একটি বধূহত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তিও পেয়েছে। দু-চারটি ক্ষেত্রে নবপরিণীতা বধূর অলঙ্কার ও নগদ অর্থ আত্মসাৎ করে উধাও হয়েছে। ফলে প্রত্যাশিত ভাবেই কমলেশবাবুর শত্রু সংখ্যা যথেষ্ট। পুলিশের অনুমান তাদেরই ভিতর কেউ এসে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে গেছে।

"রাত প্রায় একটা সাতাশ মিনিট স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে একটি টেলিফোন আসে। থানা থেকে রেডিও মেসেজে ভ্রাম্যমাণ একটি পুলিস-পেট্রল-কারকে তৎক্ষণাৎ জানানো হয়। অকুস্থলে উপনীত

হতে পুলিশ আন্দাজ সাত মিনিট সময় নেয়। সদর দরজা বন্ধ ছিল, যদিও নিহতের মেজানাইন-ফ্লোরের দরজা ছিল খোলা। ভূলুণ্ঠিত কমলেশ তখন জীবিত, কিন্তু জ্ঞানহীন। আহতের ঘরে গাদা করে রাখা ছিল গৃহ-নির্মাণের নানান সাজ সরঞ্জাম। তার ভিতর একটি পৌনে এক মিটার দীর্ঘ গ্যালভানাইজড্ লোহার বিশ মি. মি. ব্যাসের পাইপ পড়ে ছিল আহত ব্যক্তির পাশেই। তাতে রক্তের দাগ। পুলিশ প্রায় নিঃসন্দেহ — সেটাই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত। আততায়ী আচমকা সেটাই তুলে নিয়ে গৃহস্বামীর মাথায় সজোরে বসিয়ে দিয়েছিল।

"অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, নিহত ব্যক্তির হিপ্-পকেটে ছিল একটি লোডেড রিভলভার। যে কোনো কারণেই হোক কমলেশ সেটা পকেট থেকে বার করার সুযোগ পায়নি। অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে কমলেশ মারা যায়। [এরপর পাঁচের পাতায়]।"

বাসু পাতা উলটে পঞ্চম পৃষ্ঠায় উপনীত হলেন। সেখানে নিজস্ব সংবাদদাতার সরেজমিন-তদন্তের কিছু তথ্য। মধ্যরাত্রে পুলিশের উপস্থিতিতে সংবাদদাতা অকুস্থলে উপনীত হয়ে কয়েকটি বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেন! প্রথম কথা, পুলিশকে টেলিফোনটা করেছিলেন প্রতিবেশী বটুকনাথ মণ্ডল। মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টের পাশেই, বিশ ফুট গলি-পথের ও-প্রান্তে একটি ত্রিতল বাড়ির মেজানাইন-ফ্লোরে সস্ত্রীক বাস করেন বটুকনাথ। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন যে, মাঝ রাত্রে টেলিফোন বাজার শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন, তাঁর স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে পূর্বেই। ওঁরা বুঝতে পারেন, টেলিফোন বাজছে ঠিক পাশের বাড়ির মেজানাইন-ফ্লোরে। অর্থাৎ ওঁদের শয়নকক্ষ থেকে সাত-আট মিটার তফাতে। ভ্যাপ্‌সা গরম ছিল। দু-বাড়ির রুজু-রুজু জানলা খোলাই ছিল। ওঁদের জানলায় পর্দা আছে, সামনের বাড়িতে পর্দার বালাই নেই। ওঁরা দেখতে পেলেন প্রতিবেশী কমলেশ-বাবু রিসিভার থেকে টেলিফোনটা উঠিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। তখন রাত কত তা ওঁরা বলতে পারেন না। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল না, তবে দু জনের মনে হয় কমলেশ টেলিফোনে বলেছিলেন, 'বলছি তো, টাকাটা আমি এক সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দেব!...কী? চন্দ্রা কাল সকালেই দু-হাজার দেবে...', এই কথাগুলি বটুকের স্ত্রীও শুনেছেন, তবে তাঁর বিশ্বাস কমলেশ 'চন্দ্রার' কথা বলেননি, বলেছিলেন, 'সন্ধ্যা'! সে যাই হোক, তারপর ওঁরা দু-জনেই আবার ঘুমোবার চেষ্টা করেন এবং ঘুমিয়েও পড়েন। কতক্ষণ ঝিমিয়েছেন বা ঘুমিয়েছেন তা বলতে পারবেন না, তবে হঠাৎ তন্দ্রা ভাবটা ছুটে যায় কিছু উচ্চকণ্ঠস্বরে। এবারও মনে হল শব্দটা আসছে প্রতিবেশী কমলেশবাবুর ঘর থেকে।

এই পর্যায়ে ওঁরা শুনতে পান, পাশের বাড়ির মেজানাইন ঘরে কিছু কথা কাটাকাটি হচ্ছে। তার একটি পুরুষকণ্ঠ, অন্যটি স্ত্রীলোকের। দু-জনেই জোর গলায় কথা বলছিলেন ; কিন্তু কী কথোপকথন হচ্ছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না ; কারণ ঠিক একই সময়ে ওই কমলেশেরই কলবেলটা একটানা বেজে চলেছিল। অর্থাৎ সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ কল-বেল-এর পুশ-বাটন টিপে ধরেছিল। সেটা একটানা বেজেই চলছিল। ওঁরা জানতেন ও বাড়িতে ওই ঘরে কমলেশ একাই থাকেন। ফলে মধ্য রাত্রে সে-ঘরে নারীকণ্ঠ শুনে প্রতিবেশী হিসাবে কৌতূহলী হয়ে পড়েন বটুকনাথ। বিছানা থেকে উঠে জানলা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই মনে হল ও-ঘরে কী একটা শব্দ হল। কেউ আহত হয়ে অথবা ধাক্কা খেয়ে ধরাশায়ী হল। বটুকনাথ দ্রুত পদক্ষেপে জানলার কাছে সরে যান ; কিন্তু উনি দৃকপাত করার পূর্বেই ও ঘরের বাতিটা নিবে যায়। লোডশেডিং নয়, কারণ তখনো কল-বেলটা একটানা বেজে চলেছে। ইতিমধ্যে বটুকবাবুর স্ত্রীও এসে ঘোর অন্ধকারে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছেন। আন্দাজ মিনিটখানেক পরে কলবেল বাজানো বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ যে লোকটা ভিতরে আসতে চাইছিল সে ওই প্রয়াসে ক্ষান্ত দেয়। তারও মিনিটতিনেক পরে দূরে বড়ো রাস্তায় একটা গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ হয়। অবশ্য মিসেস্ মণ্ডলের ধারণা ওটা মোটরগাড়ি নয়, মোটরসাইকেল। তারপর সব শুন্‌শান্।

বটুক মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করেন। কিন্তু পাশের বাড়িতে কোনো সাড়াশব্দ জাগে না। বাতিও জ্বলে না। উনি কমলেশবাবুর নাম ধরে বার কতক ডাকাডাকি করেন। কেউ সাড়া দেয় না। বটুকনাথের

একটি বড়ো পাঁচসেল এভারেডি টর্চ আছে। এবার তিনি সেটার সাহায্যে পাশের বাড়ির গবাক্ষপথে আলোকপাত করেন। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল মেঝেতে কোনো মানুষ পড়ে আছে। পুরুষমানুষ। তার একটা অনড় পা শুধু দেখা যাচ্ছিল। এবার উনি ঘড়ি দেখেন। রাত তখন ঠিক একটা পঁচিশ। বটুকনাথ তাঁর প্রতিবেশী ডাক্তার নবীন দত্তকে ঘুম থেকে টেনে তোলেন। ডাক্তার দত্ত দ্বিতলে বাস করেন। তাঁর বাড়িতে টেলিফোন আছে। ডাক্তার দত্ত নিচের মেজানাইন ঘরে এসে টর্চের আলোয় ভূশয্যালীন ব্যক্তির অনড় একটি পা দেখে মনে করেন ঘটনাটা পুলিশে জানানো উচিত। ওঁরা থানায় ফোন করেন।

অচিরেই পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছোয়। ইন্সপেক্টার মুখার্জি ঘড়িতে তখন একটা বিয়াল্লিশ। সামনের দরজাটিতে গোদরেজের 'ইয়েল-লক' লাগানো। অর্থাৎ আততায়ী পালাবার সময় দরজার পাল্লাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। তা আর বাইরে থেকে চাবি ছাড়া খোলা যাবে না।

পুলিশ বহুক্ষণ 'কলবেল' বাজায়। ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ শোনা যায় না। তখন একজন পুলিশ ভারা বেয়ে দ্বিতলে উঠে গ্রিলহীন জানলার ফোকর দিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সদর দরজা খুলে দেয়। টর্চের সাহায্যে ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে দেড়-তলার মেজানাইন-ঘরে উপনীত হন। সুইচটা খুঁজে পেয়ে বাতি জ্বেলে দেন। দেখেন, কমলেশ অজ্ঞান অবস্থায় মেজেতে পড়ে আছে। ডাক্তার দত্ত তাকে পরীক্ষা করে বলেন যে, বেঁচে আছে। আহতের ঘরে টেলিফোন ছিল। রুমাল জড়ানো-হাতে পুলিশ-সার্জেন্ট অসীম মুখার্জি তখন টেলিফোনটা তুলে নেয়, একটা আম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছোনোর পূর্বেই কমলেশ মারা যায়। তার পরে তল্লাসির সময় পুলিশ মেজেতে একটা ছোটো চামড়ার কেস-এ চাবির রিং আবিষ্কার করে। তাতে তিন-তিনটি চাবি। পুলিশের ধারণা আততায়ী মহিলা, বড়ো ঘরের মহিলা। কারণ চাবির রিঙে আছে তিনটি চাবি। একটা নবতাল তালার। বাকি দুটি মোটরগাড়ির 'ডোর-কী'। মেক ও মডেল দেখে পুলিশের ধারণা একটি চাবি 'মারুতি-সুজুকি'র অপরটি 'অ্যাম্বাসাডার'-এর। তাহলে, নবতাল তালাটি সম্ভবত গ্যারেজের। নিহত কমলেশ বিশ্বাসের কোনো গাড়ি নেই। ফলে পুলিশের ধারণা, মধ্য রাত্রের অতিথিই অসাবধানে ওই চাবির গোছা ফেলে গেছে। এখানে তিনটি চাবির ফটো দেওয়া হল। দুটি দামি গাড়ির চাবি যাঁর রিং-কেস-এ থাকে (যে রিং-কেস-এ দামি ফরাসি সুগন্ধীর সুবাস) তাঁকে খুঁজে বার করা হয়তো কঠিন হবে না। পুলিশ সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে। এক দিকে নিহত বিবাহ-বিশারদের পরিত্যক্ত পত্নীদের পরিচয় ; অপরদিকে 'মোটর-ভেহিক্‌ল্‌স্‌'-এ এমন দম্পতির সন্ধান, যাঁরা ওই দুই মেক এর গাড়ির মালিক-মাল্‌কিন...

*　　　*　　　*

প্রাতরাশ শেষ হতে-না-হতেই বাইরের বারান্দায় 'কল-বেল' বেজে উঠল। বাসু ঘড়ি দেখলেন। সকাল সাতটা। সচরাচর উনি চেম্বারে এসে বসেন বেলা আটটায়। কম্বাইন্ড-হ্যান্ড বিশ্বনাথ বাইরের দরজা খুলে দেখে এল। ফিরে এসে নিঃশব্দে একটি আইভরি-ফিনিশড্‌ দামি ভিজিটিং কার্ড টেবিলে নামিয়ে রাখল : ত্রিদিবনারায়ণ রায়।

রানু প্রশ্ন করেন, কী? দেখা করবে? নাকি, ঘন্টাখানেক পরে ঘুরে আসতে বলব?

— না, আজ বরং একঘন্টা আগেই দপ্তর খোলা যাক। তুমি আগে যাও। রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার আর ওর স্বাক্ষর...

বাধা দিয়ে রানু বলেন, আমার কাজ আর নতুন করে আমাকে শেখাতে হবে না। এস তুমি—

একটু পরে বাসু গিয়ে বসলেন নিজের ঘরে, রানুদেবী বাইরের রিসেপশন কাউন্টার পাক মেরে এসে উপস্থিত হলেন তাঁর হুইল-চেয়ারে।

বাসু নিম্নকণ্ঠে জানতে চাইলেন, ছন্দার দু-নম্বর তো?

— হ্যাঁ। খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

— হঠাৎ 'পর্বতোবহ্নিমান' কেন? 'খুনাৎ'? এক নম্বর খুন হয়েছে বলে? ও কী জানে?

— কী জানি! ঘরময় পায়চারী করছে, আর একটার পর একটা ইন্ডিয়া কিং ধরাচ্ছে। দু-টান দিয়েই অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিচ্ছে। বেশিক্ষণ ওভাবে চালালে আমার কার্পেট পুড়িয়ে ফেলবে!

— কী চায় তা কিছু বলেছে?

— না। তোমার সাক্ষাৎ চায় শুধু। ব্যাপারটা নাকি 'জীবন-মৃত্যু' নিয়ে।

— ঠিক আছে। ডেকে দাও। দাঁড়াও...এবারও রিটেইনার নাওনি তো?

রানু হাসলেন। বললেন, আবার? তোমাকে না জিজ্ঞেস করে?

রানু বাইরের দিকে দরজাটা খুলে দ্বারপথে ও-কক্ষে কাকে যেন সম্বোধন করে বললেন, আসুন মিস্টার রাও, মিস্টার বাসু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

একটি সুসজ্জিত এবং সুদর্শন যুবক প্রবেশ করল চেম্বারে। সুদর্শন, কিন্তু পৌরুষ বা ব্যক্তিত্বের কোনো ব্যঞ্জনা নেই তার দেহাকৃতিতে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, মাঝারি উচ্চতা, কৃশকায়। কথা যখন বলতে শুরু করল তখন মনে হল আপার-প্রেপ্ এর কোনো ছাত্র 'মিস্'কে পড়া মুখস্ত হয়েছে কি না প্রমাণ দিচ্ছে :

আমার নাম শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও। আমরা শক্তাবৎ। আমার পিতৃদেব হচ্ছেন স্বনামধন্য ধনকুবের শ্রীত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও অফ নাসিক। আপনি তাঁর নাম শুনে থাকবেন।

বাসু মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

— আপনি আজ সকালে কাগজ দেখেছেন, স্যার? আই মিন সংবাদপত্র?

— মোটামুটি। এ কথা কেন?

ত্রিদিব বসেছিল ডান পায়ের উপর বাঁ পা-টা তুলে। এবার সে ভঙ্গিটা বদলাল। বাম-চরণের উপর উঠল দক্ষিণ ঠ্যাঙ। নড়াচড়ায় তার কপালের সামনের দিকে একগুচ্ছ চুল চোখের উপর এসে পড়ল। ত্রিদিব বাঁ-হাতে অশান্ত চুলের গোছা কপালের উপর দিয়ে ঠেলে দিয়ে বললে : খুনের খবরটা দেখেছেন? তারাতলায়? মা সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্ট-এ?

বাসু যেন একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, প্রথম পাতায় নিচের দিকে ওই রকম কী নিউজ আছে বটে। ডিটেইল্‌সে পড়িনি। কিন্তু সে-কথাই বা কেন?

হঠাৎ ত্রিদিব ঘনিয়ে এল ওঁর দিকে। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ওই খুনের মামলায় আমার 'ওয়াইফ'-এর জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা! আই মিন, অচিরেই ওই খুনের দায়ে সে গ্রেপ্তার হতে চলেছে।

বাসুও ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে জানতে চান, আপনার স্ত্রীই কি খুনটা করেছেন?

— না! নিশ্চয় না! সে এ কাজ করতেই পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বিশ্রীভাবে কেসটায় জড়িয়ে পড়েছে! কিছুটা নির্বুদ্ধিতা, কিছুটা অসাবধানতা, বাকিটা ওর চরিত্রদোষে। আমি অস্বীকার করব না — মানে, ও হয়তো জানে খুনটা আসলে কে করেছে। আমার অবশ্য ধারণা সে নিশ্চিত জানে। আই মিন, তার চোখের সামনেই খুনটা হয়েছে। আর দুর্ভাগ্যবশত আমার ওয়াইফ জেনেশুনে হত্যাকারীকে আড়াল করতে চাইছে। লোকটাও অদ্ভুত। কাপুরুষের অধম। একজন অবলা মহিলার আঁচলের তলায় লুকিয়ে ওকেই বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেখুন স্যার, আপনি না বাঁচালে...

বাধা দিয়ে বাসু বলে ওঠেন, দাঁড়াও, দাঁড়ও। খুনটা হয়েছে রাত দেড়টা নাগাদ। তখন কি তোমার স্ত্রী বাড়িতে ছিল না?

— না! ছিল না!

— তুমি কেমন করে জানলে?

— সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আমাকে তাহলে প্রথম থেকে বলতে হয়।

— বল না! তাই বল। প্রথম থেকেই। না হলে আমি বুঝব কী করে?

ত্রিদিব আবার আরাম করে গুছিয়ে বসল। দক্ষিণ ও বাম ঠ্যাঙ তাদের অবস্থান বদলালো। চোখের উপর ঝুলে-পড়া চুলের গোছা অশান্ত হাতে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমার নাম শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও।

আমার বাবা হচ্ছেন নাসিকের ধনকুবের শ্রীত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও। আমরা...

— জানি, শক্তাবৎ। এ কথা তুমি আগেই বলেছ। তারপরের কথাটা কী?

— আমি কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছি। আলিপুরে আমাদের একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট আছে। জাস্ট একটা গ্যারেজ আর একটু দূরে এক কামরার একটা রেসিডেন্সিয়াল য়ুনিট। ওখানে ভবিষ্যতে একটা মালটিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস হবে। আপাতত ওই এক কামরার ঘরে থেকেই আমি কলকাতায় ল' পড়ছিলাম। গত বছর পাশ করেছি। বছরখানেক আমি য়ুরোপ-আমেরিকা ঘুরতে গেছিলাম। মাস-তিনের আগে ফিরে আসি। তারপর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হই। আমার বাবা তখন বিদেশে। আমেরিকায়। ওই নার্সিং হোমে যে নাইট-নার্স ছিল তার নাম ছন্দা বিশ্বাস।

এই পর্যন্ত বলে ত্রিদিব মৌন হল। তাকিয়ে রইল ঘূর্ণ্যমান সিলিং ফ্যানটার দিকে।

বাসু বলেন, শুনলাম। তারপর?

— আমি ছন্দা বিশ্বাসকে বিয়ে করে ফেললাম!

আবার থামল সে। যেন, একটা জঘন্য অপরাধের স্বীকারোক্তি করেছে! এখন তাই একটু দম নিচ্ছে।

বাসু বললেন, ও!

যেন, নার্সিং হোমে রুগীরা সচরাচর নাইট-নার্সকে বিয়ে করে যুগলে বাড়ি ফেরে। এটাই প্রথা!

ত্রিদিব সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে, আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না, স্যার। আমরা 'রাও', মানে চিতোরের শক্তাবৎ রাও! আমি আমার স্বনামধন্য পিতা শ্রীত্রিবিক্রমনারায়ণ রাওয়ের একমাত্র পুত্র — আর আমি কিনা খানদানের কথা ভুলে গিয়ে, বংশমর্যাদার কোনো তোয়াক্কা না রেখে, বেমক্কা বিয়ে করে বসলাম একজন নার্সকে! আমার স্বনামধন্য পিতৃদেব এটাকে কী ভাবে নেবেন...

— তা নিয়ে তোমার কেন মাথাব্যথা? দেখ ত্রিদিব, জীবনটা তোমার। জীবনসঙ্গিনীও তুমি নিজে নির্বাচন করেছ...

— আপনাকে আমি কেমন করে বোঝাই? বাবামশাই আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেখলেন আমার টেলিগ্রাম তাঁর অপেক্ষায় রাখা আছে! আমি বিবাহিত! আমি একটি সামান্য নার্সকে বিবাহ করেছি। যে মেয়েটি অন্যপূর্বা এবং বয়সে আমার চেয়ে বড়ো।

— 'অন্যপূর্বা' মানে?

— ছন্দা বিশ্বাস বিধবা!

— তাতে কী হল? বিদ্যাসাগর মশায়ের আমল থেকে বিধবা-বিবাহ তো সিদ্ধ।

— আপনাকে আমি কেমন করে বোঝাই?

— ও প্রসঙ্গ থাক। তুমি কী একটা খুনের কথা বলতে চাইছিলে না?

— হ্যাঁ খুন। এই দেখুন...

— কোটের পকেট থেকে সে একটি দৈনিক পত্রিকার কর্তিত অংশ বার করে আনল। ভাঁজ খুলে সেটি পেতে দিল ওঁর গ্লাস-টপ টেবিলে। কাগজটার মাঝখানে একটা চাবির আলোকচিত্র—বস্তুত তিন-তিনটি চাবি।

ত্রিদিব তার হিপ-পকেট থেকে একটা চামড়ার 'কী-কন্‌টেনার' বার করে টেবিলে রাখল। তাতে তিন-তিনটি চাবি। বললে, মিলিয়ে নিন, স্যার?

কাগজে অবশ্য 'রিডিউস্‌ড-স্কেলে' ছাপা হয়েছে, তবু শনাক্ত করতে কোনো অসুবিধা হল না। বাসু-বললেন, এটা কেমন করে হল? আমার ধারণা এ চাবির গোছাটা তো আছে পুলিসের হেপাজতে!

ত্রিদিব মাথা নাড়ল। বলল, আজ্ঞে না! এ থোকাটা আমার। পুলিশের কাছে যেটা আছে সেটা আমার ওয়াইফ-এর। যেটা সে কাল রাত্রে অকুস্থলে অসাবধানে ফেলে এসেছে। যখন ওই লোকটা খুন হয়—তা সে যেই করুক!

—তোমার স্ত্রী যে সে সময় অকুস্থলে ছিল তা তুমি কেমন করে জানলে?

ত্রিদিব কপাল থেকে চুলের গোছাটা সরিয়ে বলল, তাহলে আপনাকে গল্পটা গোড়া থেকে বলতে হয়।

বাসু বিরক্ত হয়ে বললেন, না! গোড়ার দিকটা আমার জানা। তোমার নাম, তোমার বাবার এবং স্ত্রীর নাম এবং তোমার শক্তাবৎ। এখন শুধু বল তুমি কেমন করে জানলে যে, তোমার স্ত্রী কাল গভীর রাত্রে তারাতলায় ছিল?

ত্রিদিব চাবির থোকাটা তুলে নিয়ে বলল, এই চাবিটা মারুতির ফ্রন্ট-ডোর কী, যেটা আমার ওয়াইফ চালায়, এটা আমার অ্যাম্বাসাডারের। আর এই নবতালটা হচ্ছে গ্যারেজের চাবি। ডবল গ্যারেজ। ইগনিশন কী সচরাচর গাড়িতেই লাগানো থাকে। পাশাপাশি দুটি গাড়ি থাকে। সামনে স্লাইডিংডোর। একই তালায় দুটো গাড়ি লক করা থাকে। তাই সুবিধার জন্য আমরা তিন সেট চাবি বানিয়েছি। একটা থাকে আমার কাছে। একটা ছন্দার কাছে, তৃতীয়টা আমাদের ড্রয়ারে। আমি আপনার কাছে আসার আগে দেখে এসেছি, ড্রয়ারের চাবি স্বস্থানে আছে। আমার চাবি তো আমার পকেটে! দেয়ারফোর, পুলিশ যেটা খুঁজে পেয়েছে সেটা আমার ওয়াইফের চাবির থোকা।

— আই সি। তা তুমি যে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছ সে কথা কি তোমার স্ত্রীকে জানিয়ে এসেছ?

— না।

— কেন?

— সে অনেক কথা! শি ট্রায়েড টু ড্রাগ মি!

— সে কী করতে চেয়েছিল?

— কাল রাত দশটা নাগাদ আমাকে জোরালো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিল!

— কেন?

— না হলে তার নৈশ-অভিসারে ব্যাঘাত হত যে!

— নৈশ-অভিসার! তার মানে?

— সে কথাই তো বলতে চাইছি।

— তাহলে বল। সবটা গুছিয়ে নিয়ে বল?

ত্রিদিবের সে ক্ষমতা নেই। তার কথাবার্তা আর চিন্তার ঠিক পারম্পর্য নেই। অনেক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাসু-সাহেব তার কাছে থেকে যে ঘটনাপরম্পরা আবিষ্কার করলেন তা এই রকম :

গতকাল রাত্রি দশটা নাগাদ ওরা টি. ভি. বন্ধ করে দ্বৈতশয্যায় শয়ন করতে যায়। ছন্দা এই সময় ত্রিদিবের কাছে জানতে চায়, শোবার আগে সে একটু হট চকলেট খাবে কি-না। ত্রিদিব রাজি হয়। সে প্রায়ই শয়নের পূর্বে গরম চকলেট পান করে। এক-কামরার ফ্ল্যাট। সংলগ্ন বাথরুম এবং এক প্রান্তে কিচেনেট। ত্রিদিব শোবার ঘরে, প্যান্ট বদলে পা-জামা পরছিল, আর ছন্দা সংলগ্ন কিচেনেটে গরম চকলেট বানাচ্ছিল। ছন্দা ছিল ত্রিদিবের দৃষ্টিসীমার বাইরে, কিন্তু দরজাটা এমনভাবে আধখোলা অবস্থায় ছিল যে, দ্বারের সংলগ্ন আয়নায় অন্ধকার শয়নকক্ষ থেকে আলোকিত কিচেনেটে ছন্দাকে দেখা যাচ্ছিল। ত্রিদিবি লক্ষ্য করে, ছন্দা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট শিশি বার করে। শিশিটা পরিচিত। ওতে থাকে একটা ঘুমের ওষুধ : 'ইপ্রাল'! হাসপাতালে থাকতে প্রতি রাত্রে ওই ওষুধ খেতে হত। এখন খায় না! ত্রিদিব অবাক হয়ে দেখল, ছন্দা বেশ কয়েকটা ট্যাবলেট ওর চকলেটে মিশিয়ে দিল! তারপর এ ঘরে এসে ত্রিদিবের হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল।

— তারপর? তুমি ওকে জিজ্ঞাসা করলে না: কেন সে তোমাকে না জানিয়ে তোমার চকলেটে ঘুমের ওষুধ মেশালো! অথবা কটা ট্যাবলেট সে মিশিয়েছে?

— আজ্ঞে না, আমি জিনিসটা খতিয়ে দেখতে চাইছিলাম।

boiboi.net

— তাহলে ঠিক কী করলে তুমি?

ত্রিদিব চকলেটটা হাতে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে যায়। ভাবখানা সে ইউরিনাল ব্যবহার করতে যাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে সে চকলেটটা কমোডে ঢেলে দিয়ে ফ্লাশ টেনে দেয়। তারপর গরম জলের ট্যাপটা খুলে গ্লাসে গরম জল ভরে নেয়। এ ঘরে চলে আসে। ধীরে ধীরে সিপ্ করে গরম জলটা এমনভাবে পান করতে থাকে যাতে মনে হয় সে গরম চকলেটই খাচ্ছে।

— তারপর?

— তারপর আমি নিজেই গ্লাসটা বেসিনে ধুয়ে আনলাম, যাতে ও দেখতে না পায় তলানিটা কী জাতের। একটু পরে ওকে বললাম, আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে। ও একটা বই পড়ছিল। বলল, তাহলে শুয়ে পড়। আমি শুয়ে পড়লাম। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলাম। তার একটু পরে ছন্দাও শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমোলো না। রাত সওয়া বারোটায় ও নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। অন্ধকারেই সে নাইটি পাল্টে শাড়ি পড়ল। সাজ-পোশাক বদলালো। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

— দরজা খোলাই পড়ে রইল?

— আজ্ঞে না। আমাদের দরজায় 'ইয়েল-লক' লাগানো। ছন্দা যাবার সময়ে অতি সাবধানে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল, যাতে শব্দ না হয়।

— তারপর কী হল?

ত্রিদিব আবার উল্টোপালটা ভাবে ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা দিতে থাকে। পর্যায়ক্রমে সাজালে সেটা এই রকম দাঁড়ায় :

বিছানায় শুয়ে শুয়েই ত্রিদিব শুনতে পায় গ্যারেজের স্লাইডিং দরজাটা খোলা হল। মধ্যরাত্রে ওটা নিঃশব্দে খোলা যায় না। পাশাপাশি সমান্তরাল লোহার চ্যানেলে দুটি লোহার পাল্লা। গ্যারেজটায় দুটি গাড়িই পাশাপাশি থাকে। সচরাচর অ্যাম্বাসাডারটা ডাইনে, মারুতি বাঁয়ে। ফলে, ছন্দা নবতাল প্যাডলক খুলে খুব ধীরে ধীরে — যাতে শব্দ কম হয় — বাঁ-দিকের পাল্লাটা ডানদিকে নিয়ে আসে। ওই সময় ত্রিদিব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। জানলার কাছে সরে এসে পর্দা সরিয়ে দেখতে থাকে। দেখে, ওর স্ত্রী মারুতি গাড়িখানা বার করে আনল। আবার মারুতির দিকের লোহার পাল্লাটা ঠেলে ঠেলে স্ব-স্থানে টেনে আনল। তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে। কম্পাউন্ডের গেট খুলে বাইরে গেল। গেট বন্ধ করে রাস্তায় নামল। বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল। রাত তখন বারোটা পঁয়ত্রিশ...

এই পর্যায়ে বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, একটা কথা। তোমার স্ত্রী কি রওনা হবার আগে গ্যারেজের 'নবতাল' প্যাডলকটা বন্ধ করে দেয়নি?

ত্রিদিব বলল, নিশ্চয় দিয়েছিল।

— তুমি অতদূর থেকে সেই ব্যাপারটা দেখতে পেলে?

— আজ্ঞে না, স্বচক্ষে দেখিনি। এটা আমার আন্দাজ। দারোয়ানজি ছুটিতে ছিল তো? গ্যারেজটা লক্ না-করে গেলে অ্যামবাসাডার গাড়িটা অরক্ষিত হয়ে থাকত। তাই আন্দাজ করছি...আর তা ছাড়া আমরা দু-জনেই সব সময় গাড়ি নিয়ে বার হলেই গ্যারেজ-দরজা তালা বন্ধ করে যাই...ছন্দাও নিশ্চয় তা করেছিল...

বাসু বলেন, সে-ক্ষেত্রে ফিরে এসে সে গ্যারেজ খুলল কী করে? তোমার ধারণায় তো চাবিটা তার আগেই খোয়া গেছে তারাতলায়?

— তার কারণ ট্রিপলিকেট চাবিটাও ওর কাছে ছিল!

— ট্রিপলিকেট চাবি! মানে?

— আপনাকে আগেই বলেছি, স্যার, আমাদের তিন-সেট চাবি আছে। একটা থাকে আমার কাছে, একটা আমার ওয়াইফের কাছে, তৃতীয় সেটটা থাকে ওর ড্রেসিং টেবিলের টানা-ড্রয়ারে। ছন্দা রওনা

হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তৈরি হয়ে নিই। ওকে 'ফলো' করব বলে। পাজামা ছেড়ে প্যান্ট পরি, আর হাওয়াই শার্ট। কিন্তু আমার চাবির থোকাটা খুঁজে পাই না। সচরাচর যেখানে থাকে সেখানে নেই। খুঁজতে খুঁজতে মিনিটতিনেক দেরি হয়ে যায়। তখন মরিয়া হয়ে আমি টানা ড্রয়ার খুলে ট্রিপলিকেট চাবিটা নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু ড্রয়ার খুলে দেখি নির্দিষ্ট স্থানে চাবির থোকাটা নেই...

বাসু জানাতে চান, তার মানে?

— তার মানে ছন্দারও হয়েছিল ঠিক আমার অবস্থা। আমাকে নিথর হয়ে ঘুমাতে দেখে সে নিঃশব্দে উঠে পড়ে। অন্ধকারেই নাইটি ছেড়ে শাড়ি পরে ; কিন্তু তার চাবির থোকাটা খুঁজে পায় না। বাধ্য হয়ে নিশ্চয় সে ওই ড্রয়ারের তৃতীয় চাবির থোকাটাই নিয়ে যায়। আসলে ওর নিজের চাবি-সেটটা ছিল ওর লেডিজ ব্যাগেই। যেটা সে তারাতলায় ফেলে এসেছে ; কিন্তু তাতে বাড়ি ফিরতে তার অসুবিধা হয়নি।

— তারপর? বলে যাও...

ত্রিদিব আবার বলতে থাকে।

ড্রয়ারের থার্ড-সেট চাবিটা না পেলেও মিনিট পাঁচেক পরে সে তার নিজের থোকাটা খুঁজে পায়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। স্ত্রীকে ফলো করা আর সম্ভবপর নয়। তবে ত্রিদিব আন্দাজে বুঝতে পেরেছিল তার স্ত্রী কোথায় নৈশ-অভিসারে গেছে। অর্থাৎ কোন্ ভাগ্যবান তার সদ্যপরিণীতা সহধর্মিণীর প্রাকবিবাহযুগের প্রণয়ী। ও সেখানেই ফোন করে...

আবার বাধা দিয়ে বাসু বলেন, সে লোকটা কে?

— যে কমলেশকে খুনটা করেছে, এখন দোষটা আমার ওয়াইফের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে...

বাসু বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ! সে লোকটার পরিচয় কী? তার পিতৃদত্ত নাম?

ত্রিদিব মুখটা নিচু করল। রুমাল বার করে মুখটা মুছল। তারপর বলল, ডক্টর প্রতুলচন্দ্র ব্যানার্জি, এম. আর. সি. পি.!

— ডক্টর ব্যানার্জি? তোমার স্ত্রীর প্রাকবিবাহযুগের প্রণয়ী?

— শুধু প্রাকবিবাহ নয় স্যার, আমার অনুমান বিবাহোত্তর জীবনেও!

— তুমি বলতে চাও তোমার স্ত্রী মধ্যরাত্রে ডক্টর ব্যানার্জির বাড়িতে গেছিল?

ত্রিদিব গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ এবং না।

— তার মানে?

— ছন্দা ওই ডাক্তার বাঁড়ুজ্জের কাছেই গেছিল। তবে তাঁর বাড়িতে নয়!

— তুমি কেমন করে জানলে?

— তাহলে আপনাকে সবটা গুছিয়ে বলতে হয়।

বাসু এবার আর বিরক্ত হলেন না। বুঝতে পারছেন, এটাই ওর কথা বলার ধরন। বললেন, তাই বল?

— ওকে ফলো করা যখন অসম্ভব হয়ে গেল তখন আমি ডাক্তার ব্যানার্জির বাড়িতে একটা ফোন করি। রাত তখন পৌনে একটা।

— বাড়িতে না নার্সিং হোমে?

— আজ্ঞে না। বাড়িতে। ওঁর নার্সিং হোম-এরই তিন-তলায়। উনি ব্যাচিলার। একটি ওড়িয়া কম্বাইন্ড-হ্যান্ডকে নিয়ে ওই নার্সিং-হোমেরই তিন-তলায় দু-কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন।

— ঠিক আছে। তারপর?

— বেশ অনেকক্ষণ রিঙিং টোনের পর টেলিফোনটা তুলল ওঁর কম্বাইন্ড হ্যান্ড। জানাল যে, ডাক্তারবাবু বাড়ি নেই। তাকে আমি বলেছিলাম, একটা জরুরী কেসে ডাক্তারবাবুকে খুঁজছি। তাঁকে কি নার্সিং-হোমের নাম্বারে পাওয়া যাবে? লোকটা জানাল — না। ডাক্তারবাবু গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন!

— তুমি কি তোমার নাম জানিয়েছিলে?

— না! আমি গোটা ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম, আড়াল থেকে।

— অল রাইট! আড়ালে থেকে তুমি গোটা ব্যাপারের কী বুঝলে শেষ পর্যন্ত?

— সবটা বুঝিনি। যেটুকু বুঝেছি তা এই : আমার ওয়াইফ আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে যায়। তারপর দু-জনে একসঙ্গে যায় তারাতলায়। খুন ঐ ব্যানার্জিই করেছে আর ছন্দা বোকামি করে তার চাবিটা ফেলে এসে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে।

বাসু বললেন, একটা কথা বুঝিয়ে বল তো! তুমি সরাসরি তোমার স্ত্রীকে এসব প্রশ্ন করছ না কেন? কেন সে তোমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল? কেন মধ্যরাত্রে তোমাকে না-জানিয়ে শয্যাত্যাগ করে গাড়ি নিয়ে বার হয়েছিল এবং কীভাবে খবরের কাগজে তার চাবির ফটোটা ছাপা হয়েছে?

ত্রিদিব সোজা হয়ে বসল। কপালের চুলটা সরিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, তা আমি জানতে চাইতে পারি না!

— কিন্তু কেন?

— যেহেতু আমার ধমনীতে বইছে শক্তাবৎ রাজরক্ত। আমরা এভাবে কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, লুক হিয়ার, ইয়াং ম্যান! তুমি অহেতুক, ঈর্ষান্বিত হয়ে এসব আজগুবি কথা ভাবছ। রাত দেড়টার সময় ডাক্তার ব্যানার্জি বাড়িতে না-থাকায় এটা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোথাও রাদেভুঁ ছিল। তোমার স্ত্রী যদি অভিসারে যেতে চায় তাহলে ডাক্তার ব্যানার্জির ফ্ল্যাটেই যেতে পারত। আসলে ব্যানার্জি হয়তো কোনো রুগি দেখতে গেছিলেন। আবার তোমার স্ত্রীর চাবির থোকা ওই বাড়িতে আবিষ্কৃত হওয়ার অর্থও এ নয় যে, খুনের সময় সে সেখানে ছিল। হয়তো কমলেশকে সে চিনত, দিনের বেলা তোমার স্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল।

— ফর য়োর ইন্‌ফরমেশন, স্যার, কমলেশ আমার ওয়াইফের প্রথম পক্ষের স্বামী!

— আই সী! আর একটা কথা বুঝিয়ে বল তো! তুমি তখন একজন দারোয়ানের ছুটি নেবার কথা বললে। ওই দারোয়ান কতদিন ও বাড়িতে চাকরি করছে আর কবে থেকে ছুটিতে আছে?

— মহাদেব প্রসাদ আমার পিতাজির একজন বিশ্বস্ত কর্মী। আমি যখন কলকাতার কলেজে পড়তে আসি তখন সে নাসিক থেকে চলে আসে। সে ঠিক দারোয়ান নয়, অল্প বয়সে সে বস্তুত আমার লোকাল-গার্জেনও ছিল। আমার রান্নাবান্নাও সে করে দিত। আমি বিয়ে করার পর সে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়—

— ছুটি সে চেয়েছিল, না তুমিই তাকে তাড়ালে? নাকি তোমার স্ত্রী...

— ইন ফ্যাক্ট, পিতাজি আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পরেই তাকে তলব করেন। ও নাসিকে যায়। সেখান থেকে দেশে চলে যায়।

— তার মানে কাল গভীর রাত্রে তোমার স্ত্রী যে গাড়ি নিয়ে বাইরে গেছিল এ কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না — তাই তো?

— সম্ভবত তাই। অন্তত আমি এখনও কাউকে বলিনি।

— সেক্ষেত্রে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে : তোমাদের গ্যারেজের ওই 'নবতাল' তালার পরিবর্তে অন্য একটি বড়ো তালা ওখানে ঝোলানো। তাহলে হয়তো পুলিশের নজর তোমাদের দিকে আদৌ পড়বে না।

— এ-কথা কেন বলছেন?

— সেটাই স্বাভাবিক। পুলিস মোটর-ভেহিক্‌লস-এ গিয়ে খবর নেবে একই পরিবারভুক্ত কয়টি ক্ষেত্রে ডবল্‌-লাইসেন্স আছে — একটি মারুতি এবং একটি অ্যামবাসাডার। কলকাতা শহরে এমন পাঁচ-দশটা কেস তারা হয়তো পাবে — কিন্তু প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। দু-দুটো গাড়ি বড়োলোক ছাড়া কেউ পোষে না।

ফলে পুলিস গোয়েন্দা নিয়োগ করবে। যে সব পরিবারের নামে জোড়া লাইসেন্স আছে সেখানে গিয়ে খবর নেবে কার গ্যারেজে 'নবতাল' তালা আছে। তারপর যে নবতাল-তালার চাবিটা পুলিসের হেপাজতে আছে...

ত্রিদিব বাধা বলল, আপনি কি আমাকে এভিডেন্স ট্যাম্পার করতে পরামর্শ দিচ্ছেন?

বাসু ওর চোখের দিকে পুরো দশ-সেকেন্ড নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি কি চাও পুলিস খুঁজতে খুঁজতে ওই 'নবতাল' তালাটা আবিষ্কার করুক? সাত দিনের ভিতর?

ত্রিদিব দৃঢ়স্বরে বলল, সাত দিন কেন? আজই পুলিশ তা জানবে।

— মানে?

— কারণ আপনার এখান থেকে আমি সরাসরি পুলিস-স্টেশনে যাব। আমি যা দেখেছি, যা জানি, যা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত তা অপকটে এজাহারে জানাব।

বাসু চমকে ওঠেন : গুড গড! কেন? কেন এ কাজ করবে তুমি?

— যেহেতু এটাই আমার শিক্ষা। এটাই আমার খানদান। আমার ধমনীতে বইছে শক্তাবৎ রাজপুত রাজরক্ত।

বাসু অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন। বলেন, কিন্তু তোমার স্ত্রী তো খুনী নাও হতে পারে?

— অফ কোর্স শি ইজ ইনোসেন্ট! খুন সে করেনি। করেছে ডাক্তার ব্যানার্জি। এখন সে পরস্ত্রীর পেটিকোটের আড়ালে লুকাতে চাইছে। আপনি কেন এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, স্যার? রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশে ডাক্তার ব্যানার্জি বাড়িতে অনুপস্থিত। ছন্দা তার নৈশ অভিসারে বার হল তার ঠিক দশ মিনিট আগে, বারোটা পঁয়ত্রিশে। রাত একটা কুড়িতে তারাতলায় খুন হল কমলেশ। আর তারাতলা থেকে গাড়িতে মাঝ রাত্রে আসতে যে পনেরো মিনিট লাগে, সেই সময়ের ব্যবধানে ছন্দা ফিরে এল কাঁটায় কাঁটায় একটা পাঁয়ত্রিশে। হিসাবটা তো জলের মতো পরিষ্কার। খুনটা করেছে ব্যানার্জি, কিন্তু ছন্দার উপস্থিতিতে। আর এখন চাবিটা ফেলে আসায় সবটা দোষ চাপছে আমার ওয়াইফের ঘাড়ে। ওকে বাঁচাতেই হবে, স্যার...

বাসু বললেন, তোমার স্ত্রী যে ঠিক একটা পঁয়ত্রিশে ফিরে এসেছে তা তুমি জানলে কী করে?

— ঘড়ি দেখে! আমি জেগেই ছিলাম। গাড়ির শব্দ পেয়ে জানলার ধারে এগিয়ে এলাম। দেখলাম স্বচক্ষে। ছন্দা তালা খুলল। পাল্লাটা ঠেলে দিয়ে গাড়ি গ্যারেজ করল। তারপর এগিয়ে এল বাড়ির দিকে। আমি তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুয়ে পড়লাম...

— জাস্ট এ মিনিট! ছন্দা গাড়ি গ্যারেজ করার পর আবার পাল্লাটা ঠেলে বন্ধ করল না? 'নবতাল' তালাটা লাগাল না?

ত্রিদিব একটু চিন্তা করে বলল, না! যদ্দুর মনে পড়ছে—না!

— কেন?

— কারণ আজ সকালে যখন আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি, তখন গ্যারেজের পাল্লাটা খোলাই ছিল।

— তা নয়। আমি জানতে চাইছি, ছন্দা কী কারণে গ্যারেজ বন্ধ করে তালা লাগাল না?

— গ্যারেজটা মাপে একটু ছোটো। অ্যামবাসাডারটার সই-সই। কখনও কখনও রাস্তায় ভারি ট্রাক গেলে গ্যারেজটা কাঁপে। তখন অ্যামবাসাডার গাড়িটা একটু সড়ে-নড়ে যায়। সেক্ষেত্রে পাল্লাটা বন্ধ হয় না। তখন অ্যামবাসাডারটাকে সামনের দিকে একটু এগিয়ে নিতে হয়। ছন্দা সে রিস্ক নেয়নি। কারণ অ্যামবাসাডারটা স্টার্ট নেবার সময় বেশ শব্দ হয়। ওর আশংকা হয়েছিল হয়তো আমার ঘুম ভেঙে যাবে।

— আজ সকালে তুমি যখন আমার কাছে চলে আস তখন তোমার স্ত্রী কী করছিল?

— অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

— ও জানে না, তুমি উঠে চলে এসেছ?

— নাঃ!

— আশ্চর্য! কেন? ওকে না জানিয়ে এভাবে চলে এলে কেন?

— কেন নয়? আমার ওয়াইফ যদি আমাকে না জানিয়ে মধ্যরাত্রে শয্যাত্যাগ করতে পারে, তাহলে সূর্যোদয়ের পর...

— তা বটে। তা এত সকালে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?

— তা বলতে পারব না। তবে ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকতেও পারছিলাম না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখি কাগজওলা বারান্দায় ছুঁড়ে কাগজ ফেলে গেছে। সেটা খুলে পড়তেই দেখি প্রথম পাতায় বার হয়েছে কমলেশ বিশ্বাস খুন হয়েছে। আমি জানতাম, ছন্দার প্রথম পক্ষের স্বামীর নাম 'কমলেশ বিশ্বাস' ; কিন্তু আমার ধারণা ছিল সে মৃত। কাগজের পঞ্চম পৃষ্ঠাটা খুলেই বুঝতে পারলাম, বাস্তবে কী ঘটেছে। ব্যানার্জি আর ছন্দা কাল রাত্রে কমলেশকে খুন করতে গেছিল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ড্রয়ারটা টেনে দেখি তাতে এক সেট চাবি রয়েছে ; দ্বিতীয় সেট আমার পকেটে। ফলে বুঝতে অসুবিধা হল না, কাগজে যে ছবিটা ছেপেছে তা ছন্দার চাবির গোছা। তখনই গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বার করে আপনার কাছে চলে এলাম...

— তুমি আমার বাড়ি চিনতে?

ত্রিদিব একটু ভেবে নিয়ে বলল, হ্যাঁ চিনতাম।

— কীভাবে?

আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল, সরি স্যার! ঠিক বলতে পারব না। স্বীকারই করি — আমি ডাঃ ব্যানার্জীর নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলাম মানসিক রোগী হিসাবে। সব কথা আমি সব সময় মনে করতে পারি না।

— অল রাইট! তুমি আমার কাছে কেন এসেছিলে? ঠিক কী চাও?

— আমার ওয়াইফকে বাঁচাতে। আমার খানদানকে বাঁচাতে!

— তা যদি বাঁচাতে চাও ত্রিদিব, তাহলে তুমি নিজে থেকে কিছুতেই পুলিসে যেতে পার না!

— দ্যাটস্ ইম্‌পসিব্‌ল, স্যার! আমি রাঠোর রাজপুত! শক্তাবৎ!

— আই সি! কিন্তু তুমি যে আমাকে নিয়োগ করতে চাও তাতে আমার জানা দরকার আমার ক্লায়েন্ট কে? তুমি না তোমার স্ত্রী?

— অফ কোর্স আমার ওয়াইফ! আর যদি সম্ভবপর হয় তাহলে এই খুনের মামলায় যেন আমাদের খানদানটা জড়িয়ে না পড়ে। আমার বাবার নামটা...

— তোমার বাবার নামটা তো তুমি নিজেই জড়াচ্ছো। পুলিসে গিয়ে এজাহার দিতে গেলে প্রথম পংক্তিতেই তো তোমার বাবার নামটা বলতে হবে।

ত্রিদিব গুম মেরে বসে থাকল।

— দ্বিতীয়ত, তোমার বাবাকে আমার দরকার 'ফি'টা মেটানোর জন্য। আমার এটাই তো পেশা...

— আই নো, আই নো, কিন্তু সে প্রয়োজনে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা বৃথা। তিনি আমার ওয়াইফকে বাঁচানোর জন্য একটা পয়সাও খরচ করবেন না!

— কেন? সে তাঁর পুত্রবধূ! 'খানদান'-এর ঐতিহ্যটা বাঁচাতে হলে তাঁর পক্ষে পুত্রবধূকে রক্ষা করাই তো স্বাভাবিক।

— আজ্ঞে না। তাহলে আপনাকে ব্যাপারটা গোড়া থেকে বুঝিয়ে বলতে হয়।

— থাক্ ত্রিদিব। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে না। শুধু একটা কথা বল : তোমার বাবার সুনাম, তোমাদের 'খানদান' ইত্যাদির খাতিরে তুমি কি পুলিস-স্টেশনে যাবার ইচ্ছাটা আপাতত মুলতুবি রাখবে? আর 'নবতাল' তালাটা বদলে দেবে?

ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। বলল, সরি স্যার। আপনি আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি। এভিডেন্স নষ্ট করা

অথবা সত্য গোপন করা সাত শতাব্দী ধরে কোনো শক্তাবৎ রাজপুত করেনি। আমিও করতে পারব না।

মাথা খাড়া রেখেই গটগট করে বেরিয়ে গেল সে। শুধু দরজার কাছে একবার থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে বলল, আপনার বিলটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, স্যার। দরকার হয় ঘড়ি-আংটি বেচে আমি আপনার ফি-টা মেটাব। আর তাছাড়া জানেন নিশ্চয় — আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রটা বাঙালীদের মতো দায়ভাগের নয়। মিতাক্ষরা সূত্রে।

বাসু বললেন, মনে আছে। তুমি বলেছিলে যে, তুমি ল-পাশ।

আট

শক্তাবৎ রাজপুতের নাটকীয় প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে তিনজনে — সস্ত্রীক কৌশিক আর রানু।

রানুই তাদের যৌথ জিজ্ঞাসাটা বাঙ্ময় করে তুললেন : কেন এসেছিল? ওই শক্তাবৎ রাজপুত্র?

— আমাকে কিছু আইনের পরামর্শ দিতে!

— তোমাকে! আইনের পরামর্শ! কী সেটা?

— শক্তাবৎ রাজপুতদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রটা মিতাক্ষরা আইনে, ভেতো-বাঙালিদের মতো 'দায়ভাগ' সূত্রে নয়।

ওঁরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়া করেন।

বাসু বলেন, ওসব আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র তোমরা বুঝবে না। রানু, দেখ তো ত্রিদিব নাম-ঠিকানার সঙ্গে ওর টেলিফোন নাম্বারটা রেখে গেছে কি না। থাকলে ইমিডিয়েটলি ফোন কর। ছন্দা বাড়িতে আছে। বোধহয় এখনো ঘুমাচ্ছে। তাকে আমার দরকার।

বেলা তখন আটটা। তবু ছন্দা ঘুমাচ্ছিল। শেষ রাতে কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার ফলে। বেশ কিছুক্ষণ রিঙিং-টোনের পর ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে সাড়া দিল সে। বাসু বললেন, ছন্দা? এখনো ঘুম ছোটেনি? শোন! যা বলছি মন দিয়ে শোন!

— আপনি কি, স্যার, বাসু-সাহেব বলছেন?

— তাই বলছি! কাল রাত্রে কী ঘটেছে তা তুমি জান! আমিও জানি!

ও-প্রান্তে ছন্দা একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। বোঝা গেল, এতক্ষণ সে ছিল আধোঘুমের ঘোরে। গত রাত্রের বিভীষিকাটা ওর স্মৃতিপথে ছিল না। এতক্ষণে সে পুরোপুরি জেগে উঠল, সচেতন হল। লক্ষ্য করে দেখল, পাশের বিছানাটা খালি। কণ্ঠস্বরে সংযম এনে বলল, আমি...আমি বুঝতে পারছি না, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? কাল রাত্রে...মানে, কী এমন ঘটেছে?

— লুক হিয়ার, ছন্দা। তোমার ওসব পুরনো প্যাঁচ শিকেয় তুলে রাখ। তোমাকে যা বলছি তা বিনা প্রশ্নে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কেন তা করতে বলছি, সে-কথা যখন দেখা হবে তখন বুঝিয়ে বলব। এখন নয়! ফলো?

— বলুন?

— মিনিট পনেরোর ভিতর মিসেস্ সুজাতা মিত্র অফ 'সুকৌশলী' তোমার কাছে যাবে। এই পনেরো মিনিটের ভিতর একটা ওভার-নাইট ব্যাগে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে তৈরি হয়ে থেকো, যাতে সুজাতা পৌঁছানো মাত্র, তার আইডেন্টিটি প্রমাণ করা মাত্র, তুমি ওর সাথে রওনা হতে পার। দু-চার দিনের জন্য তোমাকে হয়তো অন্যত্র যেতে হবে। তোমার স্বামীর জন্যে...সে এখন ঘরে নেই

তা আমি জানি — কোনো নোট রেখে যাবার প্রয়োজন নেই...

ছন্দা প্রতিপ্রশ্ন না করে পারে না, ও কোথায়?

— পাঁচ মিনিট আগেও আমার চেম্বারে ছিল। এখন নেই। প্লিজ! কোনো প্রশ্ন টেলিফোনে কর না। ঠিক যা যা বলছি তাই করো, সুজাতা তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে।

ছন্দা আরও কিছু বলতে চাইছিল, পারল না, — কারণ বাসু-সাহেব লাইন কেটে দিয়ে সুজাতার দিকে ফিরলেন, শোনো সুজাতা! ত্রিদিব থানায় গিয়ে এজাহার দেওয়ামাত্র তার ফ্ল্যাটে রেইড হবে। হয়তো মিনিট কুড়ি-পঁচিশ সময় আছে। তোমাকে কী কী করতে হবে তা তুমি নিজেই স্থির করে নিও। আমি কিছু ইনস্ট্রাকশন দেব না, দিতে পারি না। আমি শুধু আমার সমস্যাটার কথা তোমাকে বলছি। প্রথম কথা : ছন্দা আমার ক্লায়েন্ট, তার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস আমি জানব, এটাই স্বাভাবিক ; কিন্তু দু-তিন দিনের জন্য সে যদি কোথাও বেড়াতে যায় — আমাকে না জানিয়ে — তাহলে তার ঠিকানা আমার জানার কথা নয়। পুলিসে জানতে চাইলে আমি নাচার। তবে আমি আশা করি — যেহেতু ছন্দা বুদ্ধিমতী — তাই কোনো হোটেলে গিয়ে উঠলে স্বনামেই রেজিস্টার খাতায় সই করবে। কারণ অন্যথায় মনে হতে পারে যে, আইনের হাত থেকে সে পালাতে চাইছে। সে দোষী, অন্তত জ্ঞানপাপী! সে তা নয়! তোমার কী মনে হয়?

সুজাতা কোনো জবাব দিল না। রানুর দিকে ফিরে বলল, মামিমা আমি একটু বেরুচ্ছি। রাতে না ফিরতে পারলে চিন্তা করবেন না।

কৌশিক মানিব্যাগ খুলে এক বান্ডিল নোট ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। সুজাতা সেটা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

বাসুও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, কৌশিক তুমি দেখ রবির কাছ থেকে পুলিস-ইনভেস্টিগেশনের আর কিছু ডিটেইলস পাওয়া যায় কি না। তাছাড়া পত্রিকা-অফিসের ওই নিজস্ব সংবাদদাতার তোলা ফটোর কপিগুলো পাওয়া যায় কি না। চিফ নিউজ-এডিটর আমাকে খুবই খাতির করে।

কৌশিক জানতে চায়, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

— একবার তারাতলা ঘুরে আসি। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে।

রানু জানতে চান, দুপুরে বাড়িতে কে-কে লাঞ্চ করছ?

বাসু বলেন, সুজাতা বাদে আমরা তিনজনই।

তারাতলার অসমাপ্ত সন্তোষী-মা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে টুলে বসে দুই সেপাই আপনমনে হাততালি দিচ্ছে। গাড়িটা কাছাকাছি এসে পড়ার পর বোঝা গেল, ওদের করধ্বনি কারও সাফল্যজনিত হেতুতে নয় — তারা দুজন মৌজ করে খৈনি বানাচ্ছে। বাসু-সাহেবকে গাড়িটা পার্ক করে নেমে আসতে দেখে তারা চঞ্চল হল না। টুলে বসে বসেই প্রশ্ন করল, ক্যা চাহিয়ে সাব?

— এ বাড়ির দেড়তলায় যিনি থাকতেন — কমলেশ বিশ্বাস...

— তিনি গুজর গিয়েসেন, মানে-কি ফৌত হইয়েসেন। আখবরে দেখেন নাই?

— হ্যাঁ! খবরের কাগজে দেখেই তো খোঁজ নিতে এসেছি।

— অখন কী তালাশ নিবেন? মুর্দা তো লাশকাটা ঘরে চালান হইয়ে গেল।

— সেটা আন্দাজ করেছি। আমি কি একবার ওর ঘরটা দেখে আসতে পারি, সেপাইজী? তোমাদের সঙ্গে — মানে, কালও আমি এসেছিলাম কমলেশের কাছে, একটা জিনিস ভুলে ফেলে গেছি...

— কুঞ্চি? এক রিংমে তিনঠো চাবিকা বাৎ বোল্‌তে ক্যা?

— না, না, চাবি নয়। একটা নোটবই, মানে ডায়েরি।

— মাফ কিজিয়ে সাব। বিনা-পারমিট ভিতর-যানা মানা হৈ!

অগত্যা বাসু-সাহেব এপাশে ফিরলেন। বটুকনাথ দুলে দুলে বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু নজর ছিল এদিকেই। বাসু-সাহেবের গাড়ি এ গলিতে ঢোকার পর থেকেই। বাসু ওর দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন। বটুক

বিনা বাক্যব্যয়ে তার উপস্থিত খদ্দেরকে পান দিল, নোট নিয়ে রেজগি দিল। তারপর দোকানটা ফাঁকা হতেই টিনের কৌটা খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরল বাসু-সাহেবের দিকে। বললে, একটা দেশলাইয়ের দাম মিটিয়ে দেবেন স্যার, নিন ধরুন!

— তার মানে?

— কাল রাতভোর ধকল গেছে! কী কুক্ষণে থানায় টেলিফোন করার দুর্মতি যে হল! জবানবন্দি দিতে দিতে জান নিকলে গেছে। একবার পুলিশ, একবার খবরের কাগজ...

— সে তো বুঝলাম। টেলিফোনটা করে তুমি নাগরিকের কর্তব্য পালন করেছ, বটুক। তা ভালো কাজ করলেই নাকাল হতে হয়। এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম, কিন্তু ওই নোটটা আমাকে ফেরত দিচ্ছ কেন?

— দারোগাবাবু যাবার আগে হুকুম দে' গেলেন, আমাদের যা বললে তা যদি বাইরের কোনও মনিষ্যিকে বল তাইলে সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দোব। ইদিকে আপনার কাছ থেকে আগাম নে বসি আছি, উদিকে আমি ছা-পোষা মনিষ্যি।

বাসু পাইপটা ধরাতে ধরাতে বললেন, যদিও তুমি ঠিক ছা-পোষা মানুষ এখনো হওনি, তবে মাস-ছয়েকের ভিতরেই তা হতে চলেছ। আমি তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি, বটুক। ঠিক আছে, তোমার কাছে কিছু জানতে চাইব না। তবে আমারও মুশকিল কী জান? যাকে যা দিই তা আর ফেরত নিই না। ওটা তোমার কাছেই থাক! আচ্ছা চলি...

বাসু পিছন ফিরলেন। বটুক নোটটা হাতে নিয়ে বিহ্বল হয়ে বসে রইল। আবার এদিক ফিরে বাসু বললেন, তুমি শুধু একটা কথা স্মরণ রেখ, বটুক — টাকাটা তোমাকে আমি দিয়েছিলাম ঘটনা ঘটে যাবার অনেক আগে। পুলিসের সাক্ষী ভাঙাতে ঘুষ দিইনি আমি। তাই না? তোমার তীক্ষ্ম দৃষ্টি আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে খুশি মনে দেশলাই কিনে ভাঙানিটা ফেরত নিইনি। ঠিক বল্‌ছি তো, বটুক?

এতক্ষণ নজর হয়নি—দোকানের পিছন দিকে অন্ধকারে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল একজন। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। একপা এগিয়ে এসে বটুকের হাত থেকে পঞ্চাশ টাকার নোটখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরল। মাথার উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে, আমার নাম সদু...সৌদামিনী, আজ্ঞে। আমারে দারোগাবাবু শাসায়ে যায়নি। গেলেও আমি কান দিতাম না। এই ভিতুর ডিম মুখে কুলুপ আঁইটে রাখতে চায় তো রাখুক। ভীমা কৈবর্তের মাইয়া কারুরে ডরায় না। কী জিগাইবেন জিগান! পঞ্চাশ ট্যাহা বশকিস্ দেবার মতো হিম্মৎ কইলকাত্তা শহরে আছে কয়জন ভদ্দরলোকের? শহরের সব বীরপুরুষই তো প্যাটের তলায় ন্যাজ স্যাঁদায়ে...

শেষ দিকের বাক্যটা সে তার মরদের দিকে ফিরে বলছিল। হঠাৎ বটুক যেন সংবিৎ ফিরে পেল। কঠিন স্বরে তার ধর্মপত্নীকে প্রথমেই একটা ধমক দিল, তুই ঘর যা কেনে! সাহেবরে আমিই সব বুলব অনে? হল তো?

সৌদামিনী হাসল। বিজয়িনীর হাসি। মরদের আদেশটা সে নিঃকথায় মেনে নিল। তবে অন্ধকারে পিছন দিকে মিলিয়ে যাবার আগে বাসু-সাহেবের দিকে হেসে যুক্তকরে প্রণাম জানাতে ভুলল না। আর বলা বাহুল্য : যাবার আগে তার বিজয়িনীর ট্রফিটা — যেটা এতক্ষণ ধরাই ছিল তার দু-আঙুলে — আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিতেও ভুল হল না।

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, না বটুক! তোমাকে বিপদে ফেলব না আমি। দারোগাবাবুর আদেশ না মানলে তোমাদের মত দোকানদারের কী হাল হয় তা আমার জানা। আমার বিশ্বাস তুমি যা দেখেছ যা বুঝেছ তা সবই বলেছ পুলিসকে এবং খবরের কাগজকে। তুমি শুধু বল, তুমি কি এমন কোনো তথ্য পুলিসে বা খবরের কাগজের বাবুকে জানিয়েছ যা সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি।

— আজ্ঞে না, স্যার। তবে দু-একটা কথা আমি ওদের আদৌ বলিনি।

— কী কথা তা আমি জানতে চাইছি না ; কিন্তু কেন বলনি?

— দেখুন, স্যার — পুলিসের উপর আমার একটুও বিশ্বাস নেই। ওরা আসে শুধু মানুষজনেরে হয়রান করতে, আর টাকা খেতে। বেশ বুঝতে পারছি — ওই বিশ্বাসবাবু ছিল একটি হাড়-হারামজাদা মনিষ্যি! অনেক অনেক মেয়েরে সে ফাঁসায়েছে। তাদেরই বাপ-ভাইয়ের কেউ একজন হয়তো ওরে খুন করে গেছে! আপনি বলবেন, আইন নিজের হাতে নেওয়ার হক কারও নেই! ভালো কথা, কিন্তু আইন ওই কমলেশকে কি অ্যাদ্দিন অপকর্ম থেকে ঠেকাতে পারিছিল? আমি যদি হক কথাটা বলি, তাহলে বেহুদ্দো আমার কয়েকজন খদ্দেরের পিছনে লাগবে ওরা। তাতে আমার লাভ তো অষ্টরম্ভা, লোকশানই ষোলোকলা।

বাসু বললেন, বুঝলাম। এবার বল, কথাটা কী? কী দেখেছ তুমি, যা পুলিসকে বা কাগজের লোককে জানাওনি।

বটুক চারিদিকে একবার দেখে নিতে নিম্নকণ্ঠে বলে, টর্চের আলোয় মেজেয় লুটিয়ে পড়া মানুষডার একটা ঠ্যাঙ দেখে আমি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাই ডাক্তারবাবুরে ডাকতে। তা সেই দেড়তলা থেকে দোতলায় উঠবার সময় সিঁড়ির জানলা দিয়ে আমি দেখতে পাই গলি দিয়ে পর পর দু-খানা গাড়ি হুস্ হুস্ করে বার হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতে সিঁড়ি ঘরের বাইরের দিকে কাচের টানা জানলা আছে — তা দিয়ে গলি তো বটেই, তারাতলা রোডটাও দেখা যায়। আমি দেখলাম, গলি দিয়ে যে দু-খানা গাড়ি বার হয়ে গেল, তার একটা মোটরসাইকেল, একটা মারুতি ভ্যান। আর ঠিক তার পরেই — বলা যায় লগে-লগেই — গলির মুখে-দাঁড়ানো একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। সে বাইরের দিকে মুখ করেই ছিল। কী গাড়ি কইতে পারব না।

— গাড়ির ভিতরে যারা ছিল তাদের দেখতে পাওনি?

— আজ্ঞে না। পেলেও ঘোর আঁধারে চেনা যেত না। তবে...

— কী তবে?

— বলাটা উচিত হবে কি না তাই ভাবছি!

— আমি তো পুলিস নই, খবরের কাগজেরও কেউ নই।

—তাইলে আপনারই বা এত উঁতাধাই কেন, তা আমারে আগে বোঝান।

এই 'উঁতাধাই' শব্দ-প্রয়োগেই বাসু-সাহেব বটুকচন্দ্রের জাতি নির্ণয় করে ফেলেন। এ গলিতে সে হাফ-প্যান্ট পরে মার্বেল খেলে থাকতে পারে। কিন্তু সে অথবা তার পিতৃদেব এককালে নির্ঘাৎ ওপার-বাঙলা থেকে এ-দেশে এসেছেন। এপার বাঙলায় কেউ 'কৌতূহল' শব্দের সমার্থ হিসাবে 'উতাধাই' বলবে না। মায় 'সমার্থশব্দকোষ' লেখক অশোক মুখুজ্জে পর্যন্ত না। বাসু বলেন, শোন বটুক। আমার এক মক্কেল এই বিবাহ-বিশারদ কমলেশের পরিত্যক্তা স্ত্রী! তার গহনাগাঁটি নিয়ে লোকটা সট্‌কেছিল। আমার আশঙ্কা পুলিস সেই নিরপরাধিনীর ঘাড়ে হত্যার অপরাধটা চাপাতে চাইবে। তাই তাকে বাঁচাবার জন্য আমি অগ্রিম সন্ধান নিয়ে চলেছি।

— তাহলে আমি আপনার লগে আছি। সব রকম সাহায্য করতে রাজি। আমি আন্দাজ করেছি, কে খুন করেছে। সে আপনার মক্কেল নয়। সে পুরুষ মানুষ।

— তুমি তাকে চেন?

— স্যার, সে-কথা জিগাবেন না। আপনার মতো সেও আমারে কিছু আগাম দে' গেছে। সন্ধে রাতে মোটর সাইকেলে চেপে — তারে তো আপনি চেনেনই — সেই বাবু আবার আমার কাছে এয়েছিল। আন্দাজ তখন সাতটা। তখনো কমলেশবাবু ফেরেনি। তার কথা আপনারে কেমন করে বলি, বলুন? আমি তো তারও নিমক খায়ে বসি আছি।

— বুঝেছি বটুক! আর কিছু বলতে হবে না তোমাকে।

* * *

তারাতলা থেকে ডায়মন্ড হারবার রোডে পৌঁছে বাসু-সাহেব গাড়ি পার্ক করলেন। একটা পাবলিক

টেলিফোন বুথ থেকে বাড়িতে ফোন করলেন। ধরলেন রানু। বাসু জানতে চাইলেন, সুজাতা কি তোমাকে ফোন করে কিছু জানিয়েছে? নিউ আলিপুরের লেটেস্ট নিউজ কী?

রানু জবাবে বললেন, আজ্ঞে না, মিস্টার বাসু কাজে বেরিয়েছেন, অ্যারাউন্ড একটা নাগাদ লাঞ্চে আসবেন।

বাসু ধমক দিয়ে ওঠেন, কাকে কী বলছ গো? আমি তোমার কর্তাই বলছি। সুজাতা কি কোনো...

কথাটা শেষ হয় না, তার আগেই রানু বলে ওঠেন, বেশ তো কাল সকালে আসুন। আমি ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্যাডে লিখে রাখছি!

এবার মালুম হল। বাসু বলেন, তোমার সামনে কেউ বসে আছে? তাই কি আবোল-তাবোল বকছ?

— একজ্যাক্টলি!

— পুলিস ইন্সপেক্টর? আমার সন্ধানে এসে ঠায় বসে আছে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন!

— বুঝেছি। এবার এমনভাবে প্রশ্ন করছি যাতে তোমার উত্তর 'হ্যাঁ-না'-র মধ্যে রাখতে পার। সুজাতা কি সফলকাম হয়েছে?

— হ্যাঁ।

— ওরা দুজনে কোথায় গিয়ে উঠেছে তা তুমি জান না, কেমন?

— ঠিক তাই।

— তোমার সামনে যে লোকটা বসে আছে সে কি হোমিসাইড-স্কোয়াডের সতীশ বর্মন?

— একজ্যাক্টলি।

— আর তাকে তুমি বলেছ আমি একটার সময় লাঞ্চ খেতে আসব?

— হাঁ, তাই।

— অল রাইট, আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি।

* * *

বর্মন অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠে, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য, বাসু-সাহেব? আপনার মক্কেলের স্বামী বলছেন, সকাল সাড়ে ছয়টার সময় তাঁর স্ত্রী ঘুমের ওষুধ খেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন, আর বেলা আটটা বেয়াল্লিশে তিনি কর্পূরের মত উপে গেলেন? স্বামীর জন্য একটা নোট পর্যন্ত না রেখে?

বাসু বললেন, আমি তো আপনাকে কিছু বিশ্বাস করতে বলিনি। সব তথ্য তো আপনিই সরবরাহ করছেন।

— এগুলো ফ্যাক্ট। টেক ইট ফ্রম মি!

— নিলাম। কিন্তু আমার কাছে কী জানতে চাইছেন?

— আপনার মক্কেল এখন কোথায়?

— আমি জানি না।

— একথা আপনি আগেও বলেছেন। কিন্তু সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অফটার অল, সে হল আপনার মক্কেল!

— তার স্বামী কোথায়?

— আমাদের হেপাজতে।

— সে জানে না তার স্ত্রী কোথায়? আফটার অল, সে হল মেয়েটির স্বামী!

— তার মানে আপনি বলবেন না?

— আজ্ঞে না। তার মানে, আমি জানি না। জানলে বলতাম। পুলিসের সঙ্গে আমি সব সময়েই সহযোগিতা করে চলি।

বর্মন উঠে দাঁড়ায়। উকিলী-কায়দায় একটা 'বাও' করে বলে, সে তথ্যটা আমি অস্থিতে-অস্থিতে জানি, য়োর অনার!

* * *

রাত আটটা নাগাদ ফিরে এল সুজাতা। ভগ্নদূতের মতো। বললে, মামিমা, রাতে খাব আর থাকব।

বাসু বলেন, কী ব্যাপার? তুমি না বলে গেলে রাতে ফিরবে না।

— তাই বলেছিলাম। কিন্তু আপনি বোধহয় সান্ধ্য-এডিশন খবরের কাগজটা দেখেননি? তাই নয়?

— না দেখিনি। কিছু খবর বের হয়েছে?

— তা হয়েছে। কীর্তিটা আপনার মক্কেলের শিভালরাস্ শক্তাবৎ মরদের। তার উদ্যোগে আজ একটি কাগজের সান্ধ্য-এডিশনে ছন্দার একটি ছবি ছাপা হয়েছে। পুলিস ছবিটা ছেপে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, এই মেয়েটিকে তারাতলা-হত্যা বাবদে পুলিসে খুঁজছে। আমরা সেটা জানতাম না ; কিন্তু যে হোটেলে ডবল-বেড রুম বুক করে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই হোটেলের ম্যানেজার কাগজটা দেখে। ছন্দা স্বনামে ঘর নিয়েছিল। ফলে ম্যানেজার তাকে সহজেই শনাক্ত করে। থানায় ফোন করে। রাত সাতটা নাগাদ পুলিসভ্যান এসে পৌঁছায়। বডি-ওয়ারেন্ট দেখায়। ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আমি চেক-আউট করে চলে আসি।

বাসু বললেন, বুঝলাম। সারাটা দিনে তুমি তাকে কতটা জানতে দিয়েছ আর কতটা জেনেছ?

— আমাকে সে কিছুই বলেনি। ইন ফ্যাক্ট, বলতে চেয়েছিল, আমিই শুনতে রাজি হইনি। তাকে বলেছিলাম, আমাকে তুমি কিছু বোলো না। কারণ পুলিসে আমাকে 'সামন' করলে আদালতে সব কথা আমাকে স্বীকার করতে হবে। আমাকে যা বলবে তা প্রিভিলেজড-কম্যুনিকেশন নয়।

— ভেরি কারেক্ট। কিন্তু তুমি তাকে কতটা জানিয়েছ?

সুজাতা বলে, আমি শুধু বলেছি যে, ত্রিদিবনারায়ণ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আর কিছু বলিনি। ...ও হ্যাঁ, আর তাকে বলেছিলাম, যদি ঘটনাচক্রে পুলিসে তাকে গ্রেপ্তার করে তাহলে সে যেন কোন অবস্থাতেই কোন জবানবন্দি না দেয়। পুলিস তাকে যে-কোন প্রশ্ন করলেই যেন সে বলে 'আমার অ্যাটর্নির অনুপস্থিতিতে আমি কিছুই বলব না।'

— গুড গ্যের্ল!

নয়

পরদিন রবিবার। হেবিয়াস কর্পাস করা যাবে না। আদালত বন্ধ। কিন্তু বাসু-সাহেবকে নিষ্কর্মা বসে থাকতে হল না। বেলা সাড়ে-দশটা নাগাদ বর্মন টেলিফোন করে জানাল যে, বাসু সাহেবের মক্কেল তাঁর উপস্থিতি ছাড়া কোনো কথারই জবাব দিচ্ছে না। উনি কি আসতে পারবেন হেড-কোয়ার্টার্সে?

বাসু এলেন। বললেন, আমার মক্কেল জবানবন্দি দেবে কিন্তু তার পূর্বে আমি তার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে চাই।

সে ব্যবস্থাই হল। ছন্দাকে নিয়ে আসা হল ওঁর কাছে, বিশেষ সাক্ষাৎ কক্ষে। লেডি-মেট্রন অদূরে বসে রইল। শ্রুতিসীমার বাইরে, কিন্তু দৃষ্টিসীমার নয়।

বাসু বললেন, আয়াম সরি ছন্দা! তুমি প্রথম থেকেই আমাকে না জানিয়ে একের পর এক ভ্রান্ত পদক্ষেপ করছিলে। তবে তুমি এটা খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ — মানে এই স্ট্যান্ডটা নিয়ে যে, তোমার অ্যাটর্নির অনুপস্থিতি তুমি কোনো এজাহার দেবে না।

— সুজাতাদি আমাকে সে-কথা বলেছিল। একটা কথা বলুন তো : পুলিসে আমাকে সন্দেহ করল কী করে?

— তোমার কর্তা থানায় গিয়ে এজাহার দিয়েছিল বলে!

ছন্দা একটু অবাক হল। বললে, তা কেমন করে হবে? সে তো কিছুই জানে না। সে তো তখন ঘুমাচ্ছিল?

— না, ছন্দা! তুমি ওর গরম চকলেটে 'ইপ্রাল' ট্যাবলেট মিশিয়েছিলে এটা সে জানতে পেরেছিল। সে ওটা কমোডে ঢেলে দেয়। আদৌ পান করেনি। ঘুমের ভান করে পড়েছিল। তুমি কখন গাড়ি নিয়ে আলিপুর থেকে রওনা হয়েছ আর কখন ফিরে এসেছ, তা সে জানে।

ছন্দা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কথাটা হজম করতে পারছিল না সে। তারপর কোনক্রমে বললে, ও জেগে ছিল? ঘুমায়নি? ও জানে যে, রাত্রে আমি গাড়ি নিয়ে...

কথাটা ওকে শেষ করতে দেন না বাসু। বলেন, এখন আমাকে সংক্ষেপে বল দিকি — কেন কাল মধ্য রাত্রে তারাতলায় গিয়েছিলে?

— কমলেন্দু আমাকে বাধ্য করেছিল। সন্ধ্যার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করে টেলিফোনে রাত একটায় ওর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি। আমার আশা ছিল, ত্রিদিবকে ঘুম পাড়িয়ে আমি একা ওর কাছে যেতে পারব।

— তোমার বয়সী একটি মেয়ের পক্ষে একা ড্রাইভ করে অত রাত্রে ওখানে যাওয়া কি দুঃসাহসিকতা নয়? তোমার ভয় হল না?

— ভয়ের কী আছে? আমার সঙ্গে লোডেড রিভলভার ছিল। আপনি তো নিজেই সেটা আমাকে ফেরৎ দিয়েছিলেন। কোনো মস্তান বাঁদরামো করতে এলে তার খুলি উড়িয়ে দিতাম!

বাসু ম্লান হেসে বললেন, তোমার ধমনীতেও কি শক্তাবৎ রাজরক্ত বইছে, ছন্দা? কী দরকার ছিল এতটা ঝুঁকি নেবার?

— সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি...আমি একটা অপরাধ করেছিলাম। কমলেশ তা জানত! খবরটা সে পুলিসে জানালে আমার নির্ঘাত জেল হয়ে যেত! কী জানেন? আমি জানি যে, আমি অন্যায় করেছি, সেজন্য জেল খাটতেও আমি প্রস্তুত, কিন্তু ত্রিদিবের কথা ভেবে আমি প্রায়শ্চিত্তটা করতে পারছিলাম না। ওর বাবা ত্রিবিক্রমের ধারণা : তাঁর পুত্র নিচু ঘরে বিয়ে করেছে, আমার 'খানদান' নেই — তা আমার নেই বটে, তেমনি আমি কিন্তু 'বর্ন-ক্রিমিনাল'ও নই। আমার জেল হলে ওর বাবা ওকে বলতেন 'দেখলে তো?'...সেটাই আমার সহ্য হচ্ছিল না। তাই আমার হাত-পা বাঁধা পড়েছিল। আমার উপায় ছিল না। কমলেশের হুকুম মতো রাত একটার সময়েই আমাকে তারাতলার মতো এলাকায় যেতে হয়েছিল, প্রচণ্ড বিপদ মাথায় করে।

— তুমি কি ওকে কিছু টাকা দিতে গেছিলে?

— আদৌ না! টাকা কোথায় যে, দেব? আমি শুধু কিছু সময় চাইতে গেছিলাম। হতভাগাটা কিছুতেই রাজি হল না।...আপনি জানেন, আমার ধারণা ছিল, সে বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আসলে হয়তো সে এ কয়বছর জেল খাটছিল — ঠিক জানি না — মোট কথা তার কোনো খবরই পাইনি বহু বছর ধরে।

— কাল রাত্রে কী ঘটেছিল তাই বল। কোনো কথা বাদ দিও না, কোনো কথা গোপন কর না। যদি তুমি স্বহস্তে খুন করে থাক তাহলে অকপটে তা স্বীকার কর!

ছন্দা মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে পাঁচ সেকেন্ড নিথর হয়ে বসে রইল। তারপর ওঁর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলল, আই কনফেস্, স্যার! হ্যাঁ, আমিই ওকে খুন করেছি...নিজের হাতে...

বাসুও মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তারপর বলেন, কিন্তু সেদিন তো তুমি আমাকে বলেছিলে ছন্দা, যে, ইঁদুর-কলে-পড়া ইঁদুরদেরও তুমি মারতে পারতে না — দূরে গিয়ে ছেড়ে দিতে। বলনি?

— বলেছিলাম। সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলাম, স্যার। কমলেশকে আমি ইচ্ছা করে খুন করিনি।

নিতান্ত ঘটনাচক্রে...

— ঠিক কী ঘটেছিল বল দিকিন।

— ওর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া হচ্ছিল। ও বিশ্বাস করছিল না যে, সত্যিই দু-হাজার টাকাও আমার কাছে নেই। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ও একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে। আমি ওকে ধাক্কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিই। কী-একটা জিনিস — কাচের গ্লাসই হবে বোধহয় — হাতের ধাক্কা লেগে ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়ল। ও দু-হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। যেন দু-হাতে আমার গলা টিপে ধরবে। আমি নিচু হয়ে হাতের কাছে যা পেলাম তাই কুড়িয়ে নিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, এখন খবরের কাগজ পড়ে বুঝছি যে, সেটা একটা গ্যালভানাইজড কলের জলের শর্টপীস। হাত-দেড়েক লম্বা। আমি সেটা এলোপাতাড়ি ঘুরিয়ে ওকে দূরে হটাতে চাইলাম। ঠিক তখনই ও মরিয়া হয়ে এগিয়ে আসে। পাইপটা ওর মাথায় লাগে। ও পড়ে যায়।

— তখনি তুমি ছুটে পালিয়ে গেলে?

— না। ঠিক তখনি কে-যেন সুইচটা অফ্ করে দিল!

— সুইচটা 'অফ' করে দিল? কে? ঘরে তো মাত্র তোমরা দুজন? আর কমলেশ তো তখন মাটিতে পড়ে?

— না! ঘরে তৃতীয় আর এক ব্যক্তিও ছিল। সে যে কে বা কখন এসেছে, তা জানি না। কিন্তু সে-ই হঠাৎ সুইচটা অফ্ করে দেয়।

— ঠিক কখন? আই মিন, কমলেশ মাথায় আঘাত পাওয়ার আগে, না পরে?

— আগেও না, পরেও নয়। ঠিক একই সময়ে। কোনো ঘটনা আগুপিছু ঘটে থাকলে তা স্প্লিট-সেকেন্ডের ব্যাপার!

— তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমার আঘাতে কমলেশ ভূতলশায়ী হয়নি। তোমার ঘূর্ণ্যমাণ ডাণ্ডাটা অন্য কিছুতে আঘাত করে থাকতে পারে? ওই তৃতীয় লোকটাই...

— আপনি যদি সেই কথা আমাকে বলতে বলেন, তবে আমি অবশ্য তাই বলব ; কিন্তু আমার দৃঢ়-বিশ্বাস আমিই তার মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি মেরেছিলাম। ওই তৃতীয় ব্যক্তি নয়।

— কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তো ঘরে নাও থাকতে পারে ছন্দা। হয়তো ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে যায়।

— না। তা যায়নি। এক নম্বর কথা : 'সুইচ অফ' হবার শব্দ আমি স্বকর্ণে শুনেছি। রাত তখন নিস্তব্ধ। দ্বিতীয়ত ঘর অন্ধকার হয়ে যাবার পর আমি দরজার আড়ালে সরে যাই। কমলেশ তখন নিথর হয়ে পড়ে আছে। সেই সময়ে ঘরে পর পর চার-পাঁচ বার কেউ একটা দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করে। পারে না। দেশলাইটা বোধহয় ভিজে ছিল। যে জ্বালছিল সে দেশলাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু ক্ষণিক আলোর ঝলকানিতে আমি পালাবার পথটা দেখে নিয়েছিলাম। নিঃশব্দে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। ঠিক তখনই কলবেলটা একটানা বেজে উঠল।

— কলবেল? কার কলবেল?

— কমলেশেরই ডোরবেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ 'কলবেল' বাজাচ্ছিল।

— ওই রাত দেড়টার সময়?

— হ্যাঁ। লোকটা ভিতরে আসতে চাইছিল। ফলে, আমি অন্ধকারে সিঁড়ির মাঝামাঝি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার মনে হয় যে-লোকটা আমার পিছনে দেশলাই জ্বালার চেষ্টা করছিল সেও থমকে থেমে পড়েছে, ল্যান্ডিঙের উপর। একটু পরে আমার নজর হয় — বাড়ির পিছনের ভারা বেয়ে কে একজন নেমে যাচ্ছে! তার একটু পরেই রাস্তায় একটা মোটরবাইক স্টার্ট নেবার শব্দ হয়। তৎক্ষণাৎ ডোরবেল বাজানো বন্ধ হয়। আমি তখন বাকি কটা ধাপ নেমে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসি। আশ্চর্য তখনও আমার মনে হচ্ছিল আমার পিছনে মেজানাইন-ল্যান্ডিঙে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা আর একবার

দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করে। এবং এবার সফল হয়। ঠিক তখনি আমি সদর দরজা পার হই। আমি প্রায় দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠি। স্টার্ট দিই...

— জ্যস্ট এ মিনিট। আলোটা নিবে যাবার কত পরে তুমি গাড়িতে স্টার্ট দাও? হোয়াটস্ য়োর বেস্ট গেস্? পাঁচ-দশ সেকেন্ড, না তিন-চার মিনিট?

— মিনিট দুই-তিন হবে।

— কে ডোরবেল বাজাচ্ছিল, কে দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছিল বা ভারা বেয়ে নেমে যায়, তা তুমি জান না? আন্দাজও করতে পার না?

— আজ্ঞে না।

— ওরা তিনজন ভিন্ন-ভিন্ন লোক? নাকি একই লোককে...

— তা আমি জানি না। তবে ভারা বেয়ে যে নেমে যায় সে লোকটা দেশলাই জ্বালছিল না। কারণ সে ভারা বেয়ে নেমে যাবার পরেও লোকটা ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়েছিল।

— তোমার চাবির থোকাটা কখন পড়ে যায়? খবরের কাগজে যে ছবিটা ছেপেছে...

— আমি জানি না। সম্ভবত ধস্তাধস্তির সময়।

— তাহলে তুমি গাড়ির দরজা খুললে কী করে?

— আমি এত উত্তেজিত ছিলাম যে, কমলেশের বাড়ির সামনে গাড়িটা পার্ক করে আদৌ লক করিনি। দরজাটা খোলা রেখেই নেমে গেছিলাম।

— তাহলে ফিরে এসে গ্যারেজের তালাটা খুললে কী করে?

— ওটাও আমি বন্ধ করে যাইনি।

— তোমার স্পষ্ট মনে আছে?

ছন্দা একটু ভেবে নিয়ে বলল, না। মনে নেই। তবে এ ছাড়া অন্য সমাধান নেই বলেই আমি ধরে নিচ্ছি যে, গ্যারেজের তালাটা আমি বন্ধ করে যাইনি।

— একটু বুঝিয়ে বল।

— দেখুন, আমরা দুজনে একই ডবল্ গ্যারেজ ব্যবহার করি। যে-কেউ গাড়ি বার করলেই স্লাইডিং ডোরটা টেনে তালা বন্ধ করে দিই। এটা অনেকটা অভ্যাসবশত — প্রতিবর্তী প্রেরণায়। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, স্লাইডিং ডোরটা আমি টেনে বন্ধ করেছিলাম ; কিন্তু নবতাল-তালাটা নিশ্চয়ই লাগাইনি। কারণ সে-ক্ষেত্রে ফিরে এসে আমি গাড়ি গ্যারেজ করতে পারতাম না। কারণ তার আগেই তারাতলায় আমার চাবিটা খোয়া গেছে।

— কেন? তোমার কাছে ট্রিপ্লিকেট-চাবিটা কি ছিল না?

— ট্রিপ্লিকেট চাবি? মানে যেটা আমাদের ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারে থাকে? আপনি তার কথা জানলেন কেমন করে?

— তোমার কর্তাই বলেছিল।

— না। সেটা যেখানে ছিল সেখানেই ছিল। কাল সারা দিনে-রাতে তাতে আমি হাত দিইনি।

— তুমি নিঃসন্দেহ? অন্যমনস্কভাবে রাত্রে ড্রয়ার খুলে সেই তৃতীয় চাবির থোকাটা নিয়ে যাওনি?

— নিশ্চয় না! এ-কথা কেন?

— অলরাইট। ফিরে এসে গাড়ি গ্যারেজ করার পর — তখন তো রাত পৌনে দুটো। তুমি গ্যারেজে নবতাল তালাটা লাগাবার চেষ্টা করনি কেন?

— সে প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ ফিরে এসে আমি স্লাইডিং পাল্লাটা টেনে বন্ধ করতে পারিনি।

— সেটাই বা কেন?

— কখনো কখনো অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা একটু সরে নড়ে গেলে দরজাটা বন্ধ হতে চায় না। তখন হয় অ্যাম্বাসাডারটাকে স্টার্ট দিয়ে সামনের দিকে দু-এক ইঞ্চি এগিয়ে নিতে হয়, নাহলে একজন

বাম্পারটা ঠেলে ধরে অন্যজন দরজাটা বন্ধ করে। একা হাতে ওটা করা যায় না। তাই ফিরে এসে নবতাল তালা লাগানোর প্রশ্নই ওঠেনি। আর সেজন্যই রাতে আমি টের পাইনি যে, আমার চাবিটা খোয়া গেছে। তাছাড়া মানসিকভাবে আমি এতই উত্তেজিত ছিলাম যে, গাড়ি দুটোর নিরাপত্তার কথা আমার মনেই ছিল না।

— তারপর কী হল?

— আমি ঘরে ফিরে এসে দেখলাম ও নিথর হয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি নিঃশব্দে শাড়ি পালটে নাইট-গাউন পরে নিলাম। রিভলভারটা অন্ধকারে লুকিয়ে ফেললাম। ভীষণ নার্ভাস লাগছিল। কমলেশ বেঁচে আছে কি না আমি জানতাম না ; আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, সে ওই সামান্য আঘাতে মারা যাবে! তবু আমি খুবই উত্তেজিত ছিলাম। তাই স্ট্রং ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙল বেলা আটটায়, আপনি টেলিফোন করায়।

— তুমি যা বললে তা আদ্যন্ত সত্য? কোনো কিছু গোপন করনি?

— না! কিন্তু ফিরে এসে আমি গ্যারেজের দরজাটা যে বন্ধ না করেই শুতে গেছি, এ-কথা আপনি কী করে জানলেন?

— তোমার স্বামী বলেছে। সে আক্ষরিক-অর্থে সাত-সকালে আমার বাড়িতে এসেছিল।

— কেন? আচ্ছা এ-কথা কি সত্যি যে, পুলিসে সে নিজে থেকে গেছিল?

— হ্যাঁ, সত্যি! ও নিজের ধারণা অনুযায়ী স্থির করেছিল যে, সে যা জানে তা পুলিসকে জানানো কর্তব্য!

— সেজন্য আপনি ওকে দোষ দিতে পারেন না। সেটাই ওর শিক্ষা! ইন ফ্যাক্ট, সেটাই ওর মানসিক অসুখ! আচ্ছা, ও কি আর কারও কথা আপনাকে বলেছে?

— বলেছে। ওর ধারণা খুন করেছে অন্য একজন, যাকে তুমি বাঁচাতে চাইছ—

— সে কে?

— ডক্টর প্রতুল ব্যানার্জি।

ছন্দা একটু চমকে উঠল। আমতা আমতা করে বললে, ও তাঁর সম্বন্ধে কী জানে?

— তা আমি কেমন করে জানব? তুমি বরং আমাকে বল, কাল রাত্রে ডক্টর ব্যানার্জি কি তারাতলায় ছিলেন — ওই গভীর রাত্রে!

— গুড হেভেন্স! নিশ্চয় নয়!

— তুমি নিঃসন্দেহ?

— নিশ্চয়ই।

মেট্রন দূর থেকে বলে ওঠে, এক্সকিউজ মি, স্যার। সময় শেষ হয়ে গেছে।

বাসু বলেন, অল রাইট, আর এক মিনিট!

ছন্দার দিকে ফিরে বলেন, কাল রাত্রে তুমি হাতে গ্লাভস্ পরে যাওনি নিশ্চয়?

— আজ্ঞে না। হাতে পরার গ্লাভস্ আমার কাছে আদৌ নেই। হাসপাতালে ও. টি. তে-গেলে পরি। নার্সিং-হোমের গ্লাভস্। একথা কেন?

বাসু বলেন, সংক্ষেপে এবার বল, তুমি কী এমন অপরাধ করেছিলে যেজন্য তোমার জেল হতে পারত...নাউ লুক হিয়ার...আমি তোমার অ্যাটর্নি! আমাকে বললে তা প্রিভিলেজড কম্যুনিকেশন! তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হতে পারে না। কিন্তু আমার জানা দরকার, কমলেশ তোমাকে কী নিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল?

ছন্দা দৃঢ়স্বরে মাথা নেড়ে বললে, সরি স্যার! বিশেষ কারণে সে-কথা আপনাকে আমি জানাতে পারি না।

— তুমি কি বলতে চাও যে, সে গোপন কথাটা তোমার একার নয়?

— আপনার সঙ্গে কথা চালানোই বিপদ।...ওই দেখুন মেট্রন এগিয়ে আসছে। আমার যা বলার ছিল, বলেছি।

— অলরাইট! এবার শেষ কথাটা বলি। আমার অনুপস্থিতিতে পুলিসের কাছে কোনও জবানবন্দি দেবে না। মনে থাকবে?

— থাকবে!

দশ

পুরো দু-দুটি দিন বাসু-সাহেব ঘর ছেড়ে বার হলেন না। ক্রমাগত পাইপ টেনে গেলেন। মূল হেতু : ওঁর মক্কেল জামিন পায়নি। ওঁর মতে জামিন দেওয়া-না-দেওয়ার দায়িত্ব আইন যাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত করেছিল তিনি অভিযুক্তের প্রতি অহেতুক নিষ্করুণ হয়েছেন। ছন্দা কিছু মস্তান পার্টির গুণ্ডা নয়, পেশাদার সমাজবিরোধী নয়, এমনকি ব্ল্যাকমানির ধনকুবের নয় যে, জামিন পেলে সে পুলিস-কেসকে প্রভাবিত করতে পারে। নিহত ব্যক্তি স্বীকৃত সমাজবিরোধী, তার হিপ্-পকেটে রিভলভার ছিল। ছন্দারও যে তা ছিল, তা কেউ এখনো জানে না। ফলে আপাতদৃষ্টিতে এটা কিছুতেই ধরে নেওয়া যায় না যে, ওই বয়সের একটি মেয়ে রাত একটার সময় অতখানি ড্রাইভ করে একা কারও বাড়িতে হানা দেবে — খুন করার পূর্ব-পরিকল্পনা নিয়ে। খুনের অস্ত্রটাও তো সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি। বেশ বোঝা যায় যে, ঘটনার দ্রুত আবর্তনে সে হঠাৎ পাইপটা হাতে তুলে নিয়েছিল — নিঃসন্দেহে আত্মরক্ষার্থে! ফলে পুলিসের যা বক্তব্য — এটা 'হত্যা' বা 'মার্ডার', তা ধোপে টেকে না। বড়ো জোর বলা যায়, আত্মরক্ষার্থে অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা : 'কাল্‌পেব্‌ল হোমিসাইড'। তাহলে জামিন কেন দিলেন না বিচারক?

তার একাধিক হেতু হতে পারে।

প্রথম কথা : বিচারক বিশ্বাস করেছেন আসামির স্বামীর জবানবন্দি। হয়তো তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল নিজের বিবাহের প্রথম সপ্তাহের কথা! একটি সদ্যোবিবাহিতা বিয়ের কনে — যার অষ্টমঙ্গলা পার হয়নি — সে তার বরকে কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মধ্যরাত্রে অভিসারে — অভিসার নাই হোক — মধ্যরাত্রে 'গৃহত্যাগ' করবে এটাই যে অচিন্তনীয়।

দ্বিতীয় কথা : এটাও বিচারক বিশ্বাস করেছেনে — স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা আত্মরক্ষার্থে যাই হোক, মেয়েটির আঘাতে কমলেশ ভূতলশায়ী হয়। এক্ষেত্রে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ফেলে পালিয়ে আসাটাও সমর্থনযোগ্য নয়। ছন্দা ওই ঘরেরই টেলিফোন ব্যবহার করে থানায়, হাসপাতালে বা কোনও অ্যাম্বুলেন্স-য়ুনিটে ফোন করে জানাতে পারত যে, ওই ঠিকানায় একজন অচৈতন্য মানুষ মাটিতে পড়ে আছে। তারপর অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ার আগে যদি সে পালিয়েও যেত তাহলে হয়তো তাকে ক্ষমা করা যেত! অন্তত জামিন দেওয়া।

অথবা হয়তো এসব কোনো হেতুই বিচারককে বিচলিত করেনি। ইদানিং সচরাচর যা হয়ে থাকে — তাই ঘটেছে। অর্থাৎ অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি — রাজনৈতিক ক্ষমতাদর্পে হোক অথবা অর্থকৌলীন্যের কল্যাণেই হোক — নেপথ্য থেকে কলকাঠি নেড়েছেন। সংবাদপত্রে বাসুসাহেব দেখেছেন, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের কলকাতা শাখা-অফিসে কী একটি সেমিনারে নাসিকের ধনকুবের ব্যবসায়ী ত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও এ সপ্তাহে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। সংক্ষেপে, আসামির পূজ্যপাদ শ্বশুর-মহাশয় এখন কলকাতায় বর্তমান।

ইতিমধ্যে 'সুকৌশলী' গোয়েন্দা সংস্থা — অর্থাৎ সুজাতা আর কৌশিক — যে সব তথ্য সরবরাহ করে চলেছে তাতে সমস্যার সমাধান তো 'দূর অস্ত্' সেটা ক্রমশই জটিলতর হয়ে উঠছে।

এক নম্বর তথ্য : মৃত কমলেশের ঘরে পুলিস কোনো লেটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট আবিষ্কার করতে পারেনি। সদ্য-লাগানো চকচকে ডোর-হ্যান্ডেলে নয়, টেলিফোনে নয়, গ্লাসটপ টেবিলে নয়। কেন?

কোথাও কোনো আঙুলের ছাপ কেন নেই? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আততায়ী হাতে গ্লাভস্ পরে এসেছিল তাহলে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না। সেটাই প্রত্যাশিত কিন্তু গৃহস্বামীর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল না কেন? বাসু-সাহেব নিজেও তো ঘটনার দিন ওই বাড়ির হ্যান্ডেলে হাত দিয়েছিলেন, তাঁর আঙুলের ছাপই বা মুছে গেল কী করে? সম্ভাব্য উত্তর একটাই : অপরাধটা যে করেছে সে গৃহত্যাগের আগে প্রতিটি আঙুলের ছাপ রুমাল দিয়ে মুছে দিয়ে গেছে। অর্থাৎ আতঙ্কতাড়িতা পলায়নপরা কোনো যুবতী নয়, প্রফেশনাল খুনির স্থিরমস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পুলিস এ তথ্যটা মেনে নিয়েছে, কিন্তু কিছু সংশোধিত আকারে : ফিঙ্গারপ্রিন্ট মোছা হয়েছে রুমাল দিয়ে নয়, আঁচল দিয়ে।

দ্বিতীয় কথা : বটুক এবং তার স্ত্রী দু-জনেই শুনেছে ওই ঘরে যখন ঝগড়া মারামারি হচ্ছিল — ঝন্‌ঝন্ করে কাচের বাসনপত্র ভাঙছিল — তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ একজন কলবেল বাজাচ্ছিল। বাসু-সাহেবের সিদ্ধান্ত : সেই লোকটা ওই ঘরে আদৌ আসেনি। ফলে সে খুনি হতেই পারে না। কারণ কমলেশ যখন ভূতলশালী হয় তারপরও সে ডোরবেল বাজিয়ে চলেছিল। পুলিস বোধকরি তা মানে না। পুলিস মানতে রাজি নয় যে, ছন্দা একা এসেছিল। অত গভীর রাত্রে ওই বয়সের একটি মেয়ে কলকাতার রাস্তায় একা ড্রাইভ করে না — বিশেষ তারাতলার নির্জন ফ্যাক্টরি-অঞ্চলে। সেই তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিটাই দুর্ঘটনাকে — পুলিসের মতে — 'ডেলিবারেট মার্ডার'-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে!

আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। ঘটনার পরদিন থেকে ত্রিদিব নিরুদ্দেশ! বস্তুত থানায় এজাহার দেয়ার পর সে আর তার আলিপুরের বাড়িতে ফিরে যায়নি। কোথায় গেছে? কেউ জানে না। পুলিস বাদে। না হলে টি.ভি.তে নিরুদ্দেশ-তালিকায় ধনকুবেরের একমাত্র পুত্রের ছবি দেখা যেত। বেশ বোঝা যায়, পুলিসের ব্যবস্থাপায় সে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনও পাঁচতারা হোটেলে তোফা আরামে আছে। ব্যবস্থাপনা পুলিসের, কিন্তু খরচ সম্ভবত তার পিতৃদেবের।

কিন্তু কেন? ত্রিদিবকে লুকিয়ে ফেলার কী কারণ — জানতে চাইলেন রানু।

ওঁরা তিনজনে বসেছিলেন লিভিং-রুমে। কৌশিক আজ তিনদিন বেপাত্তা — কোথায়-কোথায় ঘুরছে কমলেশের পূর্বজীবনের ইতিহাস সংগ্রহ মানসে। বাসু জবাবে বললেন, বুঝলে না? যাতে কারও প্রভাবে পড়ে ত্রিদিবনারায়ণ তার জবানবন্দিটা প্রত্যাহার করে না নেয়। যাতে কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন না করতে পারে। বিশেষ করে খবরের কাগজের লোক।

সুজাতা জানতে চায়, আচ্ছা মামু, একটা জিনিস আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো। আমি শুনেছি, ভারতীয় আইনে স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অথবা স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারে না — মানে ক্রিমিনাল কেস-এ! এটা সত্যি?

— হ্যাঁ সত্যি। তবে 'স্পাউস' অনুমতি দিলে, পারে।

— তাহলে এক্ষেত্রে ছন্দা যদি অনুমতি না দেয় তাহলে ত্রিদিব তো সাক্ষ্য দিতে পারবে না? ছন্দা যে তার স্বামীর চকলেটে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছিল, সে যে রাত সাড়ে বারোটায় গাড়ি নিয়ে আলিপুর থেকে রওনা হয়েছিল এসব তো ত্রিদিবের স্টেটমেন্টের উপর প্রতিষ্ঠিত?

বাসু বললেন, জবাবে তিনটে কথা বলব। প্রথম কথা : ছন্দা যে মুহূর্তে বলবে যে, স্ত্রী হিসাবে যে দাবি করছে ত্রিদিব যা দেখেছে, যা জানে তা আদালতে বলতে পারবে না, সেই মুহূর্তেই বিচারক ধরে নেবেন যে, তাহলে মেয়েটি ধোওয়া তুলসীপত্র নয়। অর্থাৎ তার স্বামী প্রথম এজাহারে যা বলেছিল — যা আদালতে পেশ করা গেল না — যার ক্রস-এগ্‌জামিন হল না — তার ভিতর অনেকটাই সত্য আছে। দ্বিতীয় কথা : পুলিস অসংখ্য সাক্ষী খাড়া করবে — যারা ত্রিদিবের না-বলা কথাটা প্রতিষ্ঠিত

করবে। কেউ বলবে যে, রাত বারোটা পঁয়ত্রিশে সে ছন্দাকে ড্রাইভ করে তার আলিপুরের বাড়ি থেকে বার হতে দেখেছে। ত্রিদিবের কোনো বন্ধু হয়তো বলবে, ত্রিদিবনারায়ণ তাকে বলেছিল যে, ত্রিদিবের স্ত্রী তার স্বামীকে ওভারডোজের ঘুমের ওষুধ খাইয়ে 'হত্যা' করতে চেয়েছিল, তাই বাড়ি ছেড়ে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে।

সুজাতা বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু আসামির অনুপস্থিতিতে ত্রিদিব আর তার বন্ধুর কথোপকথন 'হেয়ার-সে' হয়ে যাবে না?

— যাবে। আমি 'অব্জেকশান' দেব। বিচারক হয়তো তা 'সাসটেইন'ও করবেন ; কিন্তু সেই বিধিবহির্ভূত এভিডেন্স বিচারককে বিচলিত করবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা : পুলিস এমন ব্যবস্থা করবে যাতে ছন্দার ওই সাংবিধানিক অধিকারটা কার্যকর করা না যায়। অর্থাৎ ছন্দাকে এমন প্যাঁচে ফেলা হবে যাতে সে ত্রিদিবের সাক্ষ্যদানে আদৌ আপত্তি করতে পারবে না।

— সেটা কীভাবে হতে পারে? — জানতে চান রানু।

— মামলাটা আদালতে ওঠার আগেই ওরা একটা পৃথক 'অ্যাক্শন' নেবে! আদালতে আবেদন করবে, যাতে ছন্দা এবং ত্রিদিবনারায়ণের রেজিস্ট্রি বিবাহটা 'বাতিল' বলে ঘোষিত হয়।

— ডিভোর্স পিটিশান?

— না গো। ডিভোর্স আদৌ নয়। আদালত ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন করলেও ত্রিদিবনারায়ণ তার ভূতপূর্বা-স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে না — কারণ ঘটনা যেদিন ঘটেছিল সেই 22.6.91 তারিখে ওরা ছিল বৈধ স্বামী-স্ত্রী! আমি বলছি, ওপক্ষ চেষ্টা করবে ওদের বিবাহটা সমূলে অবৈধ প্রমাণ করতে। অর্থাৎ প্রমাণ করা : ওরা দুজনে — ওই ত্রিদিব আর ছন্দা কোনোদিনই স্বামী-স্ত্রী ছিল না। এক বিছানায় শুয়েছে এই পর্যন্ত! সে-ক্ষেত্রে ত্রিদিব সাক্ষ্য দিতে পারবে!

সুজাতা প্রতিবাদ করে, কিন্তু তা ওরা কীভাবে করবে? ত্রিদিব আর ছন্দা রীতিমতো রেজিস্ট্রি বিবাহ করেছে। সে বিয়ে নাকচ করা অতই সহজ।

— হ্যাঁ সহজ!

— এ-কথা কেন বলছেন?

— দ্য স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট নম্বর ফর্টিথ্রি অব নাইনটিন-ফিফ্‌টি ফোর-এর আন্ডার সেকশন ফোর-এ বলা হয়েছে : রেজিস্ট্রি-বিবাহ তখনই সিদ্ধ যখন 'নাইদার পার্টি হ্যাজ এ স্পাউস্ লিভিং'! অর্থাৎ রেজিস্ট্রি বিবাহকালে যদি মেয়েটির কোনো পূর্বতন স্বামী অথবা ছেলেটির পূর্বতনা স্ত্রী জীবিত থাকে, তাহলে সেই রেজিস্ট্রি-বিবাহ ভ্রমক্রমে লিপিবদ্ধ হলেও তা শুরু থেকেই অবৈধ। ওরা সহজেই প্রমাণ করবে যে, 15. 6. 91 যখন ছন্দা বিশ্বাস ত্রিদিবনারায়ণকে রেজিস্ট্রিমতে বিবাহ করে তখন ছন্দার পূর্বতন স্বামী কমলেশ বিশ্বাস জীবিত ছিল ! ফলে শুরু থেকে ছন্দা ত্রিদিবের বিবাহ 'নাল অ্যান্ড ভয়েড'! এককথায়, 'অসিদ্ধ'!

এই সময়েই ডোরবেল বেজে ওঠে। বিশু গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল। এল কৌশিক। হাতে স্যুটকেস, চেহারা ভগ্নদূতের।

বাসু বলেন, কী ব্যাপার? কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছিলে?

কৌশিক একটা চেয়ার টেনে বসে। বলে, তা কেন? সুজাতাকে তো বলে গেছি, দুর্গাপুর যাচ্ছি। আমি তো শক্তাবৎ রাজপুত নই যে, ধর্মপত্নীকে না জানিয়ে পালিয়ে যাব?

— তা সেখানে কেন? কিছু খবর পেলে?

— পেয়েছি, মামু। মারাত্মক খবর। অবিশ্বাস্য!

— ফায়ার!

— ছন্দা দেবীর প্রথম পক্ষের স্বামী কমলেশ বিশ্বাস ওরফে কমলাক্ষ, ওরফে কমলেন্দু গত শনিবার রাত্রে তারাতলায় আদৌ খুন হয়নি!

রানু আঁতকে ওঠেন : মানে?

বাসু বলেন, মানে, কৌশিক বোধহয় বলতে চাইছে 'কমলেশ মরিয়াও প্রমাণ করিতে পারিল না যে, সে জীবিত ছিল।' তাই কি?

— আজ্ঞে না। শনিবার যে মারা গেছে সে কমলেশের যমজ ভাই হতে পারে, কমলেশের ছদ্মবেশী হতে পারে, ছন্দা-কমলেশের যৌথ ধাপ্পাবাজি হাতে পারে...

সুজাতা বলে, যৌথ ধাপ্পাবাজি মানে?

— ওই খুন হয়ে যাওয়া লোকটা যে কমলেশ বিশ্বাস তা আমরা কী করে মেনে নিয়েছি? একমাত্র ছন্দার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী নয় কি?

বাসু প্রতিবাদে বলেন, না! কাগজে লিখেছে পুলিস তাকে সনাক্ত করেছে বিবাহ-বিশারদ সমাজবিরোধী 'কমল' নামে। কমলেশ, কমলাক্ষ, কমলেন্দু নানান নামে সে কুমারী মেয়েদের ফাঁসিয়ে বিয়ে করত। একথা কাগজে যখন ছাপা হয় তখনো ছন্দা গ্রেপ্তার হয়নি। ফলে তোমার সংগৃহীত তথ্যটা দাঁড়াচ্ছে না। নাকচ হয়ে যাচ্ছে!

কৌশিক রুখে ওঠে, অল রাইট, মামু! এবার আমি যে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছি সেটাকে নাকচ করুন।

বলো :

* * *

সুকৌশলীর উপর নির্দেশ ছিল 'কমল' নামধারী বিবাহ-বিশারদের আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা সংগ্রহ করা। কৌশিক ধাপে ধাপে তাই করছিল। ছন্দা তার এজাহারে বলেছিল, কমলেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে ওরা প্রথমে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে, কিন্তু বেলেঘাটায় ঘর নেওয়ার পর দ্বিতীয়বার রেজিস্ট্রি মতে বিয়ে করে। তারিখটা ছন্দাই জানিয়েছিল : সাতই ডিসেম্বর 1983। কৌশিক তাই বেলেঘাটা অঞ্চলে একের পর একটি করে বিবাহ-রেজিস্ট্রেশন অফিসে খোঁজ নিতে থাকে। পঞ্চম কি ষষ্ঠ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। রেজিস্ট্রারের অনুমতি নিয়ে, যথাযথ ফি জমা দিয়ে একটা জেরক্স কপি সংগ্রহ করে। তাতে কমলের পিতার নাম এবং জন্মতারিখ পাওয়া যায় — সত্য হোক, মিথ্যা হোক — তা কমলেশের স্বীকৃতি-মোতাবেক। ওই বিবাহ-চুক্তিপত্রে দু-জন সাক্ষীর নাম-ঠিকানা ছিল। একজন বাঙালি, বিমল কর, একজন অবাঙালি। বাঙালি সাক্ষীর ঠিকানায় গিয়ে শোনা যায় সে এখন ওখানে থাকে না। কোথায় থাকে তা কেউ জানে না। অবাঙালি সাক্ষীর ঠিকানা ছিল দুর্গাপুরের 'জি-টাইপ' কোয়ার্টার্সের। কৌশিক খুঁজে খুঁজে লোকটির দেখা পায়। তার বাড়িতেই।

মহেশপ্রসাদ তিওয়ারি দুর্গাপুরের একজন নামকরা লেবার লিডার। সে কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না কোনো ছন্দা বা কমলেশ বিশ্বাসকে। কৌশিক তখন বিবাহের চুক্তিপত্রের জেরক্স কপিটা দেখায়। মহেশপ্রসাদ স্বীকার করে, জি হাঁ! সিগ্‌নেচর তো হমারই আছে! লেকিন হমার তো কুছু য়্যাদ হচ্ছে না।

কৌশিক জানতে চায়, বিমল করকেও কি আপনি চিনতেন...

— নেহী নেহী। বিমলবাবু সিটু য়ুনিয়নে ছিলেন। তাঁকে পহ্‌ছান্তে পারছি। লেকিন তিনি তো গুজর গিয়েসেন!

কৌশিক পুনরায় জানতে চায়, আপনাদের দু জনের মধ্যে একজন, আই মিন, ওই বিয়ের দু-জন সাক্ষীর মধ্যে একজন কোনো ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন। কে? আপনি না বিমলবাবু?

— হামি। কেঁও?

— ছন্দা দেবী আমাকে বলেছেন যে, সেই এজেন্টের অনুরোধে ওঁরা স্বামী স্ত্রী একটি যৌথ ইন্‌শিওরেন্স করেন, দশ হাজার টাকার!

— হাঁ — ! আভি য়্যাদ হল। ঠহরিয়ে বাবু-সাব। আরাম কিজিয়ে। ম্যয়নে ঢুঁড়কে দেখুঁ!

তেওয়ারিজী ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে যাঁদের জীবনবীমা করিয়েছেন তাদের নাম-ধাম-ইন্‌শিওরেন্স নাম্বার ইত্যাদি একটি মোটা খেরো খাতায় পর পর লিখে রেখেছেন। বার্ষিক যা কমিশন পান তার হিসাব মিলানোর জন্যই শুধু নয়, ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে সন্তুষ্ট করার জন্য। সেই খেরো-খাতা দেখে তেওয়ারিজী জানালেন, হ্যাঁ ছন্দা আর ওঁর সদ্য পরিচিত অর্থাৎ বিমলের বন্ধু কমলেশ বিশ্বাস একটি যৌথ পলিসি করেছিল বটে, জেনারেল ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানিতে। দশ হাজার টাকার। একুশে ডিসেম্বর, তিরাশি সালে। কিন্তু সে পলিসি এখন আর চালু নেই। তা থেকে তেওয়ারিজীর কোনো অর্থাগম বর্তমানে হয় না। তার কারণ 27.3.88 তারিখে কমলেশ বিশ্বাস মারা গেছেন এবং তাঁর স্ত্রী নমিনি হিসাবে দশ হাজার টাকা লাভ করেছেন।

কৌশিক যথারীতি আকাশ থেকে পড়ে। তবে সে কোনো বিস্ময় প্রকাশ করে না। ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির কলকাতা-অফিসের ঠিকানা আর পলিসি নাম্বারটা টুকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে।

হাওড়া স্টেশন থেকে সে সরাসরি ওই ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির অফিসে যায়। এ-ঘর-ওঘর এ-সাহেব ও-সাহেব করতে করতে একসময়ে তথ্যটার হদিশ পায়। হ্যাঁ, বিমা কোম্পানি যথারীতি অনুসন্ধান চালিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে নমিনিকে টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছে। কমলেশ বিশ্বাসের মৃত্যুর অবিসংবাদিত প্রমাণগুলিও ওই পলিসি-পেমেন্ট ফাইলে গাঁথা আছে। 'সুকৌশলী'-র লিখিত আবেদন-মোতাবেক ইন্‌শিওর কোম্পানির এক বড়ো-সাহেব সেই প্রমাণের জেরক্স কপি ইস্যু করার অনুমতি দিলেন। কৌশিক এবার তার বাসু-মামুর সামনে একে-একে দাখিল করল তার কাগজপত্র : কমলেশ বিশ্বাসের ডেথ্-সার্টিফিকেট, নার্সিং-হোমের ডিস্‌চার্জ বিল-ভাউচার, ক্রিমেটোরিয়ামের বিল! সবই 27.3.1988 তারিখের। বললে, এবার বলুন মামু, কমলেশ বিশ্বাসের কয়বার মৃত্যু বিশ্বাসযোগ্য?

বাসু জবাব দিলেন না। সহধর্মিণীকে বললেন, সানি-সাইড নার্সিংহোমে একবার টেলিফোনে দেখ তো, ডাক্তার প্রতুল ব্যানার্জিকে পাওয়া যায় কি না।

টেলিফোন ধরল রিসেপশনিস্ট। মহিলা-কণ্ঠে শোনা গেল, ইয়েস! ডক্টর ব্যানার্জি আছেন ও. টি. তে। জানতে চাইল কে ফোন করছেন এবং কেন ফোন করছেন।

বসু বললেন, একটা মেসেজ কাইন্ডলি লিখে নেবেন?

— বলুন?

— আজ রাত নয়টার সময় আমি ডঃ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার নাম পি.কে. বাসু, অ্যাটর্নি।

মেয়েটি সবিনয়ে বললে, সরি, স্যার। রাত নয়টার সময় উনি নার্সিং হোমে থাকেন না। বাড়িতে থাকেন।

— অল রাইট! বাড়িতেই যাব। সেটা তো ওই নার্সিং হোমের উপরতলায়, তাই নয়?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ। বাট সরি স্যার, সন্ধ্যায় ওঁর আর কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি না তা তো আমি জানি না...

— কে জানে?

— ডক্টর ব্যানার্জি হিমসেল্‌ফ্। কিন্তু তিনি এখন অপারেশন থিয়েটারে..

— আই নো! তাহলে মেসেজটাতে আরও লিখে রাখুন — অন্য কোনো সান্ধ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে ডক্টর ব্যানার্জি যেন তা ক্যানসেল করে আমার জন্য অপেক্ষা করেন — অ্যাট নাইন পি. এম. শার্প!

মেয়েটির বোধকরি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বলল, আয়াম সরি এগেন, স্যার! ডক্টর ব্যানার্জি — আমি যতদূর জানি — কারও হুকুমে চলেন না।

বাসু বললেন, আপনি তো রিসেপ্‌শনিস্ট, দূত মাত্র : আপনি এত ঘনঘন 'সরি' হচ্ছেন কেন? যে মেসেজটা দিলাম সেটা ডক্টর ব্যানার্জির হাতে ধরিয়ে দেবেন। উনি অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে

আসার পর এবং এক-কাপ স্টিমুলেন্ট পান করার পর। ফলো?

মেয়েটি জবাব দেবার আগেই টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

এগারো

ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম রাত আটটা আটান্ন মিনিটে বাসু সাহেব নার্সিং হোমের উপরতলায় ডক্টর ব্যানার্জির ডোর-বেলটা টিপে ধরলেন। পাঁচ-সেকেন্ডের ভিতর সেটা খুলে গেল। উজ্জ্বল গৃহাভ্যন্তরে একটি নার্স — বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স হবে তাঁর — দরজা খুলে দ্বারপথে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন : ইয়েস?

— ডক্টর পি. ব্যানার্জি আছেন?

— আছেন। কে এসেছেন জানাব?

বাসু-সাহেব নিঃশব্দে মেয়েটির হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে ধরেন। দেখে নিয়ে মেয়েটি বললে, আই সি! আপনিই আজ সকালে টেলিফোন করেছিলেন, তাই নয়?

— হ্যাঁ, আপনার সঙ্গেই কথা হয়েছিল বুঝি?

— তাই হয়েছিল। আমিই সেই দূতী! তা আমি আপনার মেসেজটা ওঁকে পৌঁছে দিয়েছি : বাট, আয়াম সরি এগেন, উনি অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন, আজ দেখা হবে না।

— বাড়িতে আর কে আছেন? মিসেস ব্যানার্জি?

— না, উনি ব্যাচিলার।

— তাহলে আমার ওই কার্ডখানা ওঁকে দেখান। আর ওঁকে বলুন যে, আমি এসেছি ওঁর পয়েন্ট-থ্রিটু-বোর কোল্ট অটোমেটিকটার বিষয়ে আলোচনা করতে, যার নম্বর থ্রি-সেভেন-ফাইভ-নাইন-সিক্স-টু-ওয়ান...ফলো?

মেয়েটি রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। বিশেষ করে সাত-সাতটা সংখ্যায়!

বাসু-সাহেব বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অতগুলো সংখ্যা তোমার পর পর মনে থাকবে না মা, তুমি শুধু বল ডাক্তারবাবুর রিভলভারটার বিষয়ে। আর বল, আমি এখানে ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করব, তারপর দরজা খুলে ওঘরে যাব। ফলো?

নার্সটি এবার নিঃশব্দে পিছন ফিরল। ভিতরের দিকের দরজাটা খুলে অন্দরমহলে ঢুকে গেল। দরজাটা সযত্নে বন্ধ করে দিয়ে। বাসু দাঁড়িয়েই রইলেন মণিবন্ধের ঘড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ত্রিশ সেকেন্ড অতিক্রান্ত হতেই তিনি ভিতরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সৌজন্যমূলক মৃদু করাঘাত করে দরজাটা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেটি ডাক্তারবাবুর বেড-কাম-সিটিং রুম। সিঙ্গল-বেড বিছানাটা ঘরের ও-প্রান্তে। এখানে টেবিলে টেলিফোন, কাগজপত্র। ডাক্তারবাবু বসেছিলেন তাঁর চেয়ারে। নার্সটি পাশে দাঁড়িয়ে।

দু-জনেই মুখ তুলে এমন আতঙ্কতাড়িত দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যেন ম্যাকবেথের ডিনার-পার্টিতে অনিমন্ত্রিত ব্যাঙ্কোর ভূত বেমক্কা ঢুকে পড়েছে! যেন এখনি ডক্টর ব্যানার্জি আর্তনাদ করে উঠবেন : 'দাউ কান্ট্ সে দ্যাট আই ডিড ইট!'

বাসু তাঁর পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেন, সময়ের দাম আপনার-আমার দু-জনেরই আছে। তাই সৌজন্যমূলক খেজুরে আলাপ বাদ দিয়ে সরাসরি প্রসঙ্গটার অবতারণা করতে চাই। তাছাড়া ভেবে দেখুন, ডক্টর ব্যানার্জি — আপনাকে ত্রিশ-সেকেন্ডের চেয়ে বেশি সময় দিলেই আপনি একগাদা আজগুবি অবাস্তব কৈফিয়ৎ ভেবে-ভেবে বার করতেন। তাতে আবার দুজনেরই সময় নষ্ট হত — কারণ আমাকে প্রমাণ করতে হত কৈফিয়তগুলি অবাস্তব এবং আজগুবি, ধোপে টেকে না! শ্যাল আই স্টার্ট?

ডক্টর ব্যানার্জি চেয়ার চেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বলিষ্ঠ গঠন যুবাপুরুষ। যুবা ঠিক নয়, স্বাস্থ্যবান হলেও

বোঝা যায়, মেঘে-মেঘে কিছুটা বেলা হয়েছে। কানের পাশে বড়ো বড়ো জুল্‌পিতে সাদা-আখরে সেই বার্তার ঘোষণা।

বজ্রনির্ঘোষে ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, হু ডু য়ু থিংক য়ু আর? আপনি কে মশাই? কী চান? এভাবে আমার বাড়িতে চড়াও হয়েছেন কেন? এই মুহূর্তে যদি আপনি আমার ঘর ছেড়ে চলে না যান, তাহলে আমি পুলিস ডাকতে বাধ্য হব। আমিও আপনাকে ত্রিশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, অনধিকার প্রবেশের মামলা থেকে বাঁচতে।

একটা হাত উনি বাড়িয়ে দিলেন টেলিফোনটার দিকে!

বাসু দু-পা ফাঁক করে রোডস্-দ্বীপের কলোসাস-মূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত — তারপর বললেন, আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন। ত্রিশ সেকেন্ড সময়ও দয়া করে দিয়েছেন। তা আমার জবাবটা কি ওই ভদ্রমহিলার উপস্থিতিতেই দেব?

— ও আমার কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল নার্স! বলুন?

— টেলিফোনে পুলিস-স্টেশনকে ধরতে পারলে থানাকে ওই সঙ্গে জানিয়ে দেবেন যে, ছন্দা বিশ্বাসের হাতব্যাগে ঘটনার রাত্রে একটা পয়েন্ট থ্রি-টু রিভলভার ছিল, যে-কথা পুলিস এখনো জানে না আর সে রিভলভারের কেরিয়ার লাইসেন্স ছন্দার ছিল না। এবং যার লাইসেন্সি...

ডক্টর ব্যানার্জি স্থিরদৃষ্টিতে ওঁর দিকে পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। তারপর পাশ ফিরে নার্সটিকে বললেন, তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর জবা। সি দ্যাট উই আর নট ডিস্‌টার্বড।

নার্সটি ভীত-চকিত দৃষ্টিপাত করে ধীরে ধীরে বাইরের ঘরে চলে গেল। তার সেই বিচিত্রদৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ করলে শতকরা কত ভাগ ঘৃণা, কত ভাগ অপমানবোধ আর কতটাই বা আক্রোশের নির্যাস বার হবে সেটা অনুমান করা কঠিন।

ডক্টর ব্যানার্জির প্রশ্ন : এবার বলুন আপনি কে?

— ছন্দা বিশ্বাসের অ্যাটর্নি।

স্পষ্টতই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল গৃহস্বামীর। বললেন, ছন্দা আপনাকে পাঠিয়েছে?

— না।

— ছন্দা এখন কোথায়?

— আপনি জানেন না? হাজতে! খুনের অপরাধে।

— না, জানতাম না। আমার ধারণা হয়েছিল সে জামিন পেয়েছে। যাই হোক, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? ওই রিভলভারটা ছন্দা তো ব্যবহার করেনি।

— রিভলভারটা গৌণ। আমি জানতে এসেছি অন্য একটা তথ্য! একটা ডেথ-সার্টিফিকেটের বৈধতার বিষয়ে...।

ডাক্তার ব্যানার্জির মুখটা শাদা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। বললেন, বলুন! কার ডেথ-সার্টিফিকেট?

— সাম মিস্টার কমলেশ বিশ্বাস! লোকটা আপনার নার্সিং হোমে মারা যায়। ম্যালিগ্‌ন্যান্ট টাইপ লাং-ক্যান্সারে। সাতাশে মার্চ, উনিশ-শ অষ্টআশি সালে...

ব্যানার্জি তাঁর বিশুষ্ক অধরের উপর জিবটা বুলিয়ে নিয়ে কোনোক্রমে বললেন, অষ্টাশি সাল! সে তো তিন বছর আগেকার কথা! কী নাম বললেন? বিশ্বাস? কমলেশ বিশ্বাস? আপনি কাল আসুন...আমি রেজিস্ট্রি খাতা খুঁজে...

বাসু ঝুঁকে আসেন একটু : নাউ, লুক-হিয়ার, ডক্টর ব্যানার্জি। সওয়াল-জবাব করাই আমার পেশা! সাক্ষীকে পাঁকাল মাছ হতে দেওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। ছন্দা বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা আমি জানি — না হলে ওকে নিজের রিভলভারটা ওভাবে ধার দিতেন না। রেজিস্ট্রি খাতা দেখার দরকার নেই — আমি মুখে মুখে বলে যাচ্ছি, শুনুন। বাইশে মার্চ আপনার নার্সিং-হোমে একটি মরণাপন্ন

ক্যান্সার রোগী ভর্তি হয়। পাঁচদিন পরে সে মারা যায়। আপনি তার ডেথ-সার্টিফিকেট দেন। মনে পড়েছে?

ব্যানার্জি বলেন, দেখুন...কী বলব?...খাতাপত্র কিছু না দেখে...

বাসু পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে ওঁর টেবিলে মেলে ধরেন। বললেন, দেখুন! এটা আপনার স্বাক্ষর? এই ডেথ-সার্টিফিকেটে? এবার আমাকে বুঝিয়ে বলুন কীভাবে আপনার হসপিটাল-রেজিস্টারে এই রোগীর যাবতীয় তথ্য ছন্দার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেল? নাম, বয়স, বাবার নাম, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এট্‌সেট্রা, এটসেট্রা...

পুনরায় ডক্টর ব্যানার্জি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মিনিটখানেক কী ভেবে নিয়ে বললেন, আপনাকে একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবেন?

— কী কথা?

— ছন্দাকে আমি ভালোবাসি...

— এ আর কী নতুন কথা? আমিও তাকে ভীষণ ভালোবাসি। বিশ্বাস না হয় তার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। সে আমাকে মাত্র একশ টাকার রিটেইনার দিয়েছে, আর আমি ইতিমধ্যে তার পিছনে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে বসে আছি।

— আমি সে অর্থে ভালোবাসার কথা বলিনি। আমি কেন একাজ করেছি তা আপনি বুঝবেন না। কারণ বুঝলে, এভাবে আমাকে ব্যঙ্গ করতেন না। আমি সত্যিই তাকে আমার প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি।

— কিন্তু ফল্‌স্ ডেথ-সার্টিফিকেটটা সই করলেন কেন?

— না হলে ছন্দা কিছুতেই প্রমাণ করতে পারত না যে, বাস-অ্যাক্সিডেন্টে তার স্বামী মারা গেছে। ইনিশিওরেন্সের সেই ন্যায্য টাকাটা সে কোনদিন আদায় করতে পারত না। ও নিজেকে মনে করত বিধবা ; কিন্তু আইনের চোখে সেটা প্রমাণ করা যাচ্ছিল না। এই সময় আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে। এক ভদ্রলোক তাঁর মেসের এক রুমমেটকে আমার নার্সিং-হোমে ভর্তি করাতে চাইলেন। লোকটার তিনকুলে কেউ নেই। কলকাতার একটা মেসে থেকে কী একটা কোম্পানীতে ভেন্ডারের কাজ করত। নার্সিং-হোমে ভর্তি হবার মতো সঙ্গতি তার নেই। কোনো হাসপাতালেও ফ্রি-বেড পাচ্ছিল না। কারণ সব হাসপাতালই বলেছে 'কেস'টা অ্যাকিউট ক্যান্সারের। চিকিৎসার বাইরে। অথচ মেস-ম্যানেজার ওই মরণাপন্ন রোগীকে মেসেও রাখতে রাজি নয়। আমি ওর রুমমেটকে বললাম, আমি রুগিকে একটা ফ্রি-বেড দিতে পারি যদি সে আমার নির্দেশ মতো নাম ধাম লেখায়। রোগীর তখন বাক্‌শক্তি লুপ্ত হয়েছে। তার রুমমেট নিকট আত্মীয়ের মিথ্যা পরিচয়ে রোগীর নাম-ধাম, বয়স ইত্যাদি খাতায় লিখিয়ে দিয়ে যায়। বিশ্বাস করুন মিস্টার বাসু, চিকিৎসার কোনো ত্রুটি আমরা কেউ করিনি। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই রোগীটি মারা গেল। আমি ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দিলাম। হিন্দু সৎকার-সমিতির গাড়ি আনিয়ে দিলাম। ওর রুমমেট রুগিটিকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে সেই যে কেটে পড়ল আর এ দিকে ভেড়েনি। হয়তো তার ভয় ছিল মিথ্যা নাম-ধাম লেখানোর জন্য। যাই হোক, আমি, আমার দুই স্ট্রেচার-বেয়ারা, আর ছন্দা সৎকার সমিতির গাড়িতে করে হতভাগ্যকে ক্যাওড়াতলা ক্রিমেটোরিয়ামে পুড়িয়ে দিয়ে এলাম। বিশ্বাস করুন মিস্টার বাসু, শ্মশানে ছন্দা হাউ-হাউ করে কাঁদছিল। আমাকে বললে, মনে হচ্ছে আমি দ্বিতীয়বার বিধবা হলাম।

— তারপর ছন্দা দশ হাজার টাকা আদায় করল?

— তা করল। আমার ওই ডেথ-সার্টিফিকেটের বলে!

— আপনি কতদিন ধরে ওকে চেনেন?

— ও পাস করার পর থেকে—প্রায় ছয় বছর। এখানে কাজ করতে আসে যখন, তখন ওর সিঁথিতে সিঁদুর ছিল। এখানে কাজ করতে করতেই খবর পায় বাস-দুর্ঘটনায় ওর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী মারা গেছে। তারপর এখানেই কাজ করতে থাকে নার্স হিসাবে।

— ও বিধবা হবার পর আপনি কি ওকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন?

ডাক্তার ব্যানার্জির মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। মুখ তুলে বলেন, এসব প্রশ্নের কি কোনো প্রয়োজন আছে?

— আছে। বলুন?

— হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। সে রাজি হয়নি।

— কেন সে আপনাকে ভালোবাসতে পারল না, তা আন্দাজ করতে পারেন?

— কে বললে সে আমাকে ভালোবাসতে পারেনি? আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ও স্থির করেছিল আবার বিয়ে করবে না। পুরুষমানুষকে আর সে বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না — অন্তত স্বামী হিসেবে নয়।

— তারপর হঠাৎ একদিন সে ধনকুবেরের একমাত্র পুত্রটিকে রাতারাতি বিয়ে করে বসল!

— আদালত আর অপরাধ জগতের বাইরে আপনি যে কিছুই বোঝেন না, সে-কথা আপনার এই মন্তব্যে বোঝা যায়!

— কোনটা ভুল বলেছি? ত্রিদিবনারায়ণ ধনকুবেরের একমাত্র সন্তান নয়? নাকি মাত্র এক সপ্তাহের কোর্টশিপে ওদের বিয়েটা হয়নি।

— কথাটা তা নয়। প্রতিটি নারীর আদিম প্রেরণা : মাতৃত্ব! এটা জীববিজ্ঞানসম্মত, বিবর্তনবাদ সম্মত। তার যে মোহিনীরূপ, পুরুষকে ভালোবাসা, পুরুষকে কাছে পেতে চাওয়া, তারও মূল প্রেরণা ওই 'সারভাইভাল অব দ্য স্পেসিস্'। কমলেশের বিশ্বাসঘাতকতায় ওর মনের একটা দিক থেঁতলে গেছিল। কিন্তু তার মাতৃত্বকামনাটাকে কমলেশ মাড়িয়ে যেতে পারেনি। ত্রিদিবের মধ্যে ছন্দা সেই অনুভূতিটা চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। ত্রিদিব ওকে আঁকড়ে ধরেছিল, ভেবেছিল সে নিজে ছন্দার প্রেমে পড়েছে — আসলে সে শুধু বাঁচতে চেয়েছিল। যেন ডুবন্ত মানুষের কাছে ছন্দা একটা ভেসে যাওয়া কাঠ! আর ছন্দা চেয়েছিল তার অপূর্ণ মাতৃত্ব কামনাকে চরিতার্থ করতে! আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছি। তাই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ছন্দাকে বুঝিয়ে দিতে পারিনি। সে মনে করেছিল, আমি ত্রিদিবকে ঈর্ষা করছি অহেতুক।

— তারপর কি আপনার সঙ্গে ছন্দার মনান্তর হয়?

— মোটেই নয়। আমরা দু-জনে দু-জনের বন্ধু। ছন্দার রেজিস্ট্রি বিয়েতে আমিই একমাত্র কনের তরফের বন্ধু হিসাবে উপস্থিত ছিলাম।

— তারপর হঠাৎ কমলেশের আবির্ভাব ঘটল?

— হ্যাঁ! হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে সে এসে উপস্থিত। বোধকরি ইনশিওর কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পেরেছিল ছন্দা কীভাবে টাকাটা আদায় করেছে।

— আপনাকে ব্ল্যাক-মেইল করার চেষ্টা করেনি?

— না! ডেথ-সার্টিফিকেট কে দিয়েছে, তা ও জানতে পারেনি। ও আমাকে চিনত না। ও শুধু ছন্দার টাকা চেয়েছিল।

— কত টাকা?

— তৎক্ষণাৎ দু-হাজার আর এক মাসের মধ্যে দশ হাজার।

— ছন্দার কাছে অত টাকা ছিল না?

— না, ছিল না। আমি ধার দিতে চেয়েছিলাম। সে রাজি হয়নি। বলেছিল, এভাবে ব্ল্যাকমেলারকে রোখা যায় না। কমলেশ ওকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল।

— সেজন্যই ওকে রিভলভারটা দিয়েছিলেন?

— ঠিক সেজন্যই নয়। ও যাতে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করতে পারে তাই ওটা ছন্দাকে রাখতে দিয়েছিলাম।

— আপনি তাহলে জানতেন যে, শনিবার রাত একটার সময় ছন্দা ওই কমলেশের সঙ্গে দেখা করতে যাবে? তারাতলায়?

— হ্যাঁ, জানতাম। ছন্দা আমাকে বলেছিল।

— সেই জন্যেই আপনি রাতে তারাতলায় যান?

— আমি? তারাতলায়? শনিবার রাতে? নিশ্চয় নয়!

— শনিবার রাত একটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

— ন্যাচারালি বাড়িতে। ঐ সিঙ্গল-বেডখাটে অঘোর ঘুমে অচেতন।

— আপনার কোনো সাক্ষী বা প্রমাণ আছে?

— এর আবার কী প্রমাণ থাকবে?

— আপনার বাড়িতে একজন ওড়িয়া চাকর আছে। আপনার কম্বাইন্ড হ্যান্ড। সে কোথায়?

— আপনি কী করে জানলেন?

— তাকে ডাকুন। আমি জানতে চাই শনিবার রাত দেড়টার সময় টেলিফোন ধরে কেন সে মিথ্যা কথা বলেছিল?

— গদাধর? কী বলেছে গদাধর?

— 'ডাক্তারবাবু গাড়ি নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন!' কেন? আপনি ফিরে আসার পর সে আপনাকে বলেনি যে, একটা টেলিফোন কল এসেছিল রাত বারোটা তেতাল্লিশে?

— গুড গড! আপনি...আপনি ঘটনার আগে কেমন করে আমাকে ফোনে...

— আপনি যখন সাক্ষী দিতে উঠবেন তখন পুলিসের কাউন্সেল ওই প্রশ্নটা করবে। আপনি কোথায় রোগী দেখতে গেছিলেন, শনিবার রাত বারোটা তেতাল্লিশে!

— আমি...আমি কেন সাক্ষী দিতে যাব?

— যেহেতু আপনি সমন পাবেন। শুনুন ডক্টর ব্যানার্জি, আপনাকে বিপদে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়। ছন্দা আমার ক্লায়েন্ট ; ন্যাচারালি ছন্দার বন্ধুদের উপকারই আমি করব। পরিবর্তে তাদের সহযোগিতাও প্রত্যাশা করি আমি। আপনি আদ্যন্ত সত্য কথা খুলে বলবেন? ওই শনিবার রাত্রির ঘটনাটা?

একমুহূর্তে চিন্তা করে রাজি হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। বলে গেলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা —

হ্যাঁ, উনি জানতেন যে, ছন্দা রাত একটার সময় কমলেশের বাড়িতে যাবে বলে কথা দিয়েছে। ছন্দার ইচ্ছে ছিল কমলেশকে বুঝিয়ে বলবে যে, তার অনেক কীর্তি-কাহিনীর কথা ছন্দাও জানে। একটা মুখোমুখি ফয়শলা করতে চেয়েছিল সে। ডাক্তারবাবু ওকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে আগ্নেয়াস্ত্রটা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ছন্দা ওঁকে বলেছিল যে, জীবনে সে পিস্তল ছোঁড়েনি। প্রয়োজনে সময় মতো সেটা ব্যবহার করতে পারবে কি না তার নিজেরই সন্দেহ আছে। রাত বারোটা নাগাদ উনি উঠে পড়েন। গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার করে চলে আসেন তারাতলায়। কমলেশের বাড়িটা উনি চিনতেন। প্রায় একশ গজ দূরে গাড়িটা পার্ক করে উনি হেঁটে চলে আসেন। তখন কমলেশের ঘরে আলো জ্বলছিল। রাস্তার ধারে ছন্দার মারুতি গাড়িটাকে পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পান। কিছু দূরে একটা মোটর সাইকেলও দাঁড় করানো ছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে ওঁর মনে হল দেড়তলার মেজানাইনে একটা বচসা হচ্ছে। তারপরেই কাচের কিছু একটা ভেঙে যাবার শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা নিবে গেল। ডক্টর ব্যানার্জি তখন ডোরবেলটা টিপে ধরেন।

কেউ সাড়া দেয় না। হঠাৎ রাস্তায় একটা বম্ এক্সপ্লোশান হল যেন। উনি ছুটে পালিয়ে গেলেন কিছু দূরে। সেখান থেকে পিছন ফিরে দেখেন — না, শব্দটা মোটর-বাইক স্টার্ট হবার। উনি দাঁড়িয়ে পড়েন। বোধহয় মিনিটখানেক পরে কমলেশের সদর দরজা খুলে যায়। ছন্দা ছুটে বেরিয়ে আসে। গাড়িতে উঠে বসে। স্টার্ট দেয়। ছন্দা পালিয়ে আসতে পেরেছে দেখে উনি নিশ্চিন্ত হন। উনিও নিজের গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেন। পিছনে কী ঘটল তা আর দেখেননি।

—আপনি আর কোনো লোককে দেখেননি?

— কোথায়?

— ধরুন, ওই বাড়ির কাছে-পিঠে বা বাঁশের ভারা বেয়ে নামতে?

— না।

— আর কোনো গাড়ি কি পার্ক করা ছিল। রাস্তার ধারে?

— তা হয়তো ছিল। আমি নজর করিনি।

— বাসু-সাহেব দশ সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন, এবার আমি আপনাকে একটা খুব গোপন কথা বলতে চাই। যদি আপনি কথা দেন যে, কথাটা পাঁচ কান করবেন না!

— কী কথা?

— আমি বলতে চাইছিলুম যে, আপনাকে খুব সুস্থ বোধ হচ্ছে না।

— এই আপনার গোপন কথা? আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে আমাকে কেমন দেখানোর কথা? খুব সুস্থ? হেইল অ্যান্ড হার্টি?

— তা নয়, মানে এই রকম শারীরিক, এমন মানসিক অবস্থায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে...

— সাক্ষী! আমি কেন সাক্ষী দিতে যাব? ছন্দার পক্ষে? আপনি 'সমন' করবেন?

— না, আমি করব না। আপনার সাক্ষ্য তো ছন্দার ক্ষতিই করবে শুধু। আমার মনে হয় ছন্দার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য আপনার ডাক পড়বে, পুলিসের তরফ থেকে! পুলিস যখনই আবিষ্কার করবে যে, ছন্দা ওই ইনশিওরেন্স-এর টাকাটা তার স্বামীর জীবিতকালে নিয়েছে তখনই আপনাকে তলব করবে। প্রমাণ করতে যে, মেয়েটি পাকা ক্রিমিনাল, — আগেও তঞ্চকতা করেছে! আপনাকেও এ মামলায় তারা জড়াতে চাইবে — ফল্‌স ডেথ সার্টিফিকেট দেবার জন্য!

ডাক্তারবাবু অসহায় ভঙ্গিতে বাসুর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

— তাই তো বলছিলাম, আপনাকে খুবই অসুস্থ লাগছে! আপনার কোনো পেশেন্ট যদি এমন অবস্থায় পড়ে তখন আপনি তাকে কী পরামর্শ দেন? একজন স্পেশালিস্টকে দিয়ে দেখাতে। তাই নয়? আমার কথায় কিছু করে বসবেন না। তবে স্পেশালিস্টের কাছে আপনি জানতে চাইতে পারেন এ অবস্থায় বায়ু পরিবর্তনে কোনো উপকার হতে পারে কি না। আই মিন...

— কী বলছেন আপনি! ছন্দার এই বিপদ, আর আমি তাকে ফেলে এখন বেড়াতে যাব?

— তা যদি বলেন ডক্টর ব্যানার্জি, তা হলে বলি — আপনার কলকাতায় উপস্থিতিটাই ছন্দার সর্বনাশের কারণ হতে পারে। অবশ্য আমি শুধু স্বাস্থ্যের কারণে আপনাকে রাতারাতি চেঞ্জে যেতে বলছি, তার সঙ্গে ছন্দার কোনো সম্পর্ক নেই। সেটা শুধু আপনার স্বাস্থ্যের কারণে। অবশ্য আমি তো ডাক্তার নই। আপনি কোনো স্পেশালিস্টের পরামর্শ মতো যদি...

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন ডক্টর ব্যানার্জি। বাসু-সাহেবের দুটো হাত চেপে ধরে বলে ওঠেন, থ্যাঙ্কস কাউন্সেলার! কথাটা অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল! কাল সকালেই..

— আপনার অবসর বিনোদন কালের ঠিকানাটা...

— না, না, নিশ্চিন্ত থাকুন। জবাকেও তা জানিয়ে যাব না। এ মামলা না মেটা পর্যন্ত...অল রাইট, অল রাইট! এসব কথা আলোচনা করাও মূর্খতা। আই নো!

— বঁ ভয়েজ! — বাসুও উঠে দাঁড়ান!

যেন ডাক্তারবাবু এখনই রওনা দিচ্ছেন।

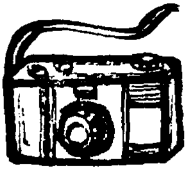

বারো

পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কৌশিক বললে, একটা দুঃসংবাদ আছে, মামু। বলেন তো সবিনয়ে নিবেদন করি।

বাসু-সাহেব পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলেন, এমন কোনো সুপ্রভাতের কথা তো স্মরণ করতে পারছি না কৌশিক, যেদিন প্রাতরাশ টেবিলে দিনটা বিষিয়ে দেবার সুব্যবস্থা তুমি করনি। বল! আমি কর্ণময়। ইদানীং নীলকণ্ঠও হয়ে গেছি! সব জাতের হলাহলই হজম করতে পারছি।

কৌশিক বললে, আপনার মক্কেল আপনার পরামর্শে কান দেয়নি, ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিত জবানবন্দি দিয়ে বসেছে।

— আরক্ষা-বিভাগের এই সুরক্ষিত গোপন তথ্য তুমি কেমন করে সংগ্রহ করলে?

— সুকৌশলী আবার কী করে জানবে? সুকৌশলে! পুলিশ বিভাগের একাংশ অর্থমূল্যে খবর বিক্রি করে থাকে। আপনি শোনেননি?

— বুঝলাম। জবানবন্দিতে ছন্দা কী বলেছে?

— বলেছে, কমলেশ তাকে ব্ল্যাকমেলিঙের চেষ্টা করছিল। বস্তুত কমলেশ এতদিন আত্মগোপন করে বসেছিল, অপেক্ষা করছিল কত দিনে ছন্দা দ্বিতীয় বার বিয়ে করে। ত্রিবিক্রমনারায়ণের একমাত্র পুত্রকে সে বিয়ে করেছে এই খবর পেয়েই কমল সবিক্রমে আত্মঘোষণা করতে উদ্‌যোগী হয়েছিল। বার-কয়েক ছন্দা নাকি টেলিফোনে কমলেশের সঙ্গে কথা বলে। ছন্দা ওকে উলটে ধমক দেয় যে, যে-মুহূর্তে সে আত্মঘোষণা করবে সেই মুহূর্তেই নানান ব্যক্তি তাকে আক্রমণ করবে — যাদের কন্যা বা ভগ্নীকে ফাঁসিয়ে এতদিন সে আত্মগোপন করে ছিল। এ আশঙ্কা কমলেশের নিজেরও ছিল। তাই সে একটা মাঝামাঝি রফা করতে চেয়েছিল। ছন্দা রাজি হয় যে, শনিবার রাত একটায় সে তারাতলায় তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে। বস্তুত ত্রিদিব ঘুমিয়ে পড়ার পর সে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে তারাতলায় চলে আসে। গাড়িটা পার্ক করে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে লক্ষ্য করে যে, কমলেশের ঘরে আলো জ্বলছে। ভিতর থেকে একটা বচসার শব্দ ভেসে আসছে। ছন্দা ওই সময় 'কলবেল'টা বাজায়। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। এই সময় ঝন্‌ঝন্ করে কাচের কিছু বাসনপত্র ভেঙে যাবার শব্দ হয় আর তৎক্ষণাৎ বাতিটা নিবে যায়। ঠিক তার পরেই ছন্দার নজরে পড়ে দেড়তলার ঘর থেকে কেউ বাঁশের ভারা বেয়ে নেমে আসছে। লোকটার পরনে শার্ট-প্যান্ট, মাথায় লোহার হেলমেট। ছন্দা আত্মগোপন করে। একটু পরেই সে শুনতে পায় একটা মোটর সাইকেলের চলে যাবার শব্দ। ছন্দা এরপর নিজের গাড়িতে উঠে বাড়ি ফিরে আসে। — এই হচ্ছে তার জবানবন্দির চুম্বকসার।

— কমলেশের বাড়ির কাছাকাছি অন্য কোনো পরিচিত গাড়িকে সে কি পার্ক করা অবস্থায় দেখেছে? সে-সব কথা কিছু বলেছে?

— না।

— তারপর বোধকরি পুলিশ-অফিসার ওর নাকের ডগায় একটা চাবির-রিং দুলিয়ে প্রশ্ন করেছিল : এটা তাহলে কী করে ঘরের ভিতর পাওয়া গেল?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তা করেছিল। ছন্দা তার জবাবে বলেছে যে, সে বিকালের দিকে তারাতলায় একবার এসেছিল। কমলেশের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে ; কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারেনি। চাবিটা হয়তো তখনই ওর ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে পড়ে যায়।

বাসু ম্লান হেসে বললেন, কেউ নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল চালায়, কেউ কুড়ুলটা খাড়া করে পেতে তাতে পদাঘাত করে! ফল একই!

রানু জানতে চান, এ কথা কেন বলছ?

— হতভাগীকে পইপই করে বলে এলাম যে, পুলিস তোমাকে নানান জাতের রাঙামূলো দেখাবে।

লোভে পড়ে কোনোটা গিলতে যেও না। আমার অনুপস্থিতিতে কোনো স্টেটমেন্ট দিও না। তা শুনল না মেয়েটা। প্রথম থেকেই দেখছি — বড্ড একবগ্গা! নিজে যা ভালো বোঝে তাই করবে।

কৌশিক সায় দেয়, ঠিক তাই। পুলিশ নানা সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স থেকে প্রমাণ করবে যে, শনিবার বিকাল থেকে রাত একটা পর্যন্ত ছন্দার কাছে চাবির থোকাটা ছিল। এরমধ্যে হয়তো দু-একবার গ্যারেজের তালা বন্ধ করেছে ত্রিদিব। ছন্দা তা খুলেছে। হয়তো কোনো পেট্রোল পাম্পের 'বয়' আদালতে উঠে সাক্ষী দেবে ওই মেমসাহেব রাত আটটার সময় তাদের দোকান থেকে পেট্রোল খরিদ করেছেন — চাবির থোকাটা ওই ছোকরার হাতে দিয়েছেন পেট্রোল ট্যাঙ্ক খুলতে। সেই পেট্রোল পাম্পের মালিক ভাউচারের কাউন্টার ফয়েলে হয়তো ওই মারুতি গাড়ির নম্বরটা এসট্যাব্লিশ করবে।

বাসু বলেন, এসব অনেক অনেক সাক্ষীর সম্ভাবনা তো আছেই। তা ছাড়াও কিছু প্রত্যক্ষ বিপদের সম্ভাবনা আছে। বাস্তবে কে যে কলবেলটা বাজিয়েছে তা আমরা জানি না, কিন্তু ঘটনাস্থলে ওই সময়ে আরও দু-জন বা তিনজন ব্যক্তির উপস্থিতির কথা অনুমান করা যাচ্ছে। যে লোকটা ভারা বেয়ে নেমেছিল, যে-লোকটা দেশলাই জ্বালাচ্ছিল, যে-লোকটা মোটর বাইকে করে পালায় এবং — নিজ স্বীকৃতি মতে — ডক্টর ব্যানার্জি। পুলিস যদি কোনোক্রমে ব্যানার্জির সন্ধান পায় এবং তাঁকে কাঠগড়ায় তোলে তাহলে তিনিই দাবি করবেন যে, কল-বেলটা তাঁরই আঙুলের ছোঁয়ায় বেজেছিল...

সুজাতা বলে, ছন্দা ওই জবানবন্দি দিয়েছে জেনেও—

বাসু বলেন, প্রথম কথা তিনি যদি সত্যিই কলবেল বাজিয়ে থাকেন তাহলে হলফ্ নিয়ে তিনি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারেন না, এমন কি ছন্দাকে বাঁচানোর জন্যও নয়। দ্বিতীয় কথা : পুলিস যদি ওই ফলস্ ডেথ-সার্টিফিকেটের অস্তিত্ব টের পায় তাহলে ডাক্তারবাবু নিতান্ত বেকায়দায় সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়াবেন। পুলিস যে-ভাবে চাইবে সেভাবেই তাঁকে সাক্ষী দিতে হবে।

কৌশিক বলে, তাছাড়া ওই মোটর-বাইকের আরোহী — সম্ভবত যে ভারা বেয়ে নেমে এসেছিল — তাকেও যদি পুলিশ পাকড়ও করে তাহলে সেও ওই সুযোগটা চাইতে পারে। কারণ বোঝা যাচ্ছে, কলবেলটা যে বাজিয়েছে সে ভিতরে ঢোকেনি!

* * *

বাসু-সাহেবের চেম্বারে দিনের প্রথম সাক্ষাৎপ্রার্থী একজন স্বনামধন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। রানু তাঁর আগমনবার্তা ইন্টারকমে জানালেন না। সাক্ষাৎপ্রার্থীকে রিসেপশন-কাউন্টারে বসিয়ে নিজেই চাকা-লাগানো চেয়ারে পাক খেয়ে এঘরে চলে এলেন। বাসু কী একটা নোট দেখছিলেন। চোখ তুলে তাকিয়ে বলেন, কী ব্যাপার? কেউ দেখা করতে চায়?

— তা চায়। ভি. আই. পি. ভিজিটার। স্বয়ং শ্বশুরমহাশয়!

— মানে? কার শ্বশুর?

— কার আবার? তোমার মক্কেলের!

— আই সি! স্বনামধন্য বাণিজ্যচুম্বক ত্রিবিক্রমনারায়ণ। ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও। তাঁকে আমার দরকার। এই বিপুল খরচের ব্যয়ভার মেটানোর জন্যে...

— তুমি কি আশা করছ পুত্রবধূর মামলায় উনি খরচ করবেন?

— তা তো করতেই হবে। 'খানদান' বলে কথা! শক্তাবৎ রাজপুত রাও পরিবারের বধূমাতা হত্যার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন অথচ তার শ্বশুরমশাই খচর করবেন না? একি হয়?

— আমি বাজি ধরতে পারি, তুমি ওঁর কাছ থেকে একটা পয়সাও আদায় করতে পারবে না।

— আমি তোমার বাজিটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না রানু, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তুমি জিতলে অথবা হারলে টাকাটা আমাকে মিটিয়ে দিতে হবে — যেহেতু আমাদের জয়েন্ট-অ্যাকাউন্ট। মহান অতিথিকে আর বেশিক্ষণ বসিয়ে রেখ না। পাঠিয়ে দাও।

রানু দুই ঘরের দরজাটা খুলে নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন রাও-সাহেব। মিস্টার বাসু

আপনার প্রতীক্ষা করছেন।

রাও ত্রিবিক্রমনারায়ণ ঘরে প্রবেশ করেলন। 'বাও' করলেন, মৃদু হাসলেন, কিন্তু কারমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন না।

বাসু দাঁড়িয়ে পড়েছেন। হাত বাড়িয়ে একটি চেয়ারকে নির্দেশ করলেন। উভয়েই উপবেশন করলেন। নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন মিসেস বাসু। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ত্রিবিক্রম বললেন, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কেন এই আন্‌-অ্যাপয়েন্টেড সাক্ষাৎকার?

বাসু সহাস্যে বলেন, আমি বস্তুত প্রতিদিনই আপনাকে প্রত্যাশা করছি! কাগজে যখন দেখলাম, আপনি ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সে বক্তৃতা দিতে কলকাতায় এসেছেন।

— সেটা গৌণ কারণ, ব্যারিস্টার-সাহেব। আমাকে নাসিক থেকে উড়ে আসতে হয়েছে আমার 'খানদান'-এর খাতিরে।

— বুঝেছি। আপনার পুত্র ত্রিদিবের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে? কলকাতায় আসার পর? শুনেছি, সে সে সেই রবিবার সকাল থেকে আর আলিপুরের ঠিকানায় থাকে না?

ত্রিবিক্রম হাসলেন। বলেন, ব্যারিস্টার-সাহেব, আমার মনে হয় আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছি, যে প্রস্তাবটা পেশ করতে চাই, তা প্রথমে দাখিল করি। তারপর আপনি আপনার সওয়াল শুরু করবেন...

— ঠিক আছে। বলুন, কী আপনার প্রস্তাব?

— দেখুন বাসু-সাহেব, আমি খেলা কথার মানুষ। শুনেছি, আপনিও তাই। আমি পেশাগতভাবে একজন 'ফিনানশিয়ার'। টাকা খাটাই। দৈনিক লাখ লাখ নয়, কোটি টাকা হাত ফিরি হয়। সবই যে আমার টাকা তা নয়, তবে আমার হাত দিয়ে যায়। এর ফলে বেশ কিছু সুদক্ষ আইনজীবীকে আমি মাস-মাহিনায় রাখতে বাধ্য হয়েছি। তবে তারা সবাই করপোরেট — বা কমার্শিয়াল-ল-এর বিশেষজ্ঞ। সবাই দেওয়ানি আদালতের। আপনিই আমার 'কর্মজীবনে' প্রথম ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, যাঁর সঙ্গে আমাকে কারবার করতে হচ্ছে।...আমি জানি, দেওয়ানি আদালতের ওই সব গয়ংগচ্ছ আইন বিশারদের মতো গদাই-লস্করি চাল আপনাদের পোষায় না। আপনাদের অত্যন্ত দ্রুত অথচ নির্ভুল বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় — কারণ ভুল হলে আপনার মক্কেল গাঁটগচ্চা দিয়েই নিষ্কৃতি পাবে না ; তাকে জেল খাটতে হবে বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, আপনি কিন্তু কাজের কথায় এখনও আসেননি। ভূমিকাটা সংক্ষেপ করলে দু-পক্ষেরই সুবিধা।

— ধন্যবাদ। আমার পুত্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে প্রথম সুযোগেই। সে তার সহধর্মিণীকে বাঁচাতে চায় — খুবই স্বাভাবিক প্রেরণা। কিন্তু যেহেতু তার ধমনীতে শক্তাবৎ-রাজবংশের রক্ত বইছে, যেহেতু সে রাঠোর রাজপুত, তাই সে মিথ্যার সঙ্গে আপোস করতে অসম্মত। স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বা সহানুভূতি তাকে কিছুতেই সত্য থেকে বিচলিত করবে না। এই তার খানদান!

বাসু পাইপে আগুন দিতে দিতে বলেন, আপনি কিন্তু ভূমিকা পর্যায়েই আটকে আছেন এখনও। আমাকে নতুন কোনো তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি।

— আমি আমার বক্তব্যের বনিয়াদটা বানাচ্ছিলাম।

— সেটা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। আপনার পুত্র তার নিদ্রাগতা ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করে স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে আমার সঙ্গে এবং থানা অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ইতিপূর্বেই 'ফাউনেন্ডশনটা' বানিয়ে ফেলেছে। আপনি সরাসরি সুপার-স্ট্রাকচারের বক্তব্যে আসতে পারেন।

— ঠিক আছে। বক্তব্যটা এই : আমার পুত্র আপনাকে নিয়োগ করেছিল তার স্ত্রীর তরফে। সে কোনো 'রিটেইনার' দিয়ে যায়নি। আমি জানি, অগ্রিম না পাওয়া সত্ত্বেও আপনি ত্রিদিবের স্ত্রীর জন্য অনেক ছোটাছুটি করছেন, অনেক খরচও ইতিমধ্যে করে বসে আছেন। আমি এও জানি যে, আপনি প্রত্যাশা করছেন যে, আপনার 'ফি'টা আমি মিটিয়ে দেব। আপনি জানেন যে, আমার পুত্রের নিজস্ব

বলতে কিছুই নেই। তার সব খরচপত্র আমিই বহন করি।...আমি ত্রিদিবের নির্বাচন ক্ষমতাকে নিশ্চয় তারিফ করব। তার স্ত্রী যে জটিল মামলায় জড়িয়ে পড়েছে তা থেকে তাকে মুক্ত করবার ক্ষমতা যদি কলকাতার কোনো আইনজীবীর থাকে তবে তিনি হচ্ছেন পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল! তাই এই পর্যায়েই আমার মনে হল, আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিত যে, আমি আপনার যাবতীয় বিল মেটাব কিন্তু একটি শর্তসাপেক্ষে—

— বলুন? আমার এখন শুধু শুনে যাওয়ার কথা।

— বলছি। কিন্তু মুশকিল কী জানেন? মন খুলে আপনাকে সব কথা যে বলা যায় না!

— কেন?

— কারণ ইতিপূর্বেই পাবলিক প্রসিকিউটার অ্যাডভোকেট নিরঞ্জন মাইতি মশায়ের সঙ্গে এই কেসটা নিয়ে কিছু আলাপচারি হয়েছে। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন : মামলাটা কোন্ পথে পরিচালনা করার প্রকল্পনা আছে তাঁর। সেটা তিনি আমাকে বিশ্বাস করে বলেছেন। তা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি না। তাতে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে।

— বটেই তো! সুতরাং?

— কিন্তু আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে বিখ্যাত। আপনি যদি নিজে থেকেই সেটা অনুমান করে আমাকে জানান, তাহলে আমি বিশ্বাসভঙ্গ না করেই ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারি!

বাসু-সাহেবের দশটা আঙুল দশ সেকেন্ড গ্লাসটপ টেবিলে টরে-টক্কা বাজালো। তারপর তিনি বললেন, আপনি বোধহয় বলতে চান যে, যতদিন আপনার পুত্র এবং ছন্দার সম্পর্কটা স্বামী-স্ত্রী, ততদিন মাইতি মশাই ত্রিদিবকে সাক্ষীর মঞ্চে তুলতে পারবেন না। ফলে, মাইতিমশায়ের প্রথম স্ট্র্যাটেজি হবে ওই বিবাহটা অ্যানাল করা অর্থাৎ বিবাহ-মুহূর্ত থেকে অসিদ্ধ প্রমাণ করা। তাই তো?

— ধন্যবাদ। আমি জানতাম, আপনি সঠিক অনুমান করতে পারবেন এবং এটাও আপনি অনুমান করতে সক্ষম যে, আমি ওই বিবাহটাকে অসিদ্ধ প্রমাণ করার বিষয়ে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি। তাই না?

— আপনার ধারণায় পুত্র অবাঞ্ছিত বিবাহবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছে। তাই কি?

— নিশ্চয়! সে এমন একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছে যে অন্যপূর্বা, যে বয়সে বড়ো, যার 'খানদান' নেই এবং শুধুমাত্র আমার পুত্রের বৈভবের কথা চিন্তা করেই তাকে বিবাহ করছে।

— সে কী? আপনি তো এইমাত্র বললেন যে,. আপনার একমাত্র পুত্র কপর্দকহীন! স্ত্রীকে ভাত-কাপড়ের জোগান দেবার প্রয়োজনে তাকে বাপের কাছে হাত পাততে হয়।

ত্রিবিক্রম আগুনঝরা চোখে বাসু-সাহেবের দিকে সেকেন্ড-পাঁচেক নির্বাক তাকিয়ে রইলেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনার মক্কেল জানে, তার স্বামী আমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ।

বাসু-সাহেব অ্যাশট্রেতে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বললেন, লুক হিয়ার, মিস্টার রাও! আপনি অহেতুক কুণ্ঠা করছেন। আপনার প্রস্তাবটা আমিই বাতলে দিচ্ছি। দেখুন মেলে কি না। যে মেয়েটি খুনের মামলায় ফেঁসেছে তার যাবতীয় ব্যয়ভার আপনি মেটাতে স্বীকৃত একটি শর্তসাপেক্ষে। শর্তটা হল এই যে, আমি 'ম্যারেজ-অ্যানালমেন্ট' কেসটাতে কোনো ডিফেন্স দেব না। নির্বিবাদে ছন্দার সঙ্গে ত্রিদিবের বিবাহটা আইনত অসিদ্ধ হয়ে যাবার পর আমি মেয়েটিকে খুনের দায় থেকে বাঁচাব। অর্থাৎ বিবাহটা নাকচ হতে দিলেই আপনি আমার ফিজ মেটাবেন, আর আসামি যদি আপনার পুত্রবধূ হিসাবে মামলা লড়ে তাহলে আপনি একটি কানাকড়িও ঠেকাবেন না। মোদ্দা কথাটা তো এই?

ত্রিবিক্রম একটু নড়েচড়ে বসলেন। অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে অবশেষে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে বড়ো চাঁচাছোলা ভাষায়।

— কিন্তু মূল বক্তব্যে কোনো ভুল নেই। তাই নয়?

— হ্যাঁ, তাই। অবশ্য আমার সঙ্গে সহযোগিতা করলে আপনার ন্যায্য বিলই শুধু মেটাব না, তার

চেয়ে অনেক-অনেক বেশি...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, 'বিল'-এর উপর 'টিপ্‌স্‌' দেওয়া হবে। এই কথা কি বলতে চান?

— ছিঃ। আমি 'সম্মানমূল্যের' কথা বলছি। 'অনারেরিয়াম্‌'...

— বুঝেছি, বুঝেছি। বিহারে ওকে বলে 'এথি', রাখা-ঢাকা-বাংলায় 'পান খেতে দেওয়া', বফর্স কেস-এর ব্যাপারে বিজনেস্ ওয়ার্ল্ডে 'কমিশন' আর হর্ষদ মেহ্‌তা বা আপনার মতো ধনকুবেরদের ভাষায় 'অনারেরিয়াম'! প্রাকৃতজনের খেলো কথায় : 'ঘুষ'! তাই তো?

ত্রিবিক্রম প্রতিবাদ করেন, এবার আপনার জবাবটা এককথায় শুনে যাই?

বাসু বলেন, তা কেমন করে হবে রাও-সাহেব? প্রস্তাবটা পেশ করার আগে আপনি দীর্ঘ ধানাই-পানাই-ভূমিকার ফাউন্ডেশন গেড়েছেন, এখন এককথায় আমার জবাবটা শুনতে চাইলে আমিই বা রাজি হব কেন? আমার জবাবেরও একটা ভূমিকা চাই তো?

— ঠিক আছে। বলুন?

প্রথম কথা : ত্রিদিবনারায়ণ রাও একটি মেরুদণ্ডহীন ইনভার্টিব্রেট! এ কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু এ দুর্ঘটনার জন্য সে বেচারি কতটা দায়ী, আর কতটা আপনি, সে-কথা আমি জানি, কিন্তু আপনি জানেন না...

ত্রিবিক্রম চাপা গর্জন করে ওঠেন, আপনি এভাবে আমাকে বাগে পেয়ে অপমান করছেন?

বাসু-সাহেব বলেন, অপমান। না তো! আপনি প্রস্তাবটা পেশ করার অবকাশে ধরে নিতে পারলেন যে, আমি সজ্ঞানে আমার মক্কেলের সর্বনাশ করব, আমি একজন অযোগ্য ঘুষখোর অ্যাটর্নি ; আর আমি তার জবাব দেবার সময় 'আর্গু' করতে পারব না, আপনি সজ্ঞানে আপনার সন্তানের সর্বনাশ করেছেন, আপনি একজন অযোগ্য অপরিণামদর্শী পিতা?

পুরো আধ মিনিট ত্রিবিক্রমের বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর দাঁতে দাঁত দিয়ে বললেন, আপনি আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছেন, না — না?

— প্লিজ মিস্টার রাও! আমাকে বলতে দিন।

— কী বলবেন? বলুন?

— আপনার আশঙ্কা হয়েছে যে, ছন্দা যদি আপনার পুত্রবধূ হয়ে টিকে থাকে তাহলে আপনার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে একটা বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। ছন্দা হয়তো ভালোবাসার জোরে স্বামীর মেরুদণ্ডের 'কার্টিলেজ'-হয়ে যাওয়া অস্থিগুলোকে কঠিন করে তুলবে। তাই আপনি তাকে সরাতে বদ্ধপরিকর। তাই না?

— আপনি কিন্তু এখনও আমার প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরটা দেননি।

— দিইনি? এবার তাহলে তাই দিচ্ছি : আমি ছন্দা রাওয়ের ডিফেন্স কেসটা নিয়েছি। সে আমার মক্কেল। তার স্বার্থের কথা সবার আগে দেখব আমি। আপনার পুত্রের মুখটা বন্ধ রাখতে পারলেই আমার মক্কেলের মস্ত সুবিধা। ফলে বিবাহ-নাকচের মামলাটা আমাকে লড়তেই হবে — জান-কবুল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই!

— কিন্তু আইনজ্ঞ হিসাবে আপনি তো বুঝতে পারছেন যে, সে চেষ্টা বৃথা। অ্যাডভোকেট মাইতি বলেছেন, এটা জাস্ট 'ওপেন অ্যান্ড শাট কেস' — দশ-মিনিটের ভিতর বিবাহটা নাকচ হয়ে যাবে, যেহেতু ছন্দা যখন আমার পুত্রকে রেজিস্ট্রি-বিবাহ করে তখনও কমলেশ জীবিত। ছন্দা সেই মুহূর্তে ছিল বিবাহিতা।

বাসু বললেন, মামলায় হার-জিত থাকেই। আমি মাইতির সঙ্গে একমত : মামলার রায় হয়তো দশ মিনিটেই দেওয়া যাবে ; কিন্তু, 'প্রফেশনাল এথিক্স' বলে তো একটা কথা আছে। বিবাহ নাকচের মামলাটা আমাকে লড়তেই হবে।

— আপনার মক্কেল যদি আপনার ফিজ না মেটাতে পারে, তবুও?

— মামলা জিতলে সে নিশ্চয় আমার প্রাপ্য মিটিয়ে দেবে। কারণ তখন তার স্বামী হয়ে যাবে কোটিপতির ওয়ারিশ। আর তার যদি সাময়িকভাবে সে ক্ষমতা না থাকে তাহলে খানদানের খাতিরে তার স্বনামধন্য শ্বশুরমশাই নিশ্চয় পুত্রবধূকে ঋণমুক্ত করে দেবেন।

— সেই হিসাবটাতেই প্রচণ্ড ভুল হচ্ছে আপনার।

— হতে পারে। আপনি বাণিজ্যচুম্বক। 'ফাটকা' নিশ্চয় খেলেন, অন্তত ফাটকা খেলা কাকে বলে তা জানেন। আমি একটা ফাটকা খেলছি। হারলেও এটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে, একজন নিষ্ঠুর কোটিপতি শ্বশুরের বিরুদ্ধে এক অসহায় নিঃস্ব পুত্রবধূর হয়ে লড়েছি। বিনা পারিশ্রমিকে। আর জিতলে? সেক্ষেত্রে আপনি এই ঘরে ওই চেয়ারে বসে আমাকে আমার ন্যায্য পারিশ্রমিকটুকু মিটিয়ে দেবেন। বিনা 'টিপ্‌স্' এ।

ত্রিবিক্রমনারায়ণ চেয়ারে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটা বিচিত্র ব্যঙ্গহাস্য ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠাধরে। বললেন, এরপর আর কথা চলে না। আমরা দুজনেই দুজনকে চিনেছি। ঠিক আছে। খেলুন ফাটকা! প্রাণ ভরে। নমস্কার।

তেরো

বাসু-সাহেবের মেজাজ খারাপ। সঙ্গত হেতুতে। প্রসিকিউশনের তরফে আদালতে আবেদন করা হয়েছিল যেন কমলেশ-হত্যা মামলার শুনানীর দিন একপক্ষকাল পিছিয়ে দেওয়া হয়। হেতু? বাদীপক্ষ এখনও নানান তদন্ত করছে — সময় লাগবে 'কেস'টা সাজাতে। বিচারক প্রতিবাদীপক্ষের মতামত জানতে চান। বাসু বলেন, প্রতিবাদীপক্ষ ডিফেন্সের জন্য তৈয়ার। বাদীপক্ষের আবেদন-মোতাবেক মামলার দিন শুধু পনেরো দিন কেন — ছয় মাস পিছিয়ে দিলেও তাঁর আপত্তি নেই — কিন্তু শর্তসাপেক্ষ : আসামিকে জামিন দিতে হবে। জীবিকায় আসামি একজন নার্স — বিনা বিচারে হাজতে রেখে দেওয়ায় তার দৈনিক উপার্জন বন্ধ।

বিচারক প্রতিবাদীর আবেদন গ্রাহ্য করেননি। তবে বাদীপক্ষের আবেদনও পুরোপুরি মেনে নেননি। মামলার তারিখ সাতদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। জামিন দেওয়া হয়নি। জামিন না-মঞ্জুর হওয়ার একটা সম্ভাব্য হেতু : পুলিস-কর্তৃপক্ষ ত্রিদিবনারায়ণের বিবৃতির অংশবিশেষ সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করেছে। কাগজে ছাপা হয়েছে ত্রিদিবের অভিযোগ। একটি সদ্যোবিবাহিতা বিয়ের কনে স্বামীকে জোরালো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অভিসারে গিয়েছিল — এমন একটা মুখরোচক কিস্‌সা খবরের কাগজ লুফে নিল। বিচারক সেজন্যই প্রভাবিত হলেন কিনা বোঝা গেল না। মোটকথা, সে জামিন পায়নি।

ওই দিন সন্ধ্যায় আদালত থেকে ফিরে আসার পরেই রানুদেবী খবর দিলেন, দু-টো কথা বলার আছে। তুমি আদালত বেরিয়ে যাবার পর কোর্ট-পেয়াদা নোটিস সার্ভ করে গেছে। তোমার মক্কেল ছন্দা রাওয়ের বিরুদ্ধে। বিবাহ-নাকচের আবেদন। শুনানীর দিন : শুক্রবার, বেলা সাড়ে দশটা, আলিপুর কোর্ট-এ তিন নম্বর এজলাসে। তোমার ডায়েরিতে লিখে রেখেছি।

বাসু বললেন, এটা তো প্রত্যাশিত সংবাদ। ছন্দার বিবাহটা নাকচ না হওয়া পর্যন্ত কমলেশ-হত্যা মামলা শুরু হতে পারছে না যে!

— জানি। ত্রিদিব যতক্ষণ আইনত ছন্দার স্বামী, ততক্ষণ বাদীপক্ষ ত্রিদিবকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলতে পারবে না। সেজন্যই ওরা মামলার দিন পিছিয়ে নিচ্ছে, যাতে তার আগেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাটার ফয়সালা হয়ে যায়।

বাসুসাহেব কোটটা গা থেকে খুলতে ব্যস্ত ছিলেন। ওই অবস্থাতেই বললেন, ব্যারিস্টারের বউ হয়ে এমন একটা বে-আইনি কথা বলতে পারলে তুমি?

সুজাতা ছিল পাশেই। উপরপড়া হয়ে বলে, কেন? মামিমা কী ভুল বললেন?

বাসু কোটের আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বসেছেন। পাইপ-পাউচ বার করতে করতে বললেন, ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়ে গেলেও ত্রিদিব আদালতে উঠে সাক্ষী দিতে পারবে না, যদি তার ভূতপূর্ব স্ত্রী আপত্তি জানায়।

— কেন?

— কারণ ঘটনার রাতে ওরা স্বামী-স্ত্রী ছিল। আজ এখন বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হলে ওদের অতীতকালের দাম্পত্য জীবনটা কর্পূরের মতো তো উপে যায় না।

সুজাতা জানতে চায়, তাহলে ওদের উদ্দেশ্যে কী? কমলেশ-হত্যা মামলার তারিখ পিছিয়ে ওরা এত তাড়াহুড়ো করে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাটা আদালতে আনছে কেন?

— আরে বাপু, নোটিসটা পড়ে দেখ। এটা কি ডিভোর্স পিটিশন? আদৌ নয়! এটা 'অ্যানাল্‌মেন্টের' মামলা। ওরা বলতে চায় যে, ছন্দা বিশ্বাস আর ত্রিদিব রায় এক বিছানায় সাত রাত শুয়েছে, এই মাত্র। ওদের বিবাহটাই অসিদ্ধ। কারণ পনেরোই জুন তারিখে যখন ছন্দা বিশ্বাস আর ত্রিদিব রাও ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হয় তখন ওদের একজন — ছন্দা ছিল অন্যপূর্বা, বিবাহিতা। তার প্রথম পক্ষের স্বামী কমলেশ বিশ্বাস ওই তারিখে জীবিত ছিল! সুতরাং ওই 'ছন্দা-ত্রিদিব' শুভবিবাহ গোড়া থেকেই অসিদ্ধ — 'নাল অ্যান্ড ভয়েড'।

— এটা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে ত্রিদিব তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে।

— আবার বে-আইনি কথা! 'স্ত্রী'-র বিরুদ্ধে হচ্ছে কোথায়? বিয়েটা যদি শুরু থেকেই অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তখন ত্রিদিবের চোখে ছন্দা তো একজন ভারতীয় নাগরিক মাত্র, যে ওর বিছানায় সাতরাত শুয়েছে — স্ত্রী নয়। ফলে ছন্দার বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দিতে পারবে না কেন? সে যাই হোক, তোমার দ্বিতীয় দুঃসংবাদটা কী? দুটো খবর দেবার আছে বলেছিলে না?

— হ্যাঁ, দ্বিতীয়টা দুঃসংবাদ নয়। ড. ব্যানার্জি ফোন করেছিলেন। বলেছেন, তুমি এলেই যেন ওঁর চেম্বারে একটা ফোন কর।

— ড. ব্যানার্জি! সে এখনও কলকাতায়?

— কেন? তাঁর কি বাইরে যাবার কথা ছিল?

— ধরত ডাক্তারকে। লোকটা এভাবে আত্মহত্যা করতে চাইছে কেন?

একটু পরেই ডাক্তার-সাহেবকে ফোনে ধরা গেল। ব্যানার্জি বললেন, আরে মশাই, ডাক্তার মানুষ কি রাতারাতি বেড়াতে যেতে পারে? যাব পরশু। টিকিট কেটেছি, হোটেলেও রিজার্ভেশন করেছি। দু-একটি রুগী মরতে বাকি আছে। সেগুলো সেরেই...

— আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন কেন?

— আমার নার্সিং হোমের একটি পেশেন্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দিন-চারেক আগে তার গল-ব্লাডারটি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই শয্যাগত। না হলে তিনি নিজেই আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতেন।

— কী নাম ভদ্রলোকের?

— ভদ্রলোক নয়। ভদ্রমহিলা। বেহালা অঞ্চলে একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ শকুন্তলা দত্ত।

— অ! তা কী বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চান সে কথার কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ। প্রথম কথা, তিনি আপনার পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎটা চাইছেন না — ওই কমলেশ বিশ্বাসের মার্ডার কেসের কিছু তথ্য আপনাকে জানাতে চান।

— রিয়ালি? আমি এখনি আসছি। আধঘণ্টার ভিতর।

রানী দেবী জানতে চান, চা-টা খেয়ে যাবে না?

— টী ক্যান ওয়েট, টাইম কান্ট!

কোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে আবার গিয়ে উঠলেন গাড়িতে।

* * *

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়নি। শকুন্তলা দত্তের কেবিনে তিন-চারজন দর্শনার্থী। ডাক্তার ব্যানার্জি বাসু-সাবকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই অন্যান্য দর্শনার্থীরা উঠে দাঁড়াল। ব্যানার্জী পরিচয় করিয়ে দিলেন। শকুন্তলা বললেন, আপনি আমার খুবই পরিচিত, যদিও আজই আপনাকে চাক্ষুষ দেখলাম।

বাসু বলেন, ভা-রি নতুন কথা বললেন! ও-কথা তো আমিও বলতে পারি!

— কোন কথা?

— আপনি আমার খুবই পরিচিত, যদিও আজই আপনাকে চাক্ষুষ দেখলাম!

— আমি আপনার পরিচিত?

— আলবৎ। আপনি বড়িষা বেহালার মেয়েদের স্কুলে হেডমিস্ট্রেস্। আপনারা দুই বোন, আপনার ছোটোবোনের নাম অনসূয়া কর...

ওঁদের কেবিনে প্রবেশের পর যারা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎ কথার মধ্যেই নিচু হয়ে বাসু-সাহেবকে প্রণাম করল। বাসু জানতে চান, কী হল? তোমার আবার হঠাৎ ভক্তি উথ্‌লে উঠল কেন?

শকুন্তলা বলেন, ওই আমার ছোটোবোন অনু।

— অ! আর যে ছেলেটি আপনাকে সেই তেরোই আগস্ট, মানে সেই চুরাশি সালের কথা বলছি — আপনাকে বেলেঘাটার বস্তিতে নিয়ে গেছিল।

— আশ্চর্য! তারিখটাও মনে আছে আপনার? আমি তো ডায়েরি না দেখে...

এবার অনসূয়ার পাশে দাঁড়ানো যুবকটি নিচু হয়ে বাসু-সাহেবকে প্রণাম করে।

বাসু দু-হাত ওর দুই কাঁধে ফেলে বললেন, থাক, থাক। তা হ্যাঁ গো, বিয়েটা সেরে ফেলেছ তো? এখন তো আর কোনো বাধা নেই।

অনসূয়া মাথা নিচু করে। ছেলেটিও অপ্রস্তুত। জবাব দিলেন শকুন্তলা। বললেন, আমি বাড়ি ফিরে একটু সুস্থ হলেই সে আয়োজন করব। আপনাকে আসতে হবে কিন্তু।

— চেষ্টা করব। ভালোমন্দ খেতে পেলে ছাড়ি না, বামুন না হলেও! তা ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

— কমলাক্ষর পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন হলে আমি রাজি আছি। প্রয়োজনে অনসূয়াও আদালতে উঠে সাক্ষী দেবে।

বাসু বলেন, কমলাক্ষ ওরফে কমলেশ ওরফে কমলেন্দু যে ধোয়া তুলসী পাতা ছিল, এমন দাবী পুলিস করেনি। ফলে আমরা সদলবলে মৃত মানুষটার চরিত্রহনন করে কোনোভাবেই লাভবান হব না। তবু তোমাদের নাম-ঠিকানাগুলো লিখে দাও।

অনসূয়া নাম-ঠিকানা লিখে দিল। অস্ফুটে বললে, আপনি যদি সময় করে সেদিন আসতে পারেন দারুণ — দারুণ খুশি হব।

— তাই বুঝি। কিন্তু কোন্ দিনটার কথা বলছো, বল তো? সাল তারিখ আমার ঠিক মনে থাকে না।

অনসূয়া গোলাপি হাসি হাসে।

ডাক্তার ব্যানার্জি ওঁকে নিজের কোয়ার্টার্সে নিয়ে এলেন। বললেন, কী খাবেন বলুন? চা, কফি, না ড্রিংক্‌স্?

— ড্রিংক্‌স্! তারও আয়োজনও আছে না কি? তা তোমার গার্জেনটিকে দেখছি না যে?

— গার্জেন?

— তোমার সেই কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল নার্স?

— ও, সে তো নার্সিংহোমে। কেন? দরকার আছে?

— আছে বৈ কি। গদাধরকে তো দেখছি না, তাহলে কফিটা বানাবে কে?

ডাক্তার ব্যানার্জি নার্সটিকে ডেকে পাঠালেন। বাসু তাকে বললেন, তোমার নামটা জানি না, তুমি বলছি। তা, আমার উপর আর রাগ নেই তো, মা?

নার্সটি সলজ্জে ওঁকে প্রণাম করে বলল, তখন তো আপনার সঠিক পরিচয় পাইনি। আমার নাম জবা দে।

— তিন কাপ কফি বানাও তো মা, জবা। মানে, তুমিও এককাপ খাবে, ধরে নিয়ে বলছি। আমারটা 'র'।

জবা হেসে সম্মতি জানিয়ে কিচেনেটের দিকে চলে গেল।

ডাক্তার বলেন, ছন্দার কেসটা কেমন বুঝছেন, বলুন?

বাসু বললেন, ডাক্তার আমাকে যা অ্যাডভাইস্ করে আমি তা কিন্তু শুনে থাকি—

— হঠাৎ এ কথা?

— তাহলে কনভার্স থিওরেমটা ট্রু হবে না কেন? তুমিই বা ব্যারিস্টারের অ্যাডভাইস মেনে নেবে না কেন?

— আরে মশাই, ছুটিতে যাব বললেই কি যাওয়া যায়?

— যায়, ডক্টর ব্যানার্জি। তোমার হাতে যে-কটা জরুরি কেস আছে তা তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দাও। তোমার পক্ষে এখন কলকাতায় পড়ে থাকা অত্যন্ত বিপদজনক। আমি যেভাবে জানতে পেরেছি যে, সাতাশে মার্চ অষ্টআশি সালে তোমার নার্সিং-হোমে একটি ক্যানসার রুগি মারা যায় — তোমার রেজিস্টার খাতার অনুযায়ী সে রুগির নাম...

— বুঝেছি, বুঝেছি। সেভাবে পুলিসেও তথ্যটা আবিষ্কার করতে পারে...তাহলেই আমার সমূহ বিপদ, নয়? আচ্ছা, আপনি ও খবরটা জানলেন কী করে?

— সে প্রশ্ন অবান্তর, ড. ব্যানার্জি! তোমাকে বরং আর একটা খবর দিয়ে রাখি, যা অত্যন্ত জরুরি...

— কী সেটা?

— ছন্দা পুলিসের কাছে একটা জবানবন্দি দিয়েছে। আমার নির্দেশ না মেনে। সে স্বীকার করেছে যে, শনিবার রাত একটা নাগাদ সে ওই কমলেশের বাড়িতে গেছিল। তার জবানবন্দি অনুসারে সে ওই বাড়ির সামনে যখন যায় তখন দোতলার ঘরে আলো জ্বলছিল। একটা বচসা চলছিল। হঠাৎ কাচের কিছু একটা ভেঙে যাওয়ার শব্দ হয়। আর তৎক্ষণাৎ আলোটা নিবে যায়। ছন্দা নাকি তখন কলবেলটা টিপে ধরে। একটু পরে ওর মনে হয় দরজা খুলে কে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল। তখন ও ভয় পেয়ে ফিরে আসে!

— আশ্চর্য! এ ঘটনা — মানে প্রায় ওই রকম — ঘটনা তো বাস্তবে ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে।

— আমি জানি। একটা কথা খেয়াল করে দেখ। পুলিস জানে, কমলেশ যখন খুন হয় তখন বাড়ির বাইরে কেউ একজন কলবেল বাজাচ্ছিল। এ তথ্যটার দু-দুটো সূত্র! পানওয়ালা বটুক এবং তার স্ত্রী। পুলিস এও জানে যে, যে লোকটা কলবেল বাজাচ্ছিল সে বাড়ির বাইরে ছিল। ফলে সে হত্যাকারী হতে পারে না। তোমাকে যদি পুলিস ট্রেস করতে পারে, তাহলে তোমার জবানবন্দি নেবে। তখন দেখা যাবে তোমরা দু-জনেই ওই দাবিটা করছ — তুমি ও ছন্দা! দু-জনেই নিজ নিজ স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ঘটনার সময় ফুটপাথে। কলবেল বাজাচ্ছ! এর মধ্যে একজন নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলছে! পুলিস বিশ্বাস করবে যে, মিথ্যা কথাটা বলেছে ছন্দা। সহজবোধ্য হেতুতে। যেহেতু ছন্দা হচ্ছে অ্যাকিউজড্! এজন্য তোমার পক্ষে কলকাতায় থাকাটা...

মাঝপথেই থেমে গেলেন বাসু-সাহেব। কারণ ঠিক তখনই পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল জবা।

তার হাতে একটা ট্রে-তে তিন কাপ কফি, বিস্কিট। একটা কাপে র-কফি।

কফি পরিবেশন করতে করতে জবা বললে, আপনারা নিশ্চয় এতক্ষণ আমার নিন্দে-মন্দ করছিলেন, তাই নয়?

ডাক্তার ব্যানার্জি বলেন, এ-কথা কেন?

— আমি আসা মাত্র আপনাদের আলোচনাটা বন্ধ হয়ে গেল।

বাসু কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, নিন্দে-মন্দ নয় গো, ডাক্তার এতক্ষণ তোমার প্রশংসা করছিল। তা তোমার সামনেই তোমার প্রশংসা করলে তোমার পায়া-ভারী হয়ে যাবে, তাই ও মাঝপথে থেমে পড়েছে।

— প্রশংসা! ফুঃ! স্যার শুধু একটি নার্স-এরই প্রশংসা করতেন, কিন্তু সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আপনার মক্কেল!

বাসু কথাটা ঘোরাবার জন্য বলেন, তুমি কোথায় থাকো গো, জবা?

— বেলঘরিয়ায়।

— ডেলি-প্যাসেঞ্জারি কর?

— উপায় কী?

— তোমার বাড়িতে আর কে আছে?

— মুন্না — আমার পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে — ননদ আর শাশুড়ি।

ওঁকে ইতস্তত করতে দেখে জবা আরও বলে, মুন্নার বাবা এখন দিল্লিতে পোস্টেড।

ঠিক ওই সময় বাইরে থেকে কে যেন কলবেল বাজালো।

জবা তার কাপটা নামিয়ে রেখে পর্দা সরিয়ে কক্ষান্তরে চলে গেল, সদর খুলতে। ঠিক বোঝা গেল না, মনে হল সদর দরজার কাছে একটা চেঁচামেচি গোলমাল। জবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : কী পেয়েছেন আপনারা? জোর করে ভিতরে ঢুকছেন কোন্ সাহসে?

কথাটা তার শেষ হল না। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল শার্ট-প্যান্ট পরা দু-জন লোক। তার পিছন-পিছন জবা। দর্শনমাত্র বাসুসাহেব চিনতে পারেন ওদের — যাকে বলে 'শাদা-পোশাকী পুলিশ গোয়েন্দা'। দু-জনেই মুখচেনা।

তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান বাসু। জবাকে বলেন, ওঁদের বাধা দিও না, জবা। শাদা পোশাকে আছেন বটে, তবে ওঁরা পুলিস। লালবাজার হোমিসাইড সেকশনের।

লোক দুটি বিরক্ত হয়। বোধকরি তারা এত শীঘ্র নিজেদের পরিচয় দিতে চাইছিল না। দর্শনার্থীদের ভেক ধরে কিছু জেনে নেবার ইচ্ছে ছিল ওদের।

বাসু ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, ঠিক আছে ডাক্তার! ব্লাড-টেস্ট করিয়ে রিপোর্টটা নিয়ে আসব কাল-পরশুর মধ্যেই। তুমি ফি নিলে না — আমি পীড়াপীড়ি করব না, বরং বলব ওকালতি পরামর্শের প্রয়োজন হলে অসংকোচে ফোন কর। একটা কথা এখনই বরং বলে যাই — এই দুজন লালবাজারি ভদ্রলোকের কোনো প্রশ্নের জবাব না দেবার সাংবিধানিক অধিকার তোমার আছে...

— ব্যস! ব্যস! ব্যস! যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনি আসুন বাসু-সাহেব!

দু-জন এসে দাঁড়ায় বাসু-সাহেবের দু-পাশে।

বাসু-সাহেবের চোখ দুটো ধ্বক করে একবার জ্বলে উঠল। তিনি পকেট থেকে নামাঙ্কিত একটি কার্ড বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, এঁরা দু-জন কেন এসেছেন তা আমি জানি না। আন্দাজ করতে পারি। সম্ভবত তোমাকে লালবাজারে নিমন্ত্রণ জানাতে। আমার টেলিফোন নাম্বারটা তোমার মানিব্যাগে ভরে রাখ। প্রয়োজনে আমাকে ফোন কর।

একজন বলে ওঠে, আপনাকে উনি ফোন করবেন কেমন করে, স্যার? যে কেঁস-এ ওঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি সে কেস-এ আপনি তো আপনার ঘোড়া আগেই ধরে বসে আছেন! এক মার্ডার কেস-

এ তো দু-জন নেওয়া চলে না। দু-জনের ইন্টারেস্ট ক্ল্যাশ করেতে পারে। পারে না?

বাসু ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম ডাক্তার, তাহলে ওদের একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতাম না! আচ্ছা চলি! গুড লাক টু এভরি-বডি!

* * *

আলিপুর আদালতে ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশনস জাজ প্রণব মুখার্জি তাঁর চেম্বার থেকে আদালতে ঢুকে নিজের আসনে বসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেলেন। চশমার উপর দিয়ে আদালত-কক্ষের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোর্ট-পেশকারকে প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার? এখন তো সেই 'অ্যানালমেন্ট' কেসটা হবার কথা?

পেশকার সসম্ভ্রমে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। 'দ্যা কেস অব্ রাও ভার্সেস রাও' অর্থাৎ ছন্দা দেবী বনাম ত্রিদিবনারায়ণ।

— হুঁ। কিন্তু আদালতে এত লোক কেন তাহলে?

বিচারকের ডানদিকে দর্শকের আসনে বসেছিলেন পাব্লিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতি। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এঁদের কিছু লোক বাদী অথবা প্রতিবাদীর আত্মীয়-বন্ধু, কিছু আলিপুর আদালতের উকিল এবং কিছু সাংবাদিক। বাদী বা প্রতিবাদীর তরফে কোনো আপত্তি না থাকায় এঁরা কেসটা শুনতে এসেছেন। সবাই আশা করছেন, এটা একটা উল্লেখযোগ্য মামলা হিসাবে রেকর্ডেড হয়ে থাকবে। তাই সকলে উৎসাহী।

জজসাহেব জানতে চান, আপনি কি বাদীপক্ষের অ্যাটর্নি?

— আজ্ঞে না, হুজুর। বাদীপক্ষের অ্যাটর্নি অ্যাডভোকেট গোপালচন্দ্র রায় — এই ইনি। আমি দর্শকমাত্র। বাদী একটি হত্যা-মামলার সাক্ষী এবং প্রতিবাদী ওই মামলারই আসামি। তাই স্টেটের স্বার্থ দেখতে আমি উপস্থিত আছি।

বিচারক এবার তাঁর টেবিলে দাখিল করা ফাইলটা তুলে নিয়ে পড়লেন, 'দ্য কেস অব রাও ভার্সেস রাও।' বাদী শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও, সান অব ত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও অব নাসিক। তাঁর পক্ষে আছেন অ্যাডভোকেট শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

বাদীপক্ষের গাউনপরা একজন উকিল উঠে দাঁড়ালেন। মুখেও বললেন, ইয়েস, য়োর অনার।

প্রতিবাদী শ্রীমতী ছন্দা রাও, 'নে' বিশ্বাস — এঁর তরফে কাউন্সেল আছেন শ্রী পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল।

প্রতিবাদীর তরফে বাসু-সাহেব হাত তুলে আত্মঘোষণা করলেন।

বিচারক জানতে চাইলেন, আপনাদের দু-জনের মধ্যে কারও দাবী নেই যে, আদালত-কক্ষে দর্শক বা প্রেসের লোক থাকবে না?

গোপালচন্দ্র একটি 'বাও' করে বললেন, বাদীর তরফে নেই হুজুর। আমরা মনে করি, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে কী কী প্রভিশন্স আছে, কীভাবে তার প্রয়োগ হয়, তা জনসাধারণের জানা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাচক্রে এক্ষেত্রে বাদী একজন ধনকুবেরের একমাত্র ওয়ারিশ এবং প্রতিবাদী একটি হত্যা মামলার বিচারাধীন আসামি। তাই এ বিষয়ে সাধারণের যথেষ্ট কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। আমরা তা প্রশমিত করতে চাই না।

পি. কে. বাসুর দিকে ফিরে বিচারক বললেন, আপনার কী অভিমত?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সহযোগীর সঙ্গে একমত। ঘটনাচক্রে বাদীর পিতা ধনকুবের শ্রীত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও স্বয়ং পুত্র ও পুত্রবধূর বিবাহ নাকচের মামলায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর প্রাসাদ থেকে পুত্রবধূকে বিতাড়ন করতে! প্রতিবাদী আইনসঙ্গত অধিকার বলে তাঁর শ্বশুরমশাইকে সে-অপরাধে আদালতকক্ষ থেকে বিতাড়ন করতে চান না।

ত্রিবিক্রমের কর্ণমূল রক্তাক্ত হয়ে উঠল। তিনি পাথরের মূর্তির মতো বসেই রইলেন।

বিচারক বললেন, অল রাইট। কিন্তু প্রেসের তরফে যাঁরা এসেছেন তাঁদের আমি আগেভাগেই জানিয়ে রাখছি, আদালতের ভিতর তাঁরা যেন কোনো ফটো না তোলেন।

বিচারকের নির্দেশে আদালতকক্ষের দু-পাশের দু-টি দরজা খুলে গেল। বাদী ও প্রতিবাদী প্রহরাধীন অবস্থায় আদালতে প্রবেশ করলেন। ঘটনার রাত্রিপ্রভাতে ছন্দা ঘুম ভেঙে উঠে দেখেছিল তার শয্যার বাকি আধখানা খালি। তারপর থেকে দু-জনের আর সাক্ষাৎ হয়নি। ছন্দা তাই নিজের অজান্তেই অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারণ করে দ্রুত পায়ে ত্রিদিবের দিকে এগিয়ে যেতে চাইল। আদালত-কক্ষে একজন মহিলা-আরক্ষা কর্মী তার গমনপথে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে রুখল।

ত্রিদিব স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করেনি। মাথা সোজা রেখে সে ধীরপদে এগিয়ে গেল তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটার দিকে। বোধকরি ঘটনাচক্রেই সেই চেয়ারটি খালি রাখা ছিল তার স্বনামধন্য পিতৃদেবের পাশেই।

ছন্দা শুধু হতাশ নয়, কিছুটা অপমানিত বোধ করল। ধীরপদে সে এসে বসল বাসু-সাহেবের পাশে খালি চেয়ারে।

বিচারক আদালতের নীরবতা ভঙ্গ করে ঘোষণা করলেন, বাদী এবং প্রতিবাদী দু-জনেই এতক্ষণ ছিলেন পুলিশের হেপাজতে। প্রতিবাদী একটি হত্যা মামলার জামিন-প্রত্যাখ্যাত আসামি হিসাবে এবং বাদী ওই মামলার একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসাবে। আদালতের সম্মুখে যে বিচার্য মামলাটি রয়েছে দেখা যাচ্ছে বাদীর সেই আবেদনপত্রটি পাব্লিক প্রসিকিউটারের দপ্তর ঘুরে এসেছে। তাতে একটি নোটও আছে। বিচার্য মামলাটি একটি রেজিস্ট্রি করা বিবাহ 'অ্যানাল' বা নাকচ করা সংক্রান্ত। আবেদনপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিবাহকালে প্রতিবাদীর স্বামী জীবিত ছিলেন এবং সে কারণে ত্রিদিবনারায়ণ ও ছন্দাদেবীর বিবাহটা অসিদ্ধ। আমরা বর্তমানে এই তথ্যটি শুধু যাচাই করে রায় দেব। তার বাইরে কোনো কিছু আলোচনা করা চলবে না। আমি আরও স্পষ্ট ভাষায় পূর্বে দু-পক্ষকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, দুই পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীদের জেরা করতে গিয়ে ওই হত্যা মামলা সংক্রান্ত কোনো তথ্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা আদালত অনুমোদন করবে না। আশা করি আমার বক্তব্যটা দু-পক্ষই প্রণিধান করেছেন।

ত্রিবিক্রম পাথরের মূর্তির মতো নিস্পন্দ বসে রইলেন ; কিন্তু নিরঞ্জন মাইতি স্পষ্টতই খুশি হয়ে বলে বসলেন, হ্যাঁ, হুজুর!

বাসু কোনো জবাব দিলেন না। নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আদালতে উপস্থিত প্রতিটি আইনজীবী বুঝতে পারলেন যে, মামলা শুরু হবার আগেই প্রতিবাদীপক্ষ হারতে শুরু করেছে। বিচারক ক্রস এগজামিনেশন করার অধিকার কেড়ে নিয়ে শুধু বাসু-সাহেবকেই বঞ্চিত করলেন : কারণ ছন্দাকে বাদীপক্ষের উকিল কোনো মারাত্মক প্রশ্ন করলে বাসু-সাহেব অনায়াসে বলতে পারেন যে, সে জবাব দেবে না ; কারণ জবাব দিলে সে নিজেকেই 'ইনক্রিমিনেট' করবে — হত্যা-মামলায় স্বীকৃতি হিসাবে সে জবাব গৃহীত হবার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে বাদী পক্ষের উকিলের সে সুযোগ ছিল না। সেই সুযোগটুকুই বিচারকের নির্দেশে এখন লাভ করলেন গোপালবাবু।

অ্যাডভোকেট গোপালচন্দ্র রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী : শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও।

ত্রিদিব তার বাবার দিকে তাকাল। ত্রিবিক্রম ওর পিঠে একটা হাত রাখলেন। ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে এল। শপথবাক্য পাঠ করার সময় তার অশান্ত চুলের গোছাটা নেমে এল বাঁ-চোখের উপর। ত্রিদিব হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

— আপনার নাম শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও?

— ইয়েস।

— এ বছর বাইশে জুন।

— কোথায়?

— তারাতলায়। মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টের মেজানাইন ঘরে।

— তার নাম কমলেশ বিশ্বাস?

— আমি জানতাম তাঁর নাম কমলাক্ষ কর। খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুর খবর পড়ে আমার দিদির সঙ্গে কমলেশ বিশ্বাসের 'ইনকোয়েস্ট'-এর সময় আমি দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁকে তখন চিনতে পারি। তাই আমি জানি, কমলেশ বিশ্বাস আর কমলাক্ষ কর একই ব্যক্তি।

— তুমি নিঃসন্দেহ যে, তোমার স্বামী কমলাক্ষ কর এবং মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টে নিহত কমলেশ বিশ্বাস একই ব্যক্তি?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ।

— তুমি তাঁকে কি হিন্দু-মতে বিবাহ করেছিলে, না রেজিস্ট্রি ম্যারেজ?

— রেজিস্ট্রি ম্যারেজ।

— কত তারিখে?

— পাঁচ সেপ্টেম্বর উনআশি সালে।

— তুমি কি তোমার রেজিস্ট্রি-বিবাহের সার্টিফিকেটের একটি জেরক্স কপি এবং তোমাদের যুগলে তোলা ছবি নিয়ে এসেছ। এনে থাকলে আমাকে দাও।

মেয়েটি একটি সার্টিফিকেট এবং একটি ফটো বাসু-সাহেবকে দেয়।

বাসু সে-দুটি গোপালচন্দ্রকে দেখতে দিলেন। বললেন, প্রতিবাদী তরফের এক্‌জিবিট হিসাবে এ দুটি আদালত দাখিল করতে চাই।

গোপালচন্দ্র তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। বলেন, ইয়োর অনার! আমি এই সাক্ষীর জবানবন্দী আদ্যোপান্ত নাকচ করার আর্জি জানাচ্ছি। প্রশ্নোত্তরের সবটাই 'ইনকম্পিটেন্ট, ইররেলিভেন্ট অ্যান্ড ইম্‌মেটিরিয়াল' — অপ্রাসঙ্গিক এবং প্রক্ষিপ্ত। কমলাক্ষ কর আর কমলেশ বিশ্বাস একই লোক কী না প্রমাণ হয়নি। আর হলেই বা কী? লোকটা বিবাহ-বিশারদ ছিল—এমন কথা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। হয়তো এমন বিয়ে সে আরও পাঁচটা করেছে। তাতে কী? প্রতিবাদী তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারতেন। তা তিনি করেননি।

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি কি কিছু বলবেন?

বাসু একটি বাও করে বলেলেন, ইয়োর অনার! ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে 'হংস যা ভক্ষণ করে তা হংসীও খেতে পারে।' আমার মনে হয় ওর কন্‌ভার্সটাও ট্রু! অর্থাৎ 'হংসী যা ভক্ষণ করতে পারে, হংসও তা পারে!' অর্থাৎ যে কারণে বিচক্ষণ সহযোগী ছন্দার সঙ্গে ত্রিদিবের বিবাহটা নাকচ করতে চাইছেন সেই হেতুটাই ওঁরই যুক্তি-মোতবেক নাকচ হয়ে যাচ্ছে। সহজ ভাষায় : কমলেশ বিশ্বাস যখন ছন্দাকে বিবাহ করে তখন কমলেশের পূর্বতন পত্নী অনসূয়া দেবী জীবিতা। সুতরাং আন্ডার দ্য স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট নং ফর্টি-থ্রি অব নাইন্টিন সিক্সটি-ফোর, আন্ডার সেকশন ফোর, ছন্দার সঙ্গে কমলেশের রেজিস্ট্রি বিবাহ অসিদ্ধ। তার ফলে, ছন্দা যখন ত্রিদিবকে বিবাহ করে তখন আইন মোতাবেক ছন্দার কোনো পূর্বতন স্বামী ছিল না। সে ছিল অবিবাহিতা। অর্থাৎ ত্রিদিব এবং ছন্দার বিবাহ সে-কারণে নাকচ করা যায় না।

নিরঞ্জন মাইতি এই সময় বলে ওঠেন, কিন্তু কমলাক্ষ কর আর কমলেশ বিশ্বাস যে একই লোক তা-তো প্রমাণ হয়নি।

বাসু বলেন, অ-প্রমাণ করার দায় বাদীপক্ষের। যতদিন তা অ-প্রমাণ করতে না পারছেন ততদিন ওই অজুহাতে ছন্দা ও ত্রিদিবের রেজিস্ট্রি-বিবাহ নাকচ করা যায় না। অন্তত ততদিন ওরা বৈধ স্বামী-স্ত্রী!

বিচারক দু-পক্ষের উকিলকে প্রশ্ন করলেন, তাঁদের আর কারও বক্তব্য আছে কি না। দু-জনেই জানালেন, না, নেই।

এবার বিচারক স্বয়ং সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, তোমাকে এবার আমিই দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, মা। প্রথমে বলতো, তুমি ওই কমলেশ বিশ্বাসের ইন্‌কোয়েস্টে কেন গেছিলে? তুমি তো কমলেশ বিশ্বাসের নামও জানতে না।

অনসূয়া বলল, না হুজুর, জানতাম। ওই ছন্দা দেবী যখন কমলেশ বিশ্বাসের সঙ্গে বেলেঘাটার বস্তিতে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করতেন, তখন আমার দিদি সেখানে খোঁজ নিতে গেছিলেন। তিনি আমার স্বামী কমলাক্ষ করের ফটো ওই প্রতিবাদী বিশ্বাসকে দেখান এবং ছন্দা দেবী চিনতে পারেন। বুঝতে পারেন যে, আমরা দু-জন একই লোকের স্ত্রী। তাই হুজুর, আমি খবরের কাগজে কমলেশ বিশ্বাসের নাম দেখে তাঁকে চিনতে পারি।

— কিন্তু স্বচক্ষে মৃতদেহ দেখতে যাবার মূল প্রেরণাটা কী?

অনসূয়া বিচারকের চোখে-চোখে রেখে অকপটে বলল, আমি জানতে গেছিলাম যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ্ করার অধিকার আমার এতদিনে বর্তেছে কি না। আমার স্বামী আমার গহনা চুরি করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল।

— তুমি তাহলে নিঃসন্দেহ যে, ওই মৃত ব্যক্তি আর তোমার স্বামী একই লোক?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, য়োর অনার।

— এবার তুমি মঞ্চ থেকে নেমে এস, মা। হয়তো বর্তমান মামলার পক্ষে এটা অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, তবু আমি খুশি মনে তোমাকে আশীর্বাদ করছি — তোমার এই দ্বিতীয়বারের বিবাহ সুখের হোক।

অনুসূয়া সাক্ষীর মঞ্চের রেলিঙে মাথাটা ঠেকালো প্রণামের ভঙ্গিতে।

বিচারক কোর্ট-পেশকারের দিকে ফিরে বললেন, লিখে নাও : জাজমেন্ট! বাদীর দাবি নাকচ করা হল। কোর্ট ইজ্ অ্যাডজর্নড।

বিচারক উঠে দাঁড়ালেন। সবাই উঠে দাঁড়ায়। বিচারক কক্ষ ত্যাগ করেন। ছন্দা হঠাৎ এগিয়ে যায় ত্রিদিবের দিকে। মহিলা-পুলিশ ওর বাহুমূল ধরে ফেলে। ছন্দা তাকে ধমকে ওঠে, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। ছাড়ুন! শুনলেন না — ওই ভদ্রলোক আমার স্বামী?

ত্রিবিক্রমনারায়ণ দৃঢ়মুষ্টিতে পুত্রের বাহুমূল ধরেছিলেন। তাকে আকর্ষণ করে বললেন, চলে এস।

ছন্দা তাঁকেও ধমকে উঠল : ওয়েট! আপনি কী রকম ভদ্রলোক মিস্টার রাও? এটিকেট জানেন না? পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে যখন জনান্তিক আলাপ হয় তখন সেখানে শ্বশুরকে থাকতে নেই — এটা আপনাদের 'শক্তাবৎ খানদানে' কেউ শেখায়নি?

ত্রিবিক্রমনারায়ণ বজ্রাহত হয়ে গেলেন। একটি পাব্‌লিক প্লেসে কোনো একজন মরমানুষ যে তাঁকে এভাবে প্রকাশ্যে অপমান করতে পারে তা ছিল তাঁর দুঃস্বপ্নের বাইরে। তবু ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, তুমি যে এখনও খুনের মামলায় জামিন-না-পাওয়া আসামী, বউমা! এই সময় সর্বসমক্ষে স্বামী-সম্ভাষণের অধিকার থাকে না। যাও মা, হাজতে যাও!

জবাবে ছন্দা কী-যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পূর্বেই ত্রিদিব বলে উঠল, তাছাড়া শক্তাবৎ রাজবংশে কেউ কখনও দ্বিচারিণী স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। চল, ড্যাডি!

এবার বজ্রাহত হবার পালা ছন্দার।

সে শুধু অস্ফুটে বললে : কী বললে? দ্বিচারিণী?

ত্রিদিব জবাব দিল না। এবার সেই আকর্ষণ করল তার বাবাকে। ওরা সবাই ততক্ষণে আদালত কক্ষ থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। আর তৎক্ষণাৎ দু-তিনটে ক্যামেরা বিদ্যুৎচমকে এই দাম্পত্য-কলহের ক্ষণিক উন্মাদনাকে শাশ্বত করে ধরে রাখল।

মহিলা-পুলিশ ছন্দার বাহুমূল ধরে এগিয়ে চলল পুলিশ-ভ্যানটার দিকে। গাড়িতে উঠতে গিয়ে ঘুরে

দাঁড়ালো ছন্দা। বলল, কই, উনি কোথায়?

— কে?

— আমার কাউন্সেলার? মিস্টার পি. কে. বাসু?

বাসু-সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, এখানে কোনো কথা নয়, ছন্দা। আমি হাজতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

চৌদ্দ

আদালত থেকে ফিরে এসে সান্ধ্য চায়ের আসরে বাসু-সাহেব তাঁর স্ত্রীকে শোনাচ্ছিলেন সেদিন কোর্টে কেসটা কী ভাবে মোড় নিল।

সুজাতা বলে, একটা কথা, মামু। আইনের প্যাঁচে আপনি ছন্দার সঙ্গে ত্রিদিবনারায়ণের বিয়েটা নাকচ হতে দিলেন না। কিন্তু ত্রিবিক্রম কি কোনদিন ওকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নেবে?

বাসু বলেন, খুব সম্ভবত, না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ত্রিদিবের অ্যাটিচুড : আমি কাল জেল-হাজতে যাব। ছন্দাকে দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ দরখাস্তে সই করিয়ে আনব। ছন্দা 'হেভি ড্যামেজ' আর 'অ্যালিমনি' দাবী করবে। দশ লক্ষ টাকা।

— দশ লক্ষ! কী হেতু দেখাবে?

— নিষ্ঠুরতা। ত্রিদিব চরম বিপদের সময় স্ত্রীকে শুধু ফেলে পালিয়েই যায়নি। পুলিসের কাছে গিয়ে মিথ্যে এজাহার দিয়েছে। খবরের কাগজে তার স্টেটমেন্ট ছাপানো হয়েছে। তাছাড়া আজ প্রকাশ্যে-আদালত প্রাঙ্গণে স্ত্রীকে দ্বিচারিণী বলে ভর্ৎসনা করেছে। সে কারণেই বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং খেশারদ।

রানু বললেন, আমার ধারণা : ত্রিবিক্রম দশ লক্ষ টাকার চেক লিখে দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদটা এক কথায় মেনে নেবেন। কারণ ছয় মাসের মধ্যেই নিজের সমাজের কোন এক কোটিপতির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন। দশ লাখ টাকার উপর 'সুদ'টুকু কষে দহেজ দাবী করবেন। আদায়ও করবেন।

বাসু বললেন, আমি রানুর সঙ্গে একমত। দহেজ হিসাবে দশলাখ টাকা আদায় করতে পারুক-না-পারুক ছন্দার মতো একটি মেয়েকে তার 'হাভেলি'তে সে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। ছন্দা যে কী পরিমাণ বিপদজনক তা ত্রিবিক্রম বুঝেছে। মাত্র সাতদিনে সে ত্রিদিবকে বাবার দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বার করে এনেছিল।

কৌশিক বলে, কোথায়? নিজের চোখেই তো আদালতে দেখলেন, সে স্ত্রীকে ত্যাগ করে বাবার বগলের তলায় ফিরে গেল...

— সেটাই একমাত্র সত্য নয়, কৌশিক। এ-কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না যে, ছন্দার প্রভাবে ত্রিদিব বাবাকে না জানিয়ে একজন সাধারণ নার্সকে রেজিস্ট্রি-বিয়ে করেছিল। হয়তো জীবনে প্রথম সে এ-ভাবে বাবার বিরুদ্ধে রুখে ওঠে। বিদ্রোহী হবার হিম্মৎ হয় তার!

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। রানু ধরলেন, ফোন করছেন ডক্টর ব্যানার্জি। রিসিভারটা স্ত্রীর হাত থেকে নিয়ে বাসু বললেন, কী ব্যাপার? তোমার না আজ সকালে কলকাতার বাইরে যাবার কথা? কোথায় যেন টিকিট কেটেছ, হোটেল রিজার্ভ করেছ...

— সব ভেস্তে গেছে, স্যার! কাল লালবাজারে আমাকে ওরা পেড়ে ফেলবার নানান চেষ্টা করে। আমি কিছুই স্বীকার করিনি। মানে, শনিবার রাত্রের...

— থাক, থাক। তোমার টেলিফোনটা 'বাগড়' হয়ে থাকতে পারে!

— বুঝেছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে লালবাজার থেকে আমার উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোন প্রয়োজন কলকাতার বাইরে গেলে আমার ঠিকানা যেন নার্সিংহোমে রেখে যাই। এবং ঠিকানা বদলালে

তা যেন আমার কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল নার্সকে টেলিফোনে বারে বারে জানাই এসব বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চাই। মানে সামনাসামনি বসে। টেলিফোনে নয়। কখন আসব?

বাসু বললেন, এ বিষয়ে আলোচনার কিছু নেই, ডাক্তার। তোমার মতো বিখ্যাত ডাক্তারের পক্ষে তোমার গতিবিধি নার্সিংহোম-এর কন্‌ফিডেনশিয়াল নার্সের জানা থাকা আবশ্যিক। তারপর এ বিষয়ে যদি লালবাজার থেকে বিশেষ নির্দেশ এসে থাকে তবে আর আলোচনার কী আছে? তুমি কলকাতার বাইরে যাচ্ছিলে স্বাস্থ্যের কারণে। ফলে আমার সঙ্গে পরামর্শের কিছু নেই। তোমার ফিজিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ কর।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন বাসু।

*   *   *

পরদিন দেখা করতে এল বটুক দত্ত। তারাতলার সেই পানওয়ালা। বাসু-সাহেব বললেন, তোমার আবার কী হল?

— বিপদে না পড়লে কে আর ডাক্তার-উকিলের কাছে দরবার করতে আসে? বলুন, স্যার?

— বল?

বটুক হাতদুটি জোড় করে গরুড়পক্ষীর ভঙ্গিতে বললে, আপনারে ট্যাকা পয়সা দিতে পারব না হুজুর, তবে হ্যাঁ, উগ্গারের বদলে উগ্গার কিছু করতে পারি।

— আগে শুনি, তুমি কী কারণে আমার দ্বারস্থ হয়েছ, তারপর ওসব কথা হবে। সাধারণ মানুষ আইনের প্যাঁচে বিপদগ্রস্ত হলে আমি বিনা পারিশ্রমিকেও আইনের পরামর্শ দিয়ে থাকি। তুমি সঙ্কোচ কর না। তুমি আমাকে পান খাওয়াওনি বটে, তার কারণ বাঁধানো দাঁতে পান আমি চিবুতে পারি না। নাও শুরু কর—

— আপনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন হুজুর, আমার পরিবার বড় এক-বগ্‌গা। আমার শশুর ভীমা কৈবর্ত-মশাই ছিলেন একজন ডাকসাইটে 'ইয়ে' আর কি। পাঁচ-গাঁয়ের মানুষ তেনারে একডাকে চিনত। সদু আর কিছু পাক-না-পাক বাপের সেই একরোখা জিদ্দিবাজিটা পেয়েছে।

— ভূমিকা তো হল, এবার আসল কথাটা বল।

— পুলিশ-ইন্সপেক্টার-সাহেবকে আমরা যে জবানবন্দি সেদিন দিছিলাম, তার মধ্যে কিছু গড়বড় ছিল। মানে, আমাদের তিনজনের এজাহার তিন রকম হয়ে যাচ্ছে...

— তৃতীয়জন আবার কোত্থেকে এল? সৌদামিনীর পেটের সেই বাচ্চাটা?

— আজ্ঞে না হুজুর, সে তো মায়ের পেটে ঘুমুচ্ছে। সে শুনবে কেমন করে?

— এমন কাণ্ডও হয়, বটুক। তুমি শোননি? অভিমন্যু মায়ের পেটের ভিতর থেকেই চক্রব্যূহে ঢোকার পথটা চিনে নিয়েছিল।

— সে সব সত্য-ত্রেতা যুগে হত, স্যার। কলিযুগে হয় না। তিন নম্বর মনিষ্যি, দোতলার ডাক্তারবাবু — ডাক্তার নবীন দত্ত-সাহেব। তাঁরেও তো সে-রাত্রে ডেকে এনেছিলাম। তিনিও টর্চের আলোয় খোলা জানলা দিয়ে ও-বাড়ির ভিতরটা দেখেছিলেন। তাঁর টেলিফোনেই...

— হ্যাঁ, বুঝেছি। তা তোমাদের কী-বিষয়ে মত-পার্থক্যটা হচ্ছে?

— আমাদের তিন জনের জবানবন্দিতে আর কোন ফারাক নেই। ঝামেলা বাধছে মাত্র একটা বিষয়ে। ঐ কলিং-বেলটা নিয়ে।...

— 'কলিংবেল'টা মানে?

— ডাক্তারবাবুর মতে ঐ একটানা শব্দটা রেল-ইঞ্জিনের হুইসিল।

— রেল-ইঞ্জিন তারাতলা রোডে কেমন করে আসবে?

— আসে, হুজুর। রেল-ইঞ্জিন আসে না, তার বাঁশির শব্দ আসে। নিষুতি রাতে মাঝের-হাট ব্রিজের তলা দিয়ে যদি কোনও ইঞ্জিন একটানা হুইসিল বাজাতে-বাজাতে না থেমে চলে যায় তাহলে তার শব্দ আমাদের পাড়া থেকে শোনা যায়।

— বুঝলাম। ডাক্তারবাবুর মতে, ঘটনার সময় — মানে কমলেশ যখন খুন হচ্ছে — তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ 'কল বেল' বাজাচ্ছিল না — ঐ সময় মাঝের-হাট ব্রিজের তলা দিয়ে একটা এঞ্জিন হুইসিল বাজিয়ে চলে যাচ্ছিল। তা, তোমার ঘরওয়ালী কী বলছে?

— তার মতে ঐ সময় পাশের বাড়িতে টেলিফোন বাজছিল — মানে ঐ কমলবাবুর ঘরেই।

— আর তোমার কী মনে আছে?

— আমার স্পষ্ট মনে আছে হুজুর, ওটা কমলবাবুর বাড়ির কলিংবেলের শব্দ। প্রথম কথা, টেলিফোনের শব্দ কখনো একটানা বাজে না, থেমে-থেমে বাজে। আমার একার নয়, ডাক্তারবাবুরও স্পষ্ট মনে আছে শব্দটা ছিল একটানা। সদু — মানে আমার পরিবার, কিছুতেই মানবে না। মেয়েটা এমনিতেই একরোখা, জেদী, পোয়াতি হয়ে যেন মাথা কিনেছেন — জিদ্দিবাজি আরও বেড়ে গেছে।

— সদুর কথা থাক ; কিন্তু তুমি আর ডাক্তারবাবু কেন একমত হতে পারছ না?

— ডাক্তারবাবু একটা কথা খেয়াল করছেন না। রেল ইঞ্জিনের শব্দে বেশ কিটুটা চন্দবিন্দুর ভেজাল থাকে...

— কী ভেজাল থাকে?

— আজ্ঞে ঐ 'চন্দরবিন্দু' আর কি! ঙ-এঞ জাতীয় শব্দে যা থাকে।

— বুঝেছি। আনুনাসিক শব্দ।

— আজ্ঞে তাই হবে হয়তো। ঐ আওয়াজে চন্দরবিন্দুর কোন ভেজাল ছিল না। ওটা তাই ইঞ্জিনের হুইসেল নয়। কলিং বেল।

— বেশ তো। তা আমার কাছে কী পরামর্শ চাইতে এসেছ?

— ডাক্তারবাবুর কথা ছাড়ান দ্যান। আমরা মাগ্-ভাতারে যদি দু-জনে দু-রকম কথা বলি, তাহলে কি আমাদের ধরে চালান দেবে না?

— তা কেন দেবে? দু-জনের অভিজ্ঞতা দু-রকম তো হতেই পারে। হলপ নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় নিছক সত্যি কথাই তো বলতে হবে।

— অ্যাই দেখুন! তাই নয়? অথচ মুখুজ্জে-সাহেব বলছেন...

— কোন মুখার্জি-সাহেব?

বটুক দু-হাতে নিজের কান স্পর্শ করে জিব বার করল। বলল, মুখ-'ফক্সে' বলে ফেলেছি, হুজুর। পুলিশ সাহেব পই-পই করে বারণ করেছেন। শাসিয়ে রেখেছেন — কথাটা পাঁচকান হলে আমার জিব উপড়ে নেবেন।

— ও বুঝেছি! ইন্সপেক্টর অসীম মুখার্জী! সে বুঝি তোমাকে তালিম দিতে গেছিল। কাঠগড়ায় উঠে কী বলতে হবে। তাই নয়?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। কথাটা গোপন রাখবেন স্যার। পুলিশের কাছে একবার যে এজাহার দিয়েছি, কাঠগড়ায় ডাঁইরে তার একটি কথা কি বদলাতে পারি? তাইলে জেল হয়ে যাবে না?

— না, বটুক। তা যাবে না। পুলিসের কাছে প্রথম যে জবানবন্দি দিয়েছ তার কিছুটা পরিবর্তন তুমি অনায়াসে করতে পার সাক্ষী দিতে উঠে। বলতে পার, পরে ভেবে দেখেছ আগেকার দেওয়া এজাহারটা ভুল। শপথ নিয়ে তুমি একবারই সাক্ষী দিচ্ছ আদালতে, — প্রথমবার পুলিসের কাছে যে এজাহার দিয়েছ, তা তো শপথ নিয়ে নয়!

বটুক এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটু ঝুঁকে সামনের দিকে এগিয়ে এল। নিচু গলায় প্রায় ফিস্-ফিস করে বলল, তাইলে এট্টা কথা বলব, হুজুর? ভয়ে বলব না নিভ্যয়ে বলব?

— ভনিতা করছ কেন? যা বলবে বল না। আমি কাউকে জানাতে যাব না।

— মুখুজ্জে-সাহেব বলছেন আমারে কবুল করতে হবে যে, আমি টর্চের আলোয় দেখতে পেয়েছিলাম যে লোকটা ফুটপাতে দাঁইড়ে 'কলিং বেল' বাজাচ্ছিল সে পুরুষ মানুষ। মুখ দেখতে পাইনি, কিন্তু তার পরনে ছিল প্যান্ট-শার্ট! এ নাকি নিয্যস স্বচক্ষে দেখিচি।

বাসু পাইপে বার দুই টান দিয়ে বললেন : হুঁ! অথচ আসলে তা তুমি দেখনি?

— আজ্ঞে না, হুজুর। আমি ও-বাগে টর্চ ফোকাসই করিনি।

— করলে, মানে ওদিকে টর্চের আলো ফেললে, তুমি তোমার ঘরের জানলা থেকে দেখতে পেতে : কে বেলটা বাজাচ্ছে?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা দেখা যায়। কিন্তু হক্কথা বলব : ও-বাগে আমি টর্চের আলো একবারো ফেলিনি। মানে আমার যদ্দূর মনে পড়ে...

— ডাক্তারবাবুর কদ্দূর মনে পড়ে? মানে টর্চের আলো ফেলার বিষয়ে?

— না, হুজুর। ডাক্তারবাবুকে আমি যখন ডাকতে যাই তখন তো কলিং বেল বাজানো বন্ধ হয়ে গেছে।

— তবে যে ডাক্তারবাবু বললেন, এঞ্জিনের শব্দ?

— সে তো উনি নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে শুনেছেন। তখনও আমি ওঁরে ডাকিনি। উনি যখন এসে দেখেন তখন ওই যে-লোকটা কলিং বেল বাজাচ্ছিল সে চলে গেছে।

বাসু বললেন, বুঝলাম। তা সৌদামিনী কী বলছে? ওই টর্চের আলো ফেলার বিষয়ে?

— ওই তো আমারে এখানে পাঠাল। আপনার কাছে জেনে যেতে যে, ওর আগেকার দেওয়া জবানবন্দিটা ও বদল করতে পারে কি না। নতুন করে বলতে পারে কি না যে, ও কিছুই দেখেনি, কিছুই শোনেনি। জানলার বাগে ও প্রথমটায় যায়নি।

— তাতে কী লাভ?

— তাহলে আমি বলতে পারি যে, আমি একাই জানলা দিয়ে টর্চের আলো ফোকাস করে মেঝেতে একটা লোকের নিথর ঠ্যাং দেখতে পাই ; আর টর্চের আলোটা ওই সদর-দরজার বাগে ফোকাস করে দেকিচি ফুটপাথে ডাঁইড়ে কলিং বেলের বোতামের গলা কে টিপে ধরেছিল। তারপর আমি সদুরে ডাকি। সে জানলার বাগে সরে আসে। দেখে, শুধু ওই নিথর ঠ্যাংখানা। ততক্ষণে ফুটপাথে ডাঁইড়ে যে কলিং বেল বাজাচ্ছিল, সে ভাগল্‌বা।

— এ ভাবে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ায় লাভ?

বটুক মাথা নিচু করে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে থাকে। নীরব।

— বুঝলাম। তাতে তোমার কিছু আর্থিক লাভ হবে। তা মিথ্যে সাক্ষীই যদি দেবে তাহলে দু-জনেই তা দিচ্ছ না কেন? তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে তো একই কথা বলতে পারো —

— কী কথা?

— ঐ মুখার্জি-সাহেব যে কথা বলতে বলছে। যে, তোমার পরিবার যখন জানলার কাছে সরে আসে তখনই তুমি টর্চের আলোটা রাস্তার দিকে ফেলেছিলে। তোমরা দু-জনেই দেখতে পাও যে, ফুটপাথে 'ডাঁইড়ে' যে মানুষটা 'কল-বেল' বাজাচ্ছে তার পরনে শার্ট-প্যান্ট! তাহলে কি মুখার্জি সাহেব তোমাকে যত টাকা দেবে বলেছে তার ডবল-টাকা দেবে না? দু-জন সাক্ষী একই কথা বললে তো ওদের কেসটা আরও জোরদার হয়।

— তা হয় হুজুর। ডবল না দিলেও আমারে যত ট্যাকা বক্‌শিস্ দেবে বলেছে, তার দেড়া দেবে নিশ্চয় — মানে ঠিক মতো দরাদরি করতে পারলে। কিন্তু মুশ্‌কিল কী হয়েছে জানেন হুজুর? সদু সাহস পাচ্ছে না।

— সে কী! এই যে বললে, সে খুব ডাকাবুকো। তার বাপ ভীমা ডাকাতের মতো?

— না, হুজুর 'ডাকাত' কথাটা আমি বলিনি। ব্যাপারটা কী জানেন? সদুর সব বীরত্ব শুধু আমার উপর। পুলিশকে ও ভীষণ ডরায়। এটাও ওর বাপের কাছ থেকে পাওয়া। ভীমা কৈবর্ত কি কম ঠ্যাঙানি খেয়েছে পুলিশের হাতে। সদুর আদালত অভিজ্ঞতাও আছে। বাপের কেস শুনতে গেছিল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় উকিলবাবুরা যে কীভাবে নাকাল করে তা ও জানে। তাই ও এখন এজাহার দিতে চায় যে,

সে বিশেষ কিছু দেকেনি।

— বুঝলাম। তা মুখার্জি-সাহেব কত টাকা দেবে বলেছে?

বটুক ঘাড় চুলকে বললে, পুলিশে আবার ট্যাকা বকশিস্ দ্যায় নাকি? এ ট্যাকা তো ওই রাও-সাহেব দিচ্ছে।

— রাও সাহেব? ত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও?

— আজ্ঞে তিনি তো আর নিজে আমার কাছে আসেননি। আন্‌জাদ করছি।

বাসু নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করে বললেন, তা আমার কাছে ঠিক কী জানতে এসেছ, বটুক? আমার মনে হচ্ছে মন খুলে তুমি সব কথা এখনও বলতে সাহস পাচ্ছ না, তাই না?

— আজ্ঞে, তাই! আপনি ঠিকই আন্‌জাদ করছেন।

— কথাটা কী?

— আমরা মাগ-ভাতারে চাই না ওই নার্স-মেয়েটার — ওই আপনার মক্কেল আর কী — তার ফাঁসি হয়ে যাক।

— ফাঁসিই যে হবে তা ধরে নিচ্ছ কেন?

— না হয়, মেয়াদই হল। ট্যাকার জোরে ওই অবাঙালি কোটিপতি লোকটা একটা খেটে-খাওয়া বাঙালি মেয়েকে এ ভাবে হেনস্তা করবে এটা আমাদের ভালো লাগছে না!

— মানলাম। তাহলে তোমরা কী করতে চাও?

— ধরুন হুজুর আমি যদি বলি যে, সদরের দিকে টর্চ-ফোকাস্ করে আমি যাঁরে দেখতে পাই তাঁর পরনে ছিল শাড়ি-বেলাউজ?

— তাহলে রাও-সাহেবের 'বক্‌শিশ' তোমরা পাবে না।

— কিন্তু আপনার মক্কেল কি...

— না বটুক, টাকার প্রতিযোগিতায় আমার মক্কেল ওই রাও-সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। আর শোন — যদি পারতও তাহলেও আমি তোমাকে দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়াতাম না। আমার এখন মনে হচ্ছে ইন্সপেক্টর মুখার্জিও তোমার কাছে যায়নি। তুমি সব বানিয়ে বানিয়ে বলছ। জানতে এসেছ, আমি টাকা দেব কি না। সে যা হোক, তুমি খুবই ভুল করলে বটুক। আমাকে সব কথা বলে ফেলে। তোমার গোপন-কথা আমি কাউকে বলব না বটে, কিন্তু কাঠগড়ায় ডাঁইরে তুমি বা তোমার পরিবার যদি একচুল মিছে-কথা বল, তাহলে তোমাদের আমি ছিঁড়ে খাব! মিথ্যে সাক্ষী দেবার দায়ে তোমাদের জেল খাটাব! বুঝেছ?

— না, মানে...

— আর একটি কথা নয়! তুমি ওঠ। তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিলে। আমার পরামর্শ হল : কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, 'যাহা বলিবে সত্য বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না'। 'বলিলে' তোমার গলায় আমি নম্বরি তক্‌ত ঝোলাইব। ওই ধুতি খুলে ডোরা কাটা হাফপ্যান্ট পরাইব, বুঝেছ? পান-সাজা ছেড়ে মাটি কোপাতে হবে তোমাকে। নাউ জাস্ট ক্লিয়ার আউট।

লোকটা দু-হাত জোড় করে বললে, স্যার...

— আই সে : গেট আউট!

ওঁর কণ্ঠস্বরে কৌশিক পাশের ঘর থেকে উঠে আসে। বটুকের দিকে ফিরে বলে, তুমি কে? কী চাও?

— আজ্ঞে না, কিছু চাই না।

— সাহেব তোমাকে চলে যেতে বলছেন, যাচ্ছ না কেন?

— যাচ্ছি, যাচ্ছি স্যার —

বটুক পালাবার পথ খুঁজে পায় না।

পনের

পরদিন বাসু-সাহেব জেল-হাজতে গিয়ে ছন্দার সঙ্গে দেখা করলেন। ওঁর মনে হল দু-দিনেই ছন্দা বেশ ভেঙে পড়েছে। তার চোখের কোলে কালি। বোধহয় রাত্রে ঘুম হয় না। বাসু-সাহেবকে দেখে বলল, মামলার দিন পড়েছে?

— হ্যাঁ, পড়েছে। তোমাকে জানিয়েও গেছি। তোমার মনে নেই?

— না, মনে পড়ছে না। আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড!

— তা বললে তো চলবে না, ছন্দা। তোমাকে লড়তে হবে।

— কার বিরুদ্ধে?

— যারা টাকার জোরে তোমার মতো অসহায় মেয়ের সর্বনাশ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে। তুমি তো খুনটা করনি, অথচ...

— কে বললে? না, স্যার, আমি পরে ভেবে দেখেছি, খুনটা আমিই করেছি।

— জানি। আমার মনে আছে। তুমি বলেছিলে, কমলেশ দু-হাত বাড়িয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসে। তুমি তখন মেঝে থেকে একটা কিছু কুড়িয়ে নাও। ঘটনাচক্রে সেটা একটা গ্যালভানাইজড্ পাইপের টুকরো। তুমি সেটা এলোপাথাড়ি ঘোরাতে থাকো। তাতেই কমলেশ আহত হয় ; তাই না?

— হ্যাঁ, তাই।

— কিন্তু তুমি স্বচক্ষে ওকে আহত হতে দেখনি, ঠিক তখনই আলোটা কে যেন নিবিয়ে দেয়।

— অথবা আলোটা ফিউজ হয়ে যায়।

— কিন্তু প্রথমবার আমাকে তা বলনি, বলেছিলে 'সুইচ অফ' হবার শব্দ তুমি স্বকর্ণে শুনেছ। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল, যে লোকটা বারে-বারে অন্ধকার ঘরে দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছিল।

— হ্যাঁ, তা জ্বালাচ্ছিল।

— এবং তোমার মনে হল, ভারা বেয়ে সেই লোকটা নেমে গেল।

— হয়তো সে-লোকটা নয়। কারণ আমি যখন দরজা খুলে বার হয়ে আসি তখনও সে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে। ভারা বেয়ে যে নেমে যায়, সে অন্য একজন।

— এবং আরও অন্য একজন বাইরে থেকে কলিং বেল বাজাচ্ছিল।

— হ্যাঁ, তাই।

— তার মানে কমলেশ খুন হবার সময় তুমি ছাড়া আরও দু-তিনজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। তাছাড়া কাগজে যে খবর বার হয়েছিল তাতে লেখা হয় : কমলেশের মাথার পিছন দিকে আঘাত লাগে। তা কেমন করে হয়? তুমি যখন এলোপাথাড়ি পাইপটা ঘোরাচ্ছিলে তখন সে তো তোমার দিকে ফিরে ছিল?

— কী জানি। আমি কিছু চিন্তা করতে পারছি না।

— একটা কথা অন্তত বল। কমলেশের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাও — শনিবার রাত একটা নাগাদ, তখন ওর বাড়ির কাছে, রাস্তায় তুমি কি গাড়িটা লক করে যাওনি? ঐ অত রাত্রে গাড়িটা অরক্ষিত রেখে গেছিলে!

— হ্যাঁ তাই। নাহলে। আমি ফেরার সময় গাড়িতে ঢুকতে পারতাম না। চাবিটা তো তার আগেই ওই ঘরে পড়ে গেছিল।

— আমি যুক্তির কথা জিজ্ঞেস করছি না ছন্দা, স্মৃতির কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমার কি স্পষ্ট মনে আছে যে, কমলেশের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে কী করে গাড়িতে উঠলে? চাবি দিয়ে দরজা খুলেছিলে কিংবা খোলনি?

— আমার কিছু মনে পড়ছে না। তখন আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলাম।

— ন্যাচারালি। কিন্তু চাবিটা তো ছিল তোমার ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর। কমলেশের ঘরে চাবিটা পড়ে গেল কী করে? ভ্যানিটি ব্যাগ তুমি ওর ঘরে ঢোকার পর খুলেছিলে?

— আমার মনে নেই! তবে ওই ব্যাগেই ছিল ডাক্তার ব্যানার্জির রিভলভারটা। হয়তো কমলেশ যখন আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তখন আমি ব্যাগ খুলে যন্ত্রটা বার করতে চেয়েছিলাম...

— এ-ও তো ডিডাক্‌শন। চাবিটা কীভাবে তোমার ব্যাগ থেকে বার হয়ে মাটিতে পড়ে গেল তার যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ। তোমার স্মৃতি কী বলে? তোমার মনে আছে কি, যে ব্যাগ খুলেছিলে?

— না, মনে নেই।

বাসু-সাহেব এবার তাঁর ব্রিফকেস্ খুলে একটা আবেদনপত্র বার করে ওর হাতে দিলেন। ছন্দা জানতে চায়, কী এটা?

— ত্রিদিবনারায়ণের বিরুদ্ধে তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন।

— কিন্তু আমি তো বিবাহ-বিচ্ছেদ চাই না...

— এর পরেও? আদালতের বারান্দায় সে সর্বসমক্ষে তোমাকে যে গালাগাল দিল, যে ব্যবহার করল...

ছন্দা ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, সেটা ওর অপরাধ নয় স্যার, সেটাই ওর অসুখ! ও একটা অবসেশনে ভুগছে। ও যা কিছু করছে তা ওর বাবার নির্দেশে...

— তা কেমন করে হবে, ছন্দা? তোমাকে একা বিছানায় ফেলে রেখে ঘটনার পরদিন শনিবার আক্ষরিক অর্থে সাত-সকালে সে যখন আমার কাছে আসে তখন তার বাবা কলকাতায় ছিলেন না। আমার নিষেধ সত্ত্বেও সে যখন পুলিসে যায় তখন সে স্বেচ্ছায় যায়, বাবার নির্দেশে নয়...

— স্বেচ্ছায় নয়, স্যার। 'স্ব-ইচ্ছা' বলে ওর কিছু নেই। ওর ইচ্ছাটাই ওরা বদলে দিয়েছে। ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-বুদ্ধিটা ওর বাবা মগজ ধোলাই করে ধ্বংস করে দিয়েছে।

বাসু নিজের পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বার করে খাপটা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরেন। বলেন, তুমি বারে বারে অবাধ্য হয়েছে। তোমাকে আমি বারণ করেছিলাম যে, পুলিশের কাছে কোনও জবানবন্দি দেবে না। তুমি আমার কথা শোননি — ফলে আত্মরক্ষার্থে তুমি কমলেশকে হত্যা করেছ — যেটা হতে পারত আমার শেষ প্রতিরোধ — তা আর দাঁড় করানো যাবে না। কারণ তুমি বলেছ যে, তুমি বাড়ির ভেতরেই যাও নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাচ্ছিলে। কিন্তু বাস্তবে কলবেল কে বাজাচ্ছিল জান? ডক্টর ব্যানার্জি।

— ডক্টর ব্যানার্জি! তিনি তখন ওখানে কেন আসবেন?

— কেন আসবেন, তা তুমি জান। যে কারণে তোমাকে বেআইনীভাবে রিভলভারটা দিয়েছিলেন। যে কারণে তোমাকে একটা ফল্‌স ডেথ সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। তার প্রতিদানে তুমি এবার চাও তোমার বদলে তিনি এসে খুনের মামলার আসামী হয়ে দাঁড়ান?

ছন্দা অসহায়ভাবে ওঁর দিকে তাকায়।

— হ্যাঁ, ডক্টর ব্যানার্জি সেই শুক্রবার রাত্রে কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেননি। তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, উনি শনিবার রাত একটা নাগাদ মা সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিলেন। তিনিই কলিংবেলটা বাজিয়েছিলেন। তাঁকে লালবাজার থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ডিভোর্সের মামলার দিন ত্রিদিবের অ্যাডভোকেট কী প্রশ্ন করেছিল মনে নেই?

এই সময় হাজতের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার মুখ বাড়িয়ে বলে, সময় হয়ে গেছে স্যার, এবার আসুন আপনি —

বাসু বলেন, আর এক মিনিট।

লোকটা চলে যেতেই বাসু-সাহেব কলমটা ছন্দার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, ডক্টর ব্যানার্জিকে তুমি এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পার না, ছন্দা, ডু অ্যাজ আই সে! সই কর।

ছন্দা আর আপত্তি করে না। কলমটা হাত বাড়িয়ে নেয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ দরখাস্তের চিহ্নিত স্থানে গোটা-গোটা হরফে নিজের নামটা সই করে দেয়।

* * *

বাড়িতে ফিরে এসে শোনেন একটা অদ্ভুত সংবাদ :

ডাক্তার ব্যানার্জি অ্যাবডাক্‌টেড!

নার্সিং-হোম থেকে জবা ফোন করে জানিয়েছে। গতকাল মধ্যরাত্রে নাকি জবার চোখের সামনেই একদল লোক ডক্টর ব্যানার্জিকে তুলে নিয়ে গেছে। খবরটা পেয়েই কৌশিক চলে যায় নার্সিং-হোমে। জবার সঙ্গে কথা বলে। সেখান থেকে থানায় যায়। তারপর ফিরে এসে বাসু-সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছে।

বাসু বলেন, 'জোর করে তুলে নিয়ে গেছে' মানে কী?

কৌশিক যা বিবরণ দিল তা এই রকম :

গতকাল রাত আটটা নাগাদ একটা এমার্জেন্সি কেস আসে। জবা সচরাচর ঐ আটটা নাগাদ বাড়ি চলে যায়। শেয়ালদহ হয়ে বেলঘরিয়া। কিন্তু এমার্জেন্সি কেসটার জন্য ও আটক পড়ে যায়। এর আগেও এমন ঘটনা দু'একবার হয়েছে। ডক্টর ব্যানার্জি ব্যাচিলার, একা থাকেন, তাই তাঁর কোয়ার্টার্সে রাত কাটায় না। হয় নার্সিং-হোমে বসে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেয়। অথবা ওর দিদির বাড়িতে চলে যায়। সেটা কাছাকাছিই। গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ রোগীটিকে অপারেশন থিয়েটার থেকে ইন্টেন্সিভ-কেয়ার ইউনিটে অপসারণ করা হয়। তারপর রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ ডাক্তার ব্যানার্জি গাড়ি নিয়ে জবাকে তার দিদির বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য বার হন। কিন্তু কিছুটা যেতেই নির্জন গলির মুখে আর একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডার ওঁর গাড়ির পথরোধ করে দাঁড়ায়। ডক্টর ব্যানার্জি কিছু বলার আগেই সেই গাড়ি থেকে দু-তিনজন লোক নেমে আসে। ব্যানার্জি তখন নিজের গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছেন! তিনি বলেন, এভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন কেন? এখনি তো অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেত!

ও-গাড়ি থেকে যারা কাছে ঘনিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে দুজন ডাক্তারবাবুর দুদিকে চলে যায়। তাদের একজনের হাতে রিভলভার। ডক্টর ব্যানার্জির তলপেটে মারণাস্ত্রটা ঠেকিয়ে লোকটা বলে, চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না। এ গাড়িতে উঠে বসুন।

একজন জবার কাছে এগিয়ে আসে। তার হাতে একটা ছোরা। লোকটা বলে, দিদি, কোনও শব্দ করবেন না। জানে মারা পড়বেন। আমরা চলে গেলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাবেন। ডাক্তারবাবুর গাড়ি এখানেই পড়ে থাক।

জবা জবাবে কিছু বলার আগেই ঐ কালো রঙের অ্যাম্বাসাডারখানা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে হাওয়া।

জবা নার্সিং হোমে ফিরে যায় হেঁটেই। থানায় ফোন করে। থানা থেকে এনকোয়ারিতে আসে মধ্যরাতে। জবার জবানবন্দি নেয়। ডাক্তারবাবুর গাড়ির ইগ্‌নিশন চাবি ড্যাশবোর্ডে লাগানোই ছিল। ওরা গাড়িটা নিয়ে গ্যারেজজাত করে চলে যায়।

বাসু বলেন, এতবড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল, জবা তাহলে কাল রাতে আমাকে ফোন করেনি কেন?

— ও বললে, ততক্ষণে রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছে, তাই!

— অল রাইট। আজ সকাল ছয়টা-সাতটার সময় সে ফোন করে আমাকে জানায়নি কেন?

— ও তো বলছে, বার-কতক চেষ্টা করেছিল। কানেক্‌শন পায়নি। যখন কানেক্‌শন পায়, ততক্ষণে আপনি ছন্দাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেছেন।

বাসু চিন্তিত মুখে বারকতক পদাচারণ করে বললেন, সবটা তদন্ত করে তোমার কী মনে হল, কৌশিক?

— থানা অফিসারের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, সে ব্যাপারটায় খুব কিছু গুরুত্ব দিচ্ছে না।

— তাই বা কী করে সম্ভব? ডক্টর ব্যানার্জি একজন অত্যন্ত নামকরা চিকিৎসক, তিনি এভাবে

অপহৃত হয়ে গেলেন তাতে থানা বিচলিত নয়?

— দুটো সম্ভাবনার মধ্যে একটা আপনাকে বেছে নিতে হবে, মামু!

— কী দুটো সম্ভাবনা?

— এক নম্বর : পুলিশ জানে, ডাক্তার ব্যানার্জি কমলেশ-হত্যা মামলায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে চান না এবং আপনিও তা চান না। তাই পুলিশ মনে করছে, এটা আপনার পরিকল্পনা মোতাবেক। অর্থাৎ অ্যাবডাকশনটা আপনিই সাজিয়েছেন। দু'নম্বর : থানা জানে যে, লালবাজার থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, অর্থাৎ ডাক্তার ব্যানার্জিকে আপনার নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে। মামলার দিন সকালে তথাকথিত অপহারকদল তাঁকে মুক্তি দেবে। আর তৎক্ষণাৎ পুলিশ তাঁকে সমন ধরাবে। তার মানে, আপনার বিনা তালিমে ডাক্তার ব্যানার্জি সাক্ষীর-মঞ্চে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন।

বাসু-সাহেব নিঃশব্দে বারকতক পদচারণা করে হঠাৎ থেমে পড়েন। নিজের চেয়ারে বসে বললেন, তোমার দুটো যুক্তির একটাও ধোপে টেকে না।

— কেন?

— প্রথম কথা, আমি যে 'অপারেশন-অ্যাবডাকশন'-এর পরিচালক নই তা তোমরা সবাই জান। তোমার দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাও গ্রাহ্য নয় — এই সামান্য কারণে পুলিস ডক্টর ব্যানার্জির মতো একজন বিখ্যাত চিকিৎসককে 'অ্যাবডাক্ট' করবে না।

— তা হলে উনি অপহৃত হলেন কেন?

— এটা ডক্টর ব্যানার্জি আর জবা মিলে অর্গানাইজ করেনি তো?

— মানে?

— মানে, সবটাই সাজানো! ডক্টর ব্যানার্জি যখন বুঝল যে, দিন দশ-পনেরোর জন্য — অর্থাৎ ঐ হত্যামামলার শুনানী পর্যন্ত — সে নিরুদ্দেশ হতে পারবে না, তখন নিজেই এই অপহরণটা সাজায়নি তো?

— সেজন্য ডাক্তার ব্যানার্জির মতো একজন ছাঁপোষা মানুষ এমন একটা অপহরণ অর্গানাইজ করাবে?

— আরে বাপু অপহরণটা তো জবার বর্ণনা মোতাবেক? আর কোনও সূত্রে তো আমরা জানি না যে ডাক্তারবাবু আদৌ অপহৃত হয়েছেন!

— তা বটে।

— সবটাই ডক্টার ব্যানার্জির উর্বর মস্তিষ্কের পরিকল্পনা বলে মনে হচ্ছে। তোমারা জান যে, লালবাজার থেকে ডাক্তারের উপর একটা নির্দেশ জারী করা হয়েছিল। কলকাতার বাইরে গেলে সে যেন তার ঠিকানা রেখে যায়। সে তখন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিল। আমি প্রত্যাখ্যান করি। হয়তো তখন ডাক্তার আর তার নার্স উদ্ভট পরিকল্পনাটা করে! সেক্ষেত্রে জবা সব কিছুই জানে। আর সে জন্যই কাল রাত্রে আমাদের অহেতুক ডিসটার্ব করেনি। আজ সকালেও তার টেলিফোন করতে এত দেরী হয়ে যায়।

সুজাতা বললে আপনি ঠিকই বলেছেন, মামু। ডাক্তার ব্যানার্জি যদি সত্যিই ঐভাবে অপহৃত হতেন তাহলে জবা নার্সিং হোমের কোন লোককে সঙ্গে নিয়ে রাত্রেই ট্যাক্সি করে এখানে চলে আসত। বিশেষ, থানা যখন তাকে আমল দিচ্ছে না।

বাসু পাইপে তামাক ঠেশ্‌তে ঠেশ্‌তে বলেন, প্রায় সবগুলো অসঙ্গতির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, শুধু একটি বাদে —

রানু জানতে চান, কী সেটা?

— রাত একটার সময় ছন্দা কোন্ আক্কেলে তারাতলায় তার মারুতি-সুজুকি গাড়ির কী-বোর্ডে ইগ্‌নিশন চাবি রেখে, গাড়িটা লক না করে কমলেশের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়!

রানু বললেন, সে সময় ও খুব উত্তেজিত ছিল।

— না, রানু, ছিল না। ফেরার পথে সে উত্তেজিতা ছিল। ফলে সে ফেরার সময় কী করে গাড়িতে ওঠে এটা তার মনে না থাকতে পারে। কিন্তু গাড়িটা তারাতলার মতো কারখানা-এলাকায় ঐভাবে অত রাত্রে সে কেন অরক্ষিত রেখে গেল? গাড়ি থেকে নেমে গেলে ড্রাইভার কাচ উঠিয়ে গাড়ি লক করে। এটা প্রায় প্রতিবর্তী প্রেরণায়। অভ্যাসবশে। দেখলে না, ছন্দা তার জবানবন্দিতে বলল, বাড়ি ফিরে এসে যখন গাড়ি গ্যারেজ করে তখন সে স্লাইডিং ডোরটা টেনে গ্যারেজটা বন্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। অ্যামবাসাডার গাড়িটা একটু সরে-নড়ে যাওয়ায়। তখন সে খুবই উত্তেজিতা। তবু নিজের গ্যারেজের ভিতর সে গাড়ি লক্ করতে চেয়েছে। আর হপ্তাবারে...মানে সপ্তাহান্তে রাত একটার সময় তারাতলার মতো কারখানায়-ভর্তি এলাকায় সে গাড়ি লক্ না-করে গাড়ি থেকে নেবে যাবে? নাঃ। মিলছে না...

— কিন্তু গাড়ি যদি সে লক্-করে নেমে যায়, তাহলে চাবি ছাড়া সে গাড়িতে উঠবে কী করে?

— দ্যাটস্ দ্য মিলিয়ান-ডলার কোশ্চেন!

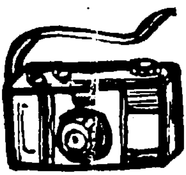

ষোলো

প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে মামলাটা ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উঠতে দেরী হয় না; এবং তিনি আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলা উঠতে বিলম্ব হ'ল না। এমনটা সচরাচর হয় না। সম্ভবত, নেপথ্যে রাজনৈতিক চাপ এর হেতু। ধনকুবের-সম্প্রদায় চার-পাঁচ বৎসর অন্তর রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটযুদ্ধের রসদ যোগান দেন। ফলে তাঁদের প্রভাবে এদেশে অনেক কিছুই ঘটে থাকে। এ-ক্ষেত্রেও যখন ছন্দা-ত্রিদিবের বিবাহটা প্রথম থেকেই নাকচ করানো গেল না তখন ত্রিবিক্রম সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন পুত্রবধূকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে। এছাড়া তাঁর একচ্ছত্র-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষিত হত না।

ত্রিদিব তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে না। উপায় নেই ; কিন্তু সাংবাদিকদের হাত থেকে রক্ষা করতে ত্রিদিবকে একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়েছে। সম্ভবত কোনও পাঁচতারা হোটেলের অজ্ঞাতবাসে।

মামলার দিন আদালতে অপ্রত্যাশিত জনসমাগম হয়েছে। অপ্রত্যাশিত বলাটা অবশ্য ঠিক হবে না, কারণ ইতিমধ্যে কয়েকটি সংবাদপত্রে এ-নিয়ে বিস্তারিত 'রিপোর্টাজ' হয়েছে। রাজপুত ঐতিহ্যের শক্তাবৎ-রাজরক্তের এক ধনকুবেরের একমাত্র পুত্রকে কী-ভাবে একটি নার্সিং-হোমের ভেতো-বাঙালী 'নাইট-নার্স' কব্জা করে ফেলল, কীভাবে তাদের রেজিস্ট্রি-বিবাহ সুসম্পন্ন হল, কী-ভাবে ছেলেটির কোটিপতি পিতা নাসিক থেকে উড়ে এসে সে বিবাহ অবৈধ প্রমাণে 'আদ্রকোদক-সেবনান্তে' প্রাণপাত করলেন, এবং কী-প্যাঁচে পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল ধনকুবেরের সে উষ্ণ-প্রয়াসে এক বালতি বরফ-গলা জল ঢেলে দিলেন! এসব তথ্যই সংবাদপত্রের একনিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকার দল প্রভাতী চায়ের উপাদান হিসাবে জানে! তাই তারা আরও জানতে আগ্রহী : ধনকুবের কি অতঃপর তাঁর বধূমাতাকে — 'উদ্বাহন' থেকে নিরস্ত করতে ব্যর্থ হয়ে 'উদ্বন্ধনে' উর্ধ্বগামী করতে সক্ষম হবেন? মামলাটা যদিও স্টেট-ভার্সেস ছন্দা রাওয়ের — সকলে ধরে নিয়েছে বাস্তবে : ধনকুবের ত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও বনাম ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর।

* * *

আদালত যদি অনুমতি করেন তাহলে বাদীপক্ষ একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে এই মামলার

সূত্রপাত করতে ইচ্ছুক। বাদীপক্ষ আশা করেন যে, তাঁরা প্রমাণ করবেন : এই মামলার আসামী শ্রীমতী ছন্দা রাও সুপরিকল্পিতভাবে তারাতলার মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে মধ্যরাতে তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী কমলেশ বিশ্বাসকে হত্যা করেছেন। আমরা আরও আশা রাখি প্রমাণ করব যে, মাত্র সাত দিনের কোর্টশিপে ঐ আসামী শয্যাশায়ী, অসুস্থ এক ধনকুবেরের একমাত্র পুত্র তথা-ওয়ারিশকে মোহমুগ্ধ করে, তাঁর পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোপনে রেজিস্ট্রি-বিবাহ করেন। এত অল্প সময়ের কোর্টশিপে এ জাতীয় বিবাহের একটিই উদ্দেশ্য হতে পারে — কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে আসামী হঠাৎ এক প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়েন : তাঁর প্রথম পক্ষের জীবিত স্বামী, কমলেশ বিশ্বাস! সদ্যোবিবাহিত রাজপুত্রের কুবেরীর্ষিত বৈভব হস্তগত করতে হলে প্রথম পক্ষের স্বামীকে অপসারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। আসামী মধ্যরাত্রে সেই উদ্দেশ্যই একাকী ড্রাইভ করে প্রথম স্বামীসাক্ষাতে গিয়েছিলেন। আমরা প্রমাণ করব : সে সময় তাঁর হাতব্যাগে একটে রিভলভার ছিল ; কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়েটি হত্যার হাতিয়ার হিসাবে একটা গ্যালভানাইড পাইপ বেছে নেয় — যাতে স্বতই মনে হতে পারে যে, এটা সুপরিকল্পিত হত্যা নয়, আত্মরক্ষার্থে হোমিসাইড। আমরা আরও আশা রাখি প্রমাণ করব যে, আসামী একটি মিথ্যা ডেথ সার্টিফিকেটের সাহায্যে তাঁর জীবিত স্বামীর ওয়ারিশ হিসাবে ইনশিওরেন্স পলিসি থেকে...

বাসু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : অবজেকশন য়োর অনার! প্রারম্ভিক ভাষণে মাননীয় সহযোগী অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করছেন। আমরা একটি হত্যা-মামলার বিচার প্রত্যাশায় এসেছি, আসামীর বিরুদ্ধে আর কোন অপরাধের জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর যদি কোন অভিযোগ আনেন, তবে তা চার্জশিটে আইনের ধারা মোতাবেক উল্লেখ করা উচিত ছিল।

পি.পি. নিরঞ্জন মাইতি বলেন, আমরা আসামীর চরিত্র উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে...

বিচারপতি সদানন্দ ভাদুড়ী বলেন, আপত্তি গ্রাহ্য হল। মিস্টার পি. পি., আপনি হত্যা-মামলার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দেবেন, এটাই আদালতের প্রত্যাশা।

— দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

বিচারক চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সদানন্দ ভাদুড়ী এবার প্রতিবাদীর দিকে ফিরে বললেন, আপনারা কি কোনও প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান?

বাসু বললেন, নো, য়োর অনার। বাদীপক্ষ এবার একে-একে তাঁদের সাক্ষীদের ডাকতে পারেন।

দর্শকের প্রথম সারিতে একদিকে বসে আছেন প্রস্তরমূর্তির মতো ত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও, অন্যদিকে সুজাতা আর কৌশিক। দর্শকমণ্ডলীর ভিতর ডক্টর ব্যানার্জি আর ত্রিদিবকে দেখা গেল না। জবা কিন্তু উপস্থিত।

বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী পুলিশ-ইন্সপেক্টর অসীম মুখার্জি। মাইতি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ইন্সপেক্টর মুখার্জি জানালো বাইশে জুন, শনিবার, রাত একটা আঠাশ মিনিটে সে রেডিও মেসেজ পায় : তারাতলায় মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টে সম্ভবত একজন লোক খুন হয়েছে। ঐ সময় সে একটা পুলিশ-জীপে ডায়মন্ডহারবার রোডে টহল দিচ্ছিল। ওর জীপে রেডিও রিসিভারে খবরটা পায়, স্থানীয় পুলিশ-স্টেশন থেকে। মুখার্জি তখন মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায়। পুলিশের গাড়ি দেখেই পাশের বাড়ি থেকে দুজন লোক নেমে এসে জানান যে, তাঁরাই ফোন করে পুলিশ ডেকেছেন। তাঁদের একজনের নাম ডক্টর এন. দত্ত, অপরজনের নাম শ্রী বটুকনাথ মণ্ডল। ওঁরা মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজায় কলবেল বাজান। কেউ সাড়া দেয় না। তখন বটুক ইন্সপেক্টার মুখার্জিকে তার নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় এবং টর্চের আলোয় পাশের বাড়িতে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটি দেখায়। শুধু পা-টুকু দেখা যাচ্ছিল। এরপর মুখার্জির নির্দেশে একজন পুলিশ ভারা বেয়ে উপরতলায় উঠে যায়। গ্রিলহীন জানলার ফোকর দিয়ে ভেতরে গলে যায়। ভিতর থেকে ইয়েল-লক খুলে দেয়। ওঁরা সদলবলে উপরে আসেন।

ভূলুণ্ঠিত কমলেশ তখনো জীবিত ছিল ; কিন্তু তার জ্ঞান ছিল না। আহতের ঘরে গৃহনির্মাণ সামগ্রী গাদা করে রাখা ছিল। তার ভিতর ছিল একটি পৌনে-এক-মিটার দীর্ঘ বিশ মিলিমিটার ব্যাসের গ্যালভানাজইড লোহার পাইপ। তাতে রক্তের দাগ। যেটি আহতের অদূরেই পাওয়া যায়। মুখার্জির ধারণা হয় : ঐ পাইপের সাহায্যেই ভূতলশায়ী লোকটি আহত হয়েছে। সে পাইপটি সংগ্রহ করে।

ডক্টর দত্ত ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সে জ্ঞানহীন বটে তবে মৃত নয়। ফলে ইন্সপেক্টর মুখার্জি একটি অ্যাম্বুলেন্স আনাবার ব্যবস্থা করে। বটুকের কাছ থেকে জানতে পারে আহত ব্যক্তির নাম কমলেশ বিশ্বাস। সে ঐ ঘরে একাই থাকত। তল্লাসি করতে গিয়ে ঘরের মেঝেতে — মৃতদেহের পাশেই — একটি চাবির রিঙ দেখতে পায়। তাতে তিনটি চাবি, একটি নবতাল তালার, আর দুটি মোটর গাড়ির ডোর-কী। মাইতি সেটিকে পিপল্‌স্ এক্সিবিট 'A' হিসাবে দাখিল করলেন। ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ি এসে পড়ে। আহতকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে মুখার্জি শুনেছে — হলপ নিয়ে বলতে পারবে না — কমলেশ ঐ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যায়। ইতিমধ্যে পুলিশ-ফোটোগ্রাফার অনেকগুলি ফটো নিয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট কিন্তু কোথায়ও কোনও আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করতে পারেনি। না — সুমসৃণ সদ্য-লাগানো দরজার ইলেক্‌ট্রো-প্লেটেড হ্যান্ডেলে, টেলিফোন রিসিভারে, গ্লাস্‌টপ টেবিলে — কোথাও কোন আঙুলের ছাপ নেই।

মাইতি বলেন : এটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি?

বাসু তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানান : জবাবটা সাক্ষীর 'কনক্লুশন।'

মাইতি বলেন, য়োর অনার! সাক্ষী-অপরাধ-বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁর যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত আদালতে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

বিচারক বাসু-সাহেবের আপত্তি নাকচ করে দিলেন।

ইন্সপেক্টর মুখার্জি বলে, হ্যাঁ, আমার কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। আততায়ী যদি হাতে গ্লাভ্‌স্ পরে এসে থাকে তাহলে গৃহস্বামীর আঙুলের ছাপ অন্তত পাওয়া যেত। তা গেল না কেন?

মাইতি জানতে চান : এমনটা হল কেমন করে?

বাসু এবারও আপত্তি জানালেন। বিচারক পুনরায় তা নাকচ করলেন।

মুখার্জি বলল, তার সিদ্ধান্ত : আততায়ী ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে একটা রুমাল দিয়ে সবকিছু মসৃণ পদার্থ মুছে দিয়ে যায়।

মাইতি বলেন, 'রুমাল দিয়ে' কী করে বুঝলেন?

— না, রুমাল দিয়েই যে মোছা হয়েছে এ-কথা বলা যায় না। হয়তো শাড়ির আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে!

মাইতি বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, য়ু মে ক্রস্ হিম!

বাসু জেরা করতে উঠে প্রথমেই বললেন, মিস্টার মুখার্জি, আপনি এইমাত্র বললেন 'রুমাল দিয়েই যে মোছা একথা বলা যায় না। হয়তো শাড়ির আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে।' তাই না?

— হ্যাঁ, তাই বলেছি আমি।

— তার মানে আপনার বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত : যে-লোকটা সব কিছু থেকে আঙুলের ছাপ মুছে দিয়ে যায় তার পরিধানে শাড়ি ছিল। ধুতি কোনক্রমেই থাকতে পারে না, তাই কি?

— না, তাই নয়। এজন্যই আমি 'হয়তো' বলেছি।

— কিন্তু নিরপেক্ষ এক্সপার্ট হিসাবে কি আপনার বলা উচিত ছিল না : 'হয়তো শাড়ির আঁচল অথবা কোঁচার খুটে?

মাইতি আপত্তি তোলেন, সহযোগী তাঁর মনোমত জবাব পাননি বলে ক্ষুব্ধ হতে পারেন; কিন্তু ক্ষোভের এ-জাতীয় প্রকাশ হওয়াটা অবাঞ্ছনীয়। আমি আপত্তি জানাচ্ছি, হুজুর।

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, য়োর পয়েন্ট ইজ ওয়েল টেকন্। আপনি পরবর্তী প্রশ্নে এগিয়ে যান।

বাসু বলেন, আমি শুধু দেখাতে চাইছিলাম, বর্তমান সাক্ষী আদৌ নিরপেক্ষ এক্সপার্ট নন, একটি পূর্ব-ধারণার বশবর্তী হয়ে সহযোগীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন।

— আদালত আপনার যুক্তি শুনেছেন, যা সিদ্ধান্ত নেবার তা নেবেন। আপনি পরবর্তী প্রশ্নটি পেশ করুন।

বাসু টেবিলের উপর থেকে পিপল্স এক্জিবিট 'বি'-এর একটি ফটো তুলে নিয়ে সাক্ষীকে দেখান। বলেন, এ ফটো আপনার উপস্থিতিতে পুলিস ফোটোগ্রাফার সে রাত্রে তুলেছিল? যখন আপনি ঐ ঘরে তদন্ত করছেন? তাই না?

— হ্যাঁ, তাই।

— ফটোতে টেবিলের উপর একটা টেব্ল্-ক্লক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেটাতে সময় দেখা যাচ্ছে দুটো বেজে দশ। যেহেতু আপনি বলছেন যে, আপনি ঐ ঘরে পদার্পণ করেন রাত একটা চল্লিশে তাই বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি কি বলবেন যে, আপনার ঐ ঘরে পদার্পণের ঠিক আধঘণ্টা পরে ফটোটি তোলা হয়।

— আজ্ঞে না। তা বলব না। বলব : পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে। কারণ ঘরে ঢুকেই আমি নিজের হাতঘড়ির...যেটা নির্ভুল ইন্ডিয়ান স্টান্ডার্ড টাইম দিচ্ছিল — সঙ্গে ওটা মিলিয়ে দেখি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম : ঐ টেবিল ঘড়িটি পাঁচ-মিনিট স্লো ছিল।

— সেই টেব্ল্ অ্যালার্ম-ক্লকটা কোথায়?

— আমরা ওটা 'সীজ' করে নিয়ে এসেছিলাম। জমা দিয়েছিলাম। এখন কোথায় আছে, তা জানি না।

বাসু-সাহেব নিরঞ্জন মাইতির দিকে ফিরে জানতে চান, ঘড়িটা কি আদালতে উপস্থিত করা যাবে?

মাইতি বললেন, যাবে। যখন বাদীপক্ষ সেটা উপস্থিত করার সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন যাবে। এখন নয়।

বাসু-সাহেব নিরুপায়ের ভঙ্গিতে 'শ্রাগ' করলেন। পুনরায় সাক্ষীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, ঐ টেব্ল্ ঘড়িতে সময়ের কাঁটা দুটো ফটো-তোলার মুহূর্তে দুটো বেজে দশ মিনিট দেখাচ্ছিল, কিন্তু ওর অ্যালার্ম-কাঁটা কী সময় নির্দেশ করছিল তা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ফটো দেখে বলবেন কি?

— ফটো দেখার দরকার হবে না। আমার মনে আছে : ঠিক একটা।

বাসু-সাহেব পি. পি.-র দিকে ফিরে বললেন, ঘড়িটা কি এখন আদালতে আনা যেতে পারে?

মাইতি দৃঢ়স্বরে বললেন, না। বাদীপক্ষ ঐ ঘড়ির প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নই করেননি। ফলে, এখন ওটা অবান্তর।

বাসু বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, য়োর অনার! বাদীপক্ষ ঐ ফটোটা তাঁদের একজিবিট হিসাবে দাখিল করেছেন। ফটোতে একটি টেব্ল-ক্লক আছে, এটা প্রত্যক্ষ সত্য। বাদীপক্ষের সাক্ষী ঐ ঘড়ি সম্বন্ধে দু-একটি তথ্য দাখিল করেছেন যা আদালতে নথীবদ্ধ হয়েছে। সাক্ষী এ কথাও স্বীকার করছেন যে, তাঁর 'সীজার লিস্টে' ঐ ঘড়িটি আছে। অর্থাৎ সেটি বাদীপক্ষের হেপাজতে রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিবাদী পক্ষের আর্জি : সেটি আদালতে দাখিল করা হোক, যাতে আমরা বর্তমান সাক্ষীকে ও বিষয়ে আরও কিছু জেরা করতে পারি।

বিচারক সম্মত হলেন না। তাঁর মতে বাদীপক্ষ ঘড়িটিকে তাঁদের এভিডেন্সের মধ্যে এখনো আনেননি! যখন আনবেন, তখন প্রয়োজনে বর্তমান সাক্ষীকে আবার কাঠগড়ায় তুলে প্রতিবাদী জেরা করতে পারবেন।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে এই সাক্ষীকে জেরায় আর কোন প্রশ্ন করছি না। ওঁরা

পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

পরবর্তী সাক্ষী অটোপ্সি সার্জন ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ সান্যাল। জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি তাঁর বিশেষজ্ঞের মতামত দিলেন : কমলেশের মৃত্যু হয়েছে, রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। মৃত্যুর হেতু কোন একটি ডাণ্ডা জাতীয় কঠিন বস্তু দিয়ে কেউ কমলেশের মাথার পিছন দিকে আঘাত করেছিল, তাতে তার 'সেরিবেলাম' আহত হয়। সে জ্ঞান হারায়।

মাইতি সুচতুরভাবে প্রশ্ন করেন, আপনি বলতে চান আততায়ী পিছন থেকে কমলেশের মাথায় আঘাত করেছিল?

— সে-কথা আমি আদৌ বলিনি। আমি বলেছি, তার মাথার পিছন দিকে অবস্থিত 'সেরিবেলাম' আহত হয়েছিল — আততায়ী যে আক্রান্ত ব্যক্তির পিছনে ছিল এ-কথা আমি বলিনি!

— কিন্তু তা কী করে সম্ভব? সামনে দাঁড়িয়ে আততায়ী কী করে একজনের মাথার পিছন দিকে আঘাত করবে?

— হ্যাঁ, সেটাও সম্ভব। সেটাই ঘটেছে, একথা আমি বলছি না অবশ্য। বলছি, সেটাও অসম্ভব নয়...

— কী ভাবে? একটু বুঝিয়ে বলুন?

— কমলেশের দেহে দুটো আঘাত-চিহ্ন ছিল। একটি মাথার পিছন দিকে — সেটি ওর মৃত্যুর কারণ; দ্বিতীয়টি ওর বাম ভ্রূর উপর। এমন হতে পারে যে, ওরা দুজন সামনা-সামনি ছিল। আততায়ী প্রথমে কমলেশের বাম ভ্রূতে আঘাত করে। তাতে কমলেশ ওর সামনে উবুড় হয়ে পড়ে যায়। তখন আততায়ী ওর মাথার পিছন দিকে অনায়াসে দ্বিতীয়বার আঘাত করতে পারে। আই রিপীট...এমনটা ঘটেছিল তা আমি বলছি না, এমনটা ঘটতে পারে, তাই বলছি।

— দ্যাটস্ অল যোর অনার।

বাসু জেরা করতে উঠে বললেন, ডক্টর সান্যাল, আমি আপনাকে একটা বিকল্প ঘটনা-পরম্পরা শোনাচ্ছি। ধরা যাক : যে প্রথম বাড়িটা মারে — কমলেশের বাম ভ্রূতে — সে আত্মরক্ষা করতে চাইছিল। হয়তো সে স্ত্রীলোক, অথবা দুর্বল, তাই নিজেকে রক্ষা করতে সে এলোপাথাড়ি ডাণ্ডা ঘোরাচ্ছিল। কমলেশ বাঁ-চোখে আঘাত পেয়ে পড়ে যায়। আত্মরক্ষাকামেচ্ছু তখন লোহার পাইপটা ফেলে পালিয়ে যায়। কমলেশ মিনিটখানেক পরে সামলে নিয়ে উঠে বসতে চায়। আর তখন ঘরে উপস্থিত কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ঐ পাইপটা তুলে নিয়ে কমলেশের মাথার পিছনে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে! এমনটা যে ঘটেছিল সে দাবী কেউ করছে না, কিন্তু এ জাতীয় ঘটনা-পরম্পরায় কি কমলেশের মৃত্যু হতে পারে? এক্সপার্ট হিসাবে আপনার কী অভিমত?

— নিশ্চয় পারে।

— থ্যাঙ্কু ডক্টর! আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

নিরঞ্জন মাইতি তখন একের পর এক সাক্ষীকে কাঠগড়ায় তুলে ঘটনাপরম্পরা প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। পাশের বাড়ির একজন ভদ্রলোক মধ্যরাত্রে ছন্দাকে তার মারুতি-সুজুকি গাড়ি চালিয়ে আলিপুরের বাড়ি থেকে রওনা হতে দেখেছে। রাত তখন বারোটা পঁয়ত্রিশ। সে ওদের অবাঙালী প্রতিবেশী। ত্রিদিবকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। ত্রিদিব যে সম্প্রতি একটি নার্সকে বিবাহ করেছে, তা ও খবর রাখে। তার নাকি 'ইনসম্‌নিয়া' আছে। রাত্রে ঘুম হয় না। ঘটনার রাত্রে সে বস্তুত জেগেই ছিল। তাই জানে, ঠিক একঘণ্টা পরে — রাত একটা পঁয়ত্রিশে — ছন্দা মারুতি-সুজুকি গাড়িটা চালিয়ে ফিরে আসে।

বাসু লোকটাকে আদৌ জেরা না করায় কৌশিক বিস্মিত হল। নিম্নস্বরে বলল, লোকটাকে জেরা করলেন না, মামু?

— পণ্ডশ্রম! ওকে তোতাপাখির মতো সব কিছু শেখানো হয়েছে। ত্রিবিক্রমনারায়ণের আমদানী করা পেশাদার মিথ্যে সাক্ষী! ওকে জেরায় কব্জা করা যাবে না।

তারপর সাক্ষী দিতে এলেন আরও একজন অবাঙালী : যশপাল মাথুর। তাঁর একটি পেট্রোল পাম্প আছে। ডায়মন্ডহারবার রোডে। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন যে, ঘটনার দিন, রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনি ক্যাশ মেলাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা মারুতি-সুজুকি চালিয়ে একজন ভদ্রমহিলা ওঁর পেট্রোল-পাম্পের শেডের ভিতর ঢুকলেন। সচরাচর এসব উনি নজর করে দেখেন না ; কিন্তু একটা বিশেষ কারণে উনি বিস্মিত বোধ করেন। গাড়ি চালিয়ে যিনি প্রবেশ করলেন তিনি যুবতী — বাঙালী মহিলা, এবং গাড়িতে আর কেউ নেই। এ জন্যই ঘড়ির দিকে তাঁর নজর পড়ে। রাত তখনো বারোটা বেজে তেতাল্লিশ! অত গভীর রাত্রে ঐ বয়সের একটি বাঙালী মহিলা একা ডায়মন্ডহারবার রোডে গাড়ি চালাচ্ছেন দেখেই উনি কৌতূহলী হয়ে পড়েন। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেন।

মাইতি প্রশ্ন করেন, সে ভদ্রমহিলা কি এখন আদালতকক্ষে আছেন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ তো আসামীর কাঠগড়ায় চেয়ারে বসে আছেন।

— তিনি কি পেট্রোল কিনতে এসেছিলেন?

লীডিং কোশ্চেন! হোক, বাসু আপত্তি করলেন না।

মাথুর বললেন, আজ্ঞে না। তাঁর গাড়িতে পিছনের ডানদিকের চাকাটায় একদম হাওয়া ছিল না। উনি হাওয়া নিতে এসেছিলেন।

— আপনি ওঁর গাড়ির চাকায় হাওয়া ভরে দিলেন?

— আজ্ঞে না। আমি নয়। রামবিলাস। আমার কর্মচারী।

মাথুর বর্ণনা করলেন : রামবিলাস প্রথমে জ্যাক দিয়ে গাড়ির পিছন দিকটা তুলল। চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া চাকাটা বার করে নিল। 'ডিক্' থেকে স্পেয়ার চাকাটা 'লাগ' খুলে বার করে এনে লাগালো। তারপর জ্যাক সরিয়ে নিতেই দেখা গেল — এ টায়ারটাও জখম। দ্রুত হাওয়া বের হয়ে যাচ্ছে। নজর হল, তাতে একটা পেরেক বিঁধে আছে। তাই আবার বাধ্য হয়ে জ্যাক লাগাতে হল। স্পেয়ার-টায়ার থেকে জখম-টিউবটা বার করে একটা নতুন টিউব দিতে হল। রামবিলাস জানতে চাইল, জখম টিউবটা উনি মেরামত করাতে চান কিনা। তার জবাবে মহিলা বলেন, অনেক রাত হয়ে গেছে। টিউবটা এখানেই থাক। পরদিন মেরামত করা টিউবটা উনি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন। এই সময়ে মাথুর বেরিয়ে এসে বলেন, 'আপনার গাড়িতে আর স্পেয়ার টায়ার থাকল না কিন্তু ম্যাডাম। আবার যদি পাঞ্চার হয়...' জবাবে উনি বলেন, উনি বেশি দূরে যাবেন না। তারাতলা যাচ্ছেন। এক কিলোমিটারও হবে না। রামবিলাস একটা রসিদ ধরিয়ে দেয় টিউবটা রাখার জন্য। ভদ্রমহিলা যখন চলে যান তখন রাত ঠিক একটা।

কাঁটায়-কাঁটায়!

সতের

বাসু জেরা করতে উঠে বললেন, মিস্টার মাথুর, আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন, আসামী যখন আপনার পেট্রোল-পাম্প স্টেশনে ঢোকেন তখন রাত বারোটা বেজে তেতাল্লিশ। তাই না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।

— আপনার হাতঘড়ি মোতাবেক, না ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম?

— আমার ঘরে তিনটে ঘড়ি ছিল, স্যার। একটা ইলেকট্রিকাল দেওয়াল ঘড়ি, একটা টেবিল ক্লক, একটা রিস্ট-ওয়াচ। তিনটেতেই একই সময় দেয়। সে রাত্রেও দিচ্ছিল। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডর্ড টাইম।

— এবং ঐ ভদ্রমহিলা যখন আপনার দোকান থেকে বার হয়ে যান তখন রাত একটা?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— কাঁটায়-কাঁটায় একটা?

— পাঁচ-দশ সেকেন্ড কম-বেশি হতে পারে।

— এই সময়কালের মধ্যে, বারোটা তেতাল্লিশ থেকে রাত একটা — এই সতের মিনিটকাল আসামী আপনার চোখের সামনে ছিলেন?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ।

— মুহূর্তের জন্যেও আপনার দৃষ্টিপথের বাইরে যাননি?

— আজ্ঞে না।

— আপনি ওঁকে চিনতে ভুল করছেন না তো?

— তা কেন করব? না, নিশ্চয় করছি না।

— ওঁর মারুতি-সুজুকি গাড়ির নাম্বারটা আপনি জানেন?

— জানি। মানে, মনে নেই, লেখা আছে আমার দোকানে। কারণ টিউবটা উনি জমা রেখে যান। সচরাচর এক্ষেত্রে গাড়ির নম্বর আমরা লিখে রাখি।

— দ্যাটস্ অল যোর অনার।

পরবর্তী সাক্ষী ডাক্তার নবীন দত্ত। মাইতি-সাহেবের প্রশ্নোত্তরে তিনি বর্ণনা করে গেলেন : কীভাবে মধ্যরাত্রে বটুক ওঁকে টেনে তোলে, উনি এসে তার ঘরের ভিতর দিয়ে টর্চের আলোয় কমলেশের পা-খানা দেখতে পান। ইত্যাদি, প্রভৃতি। ইতিপূর্বে জবানবন্দিতে তিনি যা বলেছেন এবার হলফ্ নিয়ে তা আবার বলে গেলেন।

মাইতি প্রশ্ন করেন, বটুক মণ্ডল যখন আপনাকে ডাকতে আসে তার কিছু আগে কি পাশের বাড়িতে টেলিফোন বাজার শব্দ আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?

— হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। আমি জেগেছিলাম বিছানায়।

— বটুক মণ্ডল যখন আপনাকে ডাকতে আসে রাত তখন কটা?

— আমি ঘড়ি দেখিনি! আন্দাজ দেড়টা।

— তার কতক্ষণ আগে পাশের বাড়িতে টেলিফোন বাজে?

— আন্দাজ দশ-পনের মিনিট হবে।

— টেলিফোন বাজার পর এবং বটুকবাবু আপনাকে ডাকতে আসার মাঝখানে যে দশ-পনের মিনিট সময় পার হয়ে যায় তার মধ্যে আপনি আর কোন শব্দ শুনেছিলেন কি?

— হ্যাঁ, একটানা একটা মেকানিকাল যান্ত্রিক শব্দ।

— সেটা কিসের?

— তা বলতে পারব না। আমার ধারণা হয়েছিল যে, মাঝেরহাট ব্রীজের তলা দিয়ে কোনও ইঞ্জিন না-থেমে হুইসিল বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পরে জেনেছি, রাত একটা থেকে দেড়টার মধ্যে ঐ রকম কোন ইঞ্জিন মাঝেরহাট ব্রীজের তলা দিয়ে যায়নি। তাই আমার ধারণা : ডায়মন্ডহারবার রোডে বা তারাতলা রোডে কোনও মোটরকার-এর হর্নে শর্ট-সার্কিট হয়ে একটানা শব্দ হয়েছিল। অথবা দূর দিয়ে একটা দমকল যাচ্ছিল।

— ঐ একটানা শব্দটা কতক্ষণ হয়েছিল?

— এক থেকে দেড় মিনিট।

— ওটা টেলিফোনের আওয়াজ নয়?

— নিশ্চয় না। টেলিফোনের শব্দ অমন একটানা হয় না।

— পাশের বাড়ির ডোরবেল নয়?

— খুব সম্ভবত নয়। ডোর-বেল বাজালে কেউ সচরাচর ওভাবে পুরো এক মিনিট পুশ-বাটন্ ধরে

থাকে না। বিশেষ রাত একটার সময়। একবার বাজায়, একবার থামে।

— সচরাচর করে না। কিন্তু যদি 'পুশবটন' চেপে ধরে থাকে, তাহলে তো শব্দটা ঐ রকমই হবে?

— হতে পারে। কিন্তু হলফ্ নিয়ে আমি বলতে পারব না। ওটা 'ডোরবেল'-এর শব্দ।

— তা তো কেউ বলাতে চাইছে না। হতে পারে কি না সেই সম্ভাবনার কথাই তো জানতে চাইছি।

— তা পারে।

বাসু জেরায় প্রশ্ন করলেন, ওটা যে ইঞ্জিনের শব্দ নয়, এটা সাক্ষী কেমন করে জানলেন। ডক্টর দত্ত জানালেন, তিনি স্বয়ং মাঝেরহাট স্টেশনে গিয়ে অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন মাস্টরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন। খুনের মামলায় ওঁকে সাক্ষী দিতে হবে শুনে এ. এস. এম. খাতা খুলে ওঁকে দেখিয়ে দেন ঘটনার রাত্রে ঐ সময় কোনও এঞ্জিন — কী আপ, কী ডাউন — মাঝেরহাট স্টেশন দিয়ে যায়নি।

পরবর্তী সাক্ষী বটুক মণ্ডল! পি. পি. র প্রশ্নের উত্তরে সে যা দেখেছে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেল : তার প্রথমবারের জবানবন্দির সঙ্গে বর্তমান এজাহারে বস্তুত কোন প্রভেদ হল না। মাইতি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বটুকের ঘর থেকে টর্চ ফেল্‌লে মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজাটা দেখতে পাওয়া যায় কি না।

— আজ্ঞে, তা যায়।

— তাহলে কে কলিং-বেল বাজাচ্ছে দেখবার জন্য তুমি সেদিকে টর্চের আলো ফেলনি?

বটুক ঢোক গিল্‌ল। তার গলকণ্ঠটা বার কতক ওঠা-নামা করল! আড়চোখে সে বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখল। বাসু-সাহেব তখন সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছেন। জ্বলন্ত এক-জোড়া চোখে তাকিয়ে আছেন বটুকের দিকে। বটুক আমতা-আমতা করল...

— কী হল? জবাব দাও? তুমি ওদিকে টর্চের আলো ফেলেছিলে কি?

— না। ও-বাগে ফোকাস করিনি। হল তো?

— তোমার কৌতূহল হল না? জানতে, যে — কে এতরাত্রে 'কলবেল' বাজাচ্ছে পাশের বাড়িতে?

— না হয়নি। তাছাড়া পাশের বাড়িতে কেউ 'কলবেল' বাজাচ্ছিল তা তো আমি বলিনি।

— পুলিশের কাছে প্রথম যে এজাহার দিয়েছিলে...

— সে সব কথা ছাড়ান দ্যান, হুজুর। এই কাঠগড়ায় ডাঁইরে আমি ও-কথা বলিনি। ঐ কলিংবেলের কথা...

— তুমি বলনি যে, যে সময় ঝগড়া-মারামারি হচ্ছিল তখন একটানা একটা কলিংবেলের শব্দ হচ্ছিল?

— আজ্ঞে না! একটানা 'একটা শব্দ হচ্ছিল' বলিচি! তবে সেটা কলিংবেলের কি না, জানি না। রেল-ইঞ্জিনের হতে পারে। মটোর-গাড়ির হর্ন অমন পাগলামি করে মাঝে-মধ্যে — তাও হতে পারে। আর, হ্যাঁ, দমকলের পাগলাঘণ্টিও হতে পারে...

— তুমি শুনলে না, ডক্টর নবীন দত্ত বললেন যে, উনি মাঝেরহাট স্টেশনে গিয়ে এ. এস. এম-এর কাছে জেনে এসেছেন, সে সময় মাঝেরহাট ব্রীজের তলা দিয়ে কোন এঞ্জিন যাচ্ছিল না। শোননি?

বটুক রুখে ওঠে, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনিচি! কিন্তু তার সত্যি-মিথ্যে আমি জানি না, হুজুর। ঐ শোনা কথার ভিত্তিতে আমি হলপ নিয়ে কিছু বললে ঐ উনি জেরায় আমাকে ছিঁড়ে খাবেন!

বাসু-সাহেবকে সে দেখায়।

মাইতি বলেন, দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

বাসু এবার উঠলেন জেরা করতে! প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, বটুকবাবু, তোমার পানের দোকানে তাকের উপর একটা জ্যাজ কোম্পানির অ্যালার্ম-ক্লক আছে, তাই না? মা-কালীর পটখানার ঠিক ডান-বাগে?

মাইতি আপত্তি জানালেন : অবান্তর প্রশ্ন, এই অজুহাতে।

বাসু আদালতকে আশ্বস্ত করলেন যে, প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা তিনি অচিরেই প্রতিষ্ঠা করবেন। ফলে

বিচারক সাক্ষীকে অনুমতি দিলেন প্রশ্নের জবাবটা দিতে। বটুক বলল, কোন কোম্পানির ঘড়ি তা বলতে পারব না, হুজুর, তবে হ্যাঁ, একটা ঘণ্টা-ঘড়ি আছে। বাবার আমল থেকে! ঐ আমার পানের দোকানে। ঠিকই বলেছেন, মা-কালীর পটের ডান বাগে।

— সেটা তুমি মাঝে-মধ্যে দম দিয়ে বাজাও নিশ্চয়?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বাজাই বইকি! ভোর রেতে কোথাও যাবার দরকার হলে।

— ওটার শব্দ কেমন? টেলিফোনের মতো থেমে থেমে — 'ক্রিরিং-ক্রিং — ক্রিরিং-ক্রিং'? নাকি দমকলের ঘণ্টার মতো একটানা 'ঠঙাঠঙ-ঠঙাঠঙ-ঠঙাঠঙ'?

বটুক জবাব দিল না, কী যেন ভাবছে সে।

— কী হল? জবাব দাও। কী ভাবছ?

— আজ্ঞে ঐ-কথাই ভাবছি। রেতের বেলা কি তাহ'লে দোকান ঘরে আমার ঘড়িটাই বাজছিল?

— তুমি কি ওটাতে অ্যালার্ম দম দিয়েছিলে? ঐ দিন রাত একটার?

— আজ্ঞে না।

— তাহলে তোমার ঘড়ি বাজবে কী করে?

বটুক জবাব দিল না।

— এবার তুমি এই ফটোটা দেখ তো। কমলেশের টেবিলে যে অ্যালার্ম-ক্লকটা দেখা যাচ্ছে, এটা কি তোমার পানের দোকানের ঘড়িটার মতো?

সাক্ষী ছবিটা দেখে নিয়ে নিজে থেকেই আত্মজিজ্ঞাসা করল, সে-রাতে কি তাইলে ঘড়িটাই একটানা বেজে চলেছিল? তাই শুনিচি?

বাসু বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, প্রতিবাদীপক্ষ থেকে পুনরায় দাবী করা হচ্ছে, য়োর অনার! কমলেশের ঘর থেকে অপসারিত ঘড়িটি আদালতে উপস্থাপিত করা হক। বর্তমান সাক্ষী প্রসিকিউশন-তরফের। সে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে, এই ঘড়ির শব্দই ঘটনার রাত্রে শুনে থাকবে। এ-ক্ষেত্রে বাদীপক্ষ ঘড়িটি আদালতে নিয়ে আসুন। তাঁদের তরফে সাক্ষীকে সে ঘড়ির অ্যালার্মটা শুনিয়ে দিন। প্রতিবাদী পক্ষ জানতে ইচ্ছুক ঐ অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দ শোনার পর সাক্ষীর স্মৃতি কী বলে।

বিচারক মাইতির দিকে ফিরে বলেন, অপনার নিশ্চয় আর কোন আপত্তি নেই?

মাইতি তড়াক করে উঠে দাঁড়ান : কী বলছেন ধর্মাবতার? প্রচণ্ড আপত্তি আছে। ঘড়িটা আমরা এখনি আদালতে আনতে চাই না। এভাবে বাসু-সাহেব প্যাঁচে ফেলে আমাদের বাধ্য করতে পারেন না...

বিচারক তাঁর কাঠের হাতুড়িটা টেবিলে ঠুকলেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, মিস্টার পি.পি! আপনি বসুন! আপনার ভাষা অনুমোদনযোগ্য নয়। প্রতিবাদী পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বাদীপক্ষের 'সীজ'-করা একটা বিশেষ দ্রব্য আদালতে উপস্থাপিত করা হোক। এ দাবী ইতিপূর্বেই ডিফেন্স-কাউন্সেল দু-দুবার পেশ করেছিলেন এবং আমি তখন তা নাকচ করে দিই। বর্তমানে বাদীপক্ষের সাক্ষী স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে বলছেন যে, হয়তো তিনি ঐ পুলিশের সীজ করা ঘড়ির আওয়াজটাই শুনেছেন! এক্ষেত্রে বর্তমানে আদালত মনে করছেন যে, প্রতিবাদীর দাবী যুক্তিসঙ্গত! সুতরাং এখন আমি জানতে চাইছি : মৃত কমলেশের ঘর থেকে অধিকৃত ঐ অ্যালার্ম-ক্লকটি কোথায় আছে?

মাইতি জবাব দিলেন না। অবাধ্য ছাত্রের মতো গোঁজ হয়ে বসে রইলেন।

ভাদুড়ী পুনরায় বলেন, মিস্টার পি.পি.! আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি! কমলেশের ঘর থেকে 'সীজ' করা ঘড়িটি কোথায়?

এবার মাইতি বললেন, পেশকারবাবুর কাছে জমা আছে।

বিচারকের আদেশে পেশকারবাবু অ্যালার্ম-ক্লকটি এনে জজ-সাহেবের টেবিলের উপর রাখলেন। জজ-সাহেব সেটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। মাইতি সাহেবকে প্রশ্ন করেন, এইটাই সেই আইডেন্টিকাল অ্যালার্ম-ক্লক?

মাইতি বললেন, ওর গায়ে লেবেলেই তো সে কথা লেখা আছে।

বিচারক কী একটা কথা বলতে গিয়েও বললেন না। ঘড়ির গায়ে লেবেল আঁটা কাগজটা পড়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ এটাই সেই ঘড়ি। বাইশে জুন রাত্রে মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

ঘড়িটি বিচারক বাসু-সাহেবের হাতে দিলেন। বাসু বলেন, ধরে নিচ্ছি যে, আপনি আমাকে এটা ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছেন। দম দিতে বা বাজাতে?

বিচারক পাবলিক প্রসিকিউটারের দিকে দৃকপাত করে দেখলেন। কিন্তু মাইতি তখনো স্বাভাবিক হতে পারেননি।

বিচারক বললেন, আদালতের নির্দেশেই বাদীপক্ষ তাঁদের 'সীজ'-করা ঘড়িটি আদালতে উপস্থাপিত করেছেন। আপনি প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে এটি বাজিয়ে প্রসিকিউশনের সাক্ষীকে শোনাতে চাইছেন। আমি আপত্তির কোন কারণ দেখছি না। পি. পি.-র যদি আপত্তির কারণ থাকে তবে তাঁকে তা এখনি জানাতে হবে।

মাইতি তাঁর চেয়ারে প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল বসে রইলেন।

বাসু হাত বাড়িয়ে ঘড়িটি নিলেন। সেটি বটুকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বটুকবাবু, তুমি লক্ষ্য করে দেখ, অ্যালার্ম-কাঁটাটা একটার ঘরে আছে। তাই না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই আছে বটে। ঠিক একটার ঘরে।

— আরও লক্ষ্য করে দেখ বটুকবাবু, 'অ্যালার্ম-দম' শেষ হয়ে গেছে। মানে বর্তমানে অ্যালার্ম-দম দেওয়া নেই।

মাইতি এতক্ষণে বলে ওঠেন, বিস্ময়কর তথ্য! শুধু অ্যালার্ম কেন? ঘড়িটাও তো দম না পেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে পুলিশের গুদামঘরে।

বিচারক বলেন, অবান্তর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাসু-সাহেবকে বলেন, আপনি কি অ্যালার্ম ঘড়িটা বাজিয়ে শোনাতে চান?

— ইয়েস, য়োর অনার। আমি প্রথমে ফুরিয়ে যাওয়া অ্যালার্ম দমটা দেব। তারপর মিনিটের কাঁটাখানা ধীরে-ধীরে ঘোরাতে থাকব, কারণ আমি দেখতে চাই শেষ বার অ্যালার্মটা কটার সময় বেজে শেষ হয়েছিল। অর্থাৎ ঠিক কটার সময় মিনিটের কাঁটাটা পৌঁছলে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করে। আর তখনই আমি সাক্ষীর মতামতটা শুনতে চাই। ঘটনার রাত্রে নিজের ঘর থেকে সে এই ঘড়ির অ্যালার্ম-এর আওয়াজটাই শুনেছিল কি না।

বিচারক বললেন, আপনি তা করতে পারেন। মিস্টার পি.পি., আপনি এখানে এগিয়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়াতে পারেন। বাদীর পক্ষ থেকে সবকিছু তদারক করতে পারেন।

মাইতি দৃঢ়স্বরে বললেন, পি. কে. বাসু-সাহেবের এ-জাতের হাত-সাফাই আমার অনেক দেখা আছে। আদালত যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন তিনি আবার ভানুমতীর খেল দেখান। আমার তা দেখবার উৎসাহ নেই।

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, মিস্টার পি.পি.! আপনি অবহিত আছেন কি না জানি না, আপনার আচার এবং কথাবার্তা কিন্তু আদালত-অবমাননার সীমান্তের কাছাকাছি এসে গেছে। আপনাকে আমি 'অ্যাডমনিশ্' করছি! ফর দ্য লাস্ট টাইম!

হঠাৎ এদিকে ফিরে বাসুকে বলেন, ইয়েস কাউন্সেল, আপনি যে পরীক্ষাটা করতে চান এবার শুরু করুন।

পি. কে. বাসু এগিয়ে এলেন। এখন তিনিই আদালতকক্ষের মধ্যমণি। অহেতুক — সম্ভবত নাটকীয় ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে, অথবা মাইতির ঈর্ষা অগ্নিতে সমিধনিক্ষেপমানসে — বিচারককে একটি ম্যাজিশিয়ানি 'বাও' করলেন। তারপর ঘড়িতে 'অ্যালার্ম দম' দিলেন। ধীরে ধীরে মিনিটের কাঁটাটা ঘোরাতে

শুরু করলেন। কাঁটা যখন বারোটা আটান্ন মিনিটে পৌঁছালো তখনই ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল ঘড়িটা।

যেন অপ্রত্যাশিত একটা সাফল্যলাভ করেছেন! বাসু-সাহেব টেবিল-ঘড়িটা ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের বেঞ্চে-এ রেখে নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলেন। মিনিটখানেক বেজে ঘড়িটা থামল।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। সাক্ষীকে বললেন, বটুকবাবু, এবার বল, তুমি যে একটানা শব্দটা শুনেছিলে তা কি রেল-ইঞ্জিনের হুইসিল? নাকি মটোর গাড়ির শর্ট-সার্কিট হয়ে যাওয়া হর্ন, অথবা দমকলের একটানা ঠনাঠন, কিংবা...

কথাটা তাঁর শেষ হল না। বটুক বলে উঠল : ঐ ঘড়িটা!

— কী ঐ ঘড়িটা?

— ঐ ঘড়ির 'ঠনাঠন'-শব্দটা আমি শুনেচি হুজুর!

— তুমি নিঃসন্দেহ?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, নিয্যস, নিঃসন্দেহ।

— তুমি হলপ নিয়ে এ-কথা বলছ কিন্তু!

— জানি হুজুর। মিছে কথা বললে আপনি আমারে ডোরাকাটা হাফপ্যান্ট পরাবেন, গলায় তক্তি ঝোলাবেন, পানসাজা ছেড়ে আমারে মাটি কোপাতে হবে! সব, স-ব কথা — মনে আছে হুজুর। আমি নিয্যস ঐ ঘড়িটার ঠনাঠন-ঠনাঠন শুনেছিলাম! সেদিন রেতের বেলা!

— তোমার মনে কোনও সন্দেহ নেই?

— তিলমাত্র নয়।

— তাহলে ঐ ঠনাঠনটা তুমি শুনেছিলে রাত ঠিক একটা বেজে তিন-এ?

— আজ্ঞে না। একটা বাজতে দুইয়ে। বারোটা আটান্ন-মিনিটে!

— সে তো ঐ অ্যালার্ম-ঘড়ির টাইমে। কিন্তু শুনলে না, ইন্সপেক্টর মুখার্জি সাহেব এক্সপার্ট ওপিনিয়ান দিয়ে গেলেন ঐ অ্যালার্ম-ঘড়িটা পাঁচ মিনিট স্লো ছিল? তার মানে অ্যালার্মটা বেজেছিল একটা বেজে তিন-এ?

— ও হ্যাঁ। তা বটে। ঘড়িটা পাঁচমিনিট শোলো ছিল।

বাসু-সাহেব বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, দ্যাটস্‌ অল য়োর অনার।

বিচারক নিরঞ্জন মাইতির দিকে ফিরে বলেন : এনি রিডাইরেক্ট?

মাইতি মাথা নেড়ে অস্বীকার করেন।

বাসু বিচারককে বলেন, ইতিপূর্বে ডক্টর নবীন দত্তকে ঐ অ্যালার্ম ক্লক সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করা যায়নি, কারণ তখনো সেটা আদালতে উপস্থিত করা হয়নি। আমি আর একবার বাদীপক্ষের ঐ সাক্ষীকে কাঠগড়ায় তোলার জন্য আর্জি জানাচ্ছি।

বিচারক বললেন, বর্তমান অবস্থায় এটা অনুমোদনযোগ্য।

ডক্টর দত্ত পুনরায় কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন। বাসু জানতে চান, আপনি কি অ্যালার্ম-ঘড়ির শব্দটা শুনেছেন?

— হ্যাঁ, শুনেছি।

— আপনার কি মনে হয় ঘটনার রাত্রে আপনি যে একটানা শব্দটা শুনেছেন তা ঐ ঘড়ির অ্যালার্ম?

— খুব সম্ভবত তাই। 'নিশ্চিত তাই' বলতে পারছি না।

— আপনি পেশায় চিকিৎসক। মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। তাই জানতে চাইছি : কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির নাগালের মধ্যে যদি মাঝ রাতে অ্যালার্ম ক্লক বেজে ওঠে তাহলে সে কি প্রতিবর্তী প্রেরণায় ঘুম ভেঙেই ঘড়িটা বন্ধ করে দেয় না?

মাইতি আপত্তি করেন : আর্গুমেনটেটিভ। কনক্লুশন।

বিচারক আপত্তি নাকচ করেন। সাক্ষী একজন বিশেষজ্ঞ। এ-জাতীয় প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দেবার

শিক্ষা তাঁর আছে। সাইকলজি ওঁর অধীতবিদ্যা।

— ওয়েল, ডক্টর দত্ত। আনসার দ্যাট কোশ্চেন।

— হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। ঘুম ভেঙে উঠেই প্রতিবর্তী-প্রেরণায় সে হাত বাড়িয়ে অ্যালার্মটা বন্ধ করে দেয়। বিশেষ মধ্যরাত্রে।

— বর্তমান ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে, আপনি ও বটুকবাবু ঐ অ্যালার্ম ক্লকের শব্দটাই শুনেছেন, তাহলে কী কারণে কমলেশ সেটা বন্ধ করে দেননি? আপনার কী অনুমান?

— অবজেকশন য়োর অনার! এ প্রশ্নটা শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত নয়, সাক্ষীর অধীত-বিদ্যার অন্তর্গত নয়। বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার অনুমাননির্ভর জবাব উনি দিতে পারেন না। এটা ক্রিমিনোলজির প্রশ্ন, শারীরবিদ্যার নয়।

— অবজেকশন সাসটেইন্ড!

বাসু একগাল হেসে বললেন, এবার তাহলে প্রসিকিউশন ইন্সপেক্টর মুখার্জিকে আর একবার কাঠগড়ায় তুলুন। সহযোগী তো তাঁকে ইতিপূর্বেই ক্রিমিনোলজির এক্সপার্ট হিসাবে দাবী করছেন। আমরা তাঁর কাছেই ঐ প্রশ্নটার জবাব শুনি বরং। একটা বেজে তিন-মিনিটে কমলেশ কেন অ্যালার্মটা বন্ধ করতে পারেনি! কেন ঘড়িটা দম শেষ হওয়া পর্যন্ত একটানা বেজে গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব ঘড়ি দেখে বললেন, রিসেস-এর সময় হয়ে গেছে। নেক্সট সেসনে ইন্সপেক্টর মুখার্জির ক্রস শুরু হবে। আপাতত আদালত মুলতুবি থাকছে ; কোর্ট ইজ অ্যাডজর্নড!

.net

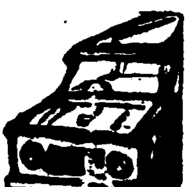

আঠার

রাত্রে ডাইনিং-টেবিলে ওঁরা 'চারজন' খেতে বসেছিলেন। আহার পর্ব শেষ হয়েছে। এখন খোশগল্প চলেছে। রানু আদালতে যান না। যেতে পারেন না। অথচ তাঁর কৌতূহল অনন্ত। বাকি তিনজনের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শোনেন।

কৌশিক বলল, মামু প্রায় জাল গুটিয়ে এনেছেন। বাদীপক্ষের দু'দুজন সাক্ষী স্বীকার করেছে যে, তারা রাত একটা বেজে তিন মিনিটে কমলেশের ঘরে অ্যালার্ম-ক্লকটা বাজতে শুনছে। কমলেশ সেটা হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দেয়নি। তার মানে, তার আগেই সে আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ভূতলশায়ী!

রানু জানতে চান, তাতেই বা কী সুবিধা হল?

— তাতে প্রমাণ হল : রাত একটা বেজে তিন মিনিটের আগে কমলেশের মাথায় আঘাতটা লেগেছিল। অথচ পেট্রোল-পাম্পের ম্যানেজার মাথুরের জবানবন্দী অনুসারে ছন্দা রাত একটা পর্যন্ত ওঁর দোকানে ছিল। মাত্র তিন মিনিটের ভিতর ছন্দার পক্ষে এক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে, গাড়ি পার্ক করে, দ্বিতলে উঠে কমলেশের সঙ্গে ঝগড়া শেষ করে তাকে হত্যা করা অসম্ভব। ফলে হত্যাকারী ছন্দা ছাড়া আর কেউ!

বাসু বললেন, অত তাড়াহুড়া কর না, কৌশিক। এখনো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি যে, ডোরবেল কেউ বাজায়নি। ডাক্তার ব্যানার্জি ধরা পড়লেই তাকে স্বীকার করতে হবে যে, ডোরবেলটা সেই বাজিয়েছিল। ওদিকে ছন্দা এজাহার দিয়ে বসে আছে যে সে নিজে ঐ ঘরে ঢোকেনি। কলিংবেলটা বাজিয়েছিল সে নিজেই...

— তা বটে।

বাসু বলেন, সুজাতা, হোটেল তাজ-বেঙ্গলে একটা ফোন কর তো? মিস্টার ত্রিবিক্রম রাও অব নাসিককে তাঁর ঘরে পাও কি না দেখ। রুম সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফ্‌টিন।

অচিরেই যোগাযোগ হল। রাশভারী গলায় ত্রিবিক্রম ইংরেজিতে জানতে চাইলেন, কে কথা বলছেন?

সুজাতা বললে, প্লীজ হোল্ড অন, স্যার! মিস্টার পি.কে. বাসু, বার অ্যাট-ল, আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

— অল রাইট!

বাসু টেলিফোনটা নিয়ে বললেন, গুড-ইভনিং মিস্টার রাও।

— হ্যাঁ, শুভ-সন্ধ্যা। বলুন? কীভাবে আপনার খিদমৎ করতে পারি?

— আপনি আদালতে ছিলেন লক্ষ্য করেছি। কখন উঠে গেলেন টের পাইনি।

— এটা তো ভূমিকা। মূল বক্তব্য? সেটায় সরাসরি এলে দুজনেরই সময় সংক্ষেপ হয়।

— অল রাইট! শুনুন। আমার মক্কেল আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন পেশ করতে ইচ্ছুক।

— করুক না! এতো ভাল কথা। তবে সে-কথা আমাকে কেন?

— তার স্বামী বর্তমানে কোথায় আছে তা আমরা জানি না, তাই নোটিস্‌টা সার্ভ করা যাচ্ছে না।

— ভা — রি দুখের কথা। আমি এ বিষয়ে আপনাকে বা আপনার মক্কেলকে সাহায্য করতে পারি এ-কথা কেন ধরে নিলেন?

— এই কারণে যে, আমার বিশ্বাস : আপনি আপনার পুত্রের বর্তমান ঠিকানা জানেন, এবং বিবাহ-বিচ্ছেদটা চাইছেন। আমার ধারণাটা ভুল হলে আমি মক্কেলের তরফে কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাইয়ের সব খানদানি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। সেটাও 'লীগ্যালি ভ্যালিড নোটিস্'। পরের ঘরের কেচ্ছা খবরের কাগজে বিস্তারিত ছাপতে আমার প্রচুর খরচ পড়বে — তবে সেটা আমার লোকসান নয়, 'অ্যালিমনি'র ভিতর সে খরচও না হয় ধরে দেওয়া যাবে; কিন্তু আপনার খানদান যেভাবে খানখান হয়ে যাবে তা আর জোড়া লাগবে না, রাও-সাহেব।

— কী পরিমাণ 'অ্যালিমনি' চেয়েছে আপনার মক্কেল?

— সে-কথা তো আপনার কপর্দকহীন পুত্রের সঙ্গে। আপনি তো লীগ্যালি থার্ড-পার্টি। তাই নয়?

— অল রাইট! কাল সকাল দশটায় এই হোটেলে, এই ঘরে যেন আদালতের লোক নোটিসটা সার্ভ করে যায়। আপনার মক্কেলের স্বামী তখন এখানে থাকবে।

— থ্যাঙ্কু অ্যান্ড গুড নাইট!

* * *

হত্যা-মামলার দিন পড়েছে পনের দিন পরে। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার দিন আগামী সপ্তাহেই। ছন্দা জামিন পায়নি। এদিকে ডক্টর ব্যানার্জি এখনো নিরুদ্দেশ। জবা হয় সত্য কথা বলছে, অথবা অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে। সে স্বীকার করেনি — এমনকি জনান্তিকেও, বাসু-সাহেবের কাছে যে, ঐ 'অপারেশন অ্যাবডাক্‌শন'টা বাস্তবে অলীক — ডাক্তার-নার্সের যৌথ পরিকল্পনা।

বিবাহ-বিচ্ছেদের নোটিস্‌টা ত্রিদিবকে সার্ভ করা গেছে। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত ছিল। স্বাক্ষর করে নোটিস্‌টা সে গ্রহণ করেছে। দেখা গেল, বাপ-বেটা দু' জনাই এটা চাইছেন। বাপ তো বটেই — ঐ 'নি-খানদানী' নার্স-মেয়েটি, যে অন্যপূর্বা, যে বাড়ি-থেকে পালিয়ে একজনের সঙ্গে বস্তিতে বাস করেছে, ফলস্ ডেথ-সার্টিফিকেটের জোরে ইনসিওরেন্স-এর টাকা আদায় করেছে এবং সম্ভবত প্রথম স্বামীকে হত্যা করেছে — তাকে তাঁর হাভেলীতে কোন মতেই প্রবেশ করতে দিতে পারেন না। অপরপক্ষে বর্তমান অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদটা মঞ্জুর হয়ে গেলে, ছন্দার ফাঁসিই হোক অথবা যাবজ্জীবন — তাঁর শক্রাবৎ খানদান অক্ষত থাকবে। এজন্য তিনি এক কথায় দশ লক্ষ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত।

দুটো অসুবিধা ছিল। এক নম্বর : ত্রিদিব বেঁকে বসতে পারত। ত্রিবিক্রম ভাগ্যবান। তা হল না। যেকোন কারণেই হোক, ত্রিদিব 'প্রডিগাল সান'-এর চরিত্রটা অভিনয় করতে আগ্রহী। ছন্দার মোহমুক্ত

হয়ে সে বাপের কক্ষপুটে ফিরে যেতে চায়। দ্বিতীয় আপত্তি : বাসু-সাহেব যে-কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদটা চাইছেন — 'নিষ্ঠুরতা'। ওটা মেনে নেওয়া চলে না। সংগ্রামসিংহের আমল থেকে কোন শক্তাবৎ রাজপুরুষ ধর্মপত্নীর প্রতি নিষ্ঠুর হয়নি।

সুতরাং ত্রিবিক্রম বোম্বাই থেকে উড়িয়ে আনলেন একজন ব্যারিস্টারকে — এল. জি. নটরাজন, বার-অ্যাট-ল। ত্রিবিক্রম জানতেন, ওঁরা দুজন — নটরাজন এবং বাসু — একই বছরে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন, চল্লিশ বছর আগে। একই বছরে একই চেম্বার থেকে।

নটরাজনকে উনি বললেন, আপনি বাসু-সাহেবের সঙ্গে দরাদরি করুন। উনি আপনার ক্লাস-ফ্রেন্ড। পারলে, আপনিই পারবেন।

নটরাজন জানতে চান, আপনি ম্যাক্সিমাম কত অ্যালিমনি দেবেন?

ত্রিবিক্রম মাথা নেড়ে বলেন, আপনি আমার প্রস্তাবটা কিছুই বুঝতে পারেননি! টাকার প্রশ্ন আদৌ উঠছে না। দশ লক্ষ পুরোই দেব। প্রয়োজনে ওটা বেড়ে পনের হলেও ক্ষতি নেই ; কিন্তু ঐ কারণটা দেখানো চলবে না : নিষ্ঠুরতা! হেতুটা হোক দুজনের মতের মিল হচ্চে না — জীবনদর্শনে ফারাক!

— এই গ্রাউন্ডে কি বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর হবে?

— হবে। সে দায়িত্ব আমার। তবে পি. কে. বাসু বাগড়া দিলে হবে না।

— আচ্ছা, দেখি আমি কী করতে পারি!

* * *

নটরাজন টেলিফোন করলেন বাসুকে। বাসু উচ্ছ্বসিত। দুই বন্ধুতে অনেক-অনেকদিন পর সাক্ষাৎ হল। প্রায় ত্রিশ বছর। বাসু এককথায় রাজি। ত্রিদিব যদি 'অপোজিশন' না দেয়, তাহলে বিচারককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাবে। সত্যিই তো। দুজনের জীবনদর্শনে আসমান-জমিন ফারাক! মিউচুয়াল ডিভোর্স হলেও হতে পারে।

বাসু নটরাজনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। নটরাজন বললেন, ভালয় ভালয় বিবাহ-বিচ্ছেদটা মিটে গেলে নিশ্চয় ডিনারে আসব। এখন ওটা দৃষ্টিকটু দেখাবে।

বাসু জানতে চান, ছন্দা রাওয়ের মামলায় তোমার কোনও ভূমিকা নেই?

— তুমি ভুল করছ, বাসু। মামলার আসামী আগামী সপ্তাহ থেকে আর ছন্দা 'রাও' থাকবে না। বিশ্বাস কর, ওটা 'বিশ্বাস' হয়ে যাবে!

নটরাজন জানতে চান, শুনেছি তুমি কোন মক্কেলের কেস নাও না যতক্ষণ না তুমি নিজে বিশ্বাস কর যে, সে নির্দোষ। কথাটা সত্যি?

— এ বদনাম বোম্বাইয়েও রটেছে?

— তার মানে অভিযোগটা তুমি মেনে নিচ্ছ। এবং তার মানে তোমার বিশ্বাস : ঐ কমলেশ বিশ্বাসকে ছন্দা হত্যা করেনি।

— হ্যাঁ, তাই!

— কী যুক্তিতে?

— একটি মাত্র যুক্তি। 'কে' হত্যা করেছে, 'কেন' হত্যা করেছে, 'কী করে' হত্যা করেছে তা আমি জানি। প্রমাণ করতে পারছিলাম না।

— 'পারছিলাম না'। মানে অতীতকাল। এখন পার?

— এখন পারি। যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর।

— আমি? আমি কী ভাবে সাহায্য করব?

— পরামর্শ দিয়ে। বাধা না দিয়ে।

— আমার 'প্রফেশনাল এথিক্সে' না আটকালে আমি নিশ্চয় সাহায্য করব। বল, কী করতে হবে?

— পরশু, শুক্রবার, আমি তোমার মক্কেলের একটা 'ডিপজিশন' নিতে চাই। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ

মামলার বিষয়েই। তার ভিতর থেকেই অপরাধী চিহ্নিত হবে। তুমি জান কি জান-না আমার জানা নেই, ত্রিদিব প্রথমে আমার কাছেই এসেছিল, তার স্ত্রীর তরফে আমাকে 'রিটেইন' করতে।

— হ্যাঁ, আমি শুনেছি সে-কথা।

— তখন সে আমাকে কতকগুলো 'ক্লু' দিয়ে যায়। যার সাহায্যে আমি কেসটার সমাধানে পৌঁছেছি, আসল হত্যাকারীকে চিহ্নিত করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করলেও আমি অকাট্য প্রমাণগুলি সংগ্রহ করতে পারিনি। সে সুযোগলাভের আগেই পুলিস ত্রিদিবকে আমার নাগালের বাইরে নিয়ে যায়। আর তার দেখা পাইনি।

— অল রাইট। কোথায় তুমি ডিপজিশনটা নিতে চাও?

— তুমি কোথায় উঠেছ?

— ঐ তাজ বেঙ্গলেই। পাঁচশ-একুশ নম্বর ঘরে।

— তাহলে ঐ ঘরেই হতে পারে। পরশু, শুক্রবার, বেলা দুটোয়। একটি শর্ত — ঘরে আমরা মাত্র চারজন থাকব : তুমি, আমি, ত্রিদিব আর স্টেনোগ্রাফার।

— আল রাইট। কিন্তু ত্রিবিক্রম কেন থাকবেন না?

— ত্রিদিব ওর দাম্পত্যজীবনের জটিলতা সম্বন্ধে এমন কিছু বলেছিল যেকথা ত্রিবিক্রমের না শোনাই মঙ্গল। এটিকেটে বাধে। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বল।

— বলব।

*   *   *

শুক্রবার, রাত আটটা। বাসু-সাহেব তাঁর চেম্বারে বসে কী-যেন করছিলেন। ইন্টারকমটা বেজে উঠল। তুলে নিয়ে বললেন, বল রানু?

— উনি এসে গেছেন।

— ঠিক আছে। তাঁকে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই ঘরের ফ্লাশ-পাল্লাটা খুলে গেল। নিখুঁত থ্রিপিস্ স্যুটধারী ত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও প্রবেশ করলেন ঘরে। সামনে দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, গুড ইভনিং! ব্যারিস্টার সাহেব।

— ওয়েলকাম, স্যার। বসুন ঐ ডিভানটায় ; কিন্তু আপনি একা যে? আমি তো নটরাজনকেও প্রত্যাশা করছিলাম।

— না। তিনি বোম্বাই ফিরে গেছেন, ইভনিং ফ্লাইটে।

— সে কী! বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার ফয়শালা না হতেই?

ত্রিবিক্রম ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। বললেন, মিস্টার নটরাজন তো যাবার আগে বলে গেলেন আপনি আর আপনার মক্কেল রাজি হয়েছেন হেতুটা পরিবর্তন করতে, অর্থাৎ 'নিষ্ঠুরতা'-র পরিবর্তে 'ম্যাল্অ্যাডজাস্টমেন্ট' — বাকিটা তো জাস্ট ফর্মালিটি।

বাসু তাঁর ড্রয়ার খুলে একটা সিগার-এর বাক্স বার করে এগিয়ে দিলেন : চলবে?

— নো, থ্যাংকস্। আই স্টিক টু মাই ওন ব্রান্ড।

বাসু পাইপ ধরালেন। ত্রিবিক্রমও ধরালেন নিজের ব্র্যান্ডের সিগার।

বাসু বলেন, বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আরও একটা জিনিস যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে সে-কথা নটরাজন আপনাকে কিছু বলে যায়নি?

— বলে গেছেন। অ্যালিমনি। তার অ্যামাউন্টটা অবশ্য বলে যাননি। সেটা আমাকে সেট্ল্ করতে পরামর্শ দিয়ে গেছেন। জোকিংলি বললেন — 'ওটা নেহাৎই দরাদরি। আপনি ব্যবসায়ী মানুষ, ওটা নিজেই ম্যানেজ করে নেবেন।' তো বলুন স্যার, আপনার মক্কেল কী পরিমাণ ড্যামেজ চাইছেন?

— 'ড্যামেজ' কেন বলছেন? 'ড্যামেজ' ক্লেম করে এমপ্লয়ী। নিগৃহীত প্রতিবেশী। অন্যায়ভাবে আহত ব্যক্তি। এটা তো শুধু 'ড্যামেজ' নয়। মানি সেট্ল্মেন্ট। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্পত্তির বিভাজন।

— সেক্ষেত্রে আপনার মক্কেলকে তো খালি হাতে ফিরে যেতে হবে মিস্টার বাসু। আপনি তো ভালভাবেই জানেন যে, আপনার মক্কেলের স্বামী কপর্দকশূন্য। আপনার ভাষায় : ওয়াইফকে খাওয়া-পরার যোগান দিতে আপনার মক্কেলের হাজবেন্ড তার বাপের কাছে হাত পাতে। আর আমি লোকটা তো থার্ড পার্টি! কী বলেন?

— কারেক্ট! ভেরি কারেক্ট! ওর স্বামীর যদি নিজস্ব বলতে কিছু না থাকে তাহলে অ্যালিমানির প্রশ্নই ওঠে না। বাই দ্য ওয়ে, নটরাজন কি আপনাকে জানিয়ে গেছে, আজ দুপুরে তার মক্কেল — আই মীন, আমার মক্কেলের স্বামী — কী জাতের ডিপজিশন দিয়েছে?

— না। নটরাজন বললেন, প্রথমত আমি তাঁর মক্কেল নই, থার্ড পার্টি। দ্বিতীয়ত, আমার পুত্র ও পুত্রবধূর মনোমালিন্যের হেতু নির্ধারণে আপনারা দুই ব্যারিস্টার মিলে ত্রিদিবের যে জবানবন্দি নিয়েছেন তার 'ডিটেইল্‌স্‌ জানা আমার পক্ষে অশোভন, এটিকেটে বারণ।

— নটরাজন ঠিক কথাই বলেছে। তার মক্কেলের গোপন কথা সে কাউকে জানাতে পারে না, এমনকি মক্কেলের বাবাকেও নয়। কিন্তু আমি পারি। কারণ ত্রিদিব আমার মক্কেল নয়। ইন ফ্যাক্ট, আমি আপনাকে তা জানাব বলেই এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।

ত্রিবিক্রম সহাস্যে বলেন, সরি স্যার! আপনি জানাতে রাজি হলেই তো চলবে না। আমি জানতে রাজি কিনা সেটাও বিচার্য! ইন ফ্যাক্ট আয়াম নট ইন্টারেস্টেড।

বাসু শ্রাগ করলেন : ইট্‌স্‌ য়োর প্রিভিলেজ! না শুনতে চাইলে আমিই বা কেন জোর করে তা শোনাব? তবে আমার অবস্থাটা হয়েছে সেই 'প্রভার্বিয়াল ভবম-হাজাম'-এর মতো! একজনকে না শোনানো পর্যন্ত আমার ফাঁপা-পেট স্বাভাবিক হবে না। আপনি শুনতে না চাইলে আমাকে কাল একটি প্রেস-কন্‌ফারেন্স ডেকে সব খবরের কাগজকে এই মুখরোচক কিস্‌সাটি শোনাতে হবে!

ত্রিবিক্রমের ভ্রূকুঞ্চন হল।

— 'মুখরোচক কিস্‌সা' মানে?

— বলতেই তো চাই, কিন্তু আপনি যে আবার নন-ইন্টারেস্টেড!

ত্রিবিক্রম পাঁচ-সেকেন্ড কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, লেট্‌স বি সিরিয়াস, ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনি কী কারণে আমাকে জোর করে ওদের দাম্পত্যজীবনের কথা শোনাতে চাইছেন?

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, প্রথম কথা : আপনার পুত্র ও পুত্রবধূর যৌন-জীবনের কথা এর মধ্যে আদৌ নেই। দ্বিতীয় কথা, ওদের দাম্পত্য জীবনের জটিলতার যে আলোচনা হয়েছে তা শ্বশুর হিসাবে আপনার শোনার মধ্যে কোনও অশোভনতা নেই। তৃতীয় কথা, এই 'ডিপজিশন-'এর কথাটা জানাতে না পারলে, আমি আমার মক্কেলের তরফে টাকাটা আদায় করতে পারব না।

— টাকা! কোন টাকা? কিসের টাকা?

— 'ঘুষ' নয়, ন্যায্য পাওনা — তাকে ড্যামেজ, অ্যালিমনি, মানি-সেটলমেন্ট আপনি যে নামে ইচ্ছা অভিহিত করুন।

— আপনি এখনো আশা করেন, আমি আপনাকে অথবা আপনার মক্কেলকে একটা নয়া পয়সাও দেব?

— ইয়েস্‌ স্যার! আমি তো ইতিপূর্বেই আপনাকে বলেছিলাম, এ কেস হারলে সান্ত্বনা থাকবে যে, বিনা পারিশ্রমিকে এক নিষ্ঠুর ধনকুবেরের বিরুদ্ধে তাঁর অসহায়া পুত্রবধূর পক্ষ নিয়ে লড়েছি; আর এ কেস জিতলে আপনি ঐ চেয়ারে বসে আমার দাবীমতো টাকাটা মিটিয়ে দেবেন! আমার ফী, আর আমার মক্কেলের খেশারত!

ত্রিবিক্রম হাসলেন। বললেন, তর্কের খাতিরে ধরা যাক, আমি আপনার মক্কেলকে 'হাফ-আ-মিলিয়ান' দিলাম — কিন্তু সেটা নিয়ে সে কী করবে? ফাঁসি না হলেও ওর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হবেই।

— আপনি তাই আশা করেন?

— করি। কারণ আপনার এবং মিস্টার মাইতির ধারণাটা ভুল। ত্রিদিব এবং আপনার মক্কেলের বিবাহ 'নাল্-অ্যান্ড-ভয়েড' না হওয়া সত্ত্বেও ত্রিদিব আদালতে উঠে সাক্ষী দিতে পারবে!

— এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর সেকশান 122-তে যে প্রভিশন্স আছে তৎসত্ত্বেও?

— ইয়েস স্যার! তা সত্ত্বেও। আইন বলছে, স্বামী বা স্ত্রী তার 'স্পাউস'-এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে **regarding any act made by one party or the other during their valid married life."**

বাসু-সাহেব স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর প্রতিপক্ষের দিকে। তারপর জানতে চাইলেন, এ-কথা কে বলেছে আপনাকে? নটরাজন?

— ইয়েস্ স্যার!

হাসলেন বাসু। বলেন, নটরাজন ইজ এ জুয়েল অব এ সলিসিটার। রেফারেন্সটা আপনাকে দিয়ে যায়নি? 'রাম ভরোসে ভার্সেস স্টেট'?

ভ্রূকুঞ্চন হল ত্রিবিক্রমের। বললেন, সেটা কী?

— ডায়েরিতে লিখে নিন বরং 'রামভরোসে ভার্সেস স্টেট — **A. I. R. 1954, S. C. 704**'। সুপ্রীম কোর্ট-এর ডিভিশন বেঞ্চ বলেছেন **"The Protection under Sec. 122 applies only to communications between the partners and not to facts."** তার মানে : ত্রিদিব আদালতে বলতে পারবে না এমন কোন গোপন কথা, যা বিশ্বাস করে ছন্দা তার স্বামীকে বলেছিল, যদি আদৌ কিছু বলে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো সব কিছুই **'facts'** — ত্রিদিবের হট-চকলেটে স্লিপিং ট্যাবলেট মেশানো, রাত্রে 'গৃহত্যাগ' করা, ইত্যাদি, প্রভৃতি। সব কিছুই ত্রিদিবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে। শোনা কথা নয়। তাই নয়?

ত্রিবিক্রম কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

বাসুই পুনরায় বলেন, শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত হল রাও-সাহেব? আপনার পুত্রের 'ডিপজিশন'টা আপনাকে শোনাব, না প্রেস-কনফারেন্স ডেকে?

ত্রিবিক্রম মনস্থির করলেন, অল রাইট। আমাকেই শোনান।

ইন্টারকমের মাউথপীসটা তুলে নিয়ে বাসু বললেন, রানু, তুমি ঐ ডিপজিশনের টাইপ করা কাগজগুলো নিয়ে কাইন্ডলি এ-ঘরে আসবে?

একটু পরেই ইনভ্যালিড-চেয়ারে পাক মেরে রানু এঘরে এলেন। বাসু তাঁকে বললেন, আজ আফটারনুনে মিস্টার ত্রিদিবনারায়ণ রাও যে ডিপজিশন দিয়েছেন তা ওঁকে পড়ে শোনাও। প্রশ্ন এবং উত্তর।

রানু চশমাজোড়া নাকে চড়ালেন। টাইপ করা কাগজগুলো তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেন —

প্রশ্ন : আপনার নাম শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও?

উত্তর : ইয়েস, স্যার।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী ছন্দা রাও?

উত্তর : ইয়েস!

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে, আপনার স্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন, যার শুনানী হবে আগামী সোমবার?

উত্তর : হ্যাঁ, শুনেছি সে-কথা।

প্রশ্ন : এবং জানেন যে, আপনার স্ত্রীর অভিযোগের মূল বক্তব্য হচ্ছে স্বামী হিসাবে আপনার নিষ্ঠুরতা?

উত্তর : নিষ্ঠুরতা! কই সে-কথা তো কেউ বলেনি?

প্রশ্ন : 'বলার' কী আছে? 'ডিভোর্স পিটিশনটা' তো আপনিই সই করে নিয়েছিলেন। পড়ে দেখেননি?

উত্তর : না, ড্যাডি বললেন, ও তোমাকে দেখতে হবে না। বলে, তিনি কাগজখানা কেড়ে নিলেন। নিষ্ঠুরতা? ছন্দা বলেছে : আমি নিষ্ঠুর?

রানু দেবী টাইপ করা পাতা-ওল্টাবার অবকাশে তাকিয়ে দেখলেন বাণিজ্য-চুম্বকটির দিকে। তিনি প্রস্তরমূর্তির মতো নির্বাক-নিস্পন্দ বসে আছেন ডিভান-এ। যেন একটা ঐতিহাসিক নাটকের ডায়ালগ শুনছেন। রানু আবার শুরু করেন —

প্রশ্ন : হ্যাঁ, আপনার বিরুদ্ধে আপনার স্ত্রীর অভিযোগ : নিষ্ঠুরতার। আপনি পড়ে দেখেননি, তাই জানেন না — আপনার নিষ্ঠুরতার অনেকগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন, 'কমলেশ হত্যা'-কেস-এ আপনি পুলিসের কাছে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছেন...

উত্তর : কিন্তু মিথ্যা অভিযোগ তো আমি করিনি। সত্যি কথাই বলেছি।

প্রশ্ন : এ কথা জেনেও যে, সেজন্য আপনার স্ত্রীর ফাঁসি হয়ে যেতে পারে?

উত্তর : তার আমরা কী করতে পারি? সে তার কৃতকর্মের ফলভোগ করবে। কোন শক্তাবৎ রাজপুত স্ত্রীকে বাঁচাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস তাই বলে।

প্রশ্ন : তার মানে, আপনি এখনো ঐ মত পোষণ করেন? ঐ হত্যা মামলার আসামী ছন্দা রাও দোষী?

উত্তর : নিশ্চয় করি।

প্রশ্ন : কোন্ যুক্তিতে? কেন আপনার মতে ছন্দা রাও হত্যাকারী?

উত্তর : অসংখ্য যুক্তিতে। ও আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে সে মধ্যরাত্রে তার প্রথম স্বামীর কাছে যায়। তাকে হত্যা করে! না-হলে সে আমার স্ত্রী থাকতে পারে না। আমার ড্যাডির কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে না। তাই সে কমলেশকে খুন করে নিঃশব্দে পালিয়ে আসে। জামা-কাপড় পাল্টে গুটিগুটি আমার পাশে খাটে উঠে শুয়ে পড়ে। এসব মিথ্যা কথা?

প্রশ্ন : মিস্টার রাও, আমি প্রশ্ন করব। আপনি শুধু জবাব দেবেন। 'ডিপজিশন'-এ সেটাই কানুন।

উত্তর : আর কী জানতে চান?

প্রশ্ন : আপনি পরদিন সকালে যখন আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'তুমি কি আমার বাড়ি চিনতে?' জবাবে আপনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, চিনতাম।' তখন আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'কী ভাবে?' তার জবাবে আপনি কী বলেছিলেন তা আপনার মনে আছে?

উত্তর : না নেই। কী বলেছিলাম? তাছাড়া আপনি এখন আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলছেন কেন? আগে তো 'তুমি'ই বলতেন?

প্রশ্ন : বেশ, আবার না হয় 'তুমি'ই বলছি। আমার ঐ প্রশ্নের জবাবে তুমি বলেছিলে "সরি, স্যার! ঠিক বলতে পারব না। স্বীকারই করি — আমি ডক্টর ব্যানার্জির নার্সিং-হোমে ভর্তি হয়েছিলাম মানসিক রোগী হিসাবে। সব সময় সব কথা আমি মনে করতে পারি না।"

উত্তর : হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ কথাই আমি বলেছিলাম বটে।

প্রশ্ন : এখন কি মনে পড়েছে? কীভাবে ঘটনার পরদিন সাত সকালে ঠিকানা জানা না-থাকা সত্ত্বেও তুমি আমার বাড়িতে গাড়ি ড্রাইভ করে চলে আসতে পেরেছিলে?

উত্তর : না, মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : আমি তোমাকে একটু সাহায্য করি, কেমন? দেখ, মনে পড়ে কিনা। তার আগে দু-একটা কথা বলি। প্রথম কথা : তোমার ড্যাডি চাইছেন যে, এই বিবাহবিচ্ছেদটা যত শীঘ্র সম্ভব অনুমোদিত হয়ে যাক। তুমিও তাই চাইছ, শুনেছি। কিন্তু তোমার স্বনামধন্য পিতৃদেব ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন যে,

বিবাহবিচ্ছেদের হেতুটা যেন 'নিষ্ঠুরতা' না হয়। হেতুটা যেন 'সমঝোতার অভাব' বলে খাতাপত্রে লেখা থাকে। তাহলে তোমাদের শক্তাবৎ খানদান অক্ষত থাকবে। সেজন্যই এই 'ডিপজিশন' নেওয়া হচ্ছে। তোমার স্বার্থ দেখবার জন্য তোমার ড্যাডি এই ব্যারিস্টার নটরাজনকে নিয়োগ করছেন। তুমি যদি এখন আমার কাছে সব সত্যি কথা স্বীকার কর — তোমার নিজের ক্ষতি না করে — তাহলে আমি চেষ্টা করব যাতে হেতুটা 'নিষ্ঠুরতা'র পরিবর্তে 'দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য' হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আমি কী বলছি তুমি বুঝতে পারছ?

উত্তর : না-বোঝার কী আছে? বুঝছি।

প্রশ্ন : এবার বলি : তুমি সেই সাত-সকালে আমার বাড়ি চিনে আসতে পেরেছিলে এই কারণে যে, তার পূর্বদিন শুক্রবার তোমার স্ত্রী যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন তুমি তাকে অনুসরণ করে এসেছিলে। তুমি নিজের গাড়িতে আসনি — যাতে ছন্দা গাড়ির নম্বর দেখে চিনতে না পারে, বুঝে ফেলতে পারে। তাই এসেছিলে একটা ভাড়া করা জীপ চেপে। তোমার চোখে ছিল সানগ্লাস, মুখে ফল্‌স্ দাড়ি, ঝোলায় একটা বাইনোকুলার...তাই নয়?

উত্তর : আপনি কেমন করে জানলেন?

প্রশ্ন : আমি জানি। জানি যে, তোমার মূল উদ্দেশ্য ছিল তদন্ত করে দেখা : তোমার স্ত্রী দ্বিচারিণী কিনা। কারণ হাজার-বছর ধরে কোনও শক্তাবৎ রাঠোর রাজপুত্র কখনো কোনও দ্বিচারিণীকে সহ্য করেনি। স্বহস্তে সেই অসতীর শিরশ্ছেদ করেছে। তাই নয়?

উত্তর : হ্যাঁ, তাই। আপনি ঠিকই বলছেন!

বাসু : এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে তুমি তোমার সদ্য-পরিণীতা ধর্মপত্নীর হাত-বটুয়া হাৎড়ে..

ত্রিদিব : কোন্ উদ্দেশ্যের কথা বলছেন, স্যার?

বাসু : তোমার তো একটাই উদ্দেশ্য ছিল, ত্রিদিব। সাচ্চা রাঠোর রাজপুতের যা লক্ষ্য : স্ত্রী দ্বিচারিণী কি না সমঝে নেওয়া!...সেই উদ্দেশ্যেই তুমি তোমার সহধর্মিণীর হাতব্যাগ হাৎড়ে কমলেশ বিশ্বাসের টেলিগ্রামখানা দেখতে পেয়েছিলে। আন্দাজ করেছিলে : সে হচ্ছে ছন্দার প্রথমপক্ষের স্বামী।

ত্রিদিব : কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়নি। ওরা এখনো স্বামী-স্ত্রী। বিশ্বাস করুন, স্যার!

বাসু : তা তুমি কেমন করে আন্দাজ করবে, ত্রিদিব? এক স্বামী জীবিত থাকতে কেউ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে?

ত্রিদিব : আপনিই বলুন, স্যার!

বাসু : আর সেই জন্যেই যখন সেই শনিবার রাত বারোটা পঁয়ত্রিশে ছন্দা তার মারুতি-সুজুকি গাড়িটা নিয়ে রওনা হয়, তখন তুমি তাকে অনুসরণ করেছিলে। তোমার অ্যাম্বাসাডারে...তাই নয়?

ত্রিদিব : আজ্ঞে না, আমি তো তখন ডক্টর ব্যানার্জির বাড়িতে ফোন করেছিলাম।

বাসু : আমার মনে আছে। গদাধর টেলিফোনে জানালো যে, ডাক্তারবাবুও গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। তাতেই তো তোমার সন্দেহ হল যে, ওরা দুজনে যুক্তি করে কমলেশকে হত্যা করতে গেছে।

ত্রিদিব : না হলে ছন্দার ব্যাগে রিভলভার আসবে কোত্থেকে? আপনিই বলুন।

বাসু : কারেক্ট। তুমি অবশ্য জানতে না যে, রিভলভারটা ডক্টর ব্যানার্জির!

ত্রিদিব : না স্যার, জানতাম। আগের দিনই টেলিফোনে ওদের কথাবার্তা আমি আড়ি পেতে শুনেছিলাম। তাতেই তো আমি জানতাম : খুনটা ডক্টর ব্যানার্জিই করেছে — সেই হচ্ছে ছন্দার আসল লাভার — কমলেশ বিশ্বাস নয়! আমি সেদিনই আপনাকে বলিনি যে, খুনটা করেছে ঐ ব্যানার্জিই — আর সে পরস্ত্রীর পেটিকোটের আড়ালে মুখ লুকাতে চাইছে? আমি জানতাম, ছন্দা খুনটা করেনি, করতে পারে না — চাবিটা ঐ ঘরের মেজেতে ফেলে এসে সে মিথ্যা খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়েছে...

বাসু : আই রিমেম্বার! এ-কথা তুমি সে-দিনই বলেছিলে! আর সে জন্যই গদাধর যখন বলল যে,

ডক্টর ব্যানার্জি বাড়িতে নেই ঠিক তখনই তুমি স্থির করলে : স্ত্রীকে ফলো করা দরকার!

ত্রিদিব : না স্যার, ঠিক তখনই নয়। তার অনেক আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, ছন্দা যদি আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাত্রে কোথাও অভিসারে যেতে চায়, তাহলে তাকে ফলো করব।

বাসু : আমি তো তা জানিই।

ত্রিদিব : আপনিও তাই আন্দাজ করেছিলেন? কেমন করে?

বাসু : না হলে ছন্দার মারুতি-সুজুকি গাড়ির পিছন দিকের ডান চাকায় অমন চোরা-লীক হবে কেমন করে? আমি জানতাম — ওটা তুমিই করেছিলে। যাতে ছন্দা তড়িঘড়ি রওনা হলেও তোমার ফলো করতে অসুবিধা না হয়।

ত্রিদিব : এটা কী করে বলছেন, স্যার? টায়ার-পাঞ্চার তো অ্যাক্সিডেন্টালিও হতে পারে?

বাসু : পারে। যে-চাকা পথের ঘর্ষণে নিত্য ক্ষয়িত হচ্ছে তা পাঞ্চার হতেই পারে। কিন্তু যে-চাকা জমি থেকে দুই-ফুট উঁচুতে ডিক-এর বর্মে নিরাপদে সুরক্ষিত, তাতে অ্যাক্সিডেন্টালি একটা পেরেক ফুটতে পারে না! পারে?

ত্রিদিব : মানে?

বাসু : আরে বাপু, 'মানে'টা তুমিও জানো, আমিও জানি। ঐ স্পেয়ার টায়ারে একটা পেরেক ঢুকিয়ে চোরা 'লীক' তৈরী করতে পার একমাত্র তুমিই। কারণ ছন্দা ছাড়া ঐ গাড়ির চাবি শুধুমাত্র তোমার কাছেই ছিল। ছন্দা তো আর নিজের গাড়ির স্পেয়ার-টায়ারে পেরেক পুঁতে রাখবে না! ফলে ওটা তোমার কীর্তি! তুমি এমন ব্যবস্থা করেছিলে যে, ছন্দা মাঝরাতে হঠাৎ কোথাও অভিসারে গেলে অন্তত পক্ষে দশ-পনের মিনিট সময় তোমাকে দিতে বাধ্য হবে। দু-দুবার 'লীক' সারাতে। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। তোমার মূল উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সাচ্চা রাঠোর শক্তাবৎ রাজপুতের মতো। শুধু সমঝে নেওয়া : স্ত্রী দ্বিচারিণী কি না!

ত্রিদিব : আপনিই বলুন, স্যার। আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমার?

বাসু : কারেক্ট! স্রেফ রাজপুত শিভাল্‌রি!...তুমি যে টেলিফোন করার পর নিজের অ্যাম্‌বাসাডার বার করে ওকে 'ফলো' করেছিলে এটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি।

ত্রিদিব : কী করে বুঝলেন?

বাসু : যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত : দেখ! ছন্দা বলেছে — গাড়িটা বার করে তারাতলামুখো যাবার আগে সে গ্যারেজের স্লাইডিং ডোরটা টেনে তালাবন্ধ করে দিয়ে গেছিল। তুমিও বলেছিলে জানলা দিয়ে দেখতে পাও ডবল্‌-পাল্লা স্লাইডিং ডোরটা সে টেনে বন্ধ করে। নবতাল তালা লাগায়। তুমি বলেছিলে, ফিরে এসে ছন্দা তোমাদের ট্রিপলিকেট চাবি দিয়ে নবতাল-তালাটা খোলে, স্লাইডিং-ডোরটা সরায়। তাই নয়?

ত্রিদিব : হ্যাঁ, তাই। কারণ, ওর নিজের চাবির সেট তো তখন তারাতলায় পড়ে আছে।

বাসু : তাই যদি হয়, অহলে শুতে যাবার আগে, গ্যারেজের পাল্লা সে টেনে বন্ধ করেনি কেন?

ত্রিদিব : আপনিই বলুন?

বাসু : একমাত্র যুক্তি : ইতিমধ্যে অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা কেউ বার করেছিল এবং ছন্দা ফিরে আসার আগে দ্বিতীয়বার ঢুকিয়েছিল। তবে তাড়াহুড়ায় অ্যাম্বাসাডার-গাড়িটা যথেষ্ট ভিতরে ঢুকিয়ে 'পার্ক' করেনি। সে জন্যই ঐ গাড়ির বাম্পারে স্লাইডিং-ডোরটা আটকে যাচ্ছিল। ছন্দা তাই স্লাইডিং ডোরটা বন্ধ করতে পারেনি। নবতাল-তালা লাগানোর প্রশ্নই ওঠেনি।

ত্রিদিব : কে?...কে? অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা বার করবে? ঢোকাবে?

বাসু : একমাত্র তুমিই তা পারতে। তুমিই তা করেছিলে। যেহেতু সাচ্চা শক্তাবতের মতো তুমি জানতে চেয়েছিলে তোমার স্ত্রী দ্বিচারিণী কিনা। কী? ঠিক বলছি তো?

ত্রিদিব : হ্যাঁ, ঠিকই বলছেন! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ছন্দা ঐ গ্যলভানাইজড পাইপটা ঘুরিয়ে কমলেশের মাথায় মারল। বিশ্বাস করতে পারেন? আমি সে-কথা পুলিশকে বলিনি। কাউকে বলিনি। কিন্তু নিজের চোখে আমি তা দেখেছি।

বাসু : আমি তো তা জানিই!

ত্রিদিব : তাও জানেন আপনি! অসম্ভব! কী জানেন?

বাসু : বলছি। শোন! মিলিয়ে নাও! ছন্দা রওনা হবার পর তুমি ডাক্তার ব্যানার্জিকে একটা ফোন কর। কারণ তুমি জানতে তোমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ছন্দাকে দু-দুবার চাকা বদলাতে হবে। দু-দুবার টিউবে হাওয়া ভরাতে হবে। ডাক্তার ব্যানার্জিও তাঁর বাড়িতে নেই শুনে তুমি ধরে নিয়েছিলে ওরা দুজনে মিলে তারাতলায় গেছে। তাই তুমি সোজা তারাতলার মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাও। ছন্দা চাকায় হাওয়া ভরে সেখানে পৌঁছানোর অনেক আগেই তুমি পৌঁছাও। পুলিসটা পরে যে-ভাবে ঢুকেছিল সেই ভাবে ভারা বেয়ে মেজানাইন-উচ্চতায় উঠে জানলার ফোকর বেয়ে ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে বসে থাক। একটু পরে কমলেশের টেলিফোনটা বাজে। কমলেশ জেগেই ছিল। টেলিফোনে কথা বলে...

ত্রিদিব : কী-কথা বলুন তো?

বাসু : ফোন করেছিল ওর এক পাওনাদার। ও তাকে জানায় ছন্দা রাও ওকে পরদিনই দু-হাজার টাকা দেবে। তা থেকে কমলেশ তার ধার কিছুটা শোধ করবে।

ত্রিদিব : আজ্ঞে না! ভুল হল আপনার : ধার নয়। ওর আর এক প্রাক্তন শ্যালক ফোন করেছিল। কমলেশ যে-টাকা চুরি করেছে তাই উশুল করতে চাইছিল। বুঝলেন?

বাসু : তাহলে তাই হবে। মোটকথা একটু পরে ছন্দা এসে কলবেল বাজায়। কমলেশ নিচে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ওরা দুজনে উপরে উঠে আসে। দু'জনে কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া করছিল। তুমি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলে। কমলেশ বিশ্বাস দু-হাজার টাকা চাইছিল, আর ছন্দা বলছিল অত টাকা ওর কাছে নেই! কমলেশ তা বিশ্বাস করে না, সে-একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে ওর হাত চেপে ধরে।

ত্রিদিব : কারেক্ট! তখন আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আপনি তো জানেনই, আমার ধমনীতে শক্তাবৎ রাঠোর রাজপুতের রক্ত।

বাসু : তাহলে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ে কমলেশের চোয়ালে একটা ঘুসি মারলে না কেন? 'ঢিসম্' করে! অমিতাভবচ্চনের মতো?

ত্রিদিব : মারতামই তো! কিন্তু ওদের দু-জনের হেপাজতেই আছে রিভলভার — আমি নিরস্ত্র! আমি দেখলাম, ওরা দুজনে মারামারি করছে! ছন্দা এক ধাক্কা মেরে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিল। সেই ধাক্কাতে একটা কাচের গ্লাস ঝন্‌ঝনিয়ে ভেঙে পড়ল। এই সময় কমলেশ কী করল জানেন?

বাসু : জানি। দু-হাত বাড়িয়ে ছন্দার গলা টিপে ধরতে গেল!

ত্রিদিব : কারেক্ট! তখনই ছন্দা একটা জলের পাইপ তুলে নিয়ে এলোপাথাড়ি ঘোরাতে থাকে। পাইপটা দ্রাম করে গিয়ে লাগে কমলেশের মাথায়। ও পড়ে যায়। ঠিক তখনি আমি হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ্ করে দিই।

বাসু : আই নো! কিন্তু কমলেশের আঘাতটা মারাত্মক ছিল না। পাঁচ সেকেন্ড বাদেই সে উঠে বসতে চাইল!

ত্রিদিব : একজ্যাক্টলি! রাস্তার আলো পড়েছিল ঐখানে। আমি স্পষ্ট দেখলাম — ও হিপ-পকেটে হাত চালিয়ে দিয়েছে। তার মানেটা বুঝেছেন, স্যার?

বাসু : জলের মতো পরিষ্কার! ওর হিপ্-পকেটে ছিল রিভলভারটা! তাই তো? তাহলে তুমি যা করেছিলে তা সমর্থনযোগ্য। ওটা তো আত্মরক্ষার্থে! না হলে কমলেশই গুলি করে মারত। তাই না?

ত্রিদিব : বলুন স্যার! আমার অন্যায়টা কী হল? আমি ছন্দার ফেলে যাওয়া জলের পাইপটা নিয়ে ঐ শয়তানটার মাথার পিছন দিকে অ্যাইসা এক বাড়ি ঝাড়লাম যে, ওর ভবলীলা খতম!

বাসু : বুঝলাম। তারপর তুমি ছন্দাকে নাম ধরে ডাকলে না কেন?

ত্রিদিব : আমার ধারণা ছিল ছন্দার জন্য ডক্টর ব্যানার্জি নিচে অপেক্ষা করছে। সেটা সত্যি কি না তাই দেখতে চাইলাম। নিচে হঠাৎ 'কলবেল' বেজে ওঠায় আমার সন্দেহ বেড়ে যায়। তারপর আমার হঠাৎ আতঙ্ক হয় — যে লোকটা 'কলবেল' বাজাচ্ছে সে যদি পুলিশ হয়! তাই আমি তৎক্ষণাৎ ভারা বেয়ে নিচে এলাম। দেখলাম, একটা লোক আমার আগে আগে ভারা বেয়ে নিচে নামছে। সে দৌড়ে গিয়ে একটা মটোর-সাইকেলে উঠে পালিয়ে যায়।

বাসু : তুমিও গাড়িতে উঠে বাড়ি ফিরে এসেছিলে, কেমন? কিন্তু তোমার হাতে সময় ছিল কম। তাই তাড়াহুড়া করে গাড়িটা পার্ক করে স্লাইডিং-ডোর টেনে দেবার সময় পাওনি। তালা লাগাবার প্রশ্নই ওঠেনি।

ত্রিদিব : কারণ আমি জানতাম দু-তিন মিনিটের মধ্যেই ছন্দা এসে পৌঁছাবে। তাড়াহুড়ায় অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা আমি ঠিক মতো পার্ক করতে পারিনি। তাই ছন্দা স্লাইডিং-ডোরটা বন্ধ করতে পারেনি।

বাসু : তুমি সব কথাই বলেছ ত্রিদিব, কিন্তু একটা কথা এখনো বলনি!

ত্রিদিব : কী কথা?

বাসু : পরদিন সকালে, যখন ছন্দা অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর তুমি আমার কাছে আসবে বলে মনস্থির করলে তখন তুমি পকেট হাৎড়ে দেখতে পেলে — তোমার চাবির থোকাটা নেই! আগের দিন রাত্রে কমলেশের ফ্ল্যাটে যখন পকেট থেকে দেশলাই বার করছিলে তখন অসাবধানে তোমার চাবির থোকাটা পড়ে গেছে! যেহেতু তারাতলায় পৌঁছে কমলেশের ফ্ল্যাটে যাওয়ার আগে তুমি গাড়ি 'লক' করে যাওনি আর ইগ্‌নিশন-কী ড্যাশ বোর্ডে লাগানো ছিল, যেহেতু ছন্দাকে অনুসরণ করার সময় তুমি নবতাল-তালাটা লাগিয়ে যাওনি তাই বাড়ি ফিরে তোমার কোনও অসুবিধা হয়নি। তাই না? তার মানে তুমিই ড্রয়ার থেকে ট্রিপ্‌লিকেট চাবিটা সংগ্রহ করেছিলে। পরদিন সকালে। আর ছন্দার ব্যাগ খুলে তার চাবিটাও নিজের পকেটে ভরে নাও। অর্থাৎ খবরের কাগজে যে ফটো বার হয়েছে তা তোমার চাবির সেট — ছন্দার নয়। কী? ঠিক বলছি?

ত্রিদিব : আশ্চর্য! আপনি কেমন করে টের পেলেন?

* * *

বাসু-সাহেব হাতটা তুলে রানুকে থামতে বললেন, দ্যাট্‌স্ অল! আর পড়ার দরকার নেই। তুমি বিশ্রাম নাও গে যাও।

রানু কাগজগুলো নিয়ে তাঁর ইনভ্যালিড-চেয়ারের চাকায় পাক মেরে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলেন। তবে নিতান্ত মেয়েলী কৌতূহলে রাঠোর রাজপুতটির দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করতে ভুল হল না।

ফোলানো বেলুনটিতে কে যেন নির্মমভাবে সূচ ফুটিয়েছে! উনি স্রেফ চুপসে গেছেন!

রানু চলে যাবার পর স্বয়ংক্রিয়-পাল্লাটা বন্ধ হতেই ত্রিবিক্রমনারায়ণ ঝুঁকে পড়ে বললেন, আপনি কি এই ডিপজিশনের কপি পুলিশকে দেবেন?

জবাবে বাসু বললেন, ফর য়োর ইনরমেশন মিস্টার রাও, আপনার পুত্রবধূর জামিনের অর্ডার বেরিয়ে গেছে। প্রসিকিউশনের নিজেদের সাক্ষীরাই তাকে 'অ্যালেবাই' দিয়েছে। সম্ভবত পুলিস এ-কেস চালাবে না। হত্যামুহূর্তে আসামী অকুস্থলে ছিল না, এটা প্রমাণিত হয়েছে!

ত্রিবিক্রম পুনরায় বলেন, তা নয়, আমি জিজ্ঞেস করছি, এই 'ডিপজিশনে'র কপি কি আপনি পুলিশ-কমিশ্নারকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন?

বাসু বলেন, আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ দু-জনেই 'মিউচুয়ালি এগ্রি' করেছে। বিবাহবিচ্ছেদটা হয়ে যাবে। অবশ্য অ্যালিমনির খেশারতটা আপনি দিতে রাজি হলে।

ত্রিবিক্রম স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন : দ্যাটস্ নট দ্য পয়েন্ট, কাউন্সেলার! আমি জানতে চাইছি, এই ডিপজিশনের কপি কি পুলিশে পাঠানো হবে?

— কে পাঠাবে? আমরা ছয়জন জানি, কমলেশকে কে হত্যা করেছে। ত্রিদিব নিজে জানে, কিন্তু সে পাঠাবে না। কারণ সে হত্যাকারী। নটরাজন আর স্টেনোগ্রাফার 'প্রফেশনাল এথিক্সে' পুলিসে জানাতে পারে না। বাকি রইলাম আমরা তিনজন : আপনি, আমি আর আমার সেক্রেটারি! কে পাঠাবে?

ত্রিবিক্রম দাঁতে-দাঁত দিয়ে বললেন, আপনি?

— না। আমি পাঠাব না। কেন জানেন? আমি চাই না যে, টাকার জোরে আপনি আইনকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হন। এ জন্য শাস্তি যা দেবার তা আমি নিজেই দেব।

— আপনি নিজেই শাস্তি দেবেন? ত্রিদিবকে?

— নিজেই দেব। ত্রিদিবকে নয়। তার বাবাকে। প্রকৃত অপরাধীকে। কমলেশ যখন পকেট থেকে রিভলভার বার করেছে, তখন তার মাথায় বাড়ি মারাকে খুন তো বলাই চলে না। সেটা আত্মরক্ষা করা। সাচ্চা মরদ হলে সে পুলিসে গিয়ে অকপটে আদ্যন্ত সত্য কথা বলত। নিঃসন্দেহে সে নির্দোষী হিসাবে মুক্তি পেত। কিন্তু ত্রিদিব সে-পথে যায়নি। তার পরিবর্তে সে তার স্ত্রীর — যে স্ত্রী দ্বিচারিণী নয়, যে দু হাজার টাকা ব্ল্যাকমেলারকে দিতে রাজি হল না — তাকে ফাঁসিয়ে দিল। ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে চাইল! তার ভ্যানিটিব্যাগ থেকে চাবির গোছা চুরি করে পুলিসের কাছে মিথ্যা এজাহার দিয়ে এল। এই হিমালয়ান্তিক অপরাধের জন্য দায়ী কে? একমাত্র ত্রিদিবের বাবা! যে ওকে মেরুদণ্ডহীন ক্রিমিকীটের মতো না-মানুষ করে গড়ে তুলেছে। অপরাধীকে তাই কঠিন শাস্তি দেব আমি।

— কী শাস্তি?

— অর্থদণ্ডই! তবে আইন-সম্মতভাবে। ঘুষ নয়!

ত্রিবিক্রম পকেট থেকে চেক বই বার করে, কলমের খাপটা খুলে বলেন, বলুন?

— দুটো চেক লিখবেন। একটা আমাকে। অ্যাকাউন্ট-পেয়ী। আপনার পুত্রবধূর পক্ষে মামলা-লড়ার জন্য 'ফীজ' : পঞ্চাশ হাজার, ইনক্লুডিং কস্ট। দ্বিতীয়টা আপনার বধূমাতাকে — হোয়াইট মানি — অ্যালিমানি-কাম-প্রপার্টি সেট্‌ল্‌মেন্ট : সাতাত্তর লক্ষ টাকা।

ত্রিবিক্রম একটু চমকিত হয়ে বললেন, বেগ্ য়োর পার্ডন? লক্ষ? 'হাজার' নয়?

— না 'মিলিয়ান' নয়, লক্ষই। আপনিই না সেদিন বললেন, আপনার হাত দিয়ে দিনে লাখ-লাখ নয়, কোটি-কোটি টাকা হাত ফিরি হয়?

ত্রিবিক্রম জবাব দিলেন না। দু-খানি চেক লিখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আগে বলিনি, তাহলে আমাকে ভুল বুঝতেন। এখন বলছি, আই প্লীড : গিল্‌টি! ছেলেটাকে আমি ঠিক মতো মানুষ করতে পারিনি।

বাসুও উঠে দাঁড়ালেন। করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, শুভ-প্রচেষ্টা যে-কোন বয়সেই শুরু করা যেতে পারে। উইশ্ য়ু বেস্ট অব লাক্। ছেলেকে এবার মানুষ করে তুলুন!

ত্রিবিক্রম ওঁর প্রসারিত হাতটা ধরেই ছেড়ে দিলেন। বললেন, থ্যাংস্ কাউন্সেলার, ফর দিস্ কাউন্সেল!

উনিশ

পরদিন সকাল।

ওঁরা চারজনে ব্রেকফাস্টে বসেছেন। আজ প্রাতরাশে কিছু রকমফের হয়েছে — কড়াইশুটির কচুরি। বোধকরি বাসু-সাহেবের সাফল্যের কারণে। সুজাতা কচুরিগুলো বেলে দিয়ে এসেছে। বিশু একটার পর একটা কড়াইয়ে ছাড়ছে, আর গরম-গরম পাতে

নামিয়ে দিচ্ছে। রানু হিসাব রাখছেন জনান্তিকে — ব্যারিস্টার সাহেবের পাতে ক-খানা নামল। তাঁর কোলেস্টর‍ল্ বুঝি বিপদসীমা ছুঁই-ছুঁই। তাই বেশি ভাজা খাওয়া মানা, অর্থাৎ ভাজা বেশি খাওয়া মানা।

কৌশিক বলল, একটা জিনিস কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি, মামু। ত্রিদিবের আগে-আগে যে ছায়ামূর্তি ভারা বেয়ে নেমে গিয়েছিল সে কে?

বাসু, পাতের স্ফীতোদর খাদ্যবস্তুটার উদরে ফর্ক সহযোগে একটা ছিদ্র করে, ফুঁ দেওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, শিবানী সোমের কমিশন এজেন্ট।

— রানু একটু বিস্মিত হয়ে পড়েন : শিবানী সোম? সে কে?

— তোমরা এখনো চেন না। আমি চিনি।

— তাহলে আমাদের চিনিয়ে দাও।

— দিতে পারি। যদি তুমি আর একখানা কচুরি স্যাংশন কর! বিনা কমিশনে 'কমিশন-এজেন্টে'র তথ্য পেশ করা চলবে না।

রানু হেসে ফেলেন। বলেন, পাতে যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে ক-খানা হল?

— তিনখানা।

সুজাতা টপ্ করে ওঁর পাতে আর একটা কচুরি নামিয়ে দিয়ে বলে, তিন শত্তুর করতে নেই। নিন, হল তো? এবার বলুন — শিবানী সোম কে? তার পাত্তা কোথায় পেলেন?

— তথ্যটা সরবরাহ করেছে বটুক। সে দু নৌকোয় পা দিয়ে চলতে চেয়েছিল। কিন্তু দোহাত্তা লোটা তার বরাতে নেই। শিবানী সোমের এজেন্ট কেটে পড়ায় সে শুধু আমাকেই সংবাদ সরবরাহ করে পকেট ভারী করছিল। একেবারে শেষ পর্যায়ে।

কৌশিক বলে, বুঝেছি। কমলেশ খুন হওয়ার আগেই পানের দোকানে যে মোটর সাইকেলের মালিকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়। যে-ছোকরা সাহস করে আপনার চেম্বারে আসতেই রাজি হয়নি।

বাসু কচুরিতে একটা কামড় দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, সেই ছোকরাই শহরতলির মস্তান। শিবানী সোমও বিবাহ-বিশারদ কমলের এক ধর্মপত্নী। তার কিছু গহনা হাতিয়ে কমল নিরুদ্দেশ হয়েছিল। ওই কমিশন-এজেন্ট ছোকরাও ঘটনার রাত্রে ওখানে উপস্থিত ছিল। সম্ভবত সে এসেছিল ত্রিদিবেরও আগে। আমার মনে হয়, সে যখন ভারা বেয়ে উঠছে তখনই ত্রিদিব এসে তার গাড়িটা রাস্তার ধারে রাখে। তাতেই ও আত্মগোপন করে লুকিয়ে বসে থাকে। সমস্ত ঘটনার হয়তো সে নীরব দর্শক — আড়ালে লুকিয়ে থেকে। চোখের সামনে কমলকে খুন হতে দেখে সে ভারা বেয়ে নেমে যায়। তার মোটর-সাইকেলের শব্দ অনেকেই শুনেছে।

— তাহলে ফিঙ্গার-প্রিন্টগুলো মুছে দিয়ে গেল কে?

— 'নেতি-নেতি' করতে করতে যে লোকটি অকুস্থলে সর্বশেষ উপস্থিত ছিল — যার ধমনীতে শক্তাবৎ রাজরক্ত! আপাতদৃষ্টিতে তাকে ন্যালা-ক্যাবলা মনে হলেও শয়তানি বুদ্ধি তার কম নয়! হয়তো প্রচুর ডিটেক্‌টিভ গল্প ওর পড়া আছে। তাই যখন দেখল সব শুনশান্ — ডোরবেল বাজানোও বন্ধ হয়ে গেছে তখন ত্রিদিবই সব কিছু মসৃণ বস্তু তার রুমাল দিয়ে মুছে দিয়ে যায়। এমনও হতে পারে যে, রুমাল বার করবার সময়েই তার গাড়ির চাবিটা পড়ে যায়।

সুজাতা জানতে চায়, কিন্তু ঐ চাবির থোকাটা — মানে, যেটার ফটো খবরের কাগজে ছাপা হয় — সেটা যে ছন্দার নয়, ত্রিদিবের, তা বুঝলেন কেমন করে?

বাসু বললেন, সেটাই হওয়ার সম্ভাবনা। ছন্দার মতো সুস্থ মস্তিষ্কের মেয়ে তারাতলার মতো এলাকায় রাত একটার সময় গাড়ি 'আন্‌লক' করে নেমে যাবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। যদি যায়ই, তাহলে সে ফেরার পথে গাড়ি স্টার্ট করবে কেমন করে? কারণ আমাদের হাইপথেসিস্ — ত্রিদিবের প্রথম দিনের বক্তব্য অনুযায়ী — ছন্দা নিজের সেট চাবিটা খুঁজে পায়নি বলেই থার্ড চাবিটা নিয়ে গিয়েছিল! সেটা যদি কমলেসের ঘরে খোয়া গিয়ে থাকে তাহলে ছন্দা ফেরার পথে গাড়ি স্টার্ট করতে পারে না! কিন্তু

ত্রিদিবের মতো মানসিক রোগাগ্রস্ত রোগির পক্ষে তা সম্ভব। সে গাড়ি আন্‌লক অবস্থায় ড্যাশ-বোর্ডে চাবি রেখে চলে যেতে পারে। অথবা তার নিজস্ব চাবির থোকাটা হয়তো তার নিজের কোটের পকেটেই ছিল, যা সে খুঁজে পায় ফেরার পথে গাড়িতে ওঠার আগে পকেট তল্লাসী করতে করতে।

হঠাৎ কলবেলটা বেজে ওঠে। বিশু গিয়ে দরজা খুলে দেখল। আগন্তুক বাধা মানল না। সরাসরি চলে এল ভিতর বাড়িতে — ডাইনিং হলে। রানু সবার আগে দেখতে পেলেন। খুশিমনে ডেকে ওঠেন, এস, এস ছন্দা! ছাড়া পেয়ে গেছ তাহলে? বস ওই চেয়ারটায়।

ছন্দা এগিয়ে এল। নত হয়ে প্রণাম করল বাসুকে আর রানুকে। বলল, হাজত থেকে সোজা চলে এসেছি। আর যাবই বা কোথায়? আলিপুরের বাড়িতে তো প্রবেশ নিষেধ। শুভ্রাদির বাড়িতে যেতে পারতাম, কিন্তু সেখানে যেতেও কেমন যেন সঙ্কোচ হল।

বাসু বললেন, এখানে চলে এসে বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ। তবে ইচ্ছা করলে যে-কোনও পাঁচতারা হোটেলে ভি. আই. পি. স্যুইটেও তুমি উঠতে পারতে।

ছন্দা ম্লান হাসে। বলে, ধনকুবেরের প্রাক্তন পুত্রবধূকে নিয়ে লেগ-পুলিং করছেন, স্যার?

রানু হাত বাড়িয়ে কর্তাকে বাধা দিলেন। ছন্দাকে বলেন, তুমি বাথরুমে গিয়ে মুখে-হাতে জল দিয়ে এখানে এসে বস দিকিন। সকাল থেকে এক কাপ চাও কপালে জোটেনি মনে হচ্ছে!

সুজাতা ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

একটু পরে মুখ মুছতে-মুছতে ছন্দা ফিরে এসে বসল একটা চেয়ারে।

বিশু ওর সামনে নামিয়ে রাখল গরম কচুরির প্লেট।

আহারান্তে বাসু বললেন, রানু বাধা দেওয়ায় তখন তোমার প্রশ্নটার জবাব দিতে পারিনি ছন্দা। এখন বলি : না! রসিকতা আমি করিনি। ধনকুবেরের প্রাক্তন পুত্রবধূ হিসাবে তুমি আজ সত্তর লক্ষ টাকার মালিক! পাঁচ তারা হোটেলের বিলাসবহুল কক্ষ তোমার কাছে স্বপ্নরাজ্য নয়।

সুজাতা সংশোধন করে দেয়, সত্তর নয় মামু, সাতাত্তর লক্ষ।

— না সুজাতা। পাঁচ লাখ টাকার চেক ছন্দা দেবে কমলাক্ষ করের বিধবা অনসূয়া করকে, আর দু-লাখ কমলাপতি সোমের বিধবা শিবানী সোমকে। ওরা দু-জনেও কম ভোগেনি। ওদের কথা মনে ছিল বলেই আমি সত্তরের বদলে অঙ্কটা সাতাত্তর লাখ করেছি।

ছন্দা বোকার মতো একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখে। শেষ বলেই ফেলে, এ সব কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনারা?

বাসু নিঃশব্দে উঠে গেলেন পাশের ঘরে। তখনই ফিরে এসে চেকটা বাড়িয়ে ধরলেন ছন্দার দিকে। টাকার অঙ্কটার দিকে নজর পড়ায় বজ্রাহত হয়ে গেল যেন। প্রশ্ন করবার ক্ষমতাও ছন্দার আর অবশিষ্ট ছিল না।

বাসু বললেন, ত্রিবিক্রম রাও আমার ফি মিটিয়ে দিয়েছেন। এটা তোমার 'নেট'। তবে ওই সাত-লাখ তোমার খরচ হবে! বুঝলে না? এটা তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদের খেশারত। তোমার প্রাক্তন স্বামী দিচ্ছে : 'অ্যালিমনি কাম-মানি-সেট্‌ল্‌মেন্ট।'

ছন্দা ধীরে-ধীরে চেকটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। মুখটা থমথমে হয়ে গেল তার। বললে, ত্রিবিক্রম রাও-এর দেওয়া ঘুষ আমি নেব, এটা আপনি ধরে নিলেন কেন?

— ঘুষ! সার্টেন্‌লি নট! সবটাই লিগাল-মানি। কালো টাকার নয়। ত্রিবিক্রম ঘুষ দেবে আর আমি তাই হাত পেতে নেব? কী বলছ ছন্দা? এ তার অর্থদণ্ড! ঠিক আছে। চেকটা এখানেই থাক। তুমি এই কাগজগুলো নিয়ে ওঘরে যাও। পড়। তারপর ফিরে এসে তোমার সিদ্ধান্ত জানিও...

ছন্দা জানতে চায়, কীসের কাগজ এগুলো?

— তোমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার ব্যাপারে ত্রিদিব কী ডিপজিশন দিয়েছে তা পড়ে দেখ। তারপর কী করতে চাও, বল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ছন্দা ফিরে এল। বলল, আশ্চর্য! আমি তো স্বপ্নেও এমন কথা ভাবতে পারিনি। ডাক্তার ব্যানার্জি তাহলে ঠিকই বলেছিলেন, মাতৃত্ব কামনার তির্যক পরিতৃপ্তির সন্ধানে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম। ওকে শোধরানো অসম্ভব। জেনে-বুঝে সে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল! আমার চাবির গোছাটা চুরি করে...

এই সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা। এ কাজ চিরকাল রানুর। উনি আগ বাড়িয়ে যন্ত্রটা তুলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই খবর পেয়েছেন। ছন্দা ছাড়া পেয়ে গেছে।...না, জামিন নয়, মুক্তি! পুলিশ আর মামলা চালাতেই চায় না।...আপনি কোথা থেকে বলছেন?...কী?...ক্যালাঙ্গুটে! সেটা আবার কোথায়?...না, না, নিতান্ত ঘটনাচক্রে সে এখানেই বসে আছে!...এই তো আমার সামনে!...আচ্ছা দিচ্ছি তাকে...

টেলিফোনটা বাড়িয়ে ধরে ছন্দাকে বলেন, ডাক্তার ব্যানার্জি! গোয়া থেকে এস. টি. ডি. করছেন...নাও, কথা বল...না, বরং এক কাজ কর। আমার রিসেপশনে চলে যাও। এই টেলিফোনের এক্সটেনশনে জনান্তিকে কথা বলতে পারবে। যাও।

ছন্দা সলজ্জে ও-ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। চেকটা তুলে নিয়ে।

রানু সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, বল তো সু, 'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতার মোদ্দা কথাটা কী?

সুজাতা অবাক হয়ে বলে, আমি জানি না। হঠাৎ এ কথা কেন?

বাসু বললেন, 'পরশুরামে'র মতে : উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে!'

boiboi.net

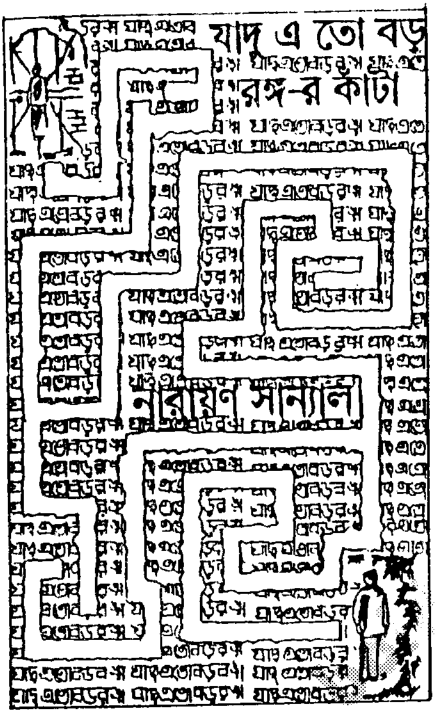

যাদু এ তো বড় রঙ্গ-র কাঁটা

রচনাকাল : 1992

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, 1993

প্রচ্ছদশিল্পী : অরূপেশ জানা

উৎসর্গ : প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

যাদু এ তো বড় রঙ্গ
যাদু এ তো বড় রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার
যাব তোমার সঙ্গ।।

না, যাদু মাত্র তিন তিতো দেখাতে গিয়েই হিমসিম। চার নম্বর তিক্ত-স্বাদের বস্তুটি কাকলির পাতে দেবার মওকা পায়নি। তাই কাকলিও ওর সঙ্গে একত্রে সপ্তপদ গমনে স্বীকৃত হয়নি। দাবা খেলার আসরে যাদুগোপাল হার মানেনি তা বলে। কাৎ করেছিল প্রতিপক্ষকে—যে প্রতিপক্ষ হলেও হতে পারত ওর স্বপক্ষ, ওর সঙ্গিনী, জীবনসঙ্গিনী।

বেমক্কা "কুইনটা" খুইয়ে কাকলি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আশ্রয় নিয়েছিল সুজাতা ফটোগ্রাফিক স্টোরসের মেজানাইন ঘরে। জয়া রাগ করেনি। সে বোধকরি বুঝতেই পারেনি কেন বাড়িটা ছেড়ে কাকলি চলে গেল। জয়া মেনে নিয়েছিল ওর দাখিল করা যুক্তিটাকে। কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় কাকলি কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকতে চায়। সে আজ প্রায় তিন বছর অতীতের কথা।

হরগোপাল দত্তের প্রয়াণের পর সংসার-তরণী যখন রীতিমতো টালমাটাল তখন হাল ধরতে এগিয়ে এসছিল যাদুগোপাল। সেই তার এ বাড়িতে প্রথম পদার্পণ। সে তখন কোনক্রমে কম্পার্টমেন্টাল বি.কম.-টা পাস করে ঢুকেছে প্রিয়রঞ্জন রায়ের ফার্মে। কাজ শিখতে। এদিকে রাতে ল পড়ত। প্রিয়রঞ্জন ছিলেন হরগোপালের বন্ধু এবং অ্যাটর্নি যাদুকে উনি পাঠিয়েছিলেন দুই বোনকে "প্রবেট" নেওয়ায় সাহায্য করতে। নানান অফিসে দৌড়ঝাঁপ করতে। হরগোপাল বেশ কিছু সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন মাতৃহীন দুই বোনের জন্য : দোতলা বাড়ি, গাড়ি, এছাড়া গড়িয়াহাট রোডে "সুজাতা ফটোগ্রাফিক স্টোরস্"-এর যাবতীয় অ্যাসেট। খানচারেক দামী ক্যামেরা, মায় একখানা মুভি ক্যামেরা।

জয়া ছোটবেলা থেকেই রুগ্ন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তার একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। হরগোপাল জীবিত থাকতেই। পিতৃবিয়োগের সময় সে একেবারে শয্যাশায়ী নয়, তবে খুব সাবধানে থাকতে হত তাকে। তাই সংসারের যাবতীয় দায়ঝক্কি পড়েছিল ছোটবোন কাকলির স্কন্ধে। বাবা মারা যাবার আগেই ইকনমিক্স-এ বি. এ.-টা পাস করে রেখেছিল। পিতৃ-বিয়োগের পর নাম কাটিয়ে এল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এম. এ. পড়ার মতলবটাকে ত্যাগ করল। কী লাভ? বাবার শেখানো বিদ্যাটাতে মন দিলে আখেরে কাজ দেবে। হরগোপাল ছিলেন তাঁর আমলে একজন প্রখ্যাত আলোকচিত্র-শিল্পী। একাধিকবার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেছেন। টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনায় ফ্রি-লান্স ফোটোগ্রাফার হিসাবে একবার অলিম্পিকস কভার করতে ভারতের বাইরেও গিয়েছিলেন। ছোট মেয়েকে তিনি হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন এই বিদ্যা। পিতৃ-বিয়োগে কাকলি সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোরসের উন্নতিবিধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। সংসারটা তো চালাতে হবে।

দুই বোন প্রবেট নিল। প্রিয়রঞ্জনকাকাকে ডেকে প্রথমেই কাকলি সম্পত্তিটা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। দিদির আপত্তি ছিল। কাকলি মানেনি। যোধপুর পার্কের বাড়ির একতলাটা ও যাবতীয় ফোটোগ্রাফির সরঞ্জাম কাকলির। গাড়িটা দিদির। এবারও আপত্তি করেছিল জয়া। গাড়ি নিয়ে কী করব আমি? আর কি কোনদিন গাড়ি চালাতে পারব?

কাকলি সে যুক্তি শোনেনি। জয়া দু-চার মাসের মধ্যেই নিশ্চয় আবার গাড়ি চালাতে পারবে। না হলে একজন ড্রাইভার রাখা যাবে। কিন্তু গাড়িখানা দিদির।

গড়িয়াহাটের দোকানটা কী হবে? স্থির হল, ওটা হবে লিমিটেড কোম্পানি, প্রায় আধাআধি, 40%, শেয়ার এক-এক বোনের। প্রিয়রঞ্জনকাকা তাঁর আইনের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, অন্তত তিন জন মেজর শেয়ার-হোল্ডারের তে-পায়া টেবিল বানাতে না পারলে লিমিটেড কোম্পানির প্ল্যানচেট টেবিলে তেনারা আসেন না। আর নামমাত্র কিছু শেয়ার পরিবারের বাইরে কাউকে বেচে দিতে হবে। কাকলি বলেছিল, তা আপনিই নিন না, কাকা?

প্রিয়রঞ্জন রাজি হননি : না। ভেস্টেড-ইন্টারেস্ট থাকলে আর আমি তোমাদের আইনত পরামর্শ দেবার অধিকারী থাকতে পারব না। শতাংশেক শেয়ার বরং যাদুগোপাল কিনে নিক।

যাদুগোপাল বলেছিল, আমার অবস্থা অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ। কাকলি আর বড়দি যদি কিছু শেয়ার আমাকে দান করে তাহলে অবশ্য আমি সানন্দে স্বীকৃত।

কাকলিকে রূঢ় প্রত্যুত্তরটা দিতে হয়নি। তার পূর্বেই প্রিয়রঞ্জন বলেছিলেন, না, তা হবে না। শেয়ার যে কিনবে সে অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক দিয়ে কিনবে।

আলোচনার সময় উপস্থিত ছিল স্বর্ণলতা। হরগোপালের আমল থেকেই সে ছিল এই প্রতিষ্ঠানে। হঠাৎ বলে বসল, দিদিরা যদি আপত্তি না করেন তা হলে আমি আমার জমানো টাকায় ঐ দশখানা শেয়ার কিনে নিতে পারি।

সে রকমই ব্যবস্থা হল। স্বর্ণলতা নিল দশটি। বাদ বাকি দশ পার্সেন্ট কিনে নিল পরিচিত এ-ও-সে! ইতিমধ্যে যাদুগোপাল তিল তিল করে দত্ত পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল। প্রবেট পেয়ে যাবার পর তার আর এ বাড়িতে সান্ধ্য-হাজিরা দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, ব্যবস্থাপনাটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অফিস-ফেরত নিজস্ব হিরো-হন্ডা চেপে যাদুগোপাল যোধপুরের বাসায় নিত্যি হাজিরা দিত। কাকলির সঙ্গে দু-চারটে ফষ্টি-নষ্টি করে দ্বিতলে উঠে যেত, দিদির তত্ত্বতালাশ নিতে এবং তার লাইব্রেরির বই বদল করতে। জয়া বইয়ের পোকা—আর করবেই বা কী, শুয়ে শুয়ে? কাঁহাতক টি. ভি.-র একই নিউজ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শোনা যায় :

"প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—", "দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ সেড—", " প্রধানমন্ত্রীনে কহা হ্যয়—"

কাকলি লাইব্রেরিতে যাবার সময় পায় না। ফলে রুগ্ন মানুষটার জন্য যাদুগোপাল এগিয়ে এসেছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। কাকলি তাই বিনিময়ে ওর জন্য বৈকালী-ভোগের ব্যবস্থা রাখত। পরোটা, লুচি, ঘরে-

করা কচুরি, ফ্রেঞ্চ টোস্ট — যেদিন যেমন।

ক্রমে কাকলি অনুভব করল, যাদুগোপাল কী একটা বিশেষ মতলব নিয়ে এ বাড়িতে আসে। এ পরিবারের সঙ্গে একটা পাকাপাকি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রাখতে যেন সে বদ্ধপরিকর। যাদুগোপাল বয়সে জয়ার চেয়ে বছরদুয়েকের ছোট, কাকলির চেয়ে বছরখানেকের বড়। দ্বিতীয়ত, জয়া প্রায় চিররুগ্না, আজ ভাল তো কাল শয্যাশায়ী। ফলে যাদুগোপাল ঘনিষ্ঠ হতে চাইল ছোটবোনের সঙ্গে।

* * *

কাকলি সংযত হয়েছিল সময়েই। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, কম্পার্টমেন্টাল হলেও বি.কম. পাস, পিতৃমাতৃহীন। কিন্তু কাকলির কেমন যেন মনে হত—ল-কলেজের ঐ স্বভাব-আয়েসী নৈশ ছাত্রটির মূল লক্ষ্য—যোধপুর পার্কের একটা ফ্ল্যাটবাড়ি, বেশ কিছু ইউনিট ট্রাস্ট সার্টিফিকেট এবং স্ত্রীর উপার্জনে বিনা ঘর্মব্যয়ে সুখী জীবন। কাকলি ওকে পাত্তা দিত না। ক্রমে যাদুগোপালের বৈকালী ভোগটাও বন্ধ করে দিল। কিন্তু তাতেও যাদুগোপালের রঙ্গ দেখানো বন্ধ হল না। সারা দিন দোকানে কাজকর্ম সেরে রাত নটা নাগাদ কাকলি ফিরে আসত। ফিয়াট গাড়িটা গ্যারাজে তুলে ঘরে এসে ঠিকে-ঝি শিবুর মাকে শুধাতো, আজ যাদুবাবু আসেননি, বিকাল নাগাদ?

শিবুর মা ঘর মুছতে মুছতে জবাব দিত, আসবেনি কেন? এসেছিলেন! অ্যাই তো গ্যালেন তিনি, তুমি আসার ঠিক আগে।

—চা করে দিয়েছিলে?

—শুধু চা কেন, ছোড়দিমণি? বড়দি ট্যাকা দিল, আমি ঐ সাঙ্গুভ্যালি থেকে চিংড়ির কাটলেস্ নিয়ে এনু তো!

কাকলি এতে আপত্তির কিছু দেখেনি। দিদির কর্মহীন প্রহরযাপনের মাঝখানে ঐ ছেলেটি যদি কিছুটা সঙ্গ দিয়ে যায় তাতে ক্ষতি কী? কাকলি নিজে তো সময়ই পায় না।

ফলে যাদুগোপাল যথারীতি সান্ধ্য হাজিরা দিতে আসত। লাইব্রেরির বই বদলে দেবার অজুহাতে। মাঝে মাঝে সে নিয়ে আসত টাটকা ফুল, নিজেই ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখত। কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিদির সঙ্গে সাত-তাসের ফিশ খেলত—অল্প পয়সার স্টেকে।

তারপর একদিন প্রিয়রঞ্জনকাকা ওর দোকানে ফোন করে নানান কুশল প্রশ্নের পর জানতে চাইলেন, কাকলি-মা, যাদুগোপাল কি এখনো মাঝে-মধ্যে তোমাদের বাড়িতে যায়?

কাকলি স্বীকার করেনি যে, যাদুগোপাল তার রঙ্গ দেখাতে প্রতিদিন বৈকালে হানা দেয়। সে শুধু বলেছিল, হ্যাঁ, কাকামণি, উনি তো প্রায়ই আসেন। কেন?

—আমার মনে হল ব্যাপারটা তোমাদের জানিয়ে রাখা ভাল।

—ব্যাপারটা! কী ব্যাপার?

—না, মানে যাদুগোপাল সেন আর আমার ফার্মে অ্যাটাচড নেই। বস্তুত আমার সঙ্গে তার দেখাশোনা আদৌ হয় না।

—ও! তা এ-কথাটা বিশেষভাবে জানাচ্ছেন কেন?

—বিশেষ হেতু আছে বলে। যাদুগোপাল যদি বেমক্কা তোমাদের কাছে কিছু টাকা কর্জ চেয়ে বসে—তা সে দু-পাঁচ হাজার বা দু-পাঁচশো যাই হোক,—দেবে না। আমার পরিচিত দু-তিনটি পার্টির কাছ থেকে—যাদের সঙ্গে আমার মাধ্যমেই ওর আলাপ—ও এভাবে টাকা ধার নিয়েছে। তারপর থেকেই নাপাত্তা, বুঝেছ?

কাকলি বুদ্ধিমতী। বুঝতে পেরেছিল সহজেই। কিন্তু কিছুতেই এই সহজ তত্ত্বটা বোঝাতে পারেনি দিদিকে। প্রসঙ্গটা দিদির কাছে উত্থাপনমাত্র জয়া বলেছিল, জানি। প্রিয়কাকা অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছেন যাদুর সঙ্গে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত যাদু বলেছে আমাকে। বেচারিকে অনেক দুঃখ সইতে হয়েছে।

বাধ্য হয়ে শুনতে হয়েছিল কাকলিকেও। আদ্যন্তই। বেশ বুঝতে পেরেছিল, যাদুগোপালের এটি দু-নম্বর রঙ্গ। বানিয়ে বানিয়ে অতি তিক্ত স্বাদের গল্প ফেঁদেছে। সে কিস্‌সায় খলনায়ক এক বৃদ্ধ অ্যাটর্নি আর কাহিনীর বঞ্চিত নায়ক সামান্য বি. কম. পাশ প্রবেশনার। যুক্তি দিয়ে, বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে দিদিকে বোঝাতে পারেনি তত্ত্বটা। তারপর ভেবেছিল, ঠিক আছে। কী দরকার দিদিকে জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করানোর? জয়েন্ট-অ্যাকাউন্টের চেক বই, ইউনিট ট্রাস্ট আর শেয়ারের কাগজ ইত্যাদি শুধু দোতলার আলমারি থেকে একতলার আলমারিতে স্থানান্তরিত করেছিল। জয়ার কাছে দু-পাঁচশ নগদ টাকা থাকেই। তা সরায়নি। কারণ কাকলি মনে মনে খুশি হত তা থেকে দিদি যদি ওকে কিছু ধার দিত। ঐ বাদুড়ে-খাওয়া মাকাল ফলটার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে ও একটা সহজ পন্থা—দু-পাঁচশ টাকা ধার দেওয়া।

ঘটনাটা ঘটল সম্পূর্ণ অন্যরকম। একচক্ষু হরিণের মতো কাকলি ওদিকটা একেবারেই নজর করেনি। এ যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ! তবু আপ্রাণ লড়াই করেছিল—দ্বন্দ্বযুদ্ধ—একদিকে ক্ষুরধারবুদ্ধি সংসার-অভিজ্ঞ অনার্স গ্র্যাজুয়েট কাকলি দত্ত, অন্যদিকে কম্পার্টমেন্টালে বি. কম. পাশ উদীয়মান ল-স্টুডেন্ট যাদুগোপাল সেন। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত, তবু ল-পরীক্ষাটা ওর পাশ করা হয়নি। সে দ্বৈরথ সমরে কাকলি ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। হার মানেনি; কিন্তু 'কুইনটা' খোয়া গেল।

যাদুগোপাল বসেছিল দাবাবোড়ের ছক পেতে। অস্বীকার করতে পারে না কাকলি, সে যে বেমক্কা দাবা ধরে ঘোড়ার ওঠসাই কিস্তি দিতে পারে এটা আন্দাজ করেনি, এই যা। মাৎ সে হয়নি। কিন্তু দাবাটা বেমক্কা মার খেল। আবাল্যের জীবনসঙ্গিনী, কত সুখ-দুঃখের সাথী দত্তবাড়ির আদরের ঐ 'কুইন'।

*　　　*　　　*

কাকলি তার পৈত্রিক বাসস্থান ছেড়ে চলে গেল। যোধপুর পার্কের একতলায় নিজের ঘরখানায় চাবি দিয়ে। এসে উঠল 'সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোর্স-এর 'মেজানাইন'-এ। যাদুগোপালও একই সঙ্গে বাসা বদলালো। উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি গলির দীর্ঘদিনের বাসাটা। মেসবাড়ির ছারপোকা-অধ্যুষিত চৌকিখানা হাফ-প্রাইসে বেচে দিয়ে এসে উঠল যোধপুর পার্কের বাড়ির দ্বিতলে। ন্যায্য অধিকারে। স্ত্রীর সম্পত্তিতে।

জয়া বয়সে তার চেয়ে দু-বছরের বড়। তা হোক, সে ওর ধর্মপত্নী। রীতিমতো রেজিস্ট্রি করা বিয়ে।

সব জেনে-বুঝেও কাকলি বাধা দিতে পারেনি। দিদিকে সে সত্যিই ভালবাসতো। ও বুঝতে পেরেছিল, ঐ চির-রুগ্না মেয়েটির জন্য কোনদিনই শাদা ঘোড়ায় চেপে দরজার সামনে হাজির হবে না কোন রাজপুত্র। কাকলি নিজে ভ্রূক্ষেপ করে না। কাজের মধ্যেই মেতে আছে সে। বান্ধবীরা বলে, ও নাকি পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদী—পাঁচ-পাঁচটা ক্যামেরার যৌথ মালকিন। কিন্তু জয়ার কথা আর কেউ না জানলেও কাকলি তো জানে। সেই কিশোরী বয়স থেকেই রুগ্ন দিদিটা কিসের স্বপ্ন দেখে এসেছে : একটা ঝকঝকে ঘর, একটা তকতকে বর, আর একটা বকবকে বাচ্চা।

শরীর যত ভেঙে পড়েছে, কামনাটা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ একদিক থেকে ভালই হল। দিদি ঝকঝকে ঘর পেয়েছিল—বাবার আশীর্বাদে। বকবকে বাচ্চা পেলেও পেতে পারে। ডাক্তারবাবুদের সাধনায়। তবে হ্যাঁ, বর সে পেয়েছে নিজের কেরামতিতে। ভালবেসে। অন্তত তার তো সেটাই ধারণা। কাকলি জানত, দিদি মূর্খের স্বর্গে বাস করছে ; কিন্তু যে-কটা দিন স্বর্গসুখ পায় সে-কটা দিন তাকে তা পেতে দেবে না কেন?

কাকলি বুঝতে পেরেছিল—যাদুগোপালের এই চরম-রঙ্গের তিক্ততা সে নিজে বরদাস্ত করতে পারবে না। তাই কাজের অজুহাতে ও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। ওতপ্রোতভাবে ডুবে গিয়েছিল দোকানের কাজে। ইতিমধ্যে 'ক্যামেরা-পার্সন' হিসাবে কাকলি দত্তও ক্রমে ক্রমে স্বনামধন্যা হতে শুরু করেছে। অনেক নাম করা জার্নালে তার তোলা ফটো ছাপা হয়। মুভি-ক্যামেরা নিয়ে একটা ডকুমেন্টারিও তুলেছে। রাশ-প্রিন্ট দেখে বুঝেছে ভালভাবে এডিট করাতে পারলে দামি ছবি হতে পারে। বিষয়বস্তুটা "বাংলার মেলা"।

শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা থেকে ঘোষপাড়ার মেলা, মায় মকর-সংক্রান্তির সাগর মেলা। এডিটিংটা কাকলি ভাল জানে না। তাই ছবিটা পাতে দেবার মতো প্রস্তুত নয়।

মাঝে মধ্যে যোধপুর পার্কের বাড়িতে যায়। দিদির সঙ্গে গল্প-গুজব করে আসে। যাদুগোপাল আগলে রাখে স্ত্রীকে। শালীর দেখ-ভাল করার অছিলায়। কাকলি বোঝে সবই। সহ্য করতে হয় তাকে। দিদি যেন টের না পায়।

জয়া এখনো শয্যাশায়ী।

ডাক্তারবাবু নাকি বলেছেন, জয়াকে সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। হার্টের অসুখ তো! রক্ত চাপ—কালাজ্বর রোগীর টেম্পারেচারের মতো—ক্রমাগত ওঠে আর নামে। যাদুগোপাল বুক দিয়ে আগলে রাখে স্ত্রীকে। জয়া কৃতজ্ঞ। বিগলিত। যাদুগোপালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কী সেবাটাই না করছে বেচারি।

সাংসারিক কোনও দায়ঝক্কি জয়াকে আর পোহাতে হয় না।

ঘরের কাজকর্ম শিবুর মা-ই করে। ঐসঙ্গে রেখেছে একটা ছোকরা কম্বাইন্ড হ্যান্ড। রান্নাবান্নাটা ঐ ছোকরাই করে। মেদিনীপুরে বাড়ি। নাম নেতাই।

আর নৌকার হাল ধরে বসে আছে স্বয়ং যাদুগোপাল।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা, হিসাব রাখা, ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোনের বিল মেটানো ইত্যাদি সব দায়ঝক্কি যাদুগোপালের।

কাকলি সঙ্কোচে দিদিকে প্রশ্ন করতে পারেনি আলমারির চাবিটা থাকে কার কাছে? অথবা সেভিংস-অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে কি দুজনের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় না?

দুই

ক্রিরিং—ক্রিরিং—ক্রিরিং—ক্রিরিং—। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটাকে ধারকযন্ত্রের সুখশয়ন থেকে তুলে কাকলি কানে লাগাল। তার কথা-মুখে বলল, সুজাতা ফটোগ্রাফিক স্টোরস—

—কুড আই টক টু মিস দত্তা? কাকলি দত্তা?

—স্পিকিং।

—আই থট অ্যাজ মাচ। কাকলি, আমি ভৈরব কথা বলছি।

কাকলি চিনেছে ঠিকই, কিন্তু ফিলম প্রডিউসার ভৈরব দাশ যে তার জাগর-মনের কোনও প্রান্তে নেই, এটাই প্রমাণ করতে বললে, এক্সকিউজ মি। কোন ভৈরব?

—ভৈরব দাশ। কেন ন্যাকামি করছ, কলি? চিনতে আমাকে ঠিকই পেরেছ। কেমন আছ?

—ভাল আছি। কাজের কথা কিছু কি বলার আছে?

—তা আছে। তুমি আমাকে চার-মিঠা দেখাতে বলেছিলে, মনে আছে?

—কী দেখাতে বলেছিলাম?

—চার-মিঠা। ফোর সুইটস। বলেছিলে, চার-মিঠা দেখাতে পারলে আমার সঙ্গে আসবে—

—কী আবোল-তাবোল বকছেন—

—জাস্ট আ মিনিট। লাইন কেটে দিও না প্লীজ। কাজের কথা আছে। শোন—

—বলুন?

—টেলিফোনে হবে না। সাক্ষাতে কথা হতে পারে? ধর যদি চারটে নাগাদ তোমার দোকানে যাই? তোমার দেখা পাব?

কাকলি মণিবন্ধের দিকে তাকালো। বেলা আড়াইটে। বললে, মিস্টার দাশ, আমি কাজের মানুষ। আপনার আগড়ম-বাগড়ম শুনবার মতো সময় আমার নেই। আপনার পূর্বেকার প্রস্তাবদুটি আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। সে নিয়ে কোনো আলোচনা করার সময় আমার নেই। যদি নতুন কথা কিছু —

—অ্যাবসোলিউটলি নতুন। চতুর্থ রঙ্গ।

—কী?

—সাক্ষাতে বুঝিয়ে বলব—

লাইন কেটে দিল ভৈরব দাশ।

ওই সঙ্গে চিন্তাসূত্রও ছিন্ন হয়ে গেল কাকলির। এতক্ষণ সে বসে বসে একটা প্রবন্ধ রচনা করছিল। রঙিন সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য সচিত্র প্রবন্ধ। ছবিগুলো ডেভেলপ্ হয়েছে। সাজানো আছে ওর টেবিলে। প্রবন্ধটা সেই চিত্রের সূত্র ধরে। বলা যায় ও 'সচিত্র প্রবন্ধ' রচনা করছিল না, করছিল 'সব্যাখ্যা আলোকচিত্রমালা'। এই সময় ফটো-দোকানে ভিড়টা কম থাকে। ছবি তোলাতে যারা আসে তারা হাজিরা দেয় সকালে অথবা সন্ধ্যায়। মধ্যাহ্নে কাকলি সচরাচর এইসব সৃজনীমূলক কাজ করে। ভৈরবের টেলিফোনে সেই চিন্তাসূত্রটা ছিন্ন হয়ে গেল।

ভৈরব দাশ লোকটা কী-জানি কেন কাকলির পিছনে আঠার মতো সেঁটে আছে আজ বছর দেড়-দুই। বস্তুত ওর পিতৃ-বিয়োগের সময় থেকে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। মাঝারি উচ্চতা। স্বাস্থ্যবান চেহারা। দাড়ি গোঁফ কামানো। ব্যাকব্রাশ চুল। ব্রহ্মতালুতে অকাল-ইন্দ্রলুপ্তের আভাস। সচরাচর পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে থাকে। দু-হাতে গ্রহ-বারণ সাত-আটটা আংটি। লোকটার নাকি অগাধ পয়সা। পরপর দুটি বাংলা ফ্লপ-ছবি তুলেও তার আশ মেটেনি। টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় এখনো একটা ঘর আছে ওর। ভাড়া গুণে যায়। আশা নতুন বক্স-অফিস-হিট ছবি শীঘ্রই তুলবে। কাকলির দ্বারস্থ হয়েছিল তাকে দিয়ে অভিনয় করাবে বলে। অভিনেত্রী হবার বিন্দুমাত্র বাসনা কাকলির নেই। এ কথা শোনার পর ভৈরব কাকলিকে তার ইউনিটে টানতে চেয়েছিল 'অ্যাসিস্টেন্ট ক্যামেরাম্যান' হিসাবে। সেজন্য সে সিনেমা জগতের ঐতিহ্যময় "ক্যামেরাম্যান" শব্দটাকেও বদল করতে প্রস্তুত ছিল ; কিন্তু কাকলি ওই উপজীবিকাকে প্রত্যাখ্যান করল। সে ভৈরব দাশ-এর "জয় সন্তোষী মা প্রোডাকশনের" অ্যাসিস্টেন্ট ক্যামেরাপার্সন হতেও অস্বীকৃত।

ভৈরব দাশ এর তিন নম্বর 'মিঠা'-টা ছিল খুবই দামী। 'সুইট ড্রীমস' নয়, 'সুইট-মীটস্' নয়, একেবারে আখেরি আর্জি—'সুইটী'। আদম যা পেশ করেছিল ঈভের কাছে—জীবনসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব। কাকলি সেটাও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। খোদায় মালুম, বেলা চারটের সময় কী 'মিঠা' পরিবেশন করতে আসছে সে।

কাচের পার্টিশনের ভিতর দিয়ে দেখতে পেল দু'জন খদ্দের এসেছে কাউন্টারে। স্বামী-স্ত্রী কিংবা না হলে ওরা হয়তো শীঘ্রই তা হবে। সুপর্ণাকে স্লিপ বার করে দেখালো। সুপর্ণা টানা ড্রয়ার খুলে বান্ডিল-বাঁধা খাম দেখছে। সুপর্ণা দাশগুপ্তা ওর কাউন্টারে বসে ক্যাশ ও হিসাব রাখে, ফটো ডেলিভারি দেয়। প্রয়োজনে ডেভলপিং, প্রিন্টিং-এ সাহায্যও করে। তারও নিজেস্ব ক্যামেরা আছে। বস্তুত কাকলির কাছে অবসর সময়ে সে ফটো-তোলার কায়দা শেখে।

কর্তা-গিন্নি অথবা হবু-স্বামী-স্ত্রী, যাইহোক, ফটোর খামখানা নিয়ে বাকি পেমেন্ট করে চলে গেল।

কাকলি তার টানা-ড্রয়ার খুলে একটা গোয়েন্দা গল্পের বই বার করে পড়তে বসল। ভৈরব দাশ ওর শিল্পীমনের ভারসাম্যটা নষ্ট করে দিয়েছে। ও খুলে বসল স্ট্যানলি গার্ডনারের পেরি মেসন সিরিজ-এর একটা পেপারব্যাক "দ্য কেস অব দ্য সাইলেন্ট পার্টনার।"

অচিরেই ডুবে গেল গোয়েন্দা গল্পে।

কখন কেটে গেছে দু-দুটি ঘণ্টা। বেলা চারটে। কাঁটায় কাঁটায়। কাচের পার্টিশনের ভেতর দিয়ে দেখতে পেল ভৈরব দাশ এসেছে কাউন্টারে। সুপর্ণার সঙ্গে কী যেন কথাবার্তা বলছে। সুপর্ণা ভাল করেই

চেনে ভৈরবকে। কাকলি জানে না, সুপর্ণা সুযোগমতো ভৈরবকে কিছু তৈলমর্দনও করেছে, সিনেমা অথবা টি. ভি. সিরিয়ালে অভিনয় করার সুযোগ-প্রত্যাশায়। ভৈরব পকেট থেকে কী একটা কালো মতন জিনিস বার করে সুপর্ণাকে দিল। সুপর্ণা দ্রুতগতি সেটা ড্রয়ারে রেখে দিল।

ভৈরব এগিয়ে এল কাকলির ঘরের দিকে। গ্লাস-প্যানেলে টোকা দিল। কাকলি বলল, ইয়েস। কাম ইন প্লীজ —

ভৈরব নিঃশব্দে প্রবেশ করল ঘরে। একটু ছদ্ম অভিবাদনের ভঙ্গি করে বললে, গুড আফটারনুন, ম্যাডাম।

বসল কাকলির ভিজিটার্স চেয়ারে।

— তারপর? কেমন আছ?

কাকলি ঠিক করেছিল অপ্রয়োজনে কড়া কথা বলবে না। ভৈরবকে ইতিপূর্বে ও বারণ করেছে "তুমি" বলে কথা বলতে। ভৈরব শোনেনি। শোনে না। বলে আমার প্রস্তাবটা যদি তুমি গ্রহণ করতে কলি, তাহলে আমরা দু'জনেই দুজনকে 'তুমি' বলতাম। তা যখন হল না তখন অন্তত 'হাফা-হাফি' রাজি হয়ে যাও। তুমি আমাকে 'আপনি'ই বল, বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবেই ধরে নাও — আমি 'তুমি' বলব। কাকলি প্রতিবাদ করেনি।

— কী হল? আমি তো কুশল জানতে চাইছি শুধু। কেমন আছ?

— ভাল।

— দিদি কেমন আছে?

— ভাল, অনেক ভাল। কী বলতে এসেছেন বলুন।

— বলছি, বলছি, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? শোন, কলি —

— জাস্ট-আ-মিনিট! আমার নাম কাকলি। নাম ধরে ডাকতে হলে আমার পুরো নামটাই উচ্চারণ করবেন প্লীজ, না হলে—

— কেন, কলি ? এখানে তো তৃতীয় ব্যক্তি নেই—

কাকলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, এক্সকিউজ মি! আমি তাহলে আপনার সঙ্গে কোনো আলোচনা করব না।

ভৈরব একগাল হেসে বললে, কী করবে? তোমাদের দোকানে কোনো দারোয়ান আছে বলে শুনিনি। দুই মহিলা মিলে আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে দোকান থেকে বার করে দিতে পারবে?

— না, তা পারব না। তবে আশপাশের দোকানে কিছু বন্ধুশ্রেণীর ভদ্রলোক আছেন, তাঁরা এগিয়ে এসে আপনাকে গলাধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিতে পারবেন। দেখতে চান?

ভৈরব গম্ভীর হয়ে বললে, স্থির হয়ে বস। শোন কাকলি, তুমি আমার প্রডাকশান য়ুনিটে আসতে রাজি হলে না। না অভিনয় করতে, না ক্যামেরা-পার্সন হিসাবে। তাহলে আমাকেই তোমার এস্টাব্‌লিশমেন্টে ঢুকতে দাও না কেন?

— মানে?

— ধর আমি তোমাদের দুই বোনের সহযাত্রী হয়ে গেলাম। তোমর দু'জনে আমাকে কিছু-কিছু শেয়ার বেচে দাও। আমার থাকবে ফিফটি-ওয়ান পার্সেন্ট শেয়ার, আর তোমাদের দু'বোনের মিলিতভাবে ফর্টিনাইন। তারপর তুমি এই 'সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোর্স'এর এক্সপ্যানশনে যত টাকা ঢালতে চাইবে আমি যোগাব, ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্টের আধাআধি রেট-এ। তুমি যদি ফিল্ম বা টি. ভি. সিরিয়াল তুলতে চাও — আমি ফিনান্স করব, তুমি যদি —

— জাস্ট ও মিনিট।

— ইয়েস?

— আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা রাজি নই।

— বাট হোয়াই? কেন?

— 'কেন' সে প্রসঙ্গ থাক। আমরা আপনাকে আমাদের কোম্পানির মেম্বার হিসাবে স্বীকার করতে রাজি নই।

ভৈরব হাসল। বিচিত্র হাসি। বলল, তুমি কি মনে কর, দুনিয়ার সব কিছু তোমার মর্জিমাফিক চলবে —

— না তা মনে করি না। তবে আমার দোকানের সবকিছু আমার মর্জিমাফিকই চলবে —

— তাই বা কেন কাকলি? তোমার বিজনেস পার্টনারদের কোনও বক্তব্য থাকতে পারে না?

— পারবেনা কেন? পারবে। আছে। কিন্তু দিদির ইচ্ছে আর আমার ইচ্ছেয় কোনও প্রভেদ নেই —

— কিন্তু কোম্পানির প্রধান শেয়ার-হোল্ডার তো — আমি যতদূর জানি — দুই নয় — অন্তত তিনজন। তাই নয়?

কাকলি কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বলে, আপনি এত কথা কী করে জানলেন?

— যেহেতু আমি ভৈরব দাশ। বিজনেসম্যান। তুমি জান না, তোমাদের কোম্পানির সেই তিন নম্বর মেজর শেয়ার হোল্ডারের নাম ভৈরব দাশ। হিয়ার্স ইট।

ফোলিও ব্যাগ থেকে একখণ্ড কাগজ ভৈরব নামিয়ে রাখল কাকলির গ্লাসটপ টেবিলে। বলল, যাদু এ তো বড় রঙ্গ, যাদু এ তো বড় রঙ্গ। চার 'ভেলকি' দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ। এই সেই চতুর্থ ভেলকি।

বজ্রাহতা হয়ে গেল কাকলি। কাগজটা তুলে নিয়ে বললে, স্বর্ণলতাদি তাঁর দশ পার্সেন্ট শেয়ার আপনাকে বেচে দিয়েছেন?

— হ্যাঁ। তুমি বোধহয় জান না, স্বর্ণের স্বামী এখন আমার প্রোডাকশন য়ুনিটে এমপ্লয়েড। তুমি এই শেয়ার সার্টিফিকেট ক'খানা আমার নামে এন্ট্রি করে নতুন করে ইস্যু করার ব্যবস্থা কর। জেরক্স কপি আমি দাখিল করে যাচ্ছি, অরিজিনালও দেখিয়ে গেলাম। নতুন শেয়ার পেলে এগুলো তোমাকে দিয়ে যাব। ঠিক আছে?

কাগজগুলো উল্টোপাল্টে দেখে কাকলি বলে, এটা ঠিক হয়নি।

— কোনটা?

— স্বর্ণদি নিজে থেকে চেয়েছিল বলেই তাকে আমরা মাত্র দশ পার্সেন্ট শেয়ার বিক্রি করেছিলাম, যাতে 'বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স'-এ তিনজন মেমবার থাকে। স্বর্ণলতাদি যদি সে শেয়ার বিক্রি করতে চায় তাহলে সে আমাকে বলতে পারত।

— পারত। খদ্দের না পেলে হয়তো বলতোও; কিন্তু এটা তার পক্ষে 'অবশ্যকর্তব্য' ছিল না, যে-কোন কোম্পানির শেয়ার একটা হস্তান্তরযোগ্য কমোডিটি। যে-কোন শেয়ার-হোল্ডার যে কোনো প্রার্থীকে তা বেচে দিতে পারে। স্বর্ণও তাই বেচেছে। এতে তার অন্যায়টা কী হল?

— সে আপনি বুঝবেন না। এটা একটা এথিকাল পয়েন্ট। স্বর্ণদির সংসার যখন চলছিল না তখন বাবা তাকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন —

— সো হোয়াট? স্বর্ণলতার সংসার ক'মাস আগে চলছিল না। আমি তার স্বামীকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলাম।

কাকলি রুখে ওঠে, দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। বাবা স্বর্ণদির নিঃস্বার্থ উপকার করতে চেয়েছিলেন। তখনো সে বিয়ে করেনি। এই 'সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোর্স'-এ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা না হলে বেচারি হয়তো ভেসে যেত। কিন্তু আপনি ওর স্বামীকে কাজ দিয়েছেন নিতান্ত স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে — ওই সামান্য ক'খানা শেয়ার হাতিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে।

— হাতিয়ে নেওয়া? আমি কি ন্যায্য দাম দিয়ে তা কিনিনি?

— য়ু নো হোয়াট আই মীন।

ভৈরব হাসল। বললে, তুমি এখন উত্তেজিত আছ কাকলি, তাই সহজ কথাটা তোমার মাথায় ঢুকছে না; কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী। তাই রাগ পড়ে গেলে বুঝবে — স্বর্ণলতা কিছুই অন্যায় করেনি। আমি তার স্বামীর এমপ্লয়ার। আমাকে খুশি রাখতে সে আগ্রহী। তাছাড়া যে শেয়ার তার নিজের, তা সে যাকে খুশি, যে কোন দরে, বিক্রি করতে পারে। পারে না? আমিও কিছু অন্যায় করিনি। যে কোন শেয়ার যে কোনো দরে বাজার থেকে আমি কিনতে পারি, যদি 'সেলার' সে দরে বেচতে রাজি থাকে। তাহলে তুমি রাগটা করছ কার উপর? ঠাণ্ডা মাথায় পরে ভেবে দেখ : তোমার নিজের উপর।

কাকলি জবাব দিল না। নিরুদ্ধ-আক্রোশে নতনেত্রে বসেই রইল।

ওর সেই আরক্ত মুখের অরুণাভাটা ভৈরব যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল। তারপর বলল, না, অন্যায় তুমি করনি, করেছ ভুল। কাজে অবহেলা। স্বর্ণ মাতৃত্ব-সম্ভাবনায় তোমার দোকান থেকে মেটার্নিটি লীভ পায়নি। না, সে তা চায়ওনি। — আমি জানি। রিজাইন দিয়ে চলে গেছিল মা হতে। কাকলি, তখন তোমার উচিত ছিল ওর কাছ থেকে বেনামে ওই সামান্য ক'খানা শেয়ার কিনে নেওয়া। তা তুমি নাওনি। সন্তান হবার পর তুমি নার্সিং হোমে স্বর্ণকে দেখতে গেলে, ছেলের অন্নপ্রাশনে দামী 'বাওয়া স্যুট' উপহার দিলে — কর্তব্যে কোথাও তোমার কোনও ত্রুটি হয়নি। গত বছর ডিরেক্টরস বোর্ড মিটিঙে স্বর্ণ তোমাকে নমিনেশন-পত্র পাঠিয়ে আ[illegible]ছিল। সবই মানছি। কোথাও তোমার কোনো ত্রুটি হয়নি। মানুষ হিসেবে। কিন্তু ব্যবসায়ী হি[illegible] একটা হিমালয়ান্তিক ভুল করেছিলে। তুমি ভেবে দেখনি, আক্রমণটা এদিক থেকেও আসতে পারে। তাই না?

এবারও কাকলি জবাব দিল না।

ভৈরব আবার বললে, অবশ্য এটাই [illegible]ব। বরাবর দেখেছি, প্রথমে বজ্র আঁটুনি দিয়ে শুরু করে তুমি ফসকা গেরো দিয়ে শেষ কর। যাদুগোপালের বেলাতেও তুমি এ-রকম একচক্ষু হরিণের মতো —

কাকলি হঠাৎ উঠে দাঁড়া[illegible] সোজাসুজি বলুন তো মিস্টার দাশ, ঠিক কী চান আপনি?

— তোমাদের কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধি। যেহেতু আমার টেন পার্সেন্ট স্বার্থ তাতে জড়িত। নাথিং এলস। বিশ্বাস কর কাকলি, তোমাদের কাজ-কর্মে কোনও বাধা আমি দেব না। আপাতত আমি হচ্ছি একজন 'সাইলেন্ট পার্টনার' — নীরব সহযাত্রী। তোমরা দুই বোন উন্নতি কর। আমি মালা গেঁথে তোমাদের গলায় পরাব। বলতে পার, আমার বর্তমান লক্ষ্য 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।' আচ্ছা চলি।

ভৈরব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। হেলতে-দুলতে বার হয়ে যায় ঘর ছেড়ে। পিছনে হাত দিয়ে, দেওয়ালে টাঙানো ফোটোগ্রাফগুলো দেখতে দেখতে, মরালগতিতে সে চলে গেল বহির্দ্বারের দিকে। কাচ-পার্টিশনের ভিতর দিয়ে জ্বলন্ত একজোড়া চোখে ওকে দেখতে থাকে কাকলি। ঠিক কাউন্টারের কাছে পৌঁছেই ভৈরবের বাঁ-হাতটা ঢুকে গেল বাঁ-পকেটে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে সে তাকিয়েছিল রাস্তার দিকে। কিন্তু যন্ত্রচালিত ভঙ্গিতে বাঁ-হাতখানা রাখল সুপর্ণার কাউন্টার-টেবিলে। হাতটা সরে যেতেই কাকলি দেখল — কী একটা কালো মতন জিনিস। কালো নয়, নীলচে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সুপর্ণা সেটা নামিয়ে রাখল তার ড্রয়ারে।

কী হতে পারে? কাকলি উত্তেজিত ছিলই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সে ছুটে চলে গেল কাউন্টারের কাছে। সুপর্ণা সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালো। কাকলি জানতে চাইল, ভৈরববাবু তোমাকে কী দিয়ে গেলেন?

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে সুপর্ণা বললে, তা নিয়ে আপনার এত কৌতূহল কেন?

— যেহেতু দোকানটা আমার, কাউন্টারটা আমার, কাউন্টারে বসা মেয়েটি আমার কর্মচারি।

সুপর্ণা নিঃশব্দে ড্রয়ার খুলে বার করে জিনিসটা দেখালো।

একটা ক্যাডবেরি চকোলেটের প্যাকেট।

কাকলি অবাক হল। কিছু বলল না। সে পিছন ফেরার উপক্রম করতেই সুপর্ণা ক্যাডবেরি চকোলেটের প্যাকটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়।

কাকলি প্রশ্ন না করে পারল না, কী হল? এভাবে ফেলে দিলে কেন?

সুপর্ণা বললে, যেহেতু চকোলেট-প্যাকেটটা আমার, প্রেজেন্টেশনটা আমার, কাউন্টারে বসা মেয়েটি আমি নিজে।

কাকলি কী বলবে ভেবে পেল না।

তারপর হঠাৎ বলে বসল, আয়াম সরি।

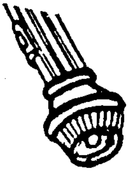

তিন

নিজের ঘরে ফিরে এসে কাকলি ভাবতে বসল।

ভৈরব দাশ কী চায়? সে যে কী চায় তা অবশ্য জানতে বাকি নেই কাকলির, কিন্তু কায়দা করে স্বর্ণদির ওই দশ শতাংশ শেয়ার সে কেন কিনেছে? ওর খাতাপত্র দেখতে পারবে বলে? ওর যাবতীয় পরিকল্পনায় তিনভাগের একভাগ নাক গলাতে পারবে বলে? এভাবে শত্রুতা করে ভৈরবের কী লাভ? বোধহয় লোকটার স্বভাবই ওই রকম। বড়লোকের আদুরে ছেলে। ছেলেবেলা থেকে যা চেয়েছে, হাতের কাছে পেয়েছে। আদর দিয়ে বাবা-মা হয়তো ওর মাথাটা শৈশবেই খেয়েছেন। কাকলি যে ওর প্রতিটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এটা সে সইতে পারছে না।

হঠাৎ কাকলির মনে পড়ে গেল এক বান্ধবীর কথা। মেয়েটি ঘটনাচক্রে একটা চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। কিছু অপরাধজীবী সুপরিকল্পিতভাবে তাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। তাকে অদ্ভুতভাবে বাঁচিয়ে দেন একজন ব্যারিস্টার—শুধুমাত্র সুপরামর্শ দিয়ে। নিরপরাধ মেয়েটি ওদের ষড়যন্ত্রজাল ভেদ করে অক্ষত বের হয়ে আসে। কাকলির মনে পড়ে গেল সেই ব্যারিস্টারটির নাম। টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে নিয়ে নম্বর দেখে ও তাঁকে ফোন করল।

ও-প্রান্তে ফোন ধরলেন একজন মহিলা, পি. কে. বাসুর রেসিডেন্স। বলুন?

কাকলি বললে, আমার নাম কাকলি দত্ত। আমি একটা বিপদে পড়ে গেছি। আইন অনুসারে আমার কী করা উচিৎ বুঝে উঠতে পারছি না। বাসু-সাহেবের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছি।

— আমি মিসেস বাসু বলছি। আমিই ওঁর সেক্রেটারি। আপনার বিপদটা কী জাতের আমাকে কিছু আভাস দিতে পারেন?

— পারি। আমি 'সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোরস'-এর মালিক। ঠিক মালিক নই। এটা একটা ছোট কোম্পানি আর কি। আমরা দুই বোন আশি ভাগ শেয়ার-হোল্ডার। শুধু বিশ শতাংশ শেয়ার ছিল আমাদের পরিবারের বাইরে। দুর্ভাগ্যবশত একজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী তার ভিতর দশ শতাংশ শেয়ার অতি সম্প্রতি কিনেছে। আমার আশঙ্কা, লোকটা আমাদের বিপদে ফেলতে চাইছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কতটা অধিকার, কী করণীয়, ইত্যাদি —

— বুঝেছি। বিষয়টা তাহলে খুব জরুরি নয়, কেমন?

— না মানে, আমি খবরটা এইমাত্র জেনেছি। আতঙ্কিত হয়ে প্রথমেই জানতে চাইছি আই মীন, উনি যদি আমার সমস্যাটা —

— ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাল বিকাল চারটের সময় আপনি ওঁর চেম্বারে আসতে পারবেন কি? চেম্বার মানে বাড়িতেই, নিউ আলিপুরে —

— হ্যাঁ, ঠিকানা তো টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আছে। তাই আসব। কাল বিকালে। এই সময়?

— না। এখন চারটে দশ। ঠিক চারটেয় আসবেন। উনি ভীষণ পাঙ্চুয়াল। আমি ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্যাডে লিখে রাখলাম।

— ঠিক আছে। তাই আসব। চারটেয়।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে কাকলি আবার বাইরে বার হয়ে এল। সুপর্ণাকে, বললে, আমি একটু বেরুচ্ছি। সাতটার মধ্যে দোকানে ফিরে না এলে তুমি দোকান বন্ধ করে চলে যেও। বাইরের চাবি গোপালের কাছে দিয়ে যেও। গোপাল দুধ আনতে গেছে। এখনি ফিরে আসবে।

গোপাল ওর ঠিকে চাকর, পাশের বাড়িতেই থাকে।

প্রবেশপথের কাছেই যে প্রমাণ মাপের আয়নাটা আছে তাতে নিজ প্রতিবিম্বের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। হাতব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে চুলটা আঁচড়ে নিল। শাড়ির নিচের দিকটা একটু টেনে-টুনে ঠিক করল। বত্রিশ বছর বয়সেও তাকে দেখলে লোকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বলে ভুল করে। মেদবর্জিত সুঠাম দীর্ঘ দেহ। কয় বছর কঠোর পরিশ্রম করে সে দোকানটাকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে এসেছে। দুর্দান্ত প্রতিকৃতি তুলবার সুখ্যাতি শহরময় এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে, দূর-দূরান্ত থেকে ওর কাছে ফটো-তোলাতে খদ্দের ছুটে আসে। এই সুখ্যাতি ওর চরিত্রে একটা আলাদা মর্যাদা অর্পণ করেছে। কাকলি দত্ত আলোকচিত্র-শিল্পী মহলে এখন একটি সুপরিচিত নাম। কাকলি বাসস্টপের দিকে এগিয়ে গেল। অফিস-টাইমের ভিড় এখনো শুরু হয়নি। অপ্রয়োজনে সে ট্যাক্সি চাপে না। ফিয়াট গাড়িটা যোধপুর পার্কের বাড়িতেই আছে। ওটা জয়া ব্যবহার করে না এখন। তা হোক, কাকলিও সেটা ব্যবহার করে না। ওটা তো দিদির।

সুপর্ণা পিছন থেকে তাকিয়ে দেখছিল। মনে মনে ভাবছিল — কী আছে ওই ত্রিশোত্তীর্ণা মহিলাটির, যা নেই ওর নিজের — এই একুশ বছরের দৃপ্তযৌবনার? কেন ভৈরব দাশ ঐ যৌবন-উত্তীর্ণার পিছন পিছন হ্যাংলার মতো ল্যাং-ল্যাং করে ঘুরে মরছে, অথচ সুপর্ণাকে একটা ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করতেও দিতে চায় না?

বাড়ির পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে কাকলি তার ভ্যানিটিব্যাগ খুলে ল্যাচ-কীটা বার করল। সদর-দরজায় ইয়েল-লক। একটা চাবি থাকে কাকলির কাছে। একতলায় শুধু ওর বেডরুমটাই তালাবন্ধ আছে — বাকি ঘর দুটি জয়া ভোগ করছে। অবশ্য জয়া বর্তমানে নিচে নামতে পারে না। আছে দ্বিতলের বড় ঘরটায় — এককালে যেটা ছিল হরগোপালের মাস্টারস-রুম।

দরজা খুলে একতলার ড্রইংরুমে ঢুকেই নজর হল একটা সোফায় আধশোয়া যাদুগোপাল স্টেটসম্যান পড়ছে। তার বাঁ-হাতে একটা সবুজ-মলাটওয়ালা ছোট্ট পকেট-বুক। ওর বাঁ-কানের উপর একটা লাল-নীল পেনসিল। দরজায় শব্দ হতেই সে চোখ তুলে তাকালো। মুহূর্তমধ্যে বিরক্তির অভিব্যক্তির উপরে স্মিতহাস্যের অভ্যর্থনার একটা ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল। কানের পাশ থেকে পেনসিল এবং বাঁ হাতের পকেটবইটা তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবির পাশ পকেটে ঢুকিয়ে বললে, কাকলি যে! আজ এত সকাল সকাল?

কাকলি সপ্তাহে দু-তিনদিন আসে। সচরাচর দোকান বন্ধ করে। সে বললে, দিদি কি ঘুমুচ্ছে?

— না, বই পড়ছে।

— ঠিক আছে, তাহলে উপরেই যাই। তুমি বেরুচ্ছ না তো?

— না। হঠাৎ ও কথা জিজ্ঞেসা করলে কেন?

— পাঞ্জাবি পরে বসে আছো তো! যা হোক, নেমে এসে তোমার সঙ্গেও দু-একটা কথা বলব, তাই জানতে চাইছি।

— না। আমি বাড়িতেই আছি।

কাকলি কোনাকুনি ঘরটা পার হয়ে দ্বিতলে যাবার সিঁড়ির মুখটায় থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ ঘুরে বললে, একটা কথা বলি যাদু, কিছু মনে কর না। রেস-খেলা বেআইনি নয়। নিজের টাকায় যে কেউ রেস খেলতে

পারে। লোকজনকে দেখলে রেসের-বই ওভাবে লুকিয়ে ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই। ওটা বিশ্রী লাগে।

যাদুগোপাল কথাটা অন্যদিকে মোড় ঘোরাতে চাইল, কতবার বলেছি কাকলি, এখন আমাকে নাম ধরে ডাকলে ভাল দেখায় না। হাজার হোক, আমি তোমার বড় ভগ্নীপতি।

কাকলি হেসে বলল, সে তো নিতান্ত ঘটনাচক্রে। হাজার হোক, দিদি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি রাজি হলে ওকেই তো "দিদি" বলে ডাকতে হত তোমাকে। তাই না?

— কিন্তু তুমি তো রাজি হওনি।

কাকলি জবাব দিল না। উঠে গেল দ্বিতলে। তখনো দিনের আলো ম্লান হয়ে আসেনি, তবু জয়া বেড ল্যাম্পটা জ্বেলেছে। কাকলিকে দেখে ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বইটা নামিয়ে রেখে বললে, আজ এত সকাল-সকাল?

— 'সকাল-সকাল' নয়, এটাকে বলে 'বিকেল-বিকেল'! দোকানে খদ্দের নেই। তাছাড়া তোকে দেখবার জন্য হঠাৎ মন কেমন করল। ওটা কী বই?

— বাদ দে। কিছু খাবি? নেতাই আছে?

জয়ার টুলের উপরেই ছিল একটা কল-বেল। জয়া সেদিকে হাত বাড়াতেই কাকলি বাধা দিল। বললে, এখন নয় রে, দিদি। ওষুধপত্র ঠিকঠাক খাচ্ছিস তো?

— আমি কি খাচ্ছি? যাদু খাওয়াচ্ছে। একেবারে ঘড়ি ধরে। বেচারি ভারি আটকা পড়েছে। বাড়ি থেকে বেরুতেই পারে না।

— কেন, নেতাই তো আছে। শিবুর মাও আছে।

— তা আছে, তবু যাদু যেভাবে আমার সেবা করে—

কাকলি উঠে দাঁড়ায়। বলে, পরে আবার আসব। একটা কথা আছে যাদুর সঙ্গে। সেটা সেরে আসি—

জয়া হাত বাড়িয়ে কাকলির মণিবন্ধটা চেপে ধরে, জরুরি কথা? কী কথা?

— ডাক্তারবাবু কী বলেন শুনতে পাস না? এখন তুই এসব কথা একদম ভাববি না।

— ভাবি কি আর সাধে? তোরা দু'জনে যে দু-মুখো হাঁটছিস!

— মানে?

— আমি কি বুঝি না, কলি? তোরা দু'জনেই দু'জনকে দেখতে পারিস না!

— এসব চিন্তা একদম করবি না কিন্তু। তাহলে আমি এবাড়ি আসা বন্ধ করে দেব।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা—

কাকলি নিচে নেমে এল। যাদুগোপাল তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে রেসের বইখানা বার করেনি। পেনসিলটাও পকেটস্থ। কাকলিকে দেখেই বললে, চা খাবে তো? নেতাই মাদার-ডেয়ারি থেকে দুধ আনতে গেছে। আমিই চাটা বানাই। কী বল?

— না থাক। শোন যাদুগোপাল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে—আমি মনে করি—আমাদের তিনজনের কিছু খোলাখুলি কথাবার্তা হওয়া দরকার।

— সেটা অসম্ভব, কলি। জয়াকে এখন বিজনেস-সংক্রান্ত কোনো কথা বলা যাবে না। ডাক্তারের বারণ। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনটা কী?

— আজ ভৈরব দাশ এসেছিল দোকানে।

— ভৈরব দাশ? সেই ফ্লপ-স্পেশালিস্ট প্রোডিউসার? কী চায় সে?

— আমাদের দোকানের অন্তত ফিফটি-ওয়ান পার্সেন্ট শেয়ার।

— বটে! তাকে বলতে পারলে না যে, দ্বিতীয়বার দোকানে ঢুকলে তাকে "ট্রেসপাসার" হিসাবে ধরিয়ে দেওয়া হবে?

— না যাদুগোপাল। তা আমি বলতে পারিনি। তার হেতু, ভৈরব দাশ আমাদের কোম্পানির একজন

মেজর শেয়ার-হোল্ডার। দশ পার্সেন্ট!

— শেয়ার-হোল্ডার মানে? টেন পার্সেন্ট? ভৈরব দাশ কোন সূত্রে —

— স্বর্ণদি! ভৈরব তার কাছ থেকে সব শেয়ার কিনে নিয়েছে। আমাদেরই ভুল। আমাদের উচিত ছিল স্বর্ণদি যখন চাকরি ছেড়ে চলে গেল তখন শেয়ারগুলো কিনে নেওয়া — স্বনামে-বেনামে যাই হোক। এটা আমাদের ত্রুটি।

কাকলির মনে হল একথা শুনে স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল যাদুগোপাল। বললে, তাই বল। কিন্তু সে তো মাত্র দশ শতাংশ....

— না, যাদু, ভৈরব অত সহজে থামবে না। সে এখন আইনত ডিরেক্টরস বোর্ডের মেম্বার-

— তা সে নয়, যতক্ষণ না শেয়ারগুলো ওর নামে এন্ডোর্স হচ্ছে।

— হতে পারে। আমি ঠিক জানি না, আইন কী বলে। তাই কাল বিকালে আইনের পরামর্শ নিতে একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।

— ভাল কথা। কে তিনি?

— পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল।

— তিনি নিলেন তোমার কেস? তাঁর সঙ্গে কথা বলেছ?

— না। তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে বলেছি।

— তাই বল। এসব 'পেটি-কেস' উনি ছোঁন না। আমি বরং তোমাকে দু-একজনের নাম বলছি, লিখে নাও—

— এখনই নয়। আগে বাসু-সাহেব প্রত্যাখ্যান করুন আমাকে। প্রত্যাখ্যান করলেও অন্তত কার কাছে যাব সে পরামর্শটা তিনি আশা করি দেবেন।

— তুমি ঘুরিয়ে কি এ-কথাই বলতে চাইছ কাকলি যে, তোমার নিকট-আত্মীয়ের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে ওই অচেনা ব্যারিস্টার-সাহেবের পরামর্শ মতোই তুমি চলতে চাও?

— না যাদু, আমি না-ঘুরিয়ে সোজাসুজি এ কথাটাই তোমাকে বলতে চাই যে, তুমি পাঁচ-সাত বছর ধরে আইন পড়ছ বটে — এখনো পাশ করনি — আর তিনি কলকাতা বারের —

— অল রাইট, অল রাইট। আর কিছু বলবে?

— আমার মনে হল আমাদের দুই বোনের সব শেয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে তাঁকে দেখানো দরকার। উনি হয়তো সেগুলো দেখতে চাইবেন। অরিজিনাল শেয়ার সার্টিফিকেটস্।

যাদুগোপাল মাথা নেড়ে বলল, না, কলি। তা তিনি চাইবেন না, অ্যাজুমিং তিনি তোমার কেসটা নেবেন।

— ঠিক আছে, দেখতে না চাইলে আবার ফেরত নিয়ে আসব। দিদির শেয়ারের কাগজগুলো একটু বার করে দেবে?

যাদুগোপাল রীতিমতো বিরক্ত হল। বলল, কেন এমন অবুঝের মতো আমাকে বিরক্ত করছ, কাকলি। বলছি, সেগুলি উনি দেখতে চাইবেন না। তাছাড়া শেয়ারের কাগজগুলো বাড়িতে নেই। ব্যাঙ্ক-ভল্টে রাখা আছে।

— ব্যাঙ্ক ভল্ট? যেটা দিদি আর আমি জয়েন্টলি খুলেছিলাম?

— না। এটা নতুন একটা ভল্ট। আমরা দু'জন খুলেছি। বিয়ের পর।

— ও! তা তুমি কাল সকালে একবার কষ্ট করে ব্যাঙ্ক-ভল্ট থেকে শেয়ারগুলো নিয়ে আসবে? আমি বিকাল তিনটে নাগাদ তা পিক-আপ করে নেব?

হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল যাদুগোপাল। কার্য-কারণসূত্র ঠিক বোঝা গেল না। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। ঘরময় পায়চারি শুরু করল। বললে, প্লীজ, স্টপ ন্যাগিং, কাকলি। ব্যারিস্টার-সাহেব যদি অরিজিনাল শেয়ারের কাগজ দেখতে চান চাহলে তোমার দিদির শেয়ারগুলো আমি দেখিয়ে আনব।

পরের সপ্তাহে। আর য়্যু স্যাটিসফায়েড?

কাকলি নির্বাক তাকিয়ে থাকে। যাদুগোপাল বোধকরি বুঝতে পারে যে, সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তাই ওর মুখোমুখি বসে বলে, কিছু মনে কর না, কাকলি। আমি নিজেই পড়েছি একটা বিপদে। তাই আমার মাথার ঠিক নেই। রূঢ় কথা যদি কিছু বলে থাকি—

বাধা দিয়ে কাকলি বললে, কী বিপদ তোমার?

— আরে সে এক মাতালের কাণ্ড। তোমাকে বলিনি। তোমার পেটে তো কথা থাকে না—দিদিকে বলে বসবে। আর তাহলেই সে worry করতে শুরু করবে। ইয়ে হয়েছে....তোমার দিদির ফিয়াট গাড়িখানায় এক মাতাল ড্রাইভার এসে মেরেছে ধাক্কা। ক্ষতি বেশি হয়নি। সামনের হেডলাইট ভেঙেছে শুধু। ডান দিকের মাড-গার্ড আর রিয়ার-ভিয়্যু আয়নাটাও চুরমার হয়ে গেছে।

— কদিন আগে?

— লাস্ট উইকে। ইন ফ্যাক্ট, গত সোমবার।

— তুমি চালাচ্ছিলে?

— আরে না। গাড়িটা বিজলী সিনেমার সামনে পার্ক করা ছিল। জাস্ট সিটিং-ডাক। লোকটা পাঁড় মাতাল। কোথা থেকে এসে মেরেছে পিছন থেকে ধাক্কা।

কাকলি অবাক হয়ে বললে, পিছন থেকে ধাক্কা মারল, আর তোমার সামনের হেডলাইট গেল ভেঙে। মানে?

— আরে বাবা, পিছন থেকে ধাক্কা লাগলে গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে না? একটা ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা লেগে....

— আই সী। সে গাড়ির নম্বরটা নিয়েছ?

— কোত্থেকে নেব? বলছি না, আমি সেখানে ছিলামই না। একটা দোকানে ঢুকেছিলাম। ফিরে এসে দেখি এই কাণ্ড। প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল তারা এতই গাঁইয়া যে, ও গাড়িটা হাওয়া হয়ে যাবার আগে তার নম্বরটা টুকে রাখেনি।

— আই সী। তোমাদের গাড়িটা কোথায়?

— সারিয়ে নিয়েছি। গ্যারেজেই আছে।

কাকলি উঠে দাঁড়াল। বলল, ঠিক আছে। গাড়ি তো সারিয়েই নিয়েছ। তাহলে কাল সকালে ব্যাঙ্কে গিয়ে—

— কী আশ্চর্য! এককথা কতবার বলবে কাকলি? কাল সকালে আমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ওই অ্যাকসিডেন্টের খেসারত আদায় করা।

— ও! তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু একটা কথা আমাকে সত্যি করে বলবে যাদুগোপাল?

যাদুগোপাল উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী?

— দিদির শেয়ারগুলো সত্যি সত্যি ব্যাঙ্ক-ভল্টেই আছে তো?

হঠাৎ ধৈর্যচ্যুত হয়ে গেল যাদুগোপাল। বললে, তুমি আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলবে কাকলি? কেন আসো রোজ দিদির কাছে? তার মনটাকে এখন আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিয়ে তোমার কিছু লাভ আছে? যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

কাকলি চাপা গর্জন করে ওঠে, আস্তে, আস্তে, চ্যাংড়া মস্তানের মতো গলাবাজি কর না। তুমি কী চাও? দিদি বুঝে ফেলুক আমরা দুজন ঝগড়া করছি?

দু'হাতে মুখ ঢেকে যাদুগোপাল বসে পড়ে। দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে, ঝগড়া যদি সত্যিই না করতে চাও তাহলে প্লীজ বাড়ি চলে যাও। তুমিও হাঁফ ফেলে বাঁচো, আমিও বাঁচি।

* * *

কাকলি সোজা চলে গেল একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ-এ। এখনো পাঁচটা বাজেনি। অফিসগুলো

বন্ধ হয়নি। সে প্রথম টেলিফোন করল ন্যাশনাল ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির ক্লেম সেকশানে। সেখানে জানা গেল ওর ফিয়াট গাড়ির কোনও ক্লেম পেন্ডিং নেই। অর্থাৎ অ্যাকসিডেন্ট যদি আদৌ হয়ে থাকে তবে যাদুগোপাল সেজন্য কোনও দাবী পেশ করেনি। কেন? দুটো সম্ভাবনা। হয়, দুর্ঘটনা আদৌ হয়নি, অথবা দুর্ঘটনার অন্তরালে এমন কিছু আছে যা যাদুগোপাল গোপন করতে চায়। দ্বিতীয় ফোনটা করল ভবানীপুর থানায়, ইন্সপেক্টর শ্যামল মণ্ডলকে। ভাগ্যক্রমে সে সীটে ছিল। শ্যামল একজন অ্যামেচার ফোটোগ্রাফার, কাকলির গুণগ্রাহী; আর তার দোকানের বাঁধা খদ্দের। শ্যামল মাধ্যমে জানা গেল গত সপ্তাহে থানার পাশে — ঠিক বিজলী সিনেমা হলের সামনে — একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির সঙ্গে একটা ফিয়াট গাড়ির ধাক্কা লাগে। দোষ সম্পূর্ণ ফিয়াট গাড়ি-চালকের। ক্ষতি বেশি হয়েছে অ্যাম্বাসাডারের। সে গাড়ির চালককে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। সে গাড়ি চালাচ্ছিলেন গাড়ির মালিক সুরেশ কাপাডিয়া। তাঁর গাড়ির ও টেলিফোন নম্বর শ্যামল দিতে পারল।

অতঃপর কাকলি ফোন করল কাপাডিয়া সাহেবকে। দেখা গেল কাপাডিয়া সাহেব সাবধানী। প্রথমেই জানতে চাইলেন, জী হাঁ, অ্যাকসিডেন্ট তো হুয়া হ্যায়, লেকিন আপ কৌন?

কাকলি জানালো যে, সে ন্যাশনাল ইন্‌শিওরেন্স কর্মী। ঐ ফিয়াট গাড়ির মালিক খেশারত দাবি করেছেন, তাই ও প্রকৃত তথ্য জানতে চাইছে।

— তব আপ ভবানীপুর থানামে যাইয়ে। ওইখানে সব পাত্তা মিলে যাবে।

— সেখানে গিয়েই তো আপনার নাম, টেলিফোন নম্বর পেয়েছি। আপনি যদি কাইন্ডলি ঘটনাটা করোবরেট করেন — মানে, ঠিক কী হয়েছিল? কিভাবে দুর্ঘটনা হল?

— আরে ম্যাডাম, হামি বিজলী পিকচার-হৌসে টিকিট খরিদ করে হমার গাড়িতে বসেছে। গাড়ি স্টার্ট ভি দি নাই। অচানাক বহ্‌ মাতোয়ারা আসে হমার বনেটে মারল ধক্কা! দ্রাম! ব্যাস। হামি বিলকুল লেংড়া।

— হ্যাঁ শুনেছি, আপনাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। এখন ভাল আছেন তো?

— হাসপাতাল নেহি, ম্যাডাম, নার্সিংহোম। অখন কুছ ভালো আছি।

— ওই ফিয়াট গাড়ির কারও চোট লাগেনি?

— জী না। না যাদুগোপাল, না উনার মিসেস।

— মিসেস? যাদুগোপালের স্ত্রীও ছিলেন গাড়িতে?

— ম্যাডাম! হামি ওঁদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখিনি। তবে সামনের সীটে ওঁর পাশে যেভাবে বসেছিলেন—ওয়েল, গার্ল ফ্রেন্ড ভি হোতে পারেন। উইটনেস হিসাবে পুলিশ তাঁর নাম পতা লিখে নিয়েছিল—হমার ভি য়্যাদ আছে ; নবনীতা রায়, 'সোনালি স্বপন', সাত-বি চৌরঙ্গী টেরেস।

— একটা কথা, যাদুগোপালবাবু কি মাতোয়ারা অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন?

— সচ্‌ বাত শুনার হিঞ্ছা আছে?

— জী হাঁ, নিশ্চয়। বলুন?

— তব কাল উলটি-টাইমমে ফোন কিজিয়ে।

— কেন? কাল সন্ধ্যায় কেন? আজ বলতে পারেন না?

— জী না। যাদুগোপাল কাল সুবে হামার ডেরায় আসবে। ক্যাস-ডাউন কম্পেনসেশন! হামার ডিমান্ড মোতাবেক সেটলমেন্ট হৈয়ে গেলে যাদুগোপাল ড্রাঙ্কার্ড ছিল না। না হৈলে সে আলবাৎ মাতোয়ারা ছিল। সমঝলেন?

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইনটা কেটে দিল কাকলি।

ধীরে ধীরে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। কেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি কিছু খবর রাখে না, কেন যাদুগোপাল দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে একগাদা মিছে কথা বলেছিল। কিন্তু একটা কথা, দিদির শেয়ারের ওরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলো ব্যাঙ্ক-ভল্টেই আছে তো?

চার

চৌরঙ্গী পাড়ায় "সোনালি স্বপন" বার কাম রেস্তোরাঁ খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না। এবার কাকলি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল। তাই সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই এসে পৌঁছালো মদিরাগারের সামনে। সন্ধ্যা সাড়ে-ছয়টা থেকে 'ফ্লোর-শো' শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ পপ্ গান গাইতে সমবেত হয় কয়েকটি ছেলে মেয়ে। রাত যত বাড়ে পপ্-গানের তাল তত বৃদ্ধি পায়। গানের সঙ্গে নাচের তাল দিতে দিতে গায়ক-গায়িকার দল নর্তক-নর্তকীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আনন্দের হিল্লোল সংক্রামিত হয় পানাহারেচ্ছুদের মধ্যে। তারাও জোড়ায় জোড়ায় নাচতে উঠে আসে।

এমন পরিবেশে কাকলির মতো বাঙালী মেয়ে কখনো একা-একা আসে না। আসে জোড়-বেঁধে। অধিকাংশই বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে, কেউ বা হবু-বর, ক্বচিৎ কর্তার হাত ধরে। নেহাৎ যদি কেউ একা আসে — ঐ বয়সের মেয়ে — তাহলে পানাহারকারীরা ধরে নেয় তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। তাই দ্বারের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ও।

দরজার বাইরে একটা টুলে বসেছিল উর্দিপরা একজন দশাসই দ্বারপাল। উষ্ণীষ-সমেত তার উচ্চতা দুই মিটারের কাছাকাছি। লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। সেলাম দিল এবং বাতানুকূল করা আসবাগারের ডবল-ডোর-এর বাহিরের দ্বারটা সসম্ভ্রমে খুলে ধরল। লোকটা মনে হয় অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। কাকলি আর ইতস্তত করল না। ঢুকে গেল আসবাগারে।

প্রথমটা কিছুই নজর হল না। ভিতরটা আলো-আঁধারি। নীলাভ একটা মোহময় বাতাবরণ। যেন সে সূর্যালোকিত প্রান্তর অতিক্রম করে হঠাৎ অজন্তার সপ্তদশ গুহা-বিহারে ঢুকে পড়েছে। অন্ধকারে মনে হয় — এখানে-ওখানে কারা যেন বসে আছে। ছোট ছোট গ্রুপ। রাজা-রাণী খলনায়ক-খিদমদগার। ঐ ছোট ছোট গ্রুপকে ঘিরে এক-একটা 'জাতক' কাহিনী। কোনটা মিলনান্তক, কোনটা বিয়োগব্যথায় বিধুর। কিছুই বোঝা যায় না। জন্ম যে নিয়েছে সে-ই তো জাতক।

একটু অপেক্ষা করার পর নজর হল, ও-প্রান্তে একটি কাউন্টার। লম্বাটে একটা টেবিল। তার ও-পাশে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বর্ষিয়সী মহিলা, কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে ফিরে বললেন, ইয়াস?

কাকলি ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, নীতা কি এসেছে?

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে মহিলা প্রতিপ্রশ্ন করেন, নীতা! নীতা কে?

— আই মীন, নবনীতা রায়!

— আই সী। ঐ তো ও কোনায় বসে আছে।

— ঐ স্টীল-গ্রে রঙের মুর্শিদাবাদী পরে?

— হ্যাঁ ; কিন্তু আপনি কি ওকে চেনেন না?

কাকলি একগাল হেসে বলে, অর্ধেক দোষ আমার, অর্ধেক আপনাদের!

— তার মানে ?

— আমার দৃষ্টিশক্তি একটু ক্ষীণ, তার উপর আপনারা ঘরটাকে প্রায় অন্ধকারে ঢেকে রেখেছেন! এনি ওয়ে, থ্যাঙ্কয়্যু।

পায়ে পায়ে ও এগিয়ে গেল হল-কামরার ও-প্রান্তে। খাদ্যরসিকরা হয়তো খেয়াল করল, পানরসিকেরা করল না। স্টীল-গ্রে রঙের মুর্শিদাবাদী এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল সবই। সেও কৌতূহলী একজোড়া চোখ মেলে তাকালো।

— আপনিই নবনীতা রায়?

— হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক —

— না, আপনি আমাকে চেনেন না। আমার নাম জয়তী চক্রবর্তী।

— মিস না মিসেস?

— তাতে কি কোনও তফাৎ হবে? আপনি তো কোনও অবিবাহিত যুবক নন।

— না, তা নই। তা হলে অবশ্য আপনাকে ও প্রশ্নটা আদৌ জিজ্ঞেস করতাম না। এ আসবাগারে অবিবাহিত যুবকেরা জীবনসঙ্গী খুঁজতে আসে না। আসে ক্ষণিকবাদিনী সান্ধ্য-সঙ্গিনীর সন্ধানে। তাই আমি যদি যুবক হতাম — নো-ম্যাটার বিবাহিত অর অবিবাহিত — এবং আপনার মতো একটি সুন্দরী যুবতী যদি এগিয়ে এসে বলতেন 'আপনি কি রমণীমোহন রায়?' তাহলে আমি রমণীমোহন হই-না-হই রমণীর প্রতি মোহিত হয়ে রায় দিতুম — "আলবৎ! বস, বল কী পান করবে? হুইস্কি, রাম না শ্যাম্পেন?" আপনি মিস না মিসেস জনতে চাইছি একটা বিশেষ হেতুতে। বুঝিয়ে বলছি, আগে জবাবটা শুনি?

সরাসরি জবাব না দিয়ে কাকলি বলে, আপনি এতক্ষণ ওটা কী পান করছিলেন?

— ভদকা-উইথ-সিট্রা। কিন্তু আমার প্রশ্নটা নিরুত্তর রয়েছে —

— না, মিসেস নয়। মিস্।

— আশ্বস্ত হলাম। বসুন তাহলে — কী জানেন? অনেক বিবাহিতা মহিলা 'সোনালি স্বপনে' এসে হানা দেন, তাঁদের কর্তাদের পানাসক্তি বিতাড়ন-মানসে। তাঁরা আমার সাহায্য চান। অথচ এটাই হল আমার গ্রাসাচ্ছাদনের আয়োজন। এটাই আমার চাকরি....

— চাকরি? আপনি 'সোনালি স্বপনে'র স্টাফ?

— না, স্টাফ নই। কমিশনড এজেন্ট বলতে পারেন। ওয়েট্রেস নই। 'বার-মেইড' শব্দটা আমার অপছন্দ। 'সাকী' বললে খুশি হব।

কাকলি ওর বিপরীতে চেয়ারে বসে পড়েছে। বলে, না, আমার স্বামীর বালাই নেই, আমার এমন কোনও বয়ফ্রেন্ডও নেই যাকে 'পানদোষ' মুক্ত করতে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।

— দ্বিগুণ আশ্বস্ত হলাম। তাহলে আপনার আগমনের হেতু?

এই সময় একটি বেয়ারা মেনুকার্ড হাতে এগিয়ে এল ওদের টেবিলের দিকে। নবনীতা তাকে বললে, না গিরিধারী, ইনি আমার বন্ধু। কিছু খেতে আসেননি, তুমি....

কাকলি বললে, বৈকালিক চা-পানটা অসমাপ্ত আছে। এখানে কি চা পাওয়া যাবে?

গিরিধারী বললে, যাবে। আর কিছু?

— চিকেন কাবাব? ফিশ ফিঙ্গার? পাওয়া যাবে?

— দুটোই তৈরি আছে। এনে দিচ্ছি, ম্যাডাম।

কাকলি নবনীতার দিকে ফিরে বললে, আপনার জন্য কী বলব, চা না কফি?

নবনীতা অনাসক্ত ভাবে প্রশ্ন করে, বিলটা কে মেটাচ্ছে?

— আমি যখন অর্ডার দিচ্ছি, তখন আমিই।

নবনীতা এবার গিরিধারীর দিকে ফিরে বললে, আমার জন্যে আর একটা ভদকা-অ্যান্ড-সিট্রা, ব্যস।

গিরিধারী শ্রুতিসীমার বাইরে চলে যেতেই নবনীতা প্রশ্ন করে, এবার বলুন? আপনার আগমনের উদ্দেশ্যটা কী?

— আমি একটি ইনভেস্টিগেটিং ব্যুরোয় কাজ করি। একটা ক্লেম কেস-এর অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছে আমাদের ব্যুরো। আমি তারই তদন্ত করছি ন্যাশনাল ইন্‌শিওরেন্স তরফে।

নবনীতা মাথা নেড়ে বলল, আপনি নিশ্চয় শাদা বাঙলা বলছেন এবং এক পেগ্ ভদকায় আমার নেশা হয় না। তবু আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কাকলি হেসে বলল, শুনুন, বুঝিয়ে বলি। ন্যাশনাল ইনশিওরেন্স কোম্পানি মোটর গাড়ির বীমা করে। কোনও ইনশিওর্ড গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে তার মালিক ঐ ইনশিওরেন্স কোম্পানির কাছে খেশারত দাবী করে। যদি ইনশিওরেন্স কোম্পানি মনে করে যে, দাবীর মধ্যে কিছু ফাঁকিবাজি আছে তখন তারা আমাদের ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোকে গোপনে তদন্ত করতে বলে। আমরা তদন্ত করে কোম্পানিকে

জানাই, বাস্তব ঘটনাটা কী।

— বুঝলাম। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

— নিতান্ত ঘটনাচক্রে। গত সপ্তাহে ভবানীপুরে বিজলী সিনেমার সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। একটা অ্যাম্বাসাডার আর একটা ফিয়াট গাড়িতে ধাক্কা লাগে। অ্যাম্বাসাডারের মালিক মিস্টার কাপাডিয়া ইনশিওর কোম্পানির কাছে খেশারত দাবী করেছেন। আমি সে বিষয়ে তদন্ত করতে ভবানীপুর থানায় গেছিলাম। সেখানেই আপনার নাম-ঠিকানা পাই — প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসাবে। এখন আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি ফুটপাথের দিকে ছিলেন, না রাস্তার দিকে? মানে, যখন ধাক্কা লাগে?

নবনীতা মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর বললে, এ আলোচনা আপনার সঙ্গে করতে যাব কেন? আমার কী স্বার্থ?

— তা ঠিক! আমারই ভুল। তাহলে ও প্রসঙ্গ থাক। আমার চা এবং আপনার ভদকা পান শেষ হলে বিল মিটিয়ে আমি চলে যাব। কেমন? সত্যিই তো, আপনি কেন আমাকে সাহায্য করতে যাবেন?

নবনীতা হেসে ফেলে। বলে, না, কথাটা মনে ছিল না আমার। আপনি ইতিপূর্বেই আমার জন্য এক পেগ ভদকার অর্ডার দিয়েছেন। ভদকা বা সিট্রা কোনটাতেই লবণ থাকে না, তবু এটা নিমকহারামি হয়ে যাচ্ছে। তাই কিছুটা আমাকে স্বীকার করতে হবে। প্রথমে বলি, আপনার দুটি অনুমানই ভ্রান্ত। দুর্ঘটনা মুহূর্তে আমি না-ছিলাম রাস্তায়, না ফুটপাথে। আমি ছিলাম ঐ ফিয়াট গাড়ির ভিতর। ড্রাইভারের পাশের সীটে।

— গুড গড! ঐ ফিয়াট গাড়ির চালক যদুগোপালবাবু আপনার আত্মীয় অথবা বন্ধু?

— আজ্ঞে না। এবারও আপনার ভুল হয়েছে। দু-দুটো আন্দাজই ভুল। এক নম্বর, ভদ্রলোকের নাম যদুগোপাল নয়, যাদুগোপাল। দু-নম্বর, তিনি আমার আত্মীয়-বন্ধু কিছুই নন।

— তিনি কি তাহলে আপনাকে একটা লিফট দিচ্ছিলেন?

— তার সঙ্গে আপনার ইনশিওরেন্স কোম্পানির খেশারতের কি কোনও সম্পর্ক আছে? আমি যাদুবাবুর আত্মীয় হতে পারি, বান্ধবী হতে পারি — অথবা আপনি যেমন বললেন — নিতান্ত অপরিচিতা হতে পারি, অর্থাৎ উনি আমাকে জাস্ট একটা লিফট দিচ্ছিলেন। বাস্তব ঘটনা যাই হোক, তার সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টের কী সম্পর্ক?

— সম্পর্ক কিছুটা আছে বৈকি। আপনি একটি মদিরাগারের — আপনার নিজের ভাষায় — 'সাকী'! যাদুবাবু যদি আপনাকে এই 'সোনালি স্বপন' থেকে উঠিয়ে বিজলী সিনেমার দিকে গাড়ি চালিয়ে থাকেন তখন তাঁর পক্ষে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর সম্ভাবনাটা বৃদ্ধি পায়। তাই না?

নবনীতা একটু কুণ্ঠিতস্বরে বললে, আমাকে মার্জনা করবেন, মিস চক্রবর্তী ; এ কথার জবাব আমি দেব না — দিতে পারি না। আই মীন, যাদুগোপাল সেনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, সে কেন, কোথা থেকে কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল তা আমি আপনাকে জানাতে পারি না।

— কিন্তু 'কেস'-টা আদালতে গেলে পুলিস তো আপনাকে সমন ধরাবে। তখন তো সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনাকে সব কথা স্বীকার করতে হবে।

— করব। তখন স্বীকার করব। তখন তো কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, আমি প্রতিহিংসাবশে বা টাকা খেয়ে মালিককে ফাঁসাতে চাইছি। হলফ নিয়ে আমাকে সত্য কথা বলতেই হবে।

— 'মালিককে' মানে?

— মিস চক্রবর্তী! প্লীজ এসকিউজ মী! ভদকা-উইথ-সিট্রার দামটা না হয় আমিই মেটাবো!

— কী বকছেন পাগলের মতো! বেশ তো, না বলতে চান, বলবেন না। আসুন, আমরা ততক্ষণ অন্য কিছু আলোচনা করি। সত্যজিতের শেষ ছবিটা দেখেছেন? 'আগন্তুক'?

নবনীতা আপন মনেই মাথা ঝাঁকি দিল। হঠাৎ কাকলির একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আমি....আমি একটা নরকের কীট! নরক-যন্ত্রণা সইছি। সইতে হবে বাকি জীবন! তাই ওসব কথা বলতে

পারছি না। বিশ্বাস করুন!

— বেশ তো! বলবেন না। কিন্তু আপনার হাতে-পায়ে তো শেকল পরানো নেই। দরজাটাও খোলা। নরকে পড়ে আছেন কেন?

— আপনি দেবেন আমাকে একটা চাকরি? মাইনে-টাইনে চাইনে। মাথার উপর একটা ছাদ, নিরাপত্তা আর ভাতকাপড়! দেবেন?

কাকলি কী-একটা কথা বলতে গেল। তার আগেই এগিয়ে এল গিরিধারী। নবনীতা এতক্ষণ কাকলির হাতটা ধরেছিল। সেটা ছেড়ে সোজা হয়ে বসল। গিরিধারী পানাহার টেবিলে সাজিয়ে দিল। নবনীতা ভদকার গ্লাসে সিট্রা মিশিয়ে টেনে নিল। কাকলি কাবাবের ডিশটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, খালি পেটে খাবেন না।

নবনীতা একটা কাবাবের টুকরো তুলে নিয়ে মুখে দিল। টী-পটে চামচ নাড়াতে নাড়াতে কাকলি প্রশ্ন করে, আপনি যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে নরকের কুম্ভীপাকে পড়ে আছেন। সুযোগ পেলেই এখান থেকে লাফ মেরে পালাতে চান —

— প্রভাইডেড সেটা 'ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার' না হয়ে যায়। এখানে আত্মসম্মান নিয়ে কাজটা করতে পারছি। আমি কোথায় থাকি তা এই প্রতিষ্ঠানের কেউ জানে না। ডিউটি খতম হলেই আমার মুক্তি। মাঝরাতে কেউ মত্তাবস্থায় আমার বাড়িতে চড়াও হতে পারে না। ছোট্ট ঘর — নানান অসুবিধা — নিজে হাতে সব কিছু করতে হয়। তবু সম্মানটা বজায় রাখা চলে।

— অন্য আর কোথাও কখনো চাকরির চেষ্টা করে দেখেছেন?

— দেখেছি। কিছুদিন একটা কনফেকশনারিতে কাজ করেছি। কেক, চকোলেট, প্যাস্ট্রি বানানোর কারখানায়। ছয় মাসও টিকতে পারিনি। তারপর একটা 'টয়-মেকিং-শপ'-এ খেলনা বানানোর কাজ করতে যাই। সেখানে মাস-দেড়েকও চাকরি করতে পারিনি।

— কেন? অসুবিধাটা কী হল?

— সর্বত্র ঝাঁকে-ঝাঁকে হাঙর!

কাকলি বলল, এবার আমাকেই ঐ প্রশ্নটা পেশ করতে হয়। আপনি কি কুমারী, না সধবা, অথবা....

— আমি নিজেই তা জানি না।

— মানে?

— শৈশবে বাবা-মা মারা যান। মামার কাছে মানুষ। উনিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করি। মামার তিন-তিনটি অবিবাহিত মেয়ে ছিল। ভালবেসে যে ছেলেটির হাত ধরে গ্রাম ছাড়ি, সে কালীঘাটে নিয়ে এসে আমার সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। মাসখানেকের মধ্যেই জানতে পারি, আমার সেই স্বপ্নের রাজপুত্র বিবাহিত, দুটি সন্তানের জনক। অর্থাৎ আমাদের কালীঘাটের বিয়েটা অবৈধ! এবার আপনিই হিসেব করে বলুন — আমি কী? বিধবাই ধরে নেওয়া উচিত, কী বলেন? আমার সেই স্বপ্ন-রাজপুত্রের অকালমৃত্যুতে?

কাকলি বললে, 'সোনালি স্বপনে' আপনি কী সূত্রে বন্দিনী?

— অর্থনৈতিক সূত্রে। এ জবাব তো আপনাকে আগেই দিয়েছি। জুটিয়ে দিতে পারেন একটা সাদামাটা চাকরি!

— চেষ্টা করে দেখতে পারি। তাহলে জানতে হয়, আপনার কোয়ালিফিকেশন কী, কোন্ কোন্ কাজ করতে পারবেন। কত টাকা মাইনে চান, ইত্যাদি....

নবনীতা আর এক সিপ্ ভদকা পান করে প্রতিপ্রশ্ন করে, আপনি সিরিয়াসলি জানতে চান?

— কেন, আপনার সন্দেহ হচ্ছে?

— তা একটু হচ্ছে, আপনি কায়দা করে জেনে নেবার চেষ্টা করছেন যাদুগোপালের ব্যাপারটা।

— ও! তবে থাক। আসুন আর কোন বিষয় আলোচনা করি। ভাল কথা, তখন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস

করেছিলাম...কী যেন প্রশ্নটা?

— হ্যাঁ, মনে আছে আমার। না, আগে দেখিনি, এখন দেখছি।

— কী?

— 'আগন্তুক' গল্পটা শুনেছি শুধু। আপনাকেও ঠিক ঐ রকম লাগছে। আপনি 'আসল বন্ধু', না 'নকল বন্ধু' ঠিক ঠাওর হচ্ছে না। সত্যি করে বলুনতো, মিস চক্রবর্তী — কেন আমাকে চাকরির লোভ দেখাচ্ছেন?

কাকলি ম্লান হাসল। বলল, এতক্ষণে আপনার ঐ কথাটার একটা অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। ঐ যে আপনি তখন নিজেকে 'নরকের কীট' বলছিলেন না? একটা নারকীয় পরিবেশে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে আপনার চিন্তাধারাই বাঁকা হয়ে গেছে। আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না : একটি আন-অ্যাটাচড্ মহিলা — যে পুরুষশাসিত সমাজে একা-হাতে লড়াই করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে — সে সমপর্যায়ের আর একটি মেয়েকে নিঃস্বার্থ সাহায্য করতে হাতটা বাড়িয়ে দিতে পারে!

নবনীতা বাকি মদটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে বলে, জীবনে বহুবার বহু লোককে বিশ্বাস করে ঠকেছি। না হয় আরও একবার ঠকব। বলুন? কী আপনার প্রশ্ন? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি হায়ার সেকেন্ডারিটা কোনক্রমে পাস করেছি। রান্না করতে জানি। প্রয়োজনে কাপড় কাচব, ঘর মুছব, কিন্তু অপরের উচ্ছিষ্ট বাসন মাজতে পারব না। মাহিনা — না, সে বিষয়ে কোনও দরাদরি নেই — চাই আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং ভাতকাপড়।

কাকলি চায়ের নিঃশেষিত কাপটা নামিয়ে রেখে বললে, তাহলে তো পারব না, নীতা। ঐ শর্তটা মানা চলবে না।

— কোনটা?

— অপরের উচ্ছিষ্ট বাসন মাজব না!

নবনীতা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি একজন 'মেইড সার্ভেন্ট' খুঁজতে 'সোনালি স্বপনে' এসেছেন, মিস চক্রবর্তী?

— না, কম্প্যানিয়ন। বান্ধবী! যে পাশাপাশি চৌকিতে আমার সঙ্গে একঘরে থাকবে। হাতে-হাতে কাজ করবে। প্রয়োজনে আমি তার এঁটোবাসন ধুয়ে নেব, সে আমার উচ্ছিষ্ট বাসন ধুয়ে দেবে। কী? পারবে না?

নবনীতা পুরো বিশ সেকেন্ড ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল। তারপর বললে, আমি তাহলে আর এক পেগ্ ভদকা নেব, জয়তী!

— নিতে পার। এ পেগের দামটাও আমি মেটাব। তবে শুধুমাত্র যদি প্রত্যাখ্যান কর আমার প্রস্তাব, তাহলেই। আর যদি আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ কর — আমার বান্ধবী হতে স্বীকৃত হও, তাহলে এটাই তোমার শেষ 'পেগ'! আর কোনদিন কোন অ্যালকহলিক ড্রিংকস্ পান করা চলবে না।

— এ তো অত্যন্ত কঠিন শর্ত।

— 'বন্ধুত্ব লাভ' একটা সহজ প্রক্রিয়া ভেবেছিলে নাকি?

— অল রাইট! আই অ্যাকসেপ্ট য়োর চ্যালেঞ্জ।

— চ্যালেঞ্জ কি গো? আমি তো বন্ধুত্ব করতে হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছি, লড়াই করতে নয়।

নবনীতা ওর হাতটা তুলে নিয়ে বললে, ঠিক কথা! তুমি কোথায় থাক গো, জয়তী?

— জয়তী নয়, আমার নাম কাকলি দত্ত। আমি থাকি —

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণা। নবনীতা ওর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল, তাই বল। তাই এই ফাঁদ পেতেছ। তুমি যাদুগোপালের শ্যালিকা।

— কারেক্ট। কিন্তু ফাঁদ আমি পাতিনি, নীতা। আমার বন্ধুত্বের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হাত যেমন ছিল তেমনই আছে। যাদুগোপাল যে মদ্যপ, রেসুড়ে, এসব তথ্য আমার জানা। তার আর কোন ম-

কারান্ত দোষ আছে কি না তা আমি জানি না, জানতে চাই না। আমি শুধু অনুরোধ করব — গত সোমবার যা যা ঘটেছে তা তুমি এখনি — স্মৃতি টাটকা থাকতে থাকতে — তোমার ডায়েরিতে লিখে ফেল।

নীতা বলে, ডায়েরী! আমি ডায়েরি কোথায় পাব? আমি কি ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার না বিজনেসম্যান? আমি ডায়েরি রাখি না।

— এবার থেকে রাখতে হবে। যদি আমার 'কম্প্যানিয়নশিপ' অ্যাকসেপ্ট কর। আমার কাছে ব্ল্যাঙ্ক ডায়েরি আছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি—ঘণ্টাখানেকের ভিতর। এটা জানুয়ারি তৃতীয় সপ্তাহ। স্মৃতি থেকে একমাসের কথা সব কিছু ডায়েরিতে লিখে ফেল। আর লেখাটা চালিয়ে যেও — যাতে আদালতে দিনপঞ্জিকাটা দাখিল করলে তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কেমন?

নবনীতা নতনেত্রে কী যেন ভাবছে।

কাকলি বললে, আরে বাপু, ফাঁদই যদি পাতব তাহলে নিজে থেকে নাম-পরিচয়টা জানাব কেন, বল?

নবনীতা স্বীকার করে, তা বটে!

— তাহলে আমর কম্প্যানিয়ন হতে রাজি? বিশ্বাস কর নীতা, যাদুগোপালের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা কতদূর হয়েছে তা জানবার কৌতূহল আমার আদৌ নেই। আমি যেটা জানতে চাই, তা তোমার অজানা।

— সেটা কী?

— যাদুগোপাল তার ধর্মপত্নীকে কতটা ডোবাচ্ছে! কারণ তার সঙ্গে আমারও ডুবে যাবার আশাঙ্কা।

পাঁচ

নবনীতা মুখটা তুলে কাকলির চোখে-চোখে তাকালো। বললে, তোমার প্রশ্নটার জবাব এবার আমি দেব কাকলি।

— কোন প্রশ্নটার?

— ওই যে, মালিক লোকটা কে?

— কী দরকার? তোমার গোপন কথা তোমারই থাক না, নীতা। তুমি খোলা মনে আমার প্রস্তাবটা এখনও গ্রহণ করতে পারছ না — ভাবছ চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে আমি আমার ভগিনীপতির গোপন ব্যাপারটা জানতে চাইছি, আমার স্বার্থে — আমার দিদির স্বার্থে। না নীতা, তা নয়। আমি এখন একা থাকি — একটা মেজানাইন ফ্লোরে। তুমি জানো কি জানো না জানি না, আমি আমাদের পৈতৃক বাড়ি থেকে স্বেচ্ছায় চলে এসেছি। সে বাড়িতে থাকে দিদি আর ওই যাদুগোপাল। তুমি কি জানো, যাদুগোপালের স্ত্রী — অর্থাৎ আমার দিদি — প্রায় পঙ্গু, দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী?

— না। যাদুগোপাল সে কথা কখনো বলেনি। তবে সে তোমার নাম, তোমার কথা, তোমার দোকানের গল্প করেছিল...

— তার কারণ খুলেই বলি, যাদুগোপাল আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় বাবার মৃত্যুর পর, আমাদের 'প্রবেট' নেবার ব্যাপারে সাহায্য করতে। ও তখন বাবার এক অ্যাটর্নি বন্ধুর কাছে অ্যাপ্রেন্টিস ছিল। আমরা প্রবেট পাবার পর ও দেখল আমরা দুই বোন বেশ কিছু সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পড়েছি। যাদুগোপাল প্রথমে ঝুঁকেছিল আমার দিকে — হয়তা দিদির রুগ্ন শরীরের জন্য, অথবা বয়সে সে দিদির চেয়ে ছোট বলে — কিন্তু আমি তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার পর, সে আমার চোখের আড়ালে দিদিকে 'উ' করতে শুরু করে।

— কী করতে শুরু করে?

— Woo! নানাভাবে তোয়াজ করা আর কি। প্রেম নিবেদন বলতে যা বোঝায়। মোট কথা, দিদির

হৃদয় জয় করে একদিন দুজনে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বসে।

— দিদি তোমাকে আগে কিছু বলেনি?

— থাক সে-সব বেদনাদায়ক ইতিহাস। মোট কথা আমি ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসি। আমাদের যৌথ সম্পত্তি ওই ফোটোগ্রাফিক স্টোরসের দেড়তলায় মেজানাইন-ফোর ফ্ল্যাটে। সেখানে অনায়াসে দু-খানা চৌকি পাতা চলে। সঙ্গে আছে অ্যাটাচড কিচেনেট আর স্নানাগার। গ্যাস আছে। রান্নার মোটামুটি সব সরঞ্জাম আছে। কিন্তু মাসে দশটা দিনও রান্না করার সময় বা সুযোগ পাই না। একটা ছোকরা চাকর আছে। রাত্রে দোকানের ভিতরে শোয়। সে হতভাগা রান্নায় দ্রৌপদী। চায়ের জলটা শুধু গরম করতে শিখেছে। ফলে মাসে বিশদিন ওই চাকরটাকে দিয়ে ওড়িয়া হোটেল থেকে টিফিন-ক্যারিয়ারে করে ভাত-ডাল-মাছ-তরকারি কিনে এনে খেতে হয়। কাজের এতই চাপ। বুঝতেই পারছ, এভাবে শরীর খারাপ হবেই। অম্বলের একটা ব্যথা সম্প্রতি শুরু হয়েছে। তাই একজন সহচরী খুঁজছি আমি। এমন একজন সহচরী যে বান্ধবীর পরিচয়ে, অথবা ছোটবোনের মতো একই ঘরে থাকবে, শোবে পাশাপাশি চৌকিতে। আমরা দু'জনেই রান্নাবান্না করব। চাকরটা যদি দোকানের কাজে বাইরে থাকে তবে দু'জনেই দু'জনের এঁটো বাসন ধুয়ে নেব। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক তাহলে আমরা পালা করে দোকানে বসতে পারি। কাউন্টারে আমাকে সব সময় একজনকে রাখতে হয়। এখন যে মেয়েটা বসে — সুপর্ণা — সে গত সপ্তাহে আমাকে নোটিস দিয়ে রেখেছে। আমি তাকে আটকাতে চাই না। বেশি মাইনেতে সে যদি অন্য কোথাও ভাল চাকরি পায় তাহলে আমি তাকে কেন আটকাবো? আর তা ছাড়া আমি চাইলেই বা সে থাকবে কেন? তাই তোমাকে আমার প্রয়োজন। বন্ধু হিসাবে চাইলেও — সুপর্ণাকে যা মাহিনা দিই, সে টাকা আমি তোমার নামে ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে মাসে-মাসে জমা দিয়ে যাব। যদি কোন কারণে তোমার-আমার বন্ধুত্বে ছেদ হয় তাহলে সে টাকা নিয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবার সময় বলবে, 'তামাম শুধ'। এই সমস্ত আয়োজনটা হচ্ছে আমার স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু বিশ্বাস কর, নীতা, মানুষ সব কিছুই স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে করে না।...তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার হঠাৎ মনে হল, হয়তো আমি একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে একজন সমব্যথীর উপকার করতে পারি। সে মেয়েটি আমারই মতো এই পুরুষ-শাসিত সমাজে একা-হাতে লড়তে-লড়তে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। এখন সে পারিশ্রমিক পর্যন্ত চায় না — চায় মাথার উপর ছাদ, ভাতকাপড় আর বিশেষ করে নিরাপত্তা। আমি যদি তাকে বিশ্বাস করতে পারি তাহলে সে বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাবে। মদটা ছাড়তে পারবে। এরপর যদি ফটো তোলা বিদ্যেটা মন দিয়ে শিখতে পারে তাহলে একদিন সে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। স্বনামখ্যাত হতেই বা বাধা কী? স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া সেটাও আমার উদ্দেশ্য। — তাই 'মালিক' বলতে তুমি কাকে 'মীন' করছিলে তা আমি জানতে চাই না। — যদি না অবশ্য তুমি মনে কর, তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করার চেষ্টায় সে তোমার বা আমার ক্ষতি করতে পারে।

নবনীতা হাসতে হাসতে বলে, না কাকলি, তুমি আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে জীবন হালদার বুক ফেটে মরে যাবে না।

— জীবন হালদার লোকটা কে?

— এই কারবারের সিনিয়র পার্টনার। আমার স্বপ্নের সেই রাজপুত্র। যার হাত ধরে একদিন গ্রাম থেকে শহরের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম।

— তাকেই তুমি 'মালিক' বলছ?

— সবাই তাই বলে। যদিও এ দোকানটা পার্টনারশিপ বিজনেস। দ্বিতীয়. মালিক, স্লীপিং পার্টনার। শুধু টাকার যোগান দেয়, লাভের হিস্যা বুঝে নেয়। কলকাঠি সব জীবন হালদারের হাতে।

— তোমাকে এখান থেকে নিয়ে গেলে জীবন আপত্তি করবে না?

— আপত্তি? সে তোমাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। কেন জানো? আমাকে সে ঘাড় থেকে নামাতেই চায়। নতুন পুতুল নিয়ে খেলার শখ হয়েছে তার। শুনেছি, আজ রাতেই তার ইন্টারভিয়ু।

— এখানে?

— তুমি ছেলেমানুষ। এখানে 'ইন্টারভিয়ু' হয় নাকি? তা হবে জীবন হালদারের 'ডেন'-এ। 'ডেন' বোঝ? সিংহের বাসা। সারারাত ধরে ইন্টারভিয়ু চলবে। জমিদারি বিলোপ হবার আগে যেমন ছিল 'বাগানবাড়ি', একালীন মস্তানদের তেমন থাকে এক-একটা 'ডেন'।

— মস্তান! জীবন হালদার কি একজন মস্তান?

— স্বনামখ্যাত। পার্টি-মস্তান। ওর নামে অনেকগুলো খুন-বলাৎকার ডাকাতির মামলা ঝুলছে। অথচ পুলিশে তাকে ঘাঁটায় না। ওর দলে অনেক নামকরা গুণ্ডা।

— যাদুগোপাল কি ওই দলের?

— মোটেই না। যাদুগোপাল ও দলের কাউকে চেনে না। আমি তার যোগসূত্র। এখানে মদ খেতে আসত যাদুগোপাল। আমার সঙ্গে আলাপ। আমার মাধ্যমেই সে মালিকের কাছ থেকে মোটা টাকা ধার নিয়েছে —

— মোটা টাকা ধার নিয়েছে? কেন? কী করবে?

— বড়লোক হবে বলে। রেস খেলে। সে টাকা এতদিনে ঘোড়ার খুরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধূলো হয়ে গেছে। কী হল?

কাকলি কোনরকমে সামলে নিয়ে বলে, কিছু না!

— কিছু না মানে। তুমি ও ভাবে শকড্ হলে কেন?

ম্লান হাসল কাকলি? বলল, যাদুগোপাল কী বন্ধক [illegible] জানো?

— ঠিক জানি না। বোধহয় কিছু শেয়ার।

— হ্যাঁ ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি। আমার দোকানের শেয়ার।

— তোমার দোকানের মানে? সে কেমন করে পাবে?

— আমার দোকানের প্রায় আধাআধি শেয়ার আমার দিদির নামে। যাদুগোপাল দিদিকে দিয়ে নিশ্চয় সেগুলো এনডোর্স করিয়ে নিয়েছে।... তুমি, তুমি আমার একটা উপকার করবে, নীতা?

— বল?

— আমার সঙ্গে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর কাছে তোমাকে যেতে হবে। সব কথা তাঁকে খুলে বলতে হবে। আমি জানি না, তিনি আমাকে কতটা সাহায্য করতে পারবেন, আদৌ পারবেন কিনা। কিন্তু তোমার কাছ থেকে নিশ্চয় তিনি কিছু জানতে পারবেন। তুমি আসবে?

— কবে? কখন?

-- আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাল বিকালে। কিন্তু আমি সেটা এগিয়ে আনতে চাই। দেখি ওঁকে একবার ফোন করে। কাছাকাছি পাবলিক টেলিফোন বুথ কোথায় আছে বল তো?

— তুমি এস আমার সঙ্গে। আমাদের কাউন্টার থেকেই ফোন করতে পার, না হলে আমার ঘর থেকে।

— তোমার ঘর? সেটা কোথায়? ঘরে টেলিফোন আছে?

— হ্যাঁ, আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেটাই ছিল 'মালিক'-এর ডেন। তবে খুব কাছে নয়, ইলিয়ট রোডে।

— না, অত দূরে যাব না। তুমি বস। আমি আশপাশের কোনও দোকান থেকে ওঁকে ফোন করে দেখি। তোমাদের রেস্তোরাঁ থেকে ফোন করা ঠিক হবে না। কেউ কিছু শুনে ফেলতে পারে। এখানে অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছে যে, তুমি আর আমি দীর্ঘ সময় আলোচনা করছি। তোমার মালিকের কোনও চর যদি দোকানে থাকে তবে সে হয়তো ইতিমধ্যেই আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। আমি এখান থেকে টেলিফোন করলে সে আড়িপাতার চেষ্টা করতে পারে।

একশ টাকার একটা নোট টেবিলে নামিয়ে দিয়ে কাকলি বললে, গিরিধারী এলে বিলটা মিটিয়ে

দিও। আমি এখনি ঘুরে এসে ব্যালেন্সটা নেব।

কাছেই একটা দোকান থেকে অর্থমূল্যে টেলিফোন করার অনুমতি পাওয়া গেল। এবারও ধরলেন মিসেস বাসু। কাকলির পরিচয় পেয়ে বললেন, আপনি তো কাল বিকালে চারটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, করেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে যে, সম্ভব হলে আজ রাত্রেই আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সম্ভবপর হবে?

রানু বললেন, লাইনটা ধরে থাকুন। আমি জিজ্ঞেস করে দেখছি।

মিনিট তিন-চার টেলিফোনটা নীরব রইল। তারপর হঠাৎ ভারী গলায় শুনতে পেল, ইয়েস। পি. কে. বাসু স্পিকিং...

কাকলি বললে, নমস্কার স্যার। আমার নাম —

— আই নো। শ্রীমতী কাকলি দত্ত, পার্ট-ওনার অব সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোরস। মিস না মিসেস?

— মিস দত্ত।

— বয়স কত?

— কার? আমার?

— না তো কি আমার?

— বত্রিশ।

— ঠিক আছে, তবে 'তুমিই' বলি। হঠাৎ কী হল তোমার?

— হঠাৎ কতকগুলো সূত্রে...

— আই নো, আই নো। মিসেস বাসুকে তা বলেছ। তুমি কোথা থেকে ফোন করছ? দোকান থেকে না বাড়ি থেকে?

— আজ্ঞে না। একটা স্টেশনারি দোকান থেকে।

— তবে যেটুকু বলেছ তার বেশি বলা ঠিক নয়। তোমার আশেপাশে লোকজন আছে নিশ্চয়?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আছে।

— তাহলে ফোনে আর কিছু বল না। তুমি আজ রাত সাড়ে ন'টায় আমার বাড়িতে আসতে পারবে?

— তাই আসব, স্যার। আমার সঙ্গে আরও একজন থাকবে—আমারই বয়সী একটি মেয়ে। 'সোনালি স্বপন'-এ কাজ কর। তার নাম নবনীতা রায়। সে অনেক কথা বলতে পারবে, যা আমি জানি না। সে অনেক কিছু জানে।

— তা যদি জানে, তাহলে সে তোমাকেই তো তা জানাতে পারে?

— কিছু অসুবিধা আছে, স্যার। আপনি যেভাবে ক্রস করে ওর কাছ থেকে বাস্তব ঘটনাগুলো জানতে পারবেন, আমি হয়তো তা পারব না। আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে অনুমতি দিন স্যার, আমি ওকে নিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

— ঠিক আছে। আমার বাড়িতে আসার রোড-ডিরেকশনটা চাও?

— আজ্ঞে না, আমি জানি।

— অলরাইট। আমি প্রতীক্ষা করব। এস তোমরা। নাইন থার্টি পি. এম.।

লাইনটা কেটে দিয়ে কাকলি 'সোনালি স্বপন'-এ ফিরে এল।

নবনীতা চুপচাপ বসে আছে একই চেয়ারে।

কাকলি তার কাছে এগিয়ে আসতেই সে এক গুচ্ছ নোট আর খুচরো বাড়িয়ে ধরে।

— এটা কী?

— তোমার ব্যালেন্স।

কাকলি হাত ব্যাগে নোট-খুচরো ভরে ফেলে জানতে চায়, তোমাকে এখানে আর কতক্ষণ থাকতে হবে?

— ঘণ্টাখানেক। রাত সাতটা পর্যন্ত। কেন?

— ব্যারিস্টার-সাহেবের সঙ্গে আজ রাত সাড়ে-ন'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। তোমাকে কি এই দোকান থেকে পিক আপ করে নেব?

— না। আমাকে একবার আমার ডেরায় যেতে হবে। বাসু-সাহেবের বাড়ি তো নিউ আলিপুরে। আমি ঠিক পৌঁছে যাব। হয়তো দু'দশ মিনিট দেরি হবে।

— ঠিক আছে। ট্যাক্সি নিয়ে যেও। অ্যাট মাই কস্ট। আর তোমার টেলিফোন নাম্বারটা আমার এই ডায়েরিতে লিখে দাও। আর তোমার মালিকের 'ডেন'-এর ঠিকানাটাও। ও ভাল কথা, তুমি রাত সাতটা পর্যন্ত এ দোকানে আছ তো? তার মধ্যেই তোমাকে সেই ব্ল্যাঙ্ক ডায়েরিটা পাঠিয়ে দেব। কাল তোমাকে নিয়ে যাব আমার 'ডেন'-এ। 'ডেন' বোঝ তো? সিংহীর বাসা। তুমি শিফট্ করার জন্য তৈরি হয়ে নিও। কেমন?

নবনীতা ওর ডায়েরীতে নির্দেশ মতো টেলিফোন নম্বর আর ঠিকানা লিখে দিল। বলল, একটা কথা, কাকলি, তুমি জীবন হালদারের ঠিকানা চাইছ কেন?

— কারণ আমার ধারণা ওই ঠিকানাতেই আমার বুকের পাঁজর ক'খানা রাখা আছে। দোকানের শেয়ারগুলো। আমার ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সেগুলো খাবলা মেরে তুলে নেবার আগেই আমাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

— কে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী?

— আজ নয়, নীতা। কাল সব কথা খুলে বলব। পাশাপাশি খাটে শুয়ে শুয়ে, কেমন?

* * *

ব্যবসার বাজারটা মন্দা চলছে। বাসু-সাহেবের হাতে বর্তমান কোনও কেস নেই। বছরের প্রথম থেকেই। মামুলি কেস উনি নেন না — সে দোষটা অবশ্য ওঁর নিজেরই। বাসু-সাহেবের হাতে কেস না থাকলে 'সুকৌশলী'ও বেকার। তাই সন্ধ্যার শো'তে কৌশিক আর সুজাতা গেছে অ্যাকাডেমিতে মনোজ মিত্রের কী একটা নতুন নাটক দেখতে। রানু বসেছেন টিভি দেখতে। বাসু-সাহেব টিভি দেখেন বিশেষ বিশেষ সময়ে — বি.বি.সি.র প্রোগ্রাম। তিনি পাশের লাইব্রেরি ঘরে ইজিচেয়ারে লম্বমান হয়ে কী একটা বই পড়ছেন। রাত আটটা বাজতে পাঁচ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। বাসু বইটার পাতার ভাঁজে একটা পেজ-মার্ক গুঁজে উঠে দাঁড়ালেন। ওখান থেকেই হাঁকাড় পাড়লেন, আমি দেখছি।

তৎপরতার প্রতিযোগিতায় রানু হার মানতে রাজি নন। রিমোট কন্ট্রোলে টিভিটার কণ্ঠ রোধ করে তাঁর হুইল-চেয়ারে পাক মেরে টেলিফোন-স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাসু টেলিফোনের কাছাকাছি এসে পৌঁছবার আগেই রানু যন্ত্রটা তুলে নিয়ে কানে বসিয়েছেন, হ্যালো?...হ্যাঁ, ব্যারিস্টার বাসুর বাড়ি... আর একটু পরিষ্কার করে বলুন। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কে? কী নাম বললেন?

বাসু এসে দাঁড়িয়েছেন ওঁর পাঁজর-ঘেঁষে। টেলিফোন যন্ত্রের 'কথামুখে' হাত চাপা দিয়ে রানু বললেন, মেয়েটা মদে চুর হয়ে আছে! সব কথাই জড়িয়ে যাচ্ছে।

— মেয়েটা? সেই ফোটোগ্রাফার? কাকলি দত্ত?

— না। নবনীতা রায়।

— হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তারও আসার কথা ছিল। দাও তো ফোনটা।

রানুর হাত থেকে যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ে বললেন, ইয়েস? বাসু বলছি। বল, কী বলতে চাইছ? নবনীতা?....হ্যালো?...নবনীতা?

ও-প্রান্তবাসিনীর কণ্ঠ রীতিমতো জড়ানো — যান্ত্রিক গোলযোগ নয় — সম্ভবত ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন মিসেস বাসু : অত্যধিক মদ্যপান! ওর কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

— হ্যাঁ, বল। পরিষ্কার করে বল। কী বলছ?

— কথা দি'ছিলাম...যাবো...রাত সাড়ে ন'টায়...পার্ছি না, পার্ব না। সরি।

— কেন? কী হয়েছে তোমার? বেশি মদ খেয়ে ফেলেছ?

— মদ নয়! বিষ! ওরা আমার মুখটা....মুখটা বন্ধ করে দিল। সাখ....সাক্ষী দিতে দেবে না।

— তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?

— বা-বাড়ি থেকে।

— ঠিকানাটা বল, কুইক।

— ওরা এক বাক্স ক্যা — ক্যান্ডি পাঠিয়েছিল। বিষ মাখানো চকোলেট। খেয়ে মরেছি।... প্লীজ স্যার সেন্ড হেল্প। পুলিশ। ডাক্তার। অ্যাম....অ্যাম্বুলেন্স

— তোমার ঠিকানাটা বল? নীতা-নীতা হ্যালো....

— থার্টিন বাই ওয়ান বি থা-থা-থার্টিন বাই ওন বি

— ইয়েস। রাস্তার নাম?

ও-প্রান্ত থেকে কোনও জবাব এল না। একটা দেহপতনের শব্দ। মনে হল হাত থেকে টেলিফোনটা ছিটকে পড়ল। বাসু বার বার 'হ্যালো' হাঁকলেন। কেউ সাড়া দিল না। পুরো এক মিনিট। তারপর কে যেন যন্ত্রটা স্বস্থানে বসিয়ে দিল। তারপর স্তব্ধতা। একটানা স্তব্ধতার গুঞ্জন।

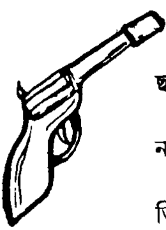

ছয়

রানু জানতে চাইলেন, কী হল হল বল তো? মেয়েটা মদ খেয়ে মাতলামি করছিল না?

বাসু তাঁর হাতের কালো যন্ত্রটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। যেন ঐ যন্ত্রের ভিতরে তিনি বিষযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরতে দেখতে পাচ্ছিলেন একটি অজানা মেয়েকে। সেদিকেই তাকিয়ে উনি বলেন, না রানু, মেয়েটা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছিল — আর তাতেই ওর কণ্ঠস্বর অমন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। কাকলি বলেছিল, এই মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সে কী-যেন একটা কথা জানে। তার মানে ঐ মেয়েটি ছিল কাকলির তরফে জোরদার সাক্ষী। হয়তো সে-জন্যই মেয়েটির মুখ ওরা বন্ধ করে দিল।

— 'ওরা' মানে?

— আমি কেমন করে জানব, রানু? এটুকু বলতে পারি তারা কাকলির প্রতিপক্ষ। আন্দাজে বলতে পারি তারা অপরাধজীবী। সচরাচর রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় তারা অবাধে অপরাধ সংঘটন করে চলে। তাদের পক্ষে কাকলির মতো অল্পবয়সী মেয়ের সর্বনাশের চেষ্টা করা এমন কোনও নতুন কথা নয়। আর সেজন্য নবনীতার মতো মেয়েকে বিষ দিতে ওদের হাত কাঁপে না। অবশ্য সবই আন্দাজে বলা। 'কেস'টা কী, তাই তো জানি না। তবে 'কেস' যাই হোক, নবনীতাকে বাঁচানোর চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু ওর ঠিকানাটা যোগাড় করি কী করে? কাকলি কি তার ঠিকানার সঙ্গে কোন টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিল?

— হ্যাঁ ওর দোকানে ফোন আছে। তার একটা এক্সটেনশন ওর ঘরেও আছে। ও নাকি ঐ দোকানঘরের উপরতলাতেই থাকে।

— তাহলে সেখানে রিং করে দেখ তো।

রানু নির্দেশ মতো টেলিফোন ডায়াল করলেন। দীর্ঘ সময় রিঙিং-টোন বেজেই গেল। বোঝা গেল, কাকলি দোকানেও নেই, বাড়িতেও নেই। দোকান নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বাড়িতে কি আর কেউ

থাকে না?

বাসু জানতে চান, কৌশিক আর সুজাতা কোথায়?

— ওরা তো বাড়িতে নেই। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ থিয়েটার দেখতে গেছে। মনোজ মিত্রের কী একটা নতুন নাটক।

— আঃ! কাজের সময় এ রকম না বলে বেরিয়ে যায় কেন?

রানুও ধমকে ওঠেন, বাঃ! না বলে কেন যাবে? তোমাকে বলেই তো গেল।

বাসু নীরবে পাইপ ধরাতে থাকেন।

— আর তাছাড়া তোমার ক্লায়েন্ট-এর সাক্ষীকে যে কেউ বিষ খাওয়াবে তা কি ওরা আগেভাগে জানত?

বাসুর পাইপে আগুনটা নিভে গেল। উনি বিরক্ত হয়ে বলেন, অহেতুক তর্ক কর কেন বলত?

— আয়াম সরি। আমার খেয়াল হয়নি যে, এটা একটা ট্রান্সফার্ড-এপিথেট।

— 'ট্রান্সফার্ড এপিথেট'! তার মনে?

— 'উয়্যারি-ওয়ে', 'স্লীপলেস পিলো'র মতো! মানে, তুমি নবনীতার ঠিকানাটা আবিষ্কারের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছ না। রাগ হচ্ছে নিজের দুর্ভাগ্যের উপর। আর ঝাল ঝাড়ছ সুজাতা-কৌশিকের উপর।

বাসুর পাইপটা ধরেছে। কিন্তু তিনি তাতে টান না দিয়েই বলেন, আচ্ছা তুমি এই মারাত্মক সময়ে রসিকতা করতে পারছ? একটা মেয়ে বিষ খেয়ে মরছে....

রানু বলেন, মোটেই নয়! মেয়েটা অতিরিক্ত মদ খেয়েছে। মদের ঝোঁকে তোমাকে কী সব আবোল-তাবোল বকেছে —

বাসু আগুনঝরা দৃষ্টিতে ধর্মপত্নীর দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, লোকাল পুলিস-স্টেশনের নম্বরটা কত?

রানুকে টেলিফোন দেখতে হল না। পর পর ছয়টা নম্বর ডায়াল করলেন। রিঙিং-টোন শুনেই বিনা কথায় যন্ত্রটা বাসু-সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

বাসু ও-প্রান্তে সাড়া পেয়েই বললেন, আমি পি. কে. বাসু বলছি। ও. সি. আছেন?

— না, স্যার, আমি খালেদ বলছি। সেকেন্ড অফিসার। ও. সি. সাহেব একটু বেরিয়েছেন। কিছু খবর আছে?

— তা আছে। সাত মিনিট আগে আমার বাড়িতে একট টেলিফোন এসেছিল। নবনীতা রায়।। বয়স অ্যারাউন্ড ত্রিশ। আজ রাত সাড়ে নয়টার সময় তার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার সঙ্গে। সে টেলিফোনে বললে যে, সে বাড়ি থেকে টেলিফোন করছে। আনফরচুনেটলি তার বাড়ির ঠিকানা অথবা টেলিফোন নম্বর আমি জানি না। একটা 'কেস'-এ নবনীতা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হত। কেসটা ঠিক কী তাও আমি জানাতে পারছি না। ....এবার মন দিয়ে শোন : টেলিফোনে নবনীতা বললে তাকে কেউ এক প্যাকেট ক্যান্ডি পাঠিয়েছে। সেগুলো বিষ মেশানো ছিল। ও তা খেয়েছে। ওর কণ্ঠস্বর ছিল জড়ানো — যেন সে ঘুমে ঢলে পড়ছে। আমি ওর ঠিকানা জানতে চাইলাম। ও বলল থার্টিন বাই ওয়ান বি — কিন্তু রাস্তার নামটা বলার আগেই ওর কণ্ঠস্বর থেমে গেল। মনে হল, ওর হাত থেকে টেলিফোন যন্ত্রটা গড়িয়ে পড়ে গেল।

— আপনি কোনও ঠিকানা দিতে পারছেন না?

— না। ওই 'থার্টিন-বাই-ওয়ান-বি'-টুকু বাদে!

— ওটা একটা ঠিকানা হল, স্যার? রাস্তার নাম বাদে?

— না, হল না। হলে, তোমাকে টেলিফোন করতাম না। নিজেই আমি চলে যেতাম সেখানে।

— তা তো বটেই। তবে কী জানেন, স্যার? ওইটুকু সম্বল করে অ্যাত্ত বড় কলকাতা শহরে কোনও

মানুষকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। তা ছাড়া হয়তো ঘটনা আমাদের থানার জুরিসডিকশনের ভিতরেই নয়।

— তাহলে তোমার আর কোন দায়িত্ব থাকে না। তাই না, খালেদ?

— আজ্ঞে?

— ও. সি. ফিরে এলে আমাকে রিং করতে বলো। তোমার দ্বারা হবে না।

যন্ত্রটা নামিয়ে বাসু এপাশ ফিরলেন। দেখলেন, রানু টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘাঁটছেন।

— কী খুঁজছ তুমি?

— রায় পদবীতে কারও বাড়ির নম্বর 'থার্টিন-বাই-ওয়ান বি' আছে কিনা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বিভিন্ন ইংরেজী বানানে রায় উপাধি বিশ-পঁচিশ পাতা।

— আরে কী পাগল তুমি? বিশ-পঁচিশ পাতার গভীর অরণ্যে একটা 'মদো-মাতাল' মেয়ের সন্ধান করার কোন মানে হয়? শুনলে না, মেয়েটা মদের ঝোঁকে আবোল-তাবোল বকছিল?

রানু স্বামীর দিকে বেদনার্ত দুটি চোখ তুলে বলেন, আয়াম সরি। পরে ভেবে দেখেছি তুমিই ঠিক বলছ — মেয়েটি হয়তো মাতাল নয়, মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাতাল। যদিও ওর কণ্ঠস্বর শুনে তা আমার মনে হয়নি, কিন্তু পরে যদি দেখা যায় যে, আমার অনুমানটা ভুল, তোমার আশঙ্কাই সত্যি, তাহলে অনুশোচনার আর শেষ থাকবে না।

বাসু স্ত্রীর পিঠে একখানা হাত রাখলেন। বললেন, কারেক্ট। আমাদের ধরে নিতেই হবে মেয়েটি সত্যিই মৃত্যু-যন্ত্রণায় অমনভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল। সেটা ভুল প্রমাণিত হলে হয়তো পণ্ডশ্রমের জন্য কিছুটা অনুশোচনা জাগবে। কিন্তু তোমার অনুমানটা ভুল প্রমাণ হলে সারাজীবন অনুশোচনার কাঁটায় বিদ্ধ হতে থাকব।

— সেজন্য তো 'রায়' উপাধি ধরে খুঁজছি, কারও বাড়ি নম্বর —

বাসু বললেন, 'ওয়াইল্ড গুজ চেজ'! হয়তো মেয়েটি বিবাহিত আর টেলিফোন তার বাবার নামে—

— অথবা মামার কিংবা দাদামশাইয়ের! তাই নয়?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় বাসু-সাহেবের। আপন মনেই বলে ওঠেন 'গট ইট'।

— কী?

— কাকলি তখন বলেছিল যে, নবনীতা 'সোনালি স্বপন'-এ কাজ করে। দ্যাটস অ্যা লীড। দেখতো, ওই নামে কোনও ফোন আছে কিনা।

রানু একটু খোঁজাখুঁজি করে বললেন, আছে, ডায়াল করব?

— না। তুমি লালবাজারে হোমিসাইড সেকশনে ইনস্পেক্টর নিখিল দাশকে পাও কি না দেখ। ছোকরা আমার গুণগ্রাহী। পুলিসের সাহায্য ছাড়া হয়তো 'সোনালি স্বপন'-এর মাধ্যমে খবর পাব না। ওরা হয়তো আমাকে পাত্তাই দেবে না। নামটাই কেমন যেন সন্দেহ জাগাচ্ছে।

রানু একটু পরে লালবাজারে ইনস্পেক্টর নিখিল দাশকে ধরতে পারলেন। বাসু তাকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে বললেন, লোকাল পুলিস স্টেশনে জানিয়ে রেখেছি, কিন্তু ঘটনাটা হয়তো এ থানার এলাকার বাইরে। তাই তোমার সাহায্য চাইছি। আমাকে হয়তো ওরা পাত্তা দেবে না। তুমি এই নম্বরে ডায়াল করে জানতে চাও নবনীতা রায় ওদের এমপ্লয়ী কিনা এবং তার বাড়ির ঠিকানা কী।

— ঠিক আছে স্যার, আপনি লাইনটা ধরে থাকুন। আমি অন্য লাইনে 'সোনালি স্বপনে' ফোন করে জেনে নিয়ে জানাচ্ছি।

বাসু ধর্মপত্নীর দিকে ফিরে বললেন, ধর।

— ধরব? কী ধরব?

— লক্ষ্মণের ফল! যতক্ষণ না সরব হচ্ছে ধরে থাক। উপায় কী? আদরের ভাগ্নে-ভাগ্নেবৌকে থ্যাটার দেখতে পাঠিয়েছ যে।

রানু টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে বসে রইলেন। বাসু পাইপ-পাউচ বের করে পুনরায় তামাক সেবনের আয়োজন করতে থাকেন। মিনিট পাঁচেক পরে — বাসু তিন-চারবার টান দিতে না দিতে — মিসেস বাসু সরব হলেন, ইয়েস? হ্যাঁ, ধরুন, দিচ্ছি।

বাসু বাঁ-কানে টেলিফোনের শ্রবণাঙ্গটা চেপে ধরেন, বল?

— সামথিং ফিশি, স্যার। 'সোনালি স্বপন' একটা বার-কাম-রেস্তোরাঁ। ওরা স্বীকার করছে যে, নবনীতা রায় ওদের পরিচিত। সন্ধ্যাবেলায় ছিল। সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি চলে যায়। কিন্তু ওর বাড়ির ঠিকানা কেউ জানে না। আমি সরেজমিনে 'সোনালি স্বপনে' তদন্ত করতে যাচ্ছি। আপনি কি আসবেন?

— নিশ্চয়ই।

— আপনাকে বাড়ি থেকে পিক-আপ করে নেব?

— না। লালবাজার থেকে সেটা উল্টোমুখো হবে। আমি বরং একটা ট্যাক্সি নিয়ে লালবাজার চলে যাচ্ছি। তুমি 'মেইন গেট'-এ গাড়ি নিয়ে রেডি থেক। ট্র্যাফিক জ্যামে না পড়লে মিনিট কুড়ির ভিতর পৌঁছাব।

— ও কাণ্ড করবেন না স্যার। এখনো অফিস ছুটির ভিড় আছে। ট্র্যাফিক জ্যাম অনিবার্য। আমি বরং সাইরেন বাজাতে বাজাতে অনেক আগে আপনাকে তুলে নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছাতে পারব। আপনি দশ মিনিট পরে আপনার গেটের সামনে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।

নিখিল দাশের জীপটা যখন 'সোনালি স্বপন'-এর সামনে এসে দাঁড়াল রাত তখন নটা। ইউনিফর্মধারী পুলিস দেখে দ্বারপাল এগিয়ে পথ রুখল।

— ক্যা চাহিয়ে আপলোগোঁ কো?

নিখিল ওই দশাসই দ্বারপালকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর বাঁ হাতে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেল। দারোয়ান বাধা দিল না। বরং সে সরে এল বাইরের পাঁচিলের একটা বিশেষ অংশে। সেখানে দেওয়ালে একটা স্যানিটারি পাইপের ট্র্যাপ-ডোর। আঙুল দিয়ে সেই দরজাটা সরিয়ে চার ইঞ্চি ব্যাস গর্তমুখে তার হুইসিলটা বারতিনেক বাজিয়ে দিল। ছোট ছোট বিরতি দিয়ে: বিপ্ বিপ্ বিপ্।

না নিখিল দাশ, না বাসু-সাহেব কেউই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তবে ঘটনাটা দুজনেরই নজরে পড়েছে।

নিখিল গট্‌গট্ করে এগিয়ে এল কাউন্টারে। সেই বর্ষীয়সী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাটি এখনো বসে আছেন। তিনি মুখ তুলে চাইলেন, ইয়েস?

নিখিল ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, নবনীতা রায় তোমাদের স্টাফ?

— নো!

— নবনীতা রায় তোমার পরিচিত?

— ইয়েস।

— আজ সন্ধ্যাবেলা সে এখানে ছিল?

— হ্যাঁ, দেখেছি তাকে। কেন?

— তার বাড়ির ঠিকানা কী?

— কেন? সে কী করেছে?

— লুক হিয়ার, ম্যাডাম। পুলিস প্রশ্ন করে, কৈফিয়ৎ দেয় না। এটুকু বলতে পারি যে, নবনীতাকে কোন অপরাধের দায়ে খুঁজছি না আমরা।

— থ্যাঙ্কু। না, মানে, একটু আগে লালবাজার থেকে —

— হ্যাঁ, আমিই ফোন করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নটা এতক্ষণে তামাদি হয়ে যেতে বসেছে। নবনীতার ঠিকানা কী?

— সরি। আমরা কেউ জানি না। আপনি লালবাজার থেকে ফোন করার পর আমি জনে জনে প্রশ্ন

করে দেখেছি।

— এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? নবনীতা রোজ সন্ধ্যাবেলা এখানে আসে, অথচ কেউ তার বাড়ির ঠিকানা জানে না।

— না, রোজ আসে না।

— সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন আসে? তিন দিন?

— হ্যাঁ, কোনও সপ্তাহে তিনদিন, কোনো সপ্তাহে চার দিন।

— সে কি কমিশন বেসিসে বার-মেইড?

— সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না।

— কে পারবে?

— মালিকদের মধ্যে কেউ থাকলে বলতে পারতেন। আমি ঠিক —

— অল রাইট। 'মালিক' শব্দটা আপনি বহুবচনে ব্যবহার করলেন। এ দোকানের ক'জন মালিক? কী নাম তাঁদের?

পানাহারকারীদের মধ্যে দু'একজন বাসু-সাহেবকে চিনে ফেলেছে। আর তাঁর সঙ্গীর পরিচয় তো বেশভূষাতেই। গুড়ের গন্ধে মাছির মতো তাই কেউ কেউ গেলাস-হাতে কাউন্টারের দিকে ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছেন। ভদ্রমহিলা বুদ্ধিমতী। তৎক্ষণাৎ বলেন, আপনারা দুজন যদি কাইন্ডলি এই পাশের ঘরে এসে বসেন তাহলে খোলাখুলি কথাবার্তা বলতে সুবিধা হয়।

নিখিল দাশ এককথায় রাজি।

পাশের ঘরে ওঁরা তিনজনে এসে বসতেই ভদ্রমহিলা দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বলেন, এটা একটা পার্টনারশিপ বিজনেস্, স্যার। দোকানের সব দেখাশোনা করা, হিসাব রাখা, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখেন মিস্টার জীবন হালদার। তিনি আজ আসবেন না জানিয়েছেন। দ্বিতীয় মালিক—তিনি বস্তুত স্লীপিং পার্টনার—তাঁর নাম রাকেশ বাজোরিয়া। তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দোকানে আসেন না। তবে আজ আসবেন।

— কেন? আজ বিশেষ প্রয়োজনটা কী হল?

— স্যার, আমরা পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তাই লালবাজার থেকে টেলিফোনটা পেয়েই আমি রাকেশজীকে টেলিফোন করেছি। উনি বলেছেন যে, উনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে যাবেন।

— অল রাইট। তিনি এলেই যেন লালবাজারে হোমিসাইড সেকশনে একটা ফোন করেন। সার্জেন্ট অমিয় সেনকে খোঁজেন—

— হোমিসাইড, স্যার? নবনীতা কি—

— প্লীজ ম্যাডাম। নবনীতা খুন হয়নি, তাকে কোন খুনের চার্জেও আমরা খুঁজছি না। কিন্তু তার ঠিকানাটা আমার এখনি চাই। এটা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এখানে কেউ তার ঠিকানা জানে না?

— ভেবে দেখুন, স্যার, কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন 'বার-মেইড' তার বাড়ির ঠিকানা মদের দোকানে রেখে যায় না। যদি না সে স্টাফ হয়। দু-জন মালিকই সম্ভবত ওর ঠিকানা জানেন। তবে ইতিমধ্যেই আমি অনুসন্ধান করে একটি সূত্র আবিষ্কার করেছি। আপনারা অনুমতি দিলে সেটাই নিবেদন করি —

— করুন।

জানা গেল, মাস কয়েক আগে একদিন কী একটা কারণে সন্ধ্যারাতেই ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়। শহরে দাঙ্গাবাজি শুরু হয়ে গিয়েছিল। নীতা ট্যাক্সি করে ফিরতে চায়, কিন্তু একা যেতে সাহস পায় না। রাত তখন প্রায় দশটা। রেস্তোরাঁর একজন বিশ্বস্ত 'বয়' ট্যাক্সি করে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে। সে নবনীতার বাড়িটা নিশ্চয় চেনে। তার নাম গিরিধারী রাউত। দুর্ভাগ্যবশত, আটটায় তার ছুটি হয়ে গেছে।

তবে সে পার্মানেন্ট স্টাফ। তার পাকা-ঠিকানা খাতায় লেখা আছে — ভবানীপুর উড়িয়াপাড়ায়।

নিখিল দাশ নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে রওনা হল।

গেটের বাইরে দারোয়ান এবার নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ওদের দেখতে পেয়ে। ওঁরা দুজনে ওকে অতিক্রম করে জীপের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর ইনস্পেক্টার নিখিল দাশ হঠাৎ কী মনে করে পিছন ফিরল। অ্যাটেনশনে দাঁড়ানো বিশালকায় দ্বারপালের ঠিক মুখোমুখি হয়ে বললে, তোমাকে তিনটি কথা বলব।

লোকটা কোনও জবাব দিল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তার বুকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর খোঁচা মেরে নিখিল দাশ বললে, এক নম্বর, তোমার স্বাস্থ্য ভাল। লম্বায় আর চওড়ায়। কিন্তু ইদানীং তোমার ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে, রোজ ওঠ-বোস দেওয়াটা ছেড়ে দিলে কেন? দু'নম্বর, দ্বিতীয়বার তোমাদের দোকানে পুলিস রেইড হলে স্পিকিং টিউবে এমনভাবে হুইসিল বাজাবে যাতে পুলিস নিজেই না সতর্ক হয়ে যায়। তুমি ওই ভাবে হুইসিল বাজানোর জন্যেই আমি বুঝতে পেরেছি, ভিতরে কিছু বেআইনী কাজ হয়। এটা আমার জানা ছিল না। তুমিই জানালে। কথাটা তোমার মালিককে বলবে। কারণ তুমি না বললে, আমি নিজেই তাকে বলব। তিন নম্বর, এরপর যখন তোমাদের দোকান রেইড করতে আসব তখন আমাকে দেখতে পেলে অ্যাটেনশনে স্যালিউট দেবে। বুঝলে? মনে থাকবে? স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ।

নিজে অ্যাবাউট টার্ন করে জীপের দিকে এগিয়ে চলল নিখিল দাশ।

পিছন পিছন বাসু-সাহেব।

boi.net

সাত

মেয়েটাকে বোধহয় বাঁচানো যাবে না। একের পর এক বাধা। ভবানীপুর উড়িয়াপাড়ার নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিরিধারী রাউতকে পাওয়া গেল না। ঠিকানা মোতাবেক বাড়ি খুঁজে পেতে ইনস্পেক্টার নিখিল দাশের সময় লাগেনি। কলকাতা শহর তার নখদর্পণে। দেখা গেল, ঐ ঠিকানায় একটা জীর্ণপ্রায় বাড়িতে বিশ-ত্রিশজন উৎকলের বাসিন্দা থাকে। তারা অধিকাংশই প্লাম্বিং-এর কাজ করে। একমাত্র গিরিধারীই 'অড-ম্যান-আউট' — বক মধ্যে হংস। সে রেস্তোরাঁর বেয়ারা।

প্রতিবেশীরা তাকে একডাকে চিনল, কিন্তু দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। গিরিধারী তার কয়েকজন ইয়ারদোস্তের সঙ্গে সন্ধ্যার শো-তে কোথায় সিনেমা দেখতে গেছে। কোন 'হল'-এ তা ওরা বলতে পারল না। আন্দাজ সাড়ে নয়টার সে বাড়ি ফিরে আসবে।

বাসু-সাহেব একটা দোকান থেকে বাড়িতে ফোন করলেন। রানুকে জানালেন যে, সাড়ে নয়টার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে পারছেন না। কাকলি এলে তাকে যেন অপেক্ষা করতে বলা হয়, নবনীতার ঠিকানাটা যেন জেনে নেওয়া হয়।

রানু বলেন, নবনীতার ফোন-এর কথা ওকে বলব না?

— না। ও যদি আসে বা ফোন করে, তাহলে নবনীতার বাড়ির ঠিকানাটা শুধু জেনে নিও। খুব সম্ভবত তার আগেই আমি নবনীতার ঠিকানাটা জোগাড় করতে পারব।

রানু জানালেন, কৌশিক আর সুজাতা ফিরেছে। তারা জানতে চাইছে, কিছু করণীয় আছে কি না।

— হ্যাঁ, ওদের বল, রাত না করে খেয়ে-দেয়ে নিতে। লাইনটা কেটে দিলেন বাসু।

গিরিধারীকে পাকড়াও করা গেল নটা বেজে বত্রিশ মিনিটে। ওকে জীপে উঠিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি চালালো নিখিল। গিরিধারীর নির্দেশ মতো এলিয়ট রোডে একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হল। গিরিধারী বললে, সেই বাড়িটা, আইজ্ঞা।

ওঁরা তিনজনে নামলেন। বাসু গিরিধারীকে প্রশ্ন করেন, নবনীতা কোন তলায় থাকে? কোনটা তার সদর দরজা?

গিরিধারী সবিনয়ে তার অক্ষমতা জানালো। বলল, একবারই মাত্র সে এ বাড়িতে এসে নীতা-দিদিকে পৌঁছে দিয়েছে। তখন আঁধার রাত। লোডশেডিং চলছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে নীতা ট্যাক্সি-ফেয়ার মিটিয়ে দেয়। কারণ গিরিধারী বলেছিল, সে হেঁটে ভবানীপুরে চলে যাবে। ফলে দিদি এই গেট দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে যায়। কোন তলায়, কোন 'ফেলাট'-এ তা সে জানে না।

পুলিসের জীপ দেখে উপর থেকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিচে নেমে এলেন।

— কাকে খুঁজছেন আপনারা?

নিখিল দাশ বললে, নবনীতা রায়। বছর ত্রিশেক বয়স —

— আজ্ঞে না, ঐ নামে এ বাড়িতে কেউ তো থাকে না।

— আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমিই বাড়ির মালিক, কেন?

নিখিল গিরিধারীকে দেখিয়ে বলে, দেখুন, এ লোকটা চৌরঙ্গী এলাকায় একটা রেস্তোরাঁয় কাজ করে। ঐ একই রেস্তোরাঁয় কাজ করে নবনীতা রায়। এ লোকটা বলছে, এই বাড়িতেই সে নবনীতাকে একদিন নামিয়ে দিয়েছিল —

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, চৌরঙ্গী এলাকার সেই রেস্টুরেন্টের নামটা বলুন তো?

— 'সোনালি স্বপন'।

— তাই বলুন। হ্যাঁ, এই বাড়িই। তবে নামটা উল্টোপাল্টা বললেন কেন? এ বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হালদার। ঐ 'সোনালি স্বপন' রেস্টুরেন্ট ওঁদেরই। আপনারা বোধহয় মিসেস হালদারকে খুঁজছেন।

গিরিধারী প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, নিখিল তার বাহুমূল বজ্রমুষ্টিতে ধরে বাধা দেয়। বলে, তবে তাই হবে। আচ্ছা, বলুন তো সেই ফ্ল্যাটে কি টেলিফোন কানেকশন আছে?

— হ্যাঁ, তা আছে। জীবন হালদারের নামে।

— তবে আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। আমরা ঐ মিসেস হালদারকেই খুঁজছি। শুনুন স্যার, ঐ টেলিফোন ব্যবহার করে নবনীতা রায় নামে একটি মেয়ে রাত আটটা-নাগাদ পুলিসের সাহায্য চায়। আমরা একবার মিসেস হালদারের সঙ্গে কথা বলতে চাই —

— এ যে অবিশ্বাস্য কথা শোনালেন, মশাই। মিস্টার হালদারের টেলিফোন ব্যবহার করে কে-এক নাম-না-জানা নবনীতা রায় —

নিখিল এবার নিজমূর্তি ধারণ করতে বাধ্য হল। বললে, লুক হিয়ার মিস্টার বাড়িয়ালা। আপনি কি এই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত তর্কই করে যাবেন, না আপনার ভাড়াটের সদর দরজাটা দেখিয়ে দেবেন? ইতিমধ্যে কিছু ভালমন্দ হয়ে গেলে আমি কিন্তু এ বাড়ির সবাইকে মাজায় দড়ি বেঁধে চালান দেব।

ভদ্রলোকের পরিবর্তনটা লক্ষণীয়। ওঁর গলকণ্ঠটা বার দুই ওঠা-নামা করল। কোনক্রমে ঢোক গিলে বললেন, আসুন, এই দোতলায় পশ্চিমদিকের ফ্ল্যাট।

ওঁরা দ্বিতলে উঠে এলেন। নির্দিষ্ট দরজাটি বন্ধ। ফ্লাশ-পাল্লায় গোদরেজের 'ইয়েল-লক'। ফলে বোঝার উপায় নেই ভিতর থেকে বন্ধ, না গৃহবাসীরা বাইরে। বারকতক ডোরবেল বাজানোতে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। নিখিল দৃঢ়মুষ্টিতে দুমদুম করে পাল্লায় কিল মারল। তাতেও ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু দুটি ব্যাপার সন্দেহজনক। প্রথমত চাবির গর্তে চোখ লাগিয়ে দেখা গেল ঘরে আলো জ্বলছে। দ্বিতীয়ত ঘরের ভিতর — সম্ভবত বাথরুমে — একটা জলের কল খোলা আছে। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বালতিতে জল পড়ে যাচ্ছে। নিখিল বলে, দরজা বন্ধ করে বাইরে গেলে লোকে সচরাচর আলোটা

নিবিয়ে দিয়ে যায়, কলটাও বন্ধ করে যায়। আমার মনে হচ্ছে ঘরে লোক আছে —

গৃহস্বামী বলেন, তাহলে সে সাড়া দিচ্ছে না কেন?

— সম্ভবত তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তাই। টেলিফোনে উনি বলেছিলেন কেউ ওঁকে বিষ খাইয়েছে —

গৃহস্বামী রীতিমতো চমকে ওঠেন, বলেন কি! কে ঐ নবনীতা রায়? আচ্ছা দাঁড়ান, এই সদর-দরজার একটা ডুপলিকেট চাবি আমার কাছে আছে। ওরা সেটা আমার কাছেই গচ্ছিত রেখেছিল, ঐ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হালদার। দাঁড়ান আপনারা, আমি চাবি নিয়ে আসছি।

একটু পরে ডুপলিকেট চাবি দিয়ে ঘরটা সহজেই খোলা গেল। নিখিল দাশ ঘরে পা দিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো। বলল, আপনারা কেউ ভিতরে আসবেন না। কোন কিছু স্পর্শ করবেন না। কী ঘটেছে দেখতেই পাচ্ছেন — সেজন্যই বারণ করছি। তারপর বাসু-সাহেবকে বললে, আপনি, স্যার, ভিতরে আসুন। কিন্তু কোন কিছু ছোঁবেন না।

খোলা দরজা দিয়ে আলোকিত বৈঠকখানা ঘরটা দেখা যাচ্ছে। সোফা-সেট দিয়ে সাজানো। মেঝেতে একটা কার্পেট পাতা। কার্পেটের উপর বেকায়দায় লুটিয়ে পড়ে আছে বছর ত্রিশ-বত্রিশের একটি মহিলা। তার এক পায়ে চটি, অপর পায়ের চটিটা খুলে গছে পতন মুহূর্তে। পরনে স্টীল-গ্রে রঙের একটা মুর্শিদাবাদী। পাশেই তার হাত-ব্যাগ এবং একটি পলিথিনের ঝোলা ব্যাগ। টেলিফোনটা ওর নাগালের মধ্যেই পড়ে আছে কার্পেটের উপর।

দরজার বাইরে থেকে দুজনে একই সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলেন — বাড়িওয়ালা আর গিরিধারী। নিখিল গৃহস্বামীকে বললে, এই টেলিফোনটায় ফিঙ্গার-প্রিন্ট আছে, এখন ব্যবহার করা যাবে না। কাছাকাছি টেলিফোন কোথায় পাব?

গৃহস্বামী জানালেন, আমার নিজেরই ফোন আছে।

— তাহলে আপনি এক্ষনি 20-0100-তে ফোন করুন। ওটা 'লালবাজার'। হোমিসাইড সেকশনে আব্দুল কাদেরকে চাইবেন — অথবা যে-আছে ডিউটিতে। তাকে বলবেন, আমি ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ খবর পাঠাচ্ছি — নবনীতা রায়কে পাওয়া গেছে। এখানকার ঠিকানা, আপনার টেলিফোন নাম্বার সব জানাবেন। বলবেন, অ্যাম্বুলেন্স, ক্যামেরাম্যান আর ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্টদের পাঠিয়ে দিতে। বুঝলেন?

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু উনি নবনীতা রায় নন, মিসেস হালদার। নিখিল নির্বিকারভাবে বললে, হ্যাঁ তাই। তবে ওরা তাকে ঐ নবনীতা নামেই চেনে।

ভদ্রলোক দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেন। নিখিল ভূলুণ্ঠিতার মণিবন্ধ স্পর্শ করে দেখল। বাসু বলেন, বেঁচে আছে?

— আছে। শরীর এখনো গরম, নিশ্বাস পড়ছে —

নিতান্ত বাহুল্য, তবু বাসু-সাহেব গিরিধারীকে প্রশ্ন করেন, নীতা দিদিমণি?

গিরিধারী শিরশ্চালনে স্বীকার করে।

বাসু বলেন, জুতো-জোড়া বাইরে খুলে তুমি সাবধানে ভিতরে এস। এ-ঘরের কোন কিছু ছোঁবে না। ভিতরে চলে যাও। দেখ, রান্নাঘরটা কোনদিকে। গ্যাস, ইলেকট্রিক হিটার বা স্টোভ কোন কিছু আছে কিনা। আমাদের এক কেটলি গরম জল লাগবে। ঠাণ্ডা জলও এক বালতি। আর দেখ বাথরুমে তোয়ালে বা গামছা পাও কি না।

গিরিধারী সামলে নিয়েছে নিজেকে। সে ভিতরে চলে যায়। জলের কলটা বন্ধ করে। রান্নাঘর খুঁজে পেয়ে গরম জল বসায়।

নিখিল বলে, আমারও আন্দাজ ঐ রকম। বিষ নয়, খুব কড়া ঘুমের ওষুধ। ওর পেটে ঠাণ্ডা-গরম জলের সেঁক অল্টার্নেটিভলি দিতে হবে। আসুন, ভদ্রমহিলাকে ধরাধরি করে উবুড় করে শুইয়ে দিই।

দেখি, যদি বমি করানো যায়।

একটু পরে গিরিধারী গরম ও ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল। একটি তোয়ালে আর একটি গামছাও। পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা তোয়ালে দিয়ে মেয়েটির উদর ও পৃষ্ঠদেশে 'ফোমেন্ট' করা হল — কিন্তু কোন সাড়া জাগল না। গভীর ঘুমে সে অচেতন।

নীতার নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে পড়ছে। হাত-পা হিম হতে শুরু করেনি। নাড়ির গতিতেও খুব কিছু উল্লেখজনক পরিবর্তন বোঝা যাচ্ছে না। নিখিল গিরিধারীকে বললে, তুমি তিনতলায় গিয়ে ঐ ভদ্রলোকের কাছ থেকে জেনে এস যে, লালবাজারে উনি যোগাযোগ করতে পেরেছেন কি না। আর কাছাকাছি কোনও ডাক্তার আছেন কি না।

গিরিধারী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। এখন আর কিছু করার নেই। দুজনে মোটামুটি ঘরটা তল্লাসী করে দেখলেন। পলিথিনের ব্যাগের ভিতর পাওয়া গেল একটা ডায়েরি। আনকোরা নতুন। যার ডায়েরি তার নামটা পর্যন্ত লেখা নেই। এছাড়া কার্পেটের উপর পড়ে আছে একটা নামকরা 'কনফেকশনারির' ক্যাণ্ডি বক্স। খোলা অবস্থায়। ঐ পিসবোর্ডের বাক্সটায় কাগজের ছোট ছোট খোপে ছয়টা ক্যান্ডি। চকোলেট-ক্যান্ডি নিশ্চয় দুই সারিতে সাজানো ছিল। নিচের সারিতে ছয়টা ক্যান্ডি রয়েছে ; কিন্তু উপরের সারিতে ছয়টা শূন্যস্থান। তা-থেকেই বোঝা যায় মেয়েটি ছ'টা চকোলেট-ক্যান্ডি খেয়েছে। বাসু-সাহেব ঘরের অন্যান্য স্থানও মোটামুটি খুঁজে দেখলেন। সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ল না। একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট কোনায় রাখা আছে, তাতে কিছু নেই। টেবিলের উপর অ্যাশট্রে — সেটাও পরিষ্কার। ভিতরে সিগ্রেটের স্টাম্প নেই। নিখিল পলিথিনের ব্যাগটার পাশে একটা ছোট্ট চিরকুট খুঁজে পেল। তাতে মেয়েলী হস্তাক্ষরে লেখা 'নীতাকে — প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ — কাকলি।'

নিখিল নিঃশব্দে কাগজের টুকরোটা বাসু-সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে। তিনিও দেখে নিয়ে নিঃশব্দে সেটা ফেরৎ দেন। নিখিল সেটা সযত্নে তার পকেট-ডায়েরিতে ভরে নিয়ে জানতে চাইল, আপনি তখন বলেছিলেন এই নবনীতা রায় মেয়েটির সঙ্গে আপনার আজ রাত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তাই নয়? কটার সময়?

— রাত সাড়ে নয়টায়।

— আরও বলেছিলেন এই নবনীতা আপনার ক্লায়েন্ট নয়, তাই না?

— হ্যাঁ। এ আমার ক্লায়েন্টের তরফে একজন জোরদার সাক্ষী। অন্তত ক্লায়েন্ট তাই আমাকে বলেছিল টেলিফোনে।

নিখিল ওঁর চোখে-চোখে তাকিয়ে বললে, কেসটা কী তা আমি জানতে চাইছি না ; কিন্তু ক্লায়েন্টের নামটা আপনি এখনো জানাননি। সেটা জানাতে কি অসুবিধা আছে, স্যার?

— না। তার নাম কাকলি দত্ত। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ, নিখিল। কেউ যদি কাউকে বিষ মেশানো মিঠাই পাঠিয়ে হত্যা করতে চায় তাহলে সে কি একটা চিরকুটে সে কথা লিখে জানায়?

নিখিল জবাব দেবার আগেই গিরিধারী উপর থেকে নেমে এল। তার পিছন পিছন গৃহস্বামী। খবর পাওয়া গেল যে, লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেছে। অ্যাম্বুলেন্স, ক্যামেরাম্যান ইত্যাদিরা রওনা হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে। গিরিধারী নিজে থেকেই জানতে চায়, সে নিচে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে কি না? কারণ তাহলে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারকে নম্বর মিলিয়ে বাড়ি খুঁজতে হবে না। নিখিল তার বুদ্ধিকে তারিফ করে নিচে পাঠিয়ে দিল। বাসু-সাহেব জানতে চান, অ্যাম্বুলেন্সে তুমি একে কোথায় পাঠাতে চাইছ, নিখিল?

— কোন সরকারি হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজ কিংবা এন. আর. এস. অথবা—

— বুঝেছি। তুমি কি আমার ইচ্ছামতো কোনও একটা নার্সিংহোমে ওকে নিয়ে যেতে রাজি আছ, নিখিল?

— নার্সিংহোমে! খরচ দেবে কে?

— আমি।

— কেন? আপনার কী স্বার্থ? মেয়েটি তো আপনার অচেনা!

— তাতে কী হল? মেয়েটি নিশ্চয় কলকাতা শহরে কয়েক ডজন লোককে চেনে, যাদের টেলিফোন আছে, তাই নয়? অথচ জ্ঞান হারাবার পূর্বমুহূর্তে সে তো এই অচেনা বুড়ো মানুষটাকেই ফোন করেছিল।

— শুধু সেই কারণে আপনি —

— কারণটা নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, নিখিল? আমার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার কি বিশেষ কোনও হেতু আছে?

— আদৌ না। আপনি খরচ দিলে আমার আর কী আপত্তি?

বাসু-সাহেব গৃহস্বামীর দিকে ফিরে বললেন, তাহলে আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব। চলুন, উপরে যাই। একবার ডাক্তারবাবুকে টেলিফোন করে বলে দিই—

— বিলক্ষণ! এ আবার কষ্ট কিসের! মিসেস হালদার শুধু আমাদের ভাড়াটেই নয়, আমার মেয়ের মতো।

দ্বিতলে উঠে এসে দেখলেন অনেকগুলি কৌতূহলী মুখ। দোতলায় কী একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা তারা জানে, তবে বিস্তারিত জানে না। গৃহস্বামী তাদের শাসিয়ে রেখেছেন, পরে সব বিস্তারিত জানানো হবে, কিন্তু এখন যদি কেউ দোতলায় উঁকি দেয় তবে থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাছারিতে তার জেরবার হয়ে যাবে।

গৃহস্বামী বাসু-সাহেবকে টেলিফোন যন্ত্রটা দেখিয়ে দিয়ে পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বাসু তাই ফোন করলেন নিজের বাড়িতে। রিঙিং টোন শুনতে শুনতে বাম মণিবন্ধে তাকিয়ে দেখলেন রাত দশটা বাজতে বারো।

রানুর সাড়া পেয়েই বাসু জানালেন যে, মেয়েটিকে পাওয়া গেছে। বেঁচে আছে। তাকে সানিসাইড নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রানু যেন সেই নার্সিংহোমে ফোন করে জানিয়ে রাখেন ডক্টর ব্যানার্জিকে। তাঁকে না পেলে নার্স জবাকে। জানতে চাইলেন, সাড়ে নয়টায় যার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সে কি এসেছে?

রানু প্রতিপ্রশ্ন করেন, কাকলির নামটা পর্যন্ত এড়িয়ে কথা বলছ দেখছি! মনে হচ্ছে তোমার পাশেই কোনও অবাঞ্ছনীয় শ্রোতা দাঁড়িয়ে? তাই কি?

— ঠিক তাই।

— তাহলে একতরফা শুনে যাও। কাকলি আসেনি, কিন্তু মিনিট-দশেক আগে ফোন করে জানিয়েছিল, একটা এমার্জেন্সিতে সে আটকে গেছে। সাড়ে-দশটার আগে আসতে পারবে না। সে জানতে চেয়েছিল অত রাতে আসবে, না কাল সকালে। আমি তাকে সাড়ে দশটাতেই আসতে বলেছি। দ্বিতীয় কথা, আমি ওকে নবনীতার ব্যাপারটা কিছু বলিনি। তৃতীয়ত, সুজাতা আর কৌশিক জানতে চাইছে ওদের কিছু করণীয় আছে কিনা।

— সে তো আগেই বলেছি — ওরা খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিক।

— কেন? তোমার কি ফিরতে দেরী হবে?

— না। সাড়ে দশটার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আমি রাখব। রাখছি।

ঐ সময়েই অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন শোনা গেল।

ওঁরা নিচে নেমে আসতে শুরু করেন। সিঁড়ির মধ্যেই দেখা হয়ে গেল গিরিধারীর সঙ্গে। দুজন স্ট্রেচার-বাহককে সঙ্গে নিয়ে সে দ্বিতলে উঠছে।

আট

বাসু-সাহেব যখন নিউ আলিপুরের বাড়িতে ফিরে এলেন তখন রাত সওয়া-দশটা। পোর্চ-এ বসেছিল কৌশিক, সে এগিয়ে এসে বলল, আপনি ভিতরে যান, গাড়িটা আমিই গ্যারেজ করে দিচ্ছি।

— না, গাড়িটা এখানেই থাক। আরও একবার হয়তো বের হতে হবে।

— এত রাত্রে! আপনাকে?

— অন্তত তোমাকে। খেয়ে নিয়েছ?

ততক্ষণে চাকা-দেওয়া গাড়িতে পাক মেরে রানু দেবীও এসে গেছেন বাইরের বারান্দায়। সেখান থেকেই বলেন, তাই কি পারে? তুমি বাড়ি ফেরনি, আর আমরা সব খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে শুয়ে পড়ব?

বাসু বিরক্ত হন, কী আশ্চর্য! আমি তখন টেলিফোনে বললাম না, ওদের খেয়ে নিতে বল?

— সে তো রাগ করে বলেছিল!

— হায় রে আমার পোড়া কপাল! কেন? ওরা থিয়েটার দেখতে গেছে বলে? আচ্ছা, বাড়িশুদ্ধ তোমরা কি সবাই পাগল? এতে আমার রাগ করার কী হল? আমি ওকে খেয়ে নিতে বলেছিলাম একটা বিশেষ কারণে? কাকলি যদি রাত সাড়ে-দশটায় আসে তাহলে কথাবার্তা শেষ হতে হতে রাত এগারোটা বাজবে। অত রাত্রে কাকলিকে একা একা ট্যাক্সিতে বাড়িতে ফেরৎ পাঠানো ঠিক নয়।

কৌশিক বলে, ঠিক আছে, ওঁকে আমরা দুজন পৌঁছে দিয়ে এসেই না হয় ডিনার সারব। সে যা হোক, নবনীতা কেমন আছেন, মামু?

— এখনো বেঁচে আছে। আপ-টু-ডেট খবর সব রানুর কাছে পেয়ে গেছ দেখছি।

তারপর রানুদেবীর দিকে ফিরে বলেন, ডাক্তার ব্যানার্জিকে টেলিফোনে পেয়েছিলে?

— হ্যাঁ, ওঁরা যথাকর্তব্য করবেন। আমি যখন ফোন করি তখনো অ্যাম্বুলেন্সটা নার্সিংহোমে পৌঁছায়নি। ও! ভাল কথা, ইতিমধ্যে রাকেশ বাজোরিয়া ফোন করেছিলেন। তিনি নাকি তোমার গুণগ্রাহী। তিনি দোকানে এসে শুনেছেন, একজন পুলিস-ইন্সপেক্টরকে নিয়ে তুমি তাঁর দোকান গেছিলে। আমার প্রশ্নের জবাবে উনি জানালেন যে, লালবাজারে উনি যোগাযোগ করেছেন। লালবাজার যা-যা জানতে চায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি জানতে চাইছিলেন, তোমার বিশেষ কোনও প্রশ্ন আছে কি না।

— বুঝলাম। তা সিক্ত-মার্জারটিকে তুমি কী বললে?

— আমি ওঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম মিস্টার বাসুর যদি বিশেষ কোনও জিজ্ঞাসা থাকে তবে তিনি নিজেই তা টেলিফোনে জানতে চাইবেন। তাতে উনি ওঁর দোকান আর বাড়ির ফোন নাম্বার দিলেন—আর তাছাড়া বললেন, এসব হাঙ্গামা মিটে গেলে তুমি যেন সপরিবারে তোমার সুবিধামতো ওঁর গরিবখানায় একরাতে পদধূলি দাও—

— গরিবখানা না গরিব-ম্যয়খানা?

— ম্যয়খানা! সেটা আবার কী?

— আসবাগার! রেস্তোরাঁ-কাম-বার। ফার্সি শব্দ।

রানু জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। তখনই পোর্চে ওঁদের গাড়িটার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ট্যাক্সি। বাসু জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। ট্যাক্সির একক যাত্রী নেমে এসে ভাড়া মেটাচ্ছে। ফলসা-রঙের একটা তাঁতের শাড়ি, ঐ রঙেরই ব্লাউজ। তার উপর একটা লেডিজ গরম ওভারকোট। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। ওভারকোটের বাঁ-দিকের পকেটটা উঁচু হয়ে আছে। টিফিন-বক্স জাতীয় কিছু আছে বোধহয়। বাসু-সাহেবের যুক্তিবাদী মনে প্রশ্ন জাগলো — মেয়েটি ওভারকোটের পকেটে না নিয়ে টিফিন-বক্সটা তো অনায়াসে ঝোলাব্যাগেই নিতে পারত। সেটাই প্রত্যাশিত।

ইতিমধ্যে ভাড়া মিটিয়ে ও বারান্দায় উঠে এসেছে। সুজাতা এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে,

মিস কাকলি দত্ত?

— হ্যাঁ, নমস্কার। উনি কি জেগে আছেন? মানে, মিস্টার বাসু?

— জেগে তো নিশ্চয়ই আছেন। আপনার প্রতীক্ষা করছেন।

মেয়েটি একটু ইতস্তত করে বলল, আমি যাঁর সঙ্গে দু-দুবার টেলিফোনে কথা বলেছি—

সুজাতা বাধা দিয়ে বললে, তিনি আমার মামিমা, মানে মিসেস বাসু। আসুন এ-ঘরে। ওরা সবাই আছেন।

কাকলি ঘরে ঢোকে। হাত তুলে বাসু আর রানু দেবীকে নমস্কার করে বলে, আপনারা বোধহয় এতরাত পর্যন্ত সচরাচর জাগেন না, বিশেষত জানুয়ারির শীতে—

বাসু বলেন, কলকাতায় জানুয়ারিতে যে শীত পড়ে তা তোমার ওভারকোট দেখে জানলাম।

তারপর রানুর দিকে ফিরে বলেন, ফর্মাল ইন্ট্রোডকশন আশা করি নিষ্প্রয়োজন — কাকলি, ইনি আমার সচিব ও ধর্মসঙ্গিনী। এস, আমার চেম্বারে এসে বসবে।

ওঁরা দুজনে বাসু-সাহেবের ঘরে এসে বসেন। এ ঘরটা এয়ার-কন্ডিশন করা। একটা ইলেকট্রিক রুম-হিটারের সুইচ অন করে বাসু-সাহেব বললেন, তোমার ওভারকোটটা বরং খুলে রাখ, গরম লাগবে না হলে।

কোটটা নিজে হাতে খুলে দিতে গেলেন। কাকলি বাধা দিল, না, না, আমার কেমন যেন-হাড়ের ভিতর শিরশির করছে। ওভারকোটটা থাক।

— তবে থাক। গরম কফি খাবে এক কাপ?

— না। আমি বরং কাজের কথাটা সেরে নিই। কিন্তু কিভাবে যে শুরু করব বুঝে উঠতে পারছি না।

— তা নিয়ে চিন্তা কর না। যেখান থেকে ইচ্ছা শুরু কর। আমি ধীরে ধীরে সব কথা জেনে নেব।

— আমার বাবা বছরতিনেক আগে মারা যান। আমরা মাত্র দুই বোন। আমি ছোট। ভাই নেই। বাবার সম্পত্তি আমরা দুই বোন পেয়েছি। যোধপুর পার্কে একটা দোতলা বড়ি আর গড়িয়াহাট রোডে একটা ফোটোগ্রাফির দোকান। দোকানটা লিমিটেড কোম্পানি। আমার আর দিদির বেশির ভাগ শেয়ার। মাত্র বিশ শতাংশ শেয়ার ছিল পরিবারের বাইরে। আজ বিকেলে আমি হঠাৎ জানতে পারলাম তার ভিতর দশ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছেন ভৈরব দাশ নামে একজন ব্যবসায়ী। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত — আর সিনেমার প্রডিউসার — তাছাড়া—

কাকলি ইতস্তত করে হঠাৎ থেমে পড়তেই বাসু-সাহেব বলেন, কী হল? ইতস্তত করছ কেন? ডাক্তার আর উকিলের কাছে কিছু গোপন করতে নেই। 'তাছাড়া'—?

— লোকটা প্রথমে আমাকে তার সিনেমায় অভিনয় করতে বলে, পরে আমাকে বিবাহ-প্রস্তাব দেয়। দুটোই আমি প্রত্যাখ্যান করায় ভৈরব এখন অন্যভাবে আমাকে কব্জা করতে চাইছে। আজ বিকালে সে আমার দোকানে এসেছিল। এসে দেখালো যে, দশ শতাংশ শেয়ার সে কিনে নিয়েছে। আইনত এখন সে আমাদের দোকানের একজন ছোট মাপের অংশীদার—

— বুঝলাম। তা তোমার কী মনে হয়? কী কারণে সে ঐ দশ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছে? তোমার বিজনেসে নাক গলাবে বলে? না কি তোমার প্রতি প্রতিহিংসাবশে? সে নিশ্চয় আশা করে না যে, ঐ ক'খানা শেয়ার সে হস্তগত করেছে বলে তুমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিনেমায় নামবে অথবা বিবাহবন্ধনে স্বীকৃত হবে।

— সেটা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। ও অবশ্য হাসতে হাসতে বলল যে, সে নীরব-সহযোগী হয়ে থাকবে — 'সাইলেন্ট পার্টনার'! কিন্তু নিঃসন্দেহে ওর কোন গভীর কুমতলব আছে।

— বলে যাও। তারপর?

— আমার দিদি বছরদেড়েক হল একজনকে বিয়ে করেছে — যাদুগোপাল সেন।

— সে কী করে? চাকরি না ব্যবসা?

কাকলির ঠোঁটের প্রান্তে একটা বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। বললে, সে আমার দিদির বিষয়-সম্পত্তির দেখ ভাল করে।

— দিদির বিষয়-সম্পত্তি কি এতই বিশাল?

— না, না, তা মোটেই নয়। বাবার উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা দু'বোন- দোকান-গাড়ি ছাড়া এমন কিছু পাইনি। কিন্তু আমার দিদি বেশ অসুস্থ। তার একটা মাইলড হার্ট-অ্যাটাকও হয়ে গেছে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ মতো সে বিষয়-সম্পত্তির কিছুই দেখে না। যাদুগোপালই তা দেখাশোনা করে। দিদি ওকে সব বিষয়েই পাওয়ার-অব-অ্যাটর্নি দিয়ে রেখেছে। আমার সন্দেহ তলে তলে দিদি নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে!

— তোমার দিদি ঐ যাদুগোপালকে বিশ্বাস করে? তুমি বারণ করা সত্ত্বেও সে সাবধান হয় না?

— যাদুগোপালের প্রতি দিদির অন্ধবিশ্বাস। তা ছাড়া দিদিকে সাবধান করার সুযোগও আমি পাই কই? যখনই ওবাড়ি যাই যাদুগোপাল দিদিকে আগলে রাখে।

বাসু প্রশ্ন করেন, তুমি বারে বারে ওকে যাদুগোপাল বলে উল্লেখ করছ। তুমি ওকে ডাক কী নামে? জামাইবাবু, না যাদুদা অথবা যাদুগোপাল?

কাকলি একটা অস্বস্তিকে ঝেড়ে ফেলে স্বীকার করল, যাদুগোপাল আমাদের পরিবারে প্রথম আসে আমাদের দুই বোনকে প্রবেট নিতে সাহায্য করবে বলে। আমরা দুই বোন যখন বাড়ি-গাড়ি-ব্যবসার সব পেলাম তখন ও প্রথমটা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। আগেই বলেছি, আমাকে প্রপোজও করে। আমি অস্বীকৃত হই। তারপর ও দিদিকে বিয়ে করে।

— তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এ বিয়ে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে। তাই না?

— তাও বলতে পারেন। আমি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। বস্তুতপক্ষে ওরা বিয়ে করার পর আমি ঐ যোধপুর পার্কের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। এখন আমি আমার দোকানঘরের দেড়তলায় 'মেজানাইনে' থাকি।

— অন্যের বাড়িতে ভাড়াটে হিসাবে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবার আমল থেকেই আমরা ভাড়াটে।

— যোধপুর পার্কের বাড়িতে তোমার স্বত্ব ছিল না?

— ছিল, এবং আছে। একতলাটা আমার, সেটা তালাবন্ধ থাকে।

— ঠিক আছে। এ তো হল পটভূমিকা। তোমার বর্তমান সমস্যাটা কী? কী এমন জরুরি কাণ্ড ঘটল যে, কাল সকালের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পরিবর্তন করে আজ এত রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছ?

কাকলি এবার বিস্তারিত ভাবে জানায় তার আশঙ্কার কথা। দিদি ইতিমধ্যে তার শেয়ারগুলো যাদুগোপালকে এনডোর্স করে দিয়েছে এবং যাদু হয়তো সেগুলি জীবন হালদারের কাছে গচ্ছিত রেখে টাকা ধার নিয়ে রেস খেলে উড়িয়েছে। ভৈরবের সঙ্গে বিকেলে কথা বলার পরেই সে যোধপুর পার্কে যায়। যাদুগোপালের মটোর-অ্যাকসিডেন্টের বিষয়ে উল্টোপাল্টা কৈফিয়ৎ শুনে তার সন্দেহ জাগে। কাপাডিয়া, ভবানীপুর থানা আর নবনীতার কাছ থেকে নানান তথ্য শুনে সে আন্দাজ করছে শেয়ারগুলো বর্তমানে আছে জীবন হালদারের কাছে। ওর আশঙ্কা, ভৈরব সেগুলো হাতাবার চেষ্ট করবে।

ভৈরব দাশ যদি দিদির অংশের শেয়ার কিনতে পারে তাহলে ঐ দশ পার্সেন্ট শেয়ার সমেত ভৈরবই হয়ে যাবে সিনিয়ার 50% পার্টনার। তখন কাকলির পক্ষে আত্মসমর্পণ করা অথবা পথের ভিখারি হওয়া, দুটো পথের যেকোন একটা বেছে নিতে হবে।

বাসু জানতে চান শেয়ারগুলো যে জীবন হালদারের কাছে গচ্ছিত আছে তা কি শুধু তোমার অনুমান?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই।

— ভৈরব দাশের সঙ্গে জীবন হালদারের পরিচয় আছে এমন কথা তুমি অনুমান করছ কেন?

— এটা নিছকই আমার অনুমান। হয়তো সিঁদুরে মেঘ দেখে আমি বৃথাই ভয় পাচ্ছি। আমার এ আশঙ্কা হয়েছে নীতার সঙ্গে কথা বলে। বাই দ্য ওয়ে, নীতা, আই মীন নবনীতা রায় আসেনি? বা টেলিফোন করেনি?

— আসেনি। তবে টেলিফোন করেছিল, আসতে পারবে না জানিয়ে।

— ও! কেন আসতে পারবে না তা বলেছে?

— বলেছে। ওকে কেউ এক বাক্স চকোলেট-ক্যান্ডি পাঠিয়েছিল। সেগুলো ছিল বিষাক্ত। ও তার কয়েকটা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নীতা আমাকে ফোন করে সে কথা জানিয়েছিল। কথা বলতে বলতেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

কাকলির দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। বলে, কী বলছেন! নীতাকে বিষাক্ত খাবার কে পাঠাবে? কেন পাঠাবে?

— সেটা এখনো জানা যায়নি। তবে ঐ চকোলেট-ক্যান্ডির সঙ্গে লোকটা একটা আনকোরা ডায়েরিও পাঠিয়েছিল। আর একটা চিরকুট নীতাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ...

কাকলি নিজের অজ্ঞাতসারেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে যেন বজ্রাহত হয়ে গেছে। বাসু বলেন, কী হল? উঠে দাঁড়ালে কেন?

— গুড হেভেন্স! ঐ ডায়েরি আর চিঠি তো আমিই পাঠিয়েছি।

— একটা পলিথিন ব্যাগে?

— হ্যাঁ।

— ঐ চকোলেট বাক্সটাও?

— না। নিশ্চয় না। বিষ-মেশানো চকোলেট আমি কেন পাঠাব?

— কখন ঐ ব্যাগটা পাঠিয়েছিলে? কার হাতে?

কাকলি আবার বসে পড়ে। বুঝিয়ে বলে যে, নবনীতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে দোকানে ফিরে আসে। নবনীতাকে সে বলেছিল একটা ডায়েরি উপহার দেবে, যাতে সে জানুয়ারি-মাসের সব ঘটনা লিখে রাখতে পারে — ঐ মটোর-অ্যাকসিডেন্ট-এর বিষয়ে তার যা স্মরণে আছে তা সমেত।

— তুমি ডায়েরিতেই তাহলে ঐ কথা লিখলে না কেন? 'নীতাকে, প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ — কাকলি।'

— আমি ভেবেছিলাম আদালতে হয়তো আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারব যে, ডায়েরিটা ও পয়লা জানুয়ারি থেকেই লিখছে। আমি উপহার দিলে তা হতে পারে না। কারণ নানান সূত্র থেকে প্রমাণ হবে যে, ওর সঙ্গে আমার পরিচয় মটোর দুর্ঘটনার পর। সে জন্যই ডায়েরিতে আমি কিছু লিখিনি। আলাদা কাগজে লিখেছিলাম।

— কার হাতে ওটা পাঠাও?

— আমার দোকানের ছোকরা চাকর। সে ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, সে দোকানের ভিতরে যায়নি। দারোয়ানের হাতে প্যাকেটটা দিয়ে আসে। প্যাকেটের উপর 'নবনীতা রায়' লেখা ছিল। দারোয়ান বলেছিল, নীতা-দিদিকে সে চেনে। দিয়ে দেবে প্যাকেটটা। আপনি স্যার কেমন করে বিশ্বাস করলেন যে, আমিই ঐ বিষাক্ত চকোলেট নীতাকে পাঠিয়েছি?

— আমি বলিনি কাকলি যে, তা আমি বিশ্বাস করেছি। এমনও হতে পারে যে, কোন একজন নবনীতাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়। সে ঐ সোনালি-স্বপনেরই লোক। বিষাক্ত ক্যান্ডিগুলো হয়তো সে আগেই তৈরি করে রেখেছিল। তোমার পাঠানো পলিথিন-ব্যাগটা দারোয়ানের মাধ্যমে পেয়ে সে এই সুযোগটা নিয়েছে। নীতা যদি জ্ঞান ফিরে পায় তাহলে একমাত্র সেই বলতে পারে কার হাত

থেকে প্যাকেটটা সে গ্রহণ করেছিল। কারণ দারোয়ান সম্ভবত বলবে যে, সে কাউন্টারে জমা দিয়ে এসেছিল। আর কিছু জানে না।

কাকলি জানতে চায়, নীতা এখন কোথায়? কেমন আছে?

— তুমি জানতে চেও না, কাকলি। এটুকু জেনে রাখ যে, তার ঠিকানা আমরা উদ্ধার করেছি। তাকেও উদ্ধার করে একটি নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিয়েছি। বিস্তারিত বিবরণ তোমার না জানা থাকাই ভাল। এখন আমাকে বল দিকিন — তোমার দিদির ঐ শেয়ারগুলো — যা, তোমার আশঙ্কায়, গচ্ছিত রাখা আছে জীবন হালদারের কাছে — তার বাজার দর কত?

কাকলি মাথা নিচু করে একটু ভেবে নিয়ে বলল, দেখুন স্যার — ব্যাপারটা এই রকম : দিদির সবগুলো শেয়ার বেচতে গেলে আমরা দেড়-দু-লাখ টাকা পাব কি না সন্দেহ। কিন্তু আমার কাছে ওর দাম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা! কারণ ঐ শেয়ারগুলো খোয়া গেলে আমি পথের ভিখারি হয়ে যাব! ভৈরব আমার দোকানের সিনিয়ার-মোস্ট পার্টনার হয়ে বসবে। আমার উপর ছড়ি ঘোরাবে। আমায় হয়তো সুইসাইড করতে হবে।

— ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল। যা বলছি তার জবাব দাও। আমাকে হয় তো তোমার অ্যাকাউন্টে কিছু খরচ করতে হবে। শেয়ারগুলো ফেরত পাও বা না পাও আমাকে কতদূর খরচ করতে দিতে পার তুমি?

কাকলি একটু ভেবে নিয়ে বলল, ধরুন দশ হাজার টাকা।

— তার বেশি নয়?

— ন্-না। অন্তত আমাকে না জানিয়ে নয়।

— হয়তো আমাকে কিছুই খরচ করতে হবে না। তবু ওটা জেনে রাখা ভাল। তাই জিজ্ঞেস করলাম।

ইন্টারকমে মিসেস বাসুকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, ঐ বাজোরিয়ার রেসিডেন্সে একটা ফোন কর তো। লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না জানি না। আমাকে এখনি জানতে হবে জীবন হালদারের ঠিকানাটা। একমাত্র বাজোরিয়াই তা বলতে পারবে। ওকে ফোনে ধর তো।

কাকলি একটু ইতস্তত করল। তারপর ওর শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা হাত ব্যাগ বার করল। তা থেকে একটা ডায়েরি বার করে মেলে ধরল বাসু-সাহেবের সামনে। বলল, জীবন হালদারের ঠিকানা আমার কাছে লেখা আছে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মোমিনপুরের কাছে — এই নিন।

— তোমার ডায়েরিতে জীবন হালদারের ঠিকানা এল কেমন করে?

— ওটা নবনীতার হাতের লেখা। কিন্তু ওর নামটা যেন প্রকাশ হয়ে না পড়ে। ও বিশ্বাস করে আমাকে দিয়েছিল।

— ঠিক আছে। কথাটা গোপনই থাকবে।

— আপনি কি জীবন হালদারের সঙ্গে দেখা করবেন?

— অফ কোর্স! আজ রাত্রেই। সে যাহোক, ও নিয়ে তুমি চিন্তা কর না। রাত এগারটা বাজে প্রায়। এতরাত্রে তোমার একলা ফেরা ঠিক নয়। আমার ভাগ্নে — সুকৌশলীর কৌশিক — তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কাকলি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। বাসু ধমক দিয়ে ওঠেন। ডোন্ট আর্গু! যাও এবার। ট্যাক্সি এতরাত্রে পাওয়াও কঠিন। পেলেও নিরাপদ নয়।

সুজাতা দ্বারপ্রান্ত থেকে ডাকল, আসুন! আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

কাকলি বাসু-সাহেবকে বলল, আমার কিছুতেই ঘুম আসবে না। জীবন হালদারের বাড়ি থেকে ফিরে এসে আমাকে একটা ফোন করবেন স্যার?

— কাল সকালে করলে হয় না?

—হয়। কিন্তু রাত দুটো-তিনটের সময় ফোন করলেও বাকি রাতটুকু আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি, এই আর কি!

— অল রাইট। যত রাতই হোক, তোমাকে ফোন করব।

নয়

কৌশিক গাড়িটা নিয়ে যখন রওনা হল রাত তখন এগারোটা। পিছনের সীটে কাকলি আর ড্রাইভারের পাশে সুজাতা। বাসু তাঁর ধর্মপত্নীকে প্রশ্ন করেন, সুজাতা আবার গেল কী করতে?

রানু বললেন, সে তোমার মাথায় ঢুকবে না। এস, ভিতরে এস। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে।

বাসু ভিতরে এসে বললেন, না, মানে সুজাতাকে যে আমার একটু দরকার ছিল।

— কী দরকার? আমাকে দিয়ে হবে না?

— হবে না কেন? হবে। বিশুকে দিয়ে তুমিই করিয়ে নাও। আজ রাতে কী খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে?

— তোমার জন্য খই-দুধ আর সন্দেশ, আর বাকি সকলের জন্য পরোটা- কিমাচচ্চড়ি। একটু কপির তরকারিও আছে। কেন বলতো? তুমি খেয়ে নিতে চাও?

— হ্যাঁ, আমার খাবারটা দিতে বল আর হট-কেস টিফিন ক্যারিয়ারে কৌশিকের পরোটা-মাংসটা ভরে দিতে বল। ওরা ফিরে এলেই আমি গাড়ি নিয়ে একবার মোমিনপুরের দিকে যাব — ঐ জীবন হালদারের 'ডেন'-এ।

— এত রাতে একা?

— জীবন হালদারের মতো লোকের কাছে 'নাইট ইজ প্রেটি ইয়াং'। এগারটা কোন রাত নয়। তবে একা যাওয়া বোধহয় সম্ভবপর নয়। তুমি যেমন ইদানিং রাতে আমার পরোটা খাওয়ার বদলে খই-দুধ-সন্দেশ ব্যবস্থা করেছ, কৌশিকও তেমনি গভীর রাতে আমাকে আজকাল একা বের হতে দেয় না। সেজন্যই ওর খাবারটা বেঁধে দিতে বলছি। আর ফ্লাস্কে পুরো এক ফ্লাস্ক হট কফি।

রানু তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে বিশুর তল্লাশে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন।

* * *

মোমিনপুরের কাছাকাছি একটা চওড়া রাস্তায় পোর্ট-ট্রাস্টের এক সারি ত্রিতল অফিসার্স কোয়ার্টার্স। দু-একটি অ্যাপার্টমেন্টে এই রাত সওয়া এগারোটার সময়ও হুল্লোড় চলছে। বাদবাকি চরাচর নিশুতি। ঐ রাস্তা থেকেই একটা ফ্যাকড়া পিচের রাস্তা ধরে কৌশিক গাড়িটাকে নিয়ে চলল। বাসু বলেন, রাস্তাটা কি তোমার চেনা?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। এ রাস্তায় এসেছি দু-একবার। এরপর একটা ফাঁকা মাঠ মতন, তার ওদিকে একটা কুখ্যাত বস্তি।

— 'কুখ্যাত বস্তি' মানে?

— পোর্ট ট্রাস্টের মজদুরদের। কন্ট্রাব্যান্ড ইম্পোর্টেড মালের ডিপো। ওদের মধ্যে অনেকের কালোবাজারে খুব দাপট।

এদিকটা রীতিমতো অন্ধকার। রাস্তায় বাতি নেই, অথবা লোডশেডিং চলছে। হেডলাইটের আলোয় পথ চলা। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। কৌশিক বলে, মনে হয় আমরা ঠিকানা অনুযায়ী গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে গেছি।

বাসু হঠাৎ কৌশিকের বাহুমূল চেপে ধরে বলেন, রোখকে, রোখকে।

কৌশিক তৎক্ষণাৎ ব্রেক-এ পা দেয়। গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ে। কৌশিক জানতে চায়, কী হল?

— সামনে পরপর চার-পাঁচটা গাড়ি পার্ক করা আছে, দেখেছ?

— হ্যাঁ, তাই তো। একটা দোতলা বাড়িতে আলো জ্বলছে। কিছু পার্টি-ফার্টি হচ্ছে নাকি?

— না। তুমি হেড লাইটটা নেবাও।

নির্দেশ মেনে ঘোর অন্ধকারে কৌশিক বলে, কী ব্যাপার?

— ঐ দোতলা বাড়িটায় কোনও পার্টি-ফার্টি হচ্ছে না কৌশিক। ওখানে কোন খুনজাতীয় কিছু ঘটেছে। শেষ গাড়ির নম্বরটা আমার চেনা। হোমিসাইড সেকশানের। ওটাতেই এতক্ষণ ঘুরছিলাম। লালবাজারেরর নিখিল দাশের গাড়ি।

কৌশিক কিছু বলার আগেই বিপরীত দিক থেকে একটা মোটর-বাইক এসে থামল বাকি রাস্তা জুড়ে। আরোহী নেমে এসে একটা টর্চ জ্বালল। অবাক হয়ে বললে, স্যার! আপনি! এতরাত্রে এখানে?

বাসু গাড়ির ভিতরের সুইচটা জ্বেলে দিয়ে বললেন, বিশ্বরূপ! তুমি এখানে! সামনের ঐ বাড়িতে বিশেষ কিছু ঘটেছে, তাই নয়? খবর সংগ্রহে এসেছ?

বিশ্বরূপ কলকাতার একটি নামী সংবাদপত্রের রিপোর্টার। সে বললে, কাল সকালে যদি নিউজটা ছাপতে হয় তাহলে আমার হাতে একটুও সময় নেই, বাসু-সাহেব। আপনি অনুমতি দিলে আমি রওনা হই, তবে আপনি যদি কোন 'স্কুপ' দিতে পারেন তাহলে না হয় দু-মিনিট দাঁড়িয়ে যাই।

— 'স্কুপ নিউজ'! কী বিষয়ে?

— বিষয় তো ঐ একটাই। যে জন্য মাঝরাতে হানা দিয়েছেন। ঐ মার্ডার কেসটার বিষয়ে।

— মার্ডার! ওখানে কেউ খুন হয়েছে?

বিশ্বরূপ হাসল। স্বীকারও করল, আপনি হাসালেন, স্যার। বলতে চান সেটা না জেনেই সুকৌশলীর কৌশিক-সহ মধ্যরাত্রে এপাড়ায় হানা দিয়েছেন?

বাসু বলেন, বিশ্বাস কর, বিশ্বরূপ, আমি সত্যিই এখনো জানিনা, কে খুন হয়েছে। আমি এপাড়ায় এসেছিলাম একজনের সঙ্গে দেখা করতে—

— ঐ বাড়িটায়? জীবন হালদারের সঙ্গে?

— হ্যাঁ, কী করে আন্দাজ করলে?

বিশ্বরূপ ওঁর শেষ প্রশ্নটা এড়িয়ে বলল, ঠিকানাটা ঠিকই খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু ঠিকানার মালিক জীবনের হাল ধরে নেই আর। আজ সন্ধ্যারাতে — ঠিক কটার সময় বলতে পারব না — এপাড়ার মস্তান 'জীবনগুরু' ভবনদীর ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন তাঁর হাল-ভাঙা নৌকার হাল ধরে।

— লোকটা খুন হয়েছে? কী ভাবে?

— কাল সকালে কী পড়বেন তার অ্যাডভান্স সামারিটা শুনিয়ে যাই। "মেয়েটি আন্দাজ করতে পারেনি: যে রক্ষক সেই ভক্ষক। জীবন-মস্তান ওর দিকে এক-পা এগিয়ে আসতেই সে টেবিলের ওপর থেকে রিভলভারটা তুলে নেয়। হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, জীবনকে ভয় দেখাতে, নিজের ধর্ম রক্ষা করতে। চাপা গর্জন করে ওঠে। 'আর এক পা এগোবার চেষ্টা করলেই....'। দুঃসাহসিক জীবন হালদার কর্ণপাত করে না। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনের দিকে। চেপে ধরে সুন্দরী মেয়েটির মুঠি আর তখনই ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে — রিভলভারটা! জীবন লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। মেয়েটি দেড়-মুহূর্ত স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়েই ছুটে পালায়"....নাঃ! দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্যার! চলি....

বাসু গাড়িতে বসে বসেই হাতটা বাড়িয়ে দেন। ওর হাতখানা চেপে ধরে বলেন মেয়েটা? 'মেয়ে' তা বুঝলে কী করে?

— ইন্সপেক্টর নিখিল দাশের তাই ধারণা। আর তাছাড়া আপনি তো তাকে চেনেন, স্যার।

— আমি? আমি তাকে চিনি? কেমন করে? কী তার নাম?

— কী মুশকিল! আমি তার নাম জানব কী করে? আপনি জানেন, যেহেতু, আপনার ক্লায়েন্ট।

তারই স্বার্থে এই মধ্যরাত্রে আপনার অভিসার....আচ্ছা, চলি স্যার...

— যাও। তেমাকে রুখব না। শুধু একটা কথা বলে যাও, মৃত্যুর সময়টা কি কিছু আন্দাজ করা গেছে?

— ইন্সপেক্টার দাশের ধারণা রাত নয়টার আগে নয়, আর এগারোটার পরে নয়। কিন্তু এটা ওর নেহাতই আন্দাজ। অটোপ্সি-সার্জেন-এর টেকনিক্যাল রিপোর্ট না পেলে কিছু বলা সম্ভবপর নয়।

— আর মার্ডার ওয়েপনটা? রিভলভারটা?

— সেটা নিয়েই মেয়েটি সটকে পড়েছে। মানে, আপনার ক্লায়েন্ট...

বিশ্বরূপকে আর ধরে রাখা গেল না। সে ভটভটিয়ে মধ্যরাত্রের কলকাতাকে কাঁপিয়ে ছুটল অফিসমুখো। কৌশিক প্রশ্ন করে, এখন কী করবেন? এগুবেন না পিছুবেন?

— পিছুবার জন্য এগোব!

— মানে?

— ঐ বাড়িটা অতিক্রম করে সামনের দিকে চলে যাও। বেশ ধীরে ধীরে। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব। তারপর কিছুদূর গিয়ে মোড় ঘুরিয়ে এই রাস্তা দিয়েই উল্টোমুখে ফিরে যাব আমরা। এ অবস্থায় আমি ইন্সপেক্টার দাশের মুখোমুখি হতে চাই না।

— কেন মামু? ইন্সপেক্টর দাশ তো শুনেছি আপনার 'ফ্যান'। ইন্সপেক্টর বরাট হোমিসাইড থেকে বদলি হয়ে যাবার পর ও নতুন এসেছে। আপনার সঙ্গে তো এখনো কোনও বিরোধের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আপনি কি আশা করছেন না যে, ওর কাছ থেকে আরও বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে?

— যাবে কি যাবে না জানি না। কিন্তু তার আগে আমাকে একটি কাজ করতে হবে, কৌশিক। ইন্সপেক্টর দাশের জীপ গড়িয়াহাটায় পৌছানোর আগে আমাকে একবার কাকলির সঙ্গে দেখা করতে হবে। কেন কী বৃত্তান্ত সে পরে শুনো। স্টার্ট দাও।

যতটা নিঃশব্দে সম্ভব কৌশিক স্টার্ট দিল। ধীর গতিতে জীবন হালদারের বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায় দু-তিনশ মিটার এগিয়ে গেল। যাওয়ার পথে বাসুসাহেব চলতি গাড়ি থেকে কিছুই দেখতে পেলেন না। এ পাড়ায় লোড-শেডিং চলছে বটে কিন্তু জীবন হালদারের বাড়িতে ডায়নামো আছে। তার ভটভট্ শব্দের সুযোগে কৌশিক নিঃশব্দে স্টার্ট নিতে পেরেছিল। বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যেতেও পেরেছিল। নির্দেশমতো এবার সে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল। ধীরে ধীরে বাড়িটা অতিক্রম করার সময় এবার তাকে বাধ্য হয়ে ব্রেক কষতে হল। পথের মাঝখানে একজন পুলিস হাত তুলে ওকে গাড়ি রুখতে বলছে।

কৌশিক গাড়িটা থামালো। বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এল ইন্সপেক্টার দাশ। কাছাকাছি এসে কৌশিককে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বাসু ওর পাশের সীটে নিখিল দাশের উল্টো দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর মুখ অন্ধকারে। কৌশিক বললে, রাস্তা ভুল করেছি। এ গলি নয়।

— অল রাইট। কোথায় যাবেন আপনি এত রাত্রে?

বাসু এদিকে ফিরে বললেন, আরে। নিখিল?

নিখিল হাতের টর্চটা জ্বালল। এখন মোটামুটি সকলকেই চেনা যাচ্ছে। নিখিল বলল, এ কী! আপনি! এখানে এত রাত্রে!

— জীবন হালদারের কাছে এসেছিলাম — ঐ নবনীতার কেসটার ইনভেস্টিগেশানে, কিন্তু এইমাত্র শুনলাম...

— এইমাত্র? না, খবরটা জেনে তারপর এসেছেন?

— না, নিখিল। এখানে এসে একজন রিপোর্টারের কাছে খবরটা প্রথম শুনলাম। সত্যিই জীবন হালদার খুন হয়ে গেছে?

নিখিল ওঁর বাহুল্য প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আজ রাত সাড়ে নটায় দু-জনের

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। তার মধ্যে একজন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। কেন পারেননি তা আমি জানি, কিন্তু সে ভদ্রমহিলা আপনার ক্লায়েন্ট নন। ক্লায়েন্টের তরফে হয়তো সাক্ষী হতেন, তাই নয়? আপনার ক্লায়েন্ট কি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে পেরেছিলেন, স্যার? তাঁর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

— হ্যাঁ, হয়েছে। তাকে আমি জানিয়েছি যে, নবনীতাকে কেউ...

— আই নো, আই নো! তাহলে ক্লায়েন্টের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে। রাত ক'টার সময়, স্যার?

বাসু বলেন, এ সব অ্যানালিটিক্যাল আলোচনা পরেও তো হতে পারে। তুমি কি ফটোগ্রাফার আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের...

কথাটা তাঁর শেষ হল না। ইন্সপেক্টর দাশ বলে, তারা জীবন হালদারের ঘরটা তন্নতন্ন করে সার্চ করছে। ফটো নিচ্ছে, ডাস্টিং করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করলাম....

এবারও বাধা পড়ল। একজন অফিসার বাড়ি থেকে বার হয়ে এসে ইন্সপেক্টর দাশকে প্রশ্ন করল, এবার কি ডেডবডি রিমুভ করব, স্যার?

ইন্সপেক্টার দাশ তাকে বললেন, আমি দেখছি।

বাসু হাত নেড়ে বললেন, বেস্ট অব ল্যক।

কৌশিক সঙ্কেতটা বুঝল। তৎক্ষণাৎ স্টার্ট দিল গাড়িতে।

* * *

মোমিনপুর থেকে ফেরার পথে হাজরা রোডে একটা পেট্রল পাম্প স্টেশন অত রাত্রেও খোলা পাওয়া গেল। বাসু গাড়িটা ওখানে ঢোকাতে বললেন। কৌশিক বলে, গাড়িতে তেল যথেষ্টই আছে।

বাসু বলেন, জানি। তুমি পেট্রল নিতে নিতে আমি একটা টেলিফোন সেরে নিই।

— এতরাত্রে কাকে ফোন করবেন?

— তা নিয়ে তোমার কেন মাথাব্যথা?

কৌশিক দশ লিটার পেট্রল ভরে নিল। ইতিমধ্যে বাসু-সাহেব ফোন করলেন সানি-সাইড নার্সিংহোমে। মিনিটখানেকের মধ্যেই রিসেপশানিস্ট ডক্টর ব্যানার্জিকে লাইনটা দিতে পারল।

— পি. কে. বাসু বলছি, বাঁডুজ্জে। নবনীতাকে কেমন বুঝছ?

— বেঁচে যাবে।

— ক্যান্ডি-চকোলেটগুলো কি বিষ মেশানো ছিল?

— হ্যাঁ, প্রতিটি ক্যান্ডির মাঝখানে বিষাক্ত ট্যাবলেট অতি সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

— কী বিষ?

— বিষ ঠিক নয়, কড়া ঘুমের ওষুধ। রুগীর বিভিন্ন সিমটম দেখে আন্দাজ করছি কোন এক রকমের বার্বিচুরিক ডেরিভেটিভ, সম্ভবত ভেরোনল। ভেরোনল ট্যাবলেটের স্বাদ একটু টকটক — অ্যাসিডিক স্বাদ। বাদাম মেশানো চকোলেটের সঙ্গে দিব্যি মিশে যায়।

— কতটা ভেরোনল খেয়েছে? কতটা খেলে ঘুম আর ভাঙে না?

— 'ভেরোনল' ঘুমের ওষুধ। নিদ্রা-আকর্ষক এবং মৃত্যু-আকর্ষক ডোজ-এর মধ্যে যথেষ্ট ফারাক সচরাচর ঘুম পাড়াতে আমরা পাঁচ থেকে দশ গ্রেন প্রেসক্রাইব করি। যাট গ্রেন খেয়ে রুগী মারা গেছে এমন নজির আছে, আবার তিনশ গ্রেন শরীরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও রোগীকে বাঁচানো গেছে, এমন রেকর্ডও আছে। তবে সেটা একটা এক্সেপশন। বলা যায়, দুশো গ্রেনের বেশি সচরাচর 'ফেটাল ডোজ'। আমরা এখনো বাকি চকলেটগুলোর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট পাইনি। কিন্তু আমার ধারণা, প্রতিটি চকোলেটে আন্দাজ পাঁচ গ্রেন ভেরোনল আছে, ম্যাক্সিমাম সাত গ্রেন। তার মানে, ও পঞ্চাশ গ্রেনের বেশি খায়নি ছয়টা চকোলেটে। আমার তো আশা আছে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ চান্স ও বেঁচে যাবে

— ও কি ঘুমাচ্ছে?

— অঘোর ঘুমে। শ্বাস-প্রশ্বাস একটু ধীরে। টেম্পারেচার এক ডিগ্রি বেড়েছে। কিন্তু বেঁচে যাবে নিঃসন্দেহে।

— ঠিক আছে। তুমি তিন-শিফট-এ নার্সের ব্যবস্থা কর। চব্বিশ ঘণ্টা যেন ওর কাছে কেউ না-কেউ থাকে। ওকে যে খাবার দেওয়া হচ্ছে...

— বাসু-সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই নার্সিংহোমের ভিতর ওর খাদ্যে নতুন করে কেউ ভেরোনল মেশাতে পারবে না। আমার এখানে সাবধানতা নিশ্ছিদ্র।

— ধন্যবাদ। কখন ওর জ্ঞান হবে মনে হয়?

— ও এখন বেশ কিছুক্ষণ ঘুমাবে। আমরা ওর স্টম্যাক-ওয়াশ করেছি, কিন্তু বেশ কিছুটা ভেরোনল ওর সিস্টেমে মিশে গেছে। ওকে আরও চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমোতে দিন, তারপর ও আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

বাসু বললেন, আমার কি মনে হয় জানো, ডাক্তার? কে ওকে চকোলেটগুলো পাঠিয়েছিল, তা আমার আন্দাজের বাইরে—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সে লোকটা নবনীতাকে হত্যা করতে চায়নি। সে শুধু চেয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ওকে ঘুম বাড়িয়ে রাখতে।

— আমি ওসব জানি না, বুঝি না। আমি এটুকু বলতে পারি — মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠবে। অলমোস্ট নির্ঘাৎ। তবে চব্বিশ ঘণ্টার আগে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। এ বিষয়ে তাড়াহুড়া চলবে না।

— একটা অনুরোধ করব, ডাক্তার?

— বলুন?

— মেয়েটি জ্ঞান হলে আমি যেন প্রথম খবরটা পাই।

— ব্র্যাকেটে ফার্স্ট।

— বেগ য়োর পার্ডন?

— আমি বলছি, আপনারা দুজন একই সঙ্গে বিজ্ঞাপিত হবেন। আপনি এবং লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াড। কারণ, ঐ পুলিস ইন্সপেক্টরটি রোগী ভর্তি করে আমাকে একই অনুরোধ করে গেছে, রোগিণী কথা বলার মতো অবস্থায় এলে আমি যেন তাকে সবার আগে জানাই।

— অল রাইট! আমরা যেন একই সঙ্গে ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হই।

— তাই হবে।

কৌশিক ইতিমধ্যে পেট্রল ভরে নিয়ে বিল মিটিয়ে তৈরি। বাসু গাড়িতে উঠে বললেন, এবার চল গড়িয়াহাটে। কাকলির বাড়িতে। সেটা তো তোমার চেনা।

কৌশিক বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কাকলির বাড়ির দোরগোড়ায় যখন গাড়িটা পৌঁছাল রাত তখন পৌনে- বারটা। গড়িয়াহাটের মতো কর্মব্যস্ত রাজপথ তখন ঘুমে অচেতন। কিন্তু কাকলির মেজানাইন-ঘরে আলো জ্বলছে। মেয়েটি বাসু-সাহেবকে অনুরোধ করেছিল দুটো-তিনটে যতই রাত হোক, বাসু-সাহেব যেন জীবন হালদারের সঙ্গে দেখা করার পরে ওকে একটা ফোন করেন। না হলে ওর সারারাত নাকি ঘুম হবে না। কেন? কাকলি কি জানত, বাসু-সাহেব জীবন হালদারের 'ডেন'-এ পৌঁছালে একটা বীভৎস দৃশ্যের মুখোমুখি হবেন? কিভাবে এটা সে অনুমান করল?

বাসু গাড়ি থেকে নেমে বললেন, কৌশিক, তুমি গাড়িতেই থাক। তবে এখানে নয়, একশ গজ এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা পার্ক কর। কারণ আমার আশঙ্কা আধঘণ্টার মধ্যেই নিখিল দাশ এখানে হাজির হবে। আমি তার মুখোমুখি হতে চাইনা। তাই তুমি এমনভাবে গাড়িটা পার্ক কর যাতে দূর থেকে তোমার নম্বর-প্লেটটা পড়া না যায় — আধ-অন্ধকারে গাড়িটা রেখ। ততক্ষণ তুমি রাতের খাবারটা খেয়ে নাও। কেমন?

কৌশিক ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বাসু এগিয়ে গেলেন ফটোগ্রাফিক স্টোরসের দিকে। দোকানের পাশ দিয়ে উপরে ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু এই মধ্যরাত্রে তা কোলপসিবল গেটে বন্ধ। বাসু এদিক-ওদিক কলিংবেল খুঁজতে থাকেন। হটাৎ মেজানাইন-ঘরের জানলাটা খুলে গেল। কাকলি মুখ বার করে বললে, আসছি স্যার।

মিনিটখানেকের মধ্যেই নেমে এসে ও তালা খুলে ওঁকে ভিতরে নিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে কাকলি প্রশ্ন করে, জীবন হালদারের সঙ্গে দেখা হল?

— না, হল না। তুমি ওভারকোটটা খুলে রেখেছ কেন? শীত করছে না?

— করছে। আমি এতক্ষণ কম্বলের তলায় ছিলাম। আসুন—

বাসু ওর পিছন-পিছন ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। ছিমছাম সাজানো এক-কামরার ফ্ল্যাট। সব রকম ব্যবস্থাই আছে।

ঘরে ঢুকে কাকলি দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, একটু কফি খাবেন? গরম কফি? হীটারে বসিয়ে দেব?

— দাও। কিন্তু জীবন হালদারের সঙ্গে কেন দেখা হল না তা তো তুমি জানতে চাইলে না, কাকলি?

কাকলি কেটলিতে জল ভরে হীটারে বসাতে বসাতে বললে, ও কি বাড়িতে ছিল না? অত রাতেও?

— না, ছিল। বাড়িতেই ছিল।

তবু বাসু-সাহেবের চোখে-চোখে না তাকিয়ে কাকলি জানতে চায়, তাহলে কি নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল?

— না, মদের নেশায় নয়। জীবন হালদার আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি, কারণ লোকটার দেহে প্রাণ ছিল না!

কাকলি ঘুরে দাঁড়ায়। ওঁর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলে, মানে?

— মানেটা তুমি কি সত্যিই জান না, কাকলি?

কাকলি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার কণ্ঠে স্বর ফোটে না।

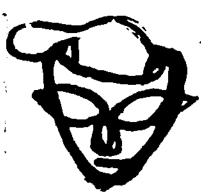

দশ

পুরো দশ সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর বাসু বলেন, সন্ধ্যা রাত্রে পয়েন্ট থ্রি-টু ক্যালিবারের একটা রিভলভারের গুলি জীবনের জীবনাবসান ঘটিয়েছে।

কাকলি অনেক কষ্টে বললে, কে? ... কে মেরেছে ওকে?

— সেটা এখনো জানা যায়নি। তবে গুলিটা ওর পিঠের দিক দিয়ে ঢুকেছে। যেই হত্যা করে থাক — আত্মরক্ষার্থে সে গুলি করেছে এটা প্রমাণ করা শক্ত হবে।

কাকলি অহেতুক হেসে ওঠে। বলে যাক বাবা, আমার একটা 'অ্যালিবাই' আছে।

— আছে? কী সেটা?

কাকলির ভ্রূকুটি হয়। বলে, সত্যিই জানতে চান? আর যু রিয়ালি সিরিয়াস?

— তুমি কি কথাটা গুরুত্ব দিয়ে বলনি?

— কোন কথাটা? ঐ 'অ্যালিবাই'-এর কথা? নিশ্চয় নয়।

— বেশ তাহলে এস এবার আমরা গুরুত্ব দিয়ে কথাটা বিচার করি। তোমার সত্যি কোনও 'অ্যালিবাই' আছে?

— কী বলছেন স্যার? আমি...আমি কেন জীবন হালদারকে খুন করতে যাব? আমি তাকে চিনিই না। তাছাড়া আমি তো তার কাছ থেকে ঐ শেয়ারের কাগজগুলো...

— আমার সঙ্গে সাড়ে নয়টায় তুমি দেখা করতে পারনি একটা জরুরি কাজে। অন্তত সে কথাই তখন বলেছিলে। সেই জরুরি কাজটা কী?

— আমি...আমি যোধপুর পার্কের বাড়িতে গেছিলাম।

— দিদির কাছে? দেখা হয়েছিল?

— না, দিদি ছিল না বাড়িতে।

— তুমি না বলেছিলে তোমার দিদি শয্যাগত?

— না, শয্যাগত ঠিক নয়। মাঝেমাঝে বের হয়...।

— যাদুগোপালের সঙ্গে? সেও ছিল না নিশ্চয়?

— না। বাড়ি তালাবন্ধ ছিল।

— তাহলে তোমার 'অ্যালিবাই'টা কী?

কাকলি দেখতে গেল জলটা ফুটেছে কি না। প্রয়োজন ছিল না। জল এত অল্প সময়ে ফুটতে পারে না। হঠাৎ কাকলি জানতে চায়, ব্রান্ডি খাবেন স্যার?

— ব্রান্ডি? তুমি খাও?

— না-না। খাই না। ডাক্তার একবার প্রেসক্রাইব করেছিলেন। মানে, ডক্টরস ব্রান্ডি। আধ বোতলটাক আছে। কফির সঙ্গে মিশিয়ে দেব? দারুণ শীত নয়?

বাসু বললেন, কই আমার তো শীত করছে না। তুমি একটা জামা গায়ে দাও না—

কাকলি কথাটা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। নিচু হয়ে একটা কাবার্ড খুলে বার করে আনে একটা ডক্টরস ব্রান্ডি বোতল। গ্লাসে ঢালতে থাকে। ওর হাতটা কাঁপছে। বোতলের মাথাটা গ্লাসের কানায় ঠুনঠুন করে বাজছে। শীতে? না, নার্ভাসনেস?

বাসু ঘরের চারিদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন। নিঃশব্দে চরণে সোজা এগিয়ে গেলেন একটা কাঠের ওয়ার্ড্রোবের দিকে। তালাবন্ধ ছিল না। বাসু পাল্লাটা খুলে দেখলেন নিচে কয়েক জোড়া নানান রঙের লেডিজ শ্যু — উপরে হ্যাঙারে ঝুলছে নানান শাড়ি। আর সেই গরম ওভারকোটটা।

হঠাৎ এদিকে ফিরল কাকলি। সবিস্ময়ে বলে, ও কী করছেন?

— তোমার ওভারকোটটা...

চমকে ওঠে মেয়েটা। প্রায় দৌড়ে এগিয়ে আসে এদিকে। কিন্তু তার আগেই বাসু-সাহেব ঐ ওভারকোটের বাঁ-পকেট থেকে বার করে ফেলেছেন জিনিসটা।

কাকলি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়।

বাসু আলোর দিকে তুলে ধরলেন যন্ত্রটা। বললেন, — হ্যাঁ, পয়েন্ট থ্রি-টু বোরই। স্প্যানিশ রুবি। চেম্বারটা খুলে আলোর বিপরীতে ধরলেন। পাঁচটা চেম্বারে টাটকা বুলেট। শুধু ট্রিগারের সামনেরটা ফাঁকা। উনি নাকের কাছে নিয়ে এসে গন্ধ শুঁকলেন। চেম্বারটা বন্ধ করলেন, ওয়ার্ড্রোবের পাল্লাটাও। ধীর পায়ে ফিরে এসে বসলেন আবার নিজের চেয়ারে। রিভলভারটা নামিয়ে রাখলেন টি-পয়ে।

কাকলি কেটলি থেকে একটু আধাগরম জল তার ব্রান্ডি-গ্লাসে মিশিয়ে দিল। তারপর ঢেলে দিল নিজের কণ্ঠনালীতে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল।

বাসু প্রশ্ন করেন, এটা তোমার?

— হ্যাঁ, বাবার ছিল। এখন আমার।

— লাইসেন্স তোমার নামে?

— ইয়েস।

— তুমি কি জান কাকলি, ব্যালাস্টিকস এক্সপার্ট বুলেটটা উদ্ধার করতে পারলে বলে দিতে পারবে কোন রিভলভার থেকে তা ছোঁড়া হয়েছে?

কাকলি বলে — আপনি কি আমাকে লিগাল পরামর্শ দিচ্ছেন? ..আই মীন, আমার ল-ইয়ার

হিসাবে?

— না কাকলি। তোমার আইন-পরামর্শদাতা আমি নই। তোমাকে আমি আমার ক্লায়েন্ট বলে মেনে নিচ্ছি না।

— আমি আপনার ক্লায়েন্ট নই? আমার ধারণা হয়েছিল...

— না! ধারণাটা ভ্রান্ত। এই মার্ডার কেস-এ আমি তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করছি না।

— কেন? কেন করছেন না?

— যেহেতু এ কেসটা সম্বন্ধে আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই শুনিনি। তুমি যখন আমার কাছে এসেছিলে তখন তোমার ওভারকোটের বাঁ-দিকের পকেটটা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ছিল। ওয়েল, থাক ওসব কথা...তুমি আমাকে বলেছিলে তোমার দোকানের শেয়ারের কথা, তখনো জীবন হালদার খুন হয়নি,—

কাকলি বলে — আপনি কি ধরে নিয়েছেন আমিই খুনটা করেছি?

বাসু উঠে গেলেন। কেটলির জলটা ফুটছে। রুমাল দিয়ে ধরে নামালেন। কফির কৌটো থেকে কফি নিয়ে কফি-পটে দিলেন। গরম জলটা এবার ঐ পটে ঢালতে থাকেন। কাকলি ওঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না।

বাসু চিনি মেশাতে মেশাতে বললেন, আমি জানি না। তুমি আমাকে কিছুই বলনি।

— যদি সব কথা খুলে বলি?

— না, বলো না। কারণ আমি তোমাকে রিপ্রেজেন্ট না করলে তোমার পক্ষে অসুবিধা হবে। তবে দু'একটা প্রশ্ন করে মোটামুটি তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি। সময় খুবই কম, কাকলি। আমার মনে হয়, দশ-পনের মিনিট মাত্র সময় আছে....

— কেন? তারপর কী হবে?

— লালবাজার হোমিসাইড স্কোয়াড-এর ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ এখানে এসে পৌঁছাবে।

— অল রাইট। আপনি কি আমার দিদিকে ক্লায়েন্ট বলে মেনে নেবেন? যদি আমি আপনাকে নিয়োগ করি?

— তোমার দিদি? এ কেসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

— বলতে পারি, যদি কথা দেন আপনি গোপন রাখবেন?

— কী পাগলামি করছ, কাকলি। তুমি আমাকে যা বলবে তা তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি বলব না, তোমার কেস নিই বা না-নিই।

কাকলি এবার বিস্তারিত খুলে বলে তার অভিজ্ঞতার কথা।

'সোনালি স্বপন' থেকে ফিরে এসে সে চাকর দিয়ে নবনীতাকে ঐ ডায়েরিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। ততক্ষণে ওর কাউন্টার-গার্ল সুপর্ণাও চলে গেছে। দোকান বন্ধ করে কাকলির মনে হয় হাতে যথেষ্ট সময় আছে। সে সত্যিই আর একবার যোধপুর পার্কের বাড়িতে যায়। রাত তখন পৌনে নয়টা। সত্যিই দেখে, সদরে তালা ঝুলছে। কাকলি খুবই অবাক হয়।

এতরাত্রে যাদুগোপাল তার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় গেল? ওর কাছে ডুপ্লিকেট-চাবি ছিল। সদর খুলে ও একতলায় আসে। সেখান থেকে ওদের গ্যারেজটা দেখা যায়। দেখে, গ্যারেজে গাড়িটা নেই। সেটাই স্বাভাবিক। যাদুগোপাল সস্ত্রীক কোথাও গেলে গাড়ি নিয়েই যাবে। মাসদুয়েক জয়া শয্যাশায়ী ছিল। ইদানীং দু-একবার যাদুগোপাল ওকে নিয়ে এখানে-ওখানে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে ওর খটকা লাগে। যাদুগোপালের মোটর সাইকেলটাও গ্যারেজে অনুপস্থিত। এটা কেমন করে হয়? কাকলি দ্বিতলে উঠে আসে। দ্বিতলের সদর-দরজাটা চাবি বন্ধ ছিল না। ও ঘরে ঢোকে। আলোটা জ্বালে। ওদের ডবল-বেড খাটের মাথার কাছে একটা লকার আছে। এখন এই ডবল-বেড পালঙ্কটা ওর দিদি-জামাইবাবু ব্যবহার করে ; এককালে ওরা দুই বোন ব্যবহার করত। ঐ লকারের চাবি দু-বোনের কাছেই

ছিল, এখনো আছে। কাকলি ঐ লকারটা তার ডুপ্লিকেট-চাবি দিয়ে খুলে ভিতরে দেখতে গেল....

বাসুসাহেব এতক্ষণ নিঃশব্দে ওর জবানবন্দি শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, ঐ বেড-সাইড লকারের ভিতর কী খুঁজছিলে তুমি? দিদির লেডিজ ব্যাগ? ড্রাইভিং লাইসেন্স?

— আজ্ঞে না। এই রিভলভারটা—

— সে কী। তুমি যে বললে এটা তোমার?

— হ্যাঁ, আমারই ছিল, আমারই আছে। বাবা মারা যাবার পর ওটা আমার নামে ট্রান্সফার করা হয়েছে। কিন্তু দিদি অসুস্থ, ও বাড়িতে কখনো কখনো একেবারে একা থাকে, যখন যাদুগোপাল ইয়েল-লক বন্ধ করে বাইরে যায়। তাই আমি প্রায় মাসদুয়েক আগে এটা দিদিকে রাখতে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম, দিদি ঐ লকারে রিভলভারটা রাখে।

— আই সী। তারপর? বলে যাও।

— ড্রয়ারে রিভলভারটা ছিল না। বুঝুন তখন আমার অবস্থা! দিদি যদি যাদুগোপালের সঙ্গে বাড়ির বাইরে গিয়ে থাকে তা হলে মোটরবাইকটা গ্যারেজে থাকার কথা। তা যখন নেই তখন দিদিই ড্রাইভ করছে। ঐ আগ্নেয়াস্ত্রটা নিয়ে অসুস্থ-অবস্থায় দিদি নিজে গাড়ি চালিয়ে কোথায় যেতে পারে?

— তখন রাত ক'টা?

— আমি জানি না। ন'টার কাছাকাছি। আমি ওখান থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিই। কাছাকাছি আমাদের আত্মীয়-বন্ধু যাঁরা থাকেন তাঁদের কাছে একের পর এক খোঁজ নিতে থাকি। কোথাও ওদের দেখা পাই না।

— তার মানে কালকের কাগজে এই হত্যাকাণ্ডের খবরটা ছাপা হলে আর তোমাকে পুলিসে অ্যারেস্ট করলে বেশ কিছু সাক্ষী পুলিস যোগাড় করতে পারবে, যারা কাঠগড়ায় উঠে বলবে তুমি ট্যাক্সি নিয়ে তোমার দিদি-জামাইবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে?

— তাই বলছি, আপনি, স্যার, দিদিকে রিপ্রেজেন্ট করুন।

— দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে সবটা শুনি। প্রথমে বল — পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক জবাব দাও — তুমি জীবন হালদারকে খুন করনি?

— কী বলছেন আপনি? না, নিশ্চয় না।

— তুমি কি তোমার দিদি অথবা জামাইবাবুর সাক্ষাৎ পেয়েছ তারপর?

— আজ্ঞে না।

— তাহলে তোমার কাছে যন্ত্রটা এল কী করে?

— সে কথাই তো বলছিলাম, আপনি মাঝখানে থামিয়ে দিলেন।

— অল রাইট। বাকিটা বল, কিন্তু খুব সংক্ষেপে।

— ট্যাক্সি করে যখন ওদের এখানে-ওখানে খুঁজছি তখন হঠাৎ খেয়াল হল যে, রাত সাড়ে ন'টায় আপনার বাড়িতে আসার কথা। সে সময় আমি গড়িয়াহাটাতেই। তাই ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। আপনাকে টেলিফোনে জানাতে চাই যে, বিশেষ কারণে সাড়ে নয়টায় আমি আসতে পারিনি। আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। রাত তখন নটা চল্লিশ। মেসেজটা মিসেস বাসুকে দিই।

—রিভলভারটা কোথায় পেলে সেটা ঝটপট বল।

— রাত পৌনে দশটা নাগাদ আবার আমি যোধপুর পার্কের বাড়িতে পৌছাই। এবারও বাড়ি বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। ওদের দু'জনের কেউই তখনো ফেরেনি। কিন্তু আশ্চর্য। দোতলায় বাতিটা জ্বলছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে যখন প্রথমবার নির্জন বাড়িতে-আমি আসি, মানে যখন দেখি যে, বেড-সাইড লকারে রিভলভারটা নেই, তখন ঘর ছেড়ে যাবার আগে আমি সুইচটা অফ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি। সিঁড়ির উপরে-নিচে সুইচ আছে। তাই নিচে নেমে এসে সিঁড়ির আলোটাও নিবিয়ে দিই। তাই আমি খুব অবাক হয়ে যাই। আলোটা আবার জ্বলে উঠল কী করে? আমি ভাবলাম...

— তুমি কি ভাবলে তা আমি জানতে চাই না কাকলি, তুমি পর পর কী করলে তাই শুধু বলে যাও...অ্যান্ড বি স্ন্যাপি। সময় খুব কম।

কাকলি বলে, — এরপর সে পুনরায় তার চাবি দিয়ে সদর খোলে। সিঁড়ির আলো জ্বালে। উপরে ওঠে। ওদের ফ্ল্যাটে সদর এখনো খোলা পড়ে আছে। ও ঘরে ঢোকে। আলোটা জ্বলছে। দু'একবার দিদিকে ডাকে। কেউ সাড়া দেয় না। ও লক্ষ্য করে দেখে দিদির কিছু জামা-কাপড় খাটের উপর পড়ে আছে। যা আগের বার ছিল না। ও এগিয়ে এসে আবার লকারটা খোলে। দেখতে পায় এবার রিভলভারটা রয়েছে। কাকলি যন্ত্রটা হাতে তুলে নেয়। চেম্বারটা খুলে দেখে পাঁচটা তাজা বুলেট ভরা আছে, কিন্তু ট্রিগারের সামনে চেম্বারটা ফাঁকা। কাকলি ওটার গন্ধ শুঁকে দেখে। বেশ বোঝা যায়, কিছুক্ষণ আগেই যন্ত্রটা ব্যবহার করা হয়েছে। বারুদের গন্ধ তখনো লেগে রয়েছে। ও যন্ত্রটা ওভারকোটের পকেটে ভরে নেয়। সোজা চলে আসে নিউ আলিপুরে বাসু-সাহেবের বাড়িতে।

— তার মানে ওটাতে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে?

— তা তো যাবেই।

— তোমার ধারণা তোমার দিদি ঐ বুলেটটা ছুঁড়েছে?

— না! যাদুগোপাল ওটা ব্যবহার করেছে।

কাকলির বিশ্বাস, বিকালে সে যখন যাদুগোপালের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল তখন সিঁড়ির মুখে এগিয়ে জয়া সেটা শুনেছে। তারপর কী হয়েছে বলা মুশকিল ; কিন্তু ওর বিশ্বাস যাদুগোপাল স্ত্রীর লকার থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে মোমিনপুরের দিকে রওনা দেয় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। তার মোটর সাইকেলের শব্দে জয়া সেটা টের পায়। ও নিজের গাড়ি নিয়ে যাদুগোপালের পিছু নেয়। এ-ছাড়া গ্যারেজ এবং লকার শূন্য থাকার আর কোনো যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা হতে পারে না। তারপর ওদের মধ্যে যে কোনও একজন ফিরে এসে রিভলভারটা ঐ লকারে রেখেছে। কাকলির ধারণা, গুলিটা করেছে যাদুগোপাল, কিন্তু জয়া সেটা জানে।

— তুমি চাও, আমি জয়ার পক্ষে থাকি? জয়া আমার ক্লায়েন্ট?

— হ্যাঁ, তাই।

— তার মানে, জয়াকে বাঁচাতে গিয়ে যদি অপরাধটা তোমার দিকে ঠেলে দিতে হয় তাহলে আমি দ্বিধা করব না। কেমন?

— হ্যাঁ, তাই। আমি নিজেকে রক্ষা করতে জানি। পারব। দিদি অসুস্থ, ওকে যদি পুলিস ধরে, জেরা করে, কাঠগড়ায় তোলে, তাহলে ও হার্টফেল করেই মারা যাবে। আপনি শুধু ওর ইন্টারেস্টটা দেখুন। আমি নিজেরটা দেখব।

বাসু-সহেব হঠাৎ প্রশ্ন করেন, কাকলি, তুমি 'প্যারাফিন-টেস্ট' কথাটা কখনো শুনেছ?

— 'প্যারাফিন-টেস্ট'? না শুনিনি। প্যারাফিন জানি। একটা হাইড্রোকার্বন। গলানো মোমজাতীয় পদার্থ। 'টেস্ট' তো পরীক্ষা। দুটো মিলিয়ে...

— শোন বুঝিয়ে বলি, কেউ যদি একটা রিভলভার ছোঁড়ে তাহলে কিছুটা বারুদ ব্যাকফায়ার করে পিস্তল-ব্যবহারকারীর হাতে—চামড়ার খাঁজে খাঁজে ঢুকে যায়। সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে ফেললেও এবং চোখে দেখা না গেলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বলে দেওয়া যায়—কেউ সম্প্রতি একটা রিভলভার ব্যবহার করেছে কি না।

— কেমন করে?

— ঐ 'প্যারাফিন টেস্ট' করে। রিভলভার ব্যবহার করার তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহলে তথ্যটা ধরা পড়ে। প্রথমে গলানো প্যারাফিন সন্দেহভাজন ব্যক্তির হাতে ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর পাতলা একটা তুলোর প্রলেপে হাতটা ঢেকে দেওয়া হয়। তারপর প্যারাফিনটা 'সেট' করে গেলে খুব সাবধানে তুলোর ব্যান্ডেজটা গুটিয়ে নেওয়া হয়। হাতে চামড়ায় যে-সব অদৃশ্য বারুদের

টুকরো গেঁথে গিয়েছিল তা ঐ প্যারাফিনের সঙ্গে উঠে আসে। তার পর একটা রাসায়নিক 'রি-এজেন্ট' ঐ প্যারাফিনে ঢেলে দেওয়া হয়। একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় — বারুদের নাইট্রেট-কণা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে...

— আপনি এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?

— বলছি এজন্য যে, জয়া যদি রিভলভারটা না ব্যবহার করে থাকে তাহলে যত শীঘ্র সে ধরা পড়ে ততই ভাল। এখনি 'প্যারাফিন-টেস্ট' করে বলে দেওয়া যায় যে, চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সে কোনও রিভলভার ছোঁড়েনি।

— কিন্তু...কিন্তু ধরুন যদি সে রিভলভারটা ছুঁড়ে থাকে? আই মীন আত্মরক্ষার্থে?

— ভুলে যেও না কাকলি, গুলিটা জীবন হালদারের পিঠের দিক দিয়ে ঢুকেছে। তার মানে সে পিছন ফিরে ছিল। আত্মরক্ষার দাবিটা খুব জোরদার হবে না।

— তা হলে কী হবে?

— সেটা সহজবোধ্য। যদি পুলিস রিভলভারটা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, আর দেখা যায় যে, প্রথমত তার একটা গুলি সম্প্রতি ফায়ার করা হয়েছে ; যদি টেস্ট-ফায়ারিং করে পুলিস প্রমাণ করতে পারে, দ্বিতীয়ত, যে, যে-গুলিটা জীবন হালদারের পিঠ দিয়ে ঢুকে হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হয়েছে সেটা ঐ রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত, এবং যদি পুলিস প্যারাফিন-টেস্টে প্রমাণ করতে পারে, তৃতীয়ত, যে, তোমার দিদির হাতের আঙুলে বারুদ রয়েছে ; এবং, চতুর্থত, যদি আমি তোমার দিদির ডিফেন্স-কাউন্সেলার হিসাবে আদালতে উঠে দাঁড়াই, তাহলে নিরঞ্জন মাইতি একটা ডিনার থ্রো করবে।

— বুঝলাম না। নিরঞ্জন মাইতি কে?

— পাবলিক প্রসিকিউটর। কারণ অনেক-অনেক দিনের অপূর্ণ ইচ্ছাটা তার পূরণ হবে। আমি কেস-এ হারব। তোমার দিদির ফাঁসি না হলেও যাবজ্জীবন হয়ে যাবেই।

কাকলি তার নিঃশেষিত কফি-কাপটা নামিয়ে রাখল। হাত বাড়িয়ে টি-পয় থেকে রিভলভারটা উঠিয়ে নিল। বলল, আমার মনে হয় আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এটায় থাকা ঠিক নয়। তাই না?

বাসু বলেন, আমি কী বলব? আমি তো তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করছি না। করছি তোমার দিদিকে।

— ঠিক বলেছেন। যা করবার তা আমাকেই করতে হবে।

সে আঁচল দিয়ে আঙুলের দাগ মুছে দিতে যায়।

বাসু বলেন, সাবধান। ওটা কিন্তু লোডেড। তোমার আঙুল ট্রিগার স্পর্শ করে আছে। ঠিক তখনই পাড়া কাঁপিয়ে একটা পুলিস-গাড়ির সাইরেন বেজে উঠল। বাসু বললেন, যা আশঙ্কা করছিলাম। ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ এসে গেছে। ওটা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দেবার চেষ্টা...ও কী করছ? এই...এই...

কাকলি হঠাৎ জানলার দিকে রিভলভারটা তুলে ট্রিগার টেনে দিল।

মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দ্য খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল।

এগার

কাকলি অত্যন্ত দ্রুতহাতে রিভলভারটা গুঁজে দিল একটা সয়েড্ লিনেন ব্যাগে। পরদিন ড্রাইং ক্লিনিং-এ পাঠাবে বলে ছাড়া শাড়ি-শায়া বিছানার চাদরে বোঝাই ব্যাগ। বাসু মাথা নেড়ে শুধু বললেন, বোকামি — বোকামি! কাজটা আদৌ বুদ্ধিমতীর মতো হচ্ছে না কিন্তু। ইন্সপেক্টার দাশ ওটা খুঁজে দেখবেই।

ঠিক তখন ওর ডোরবেলটা বেজে উঠল। বাসু বললেন: দরজাটা খুলে দাও, কাকলি।

কাকলি এগিয়ে এসে ওর ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে দিল। কোলাপসিবল গেটটা এখন বন্ধ করা ছিল

না। তাই নিখিল দাশ সোজা চলে এসেছে আধতলায় — মেজানাইন-ফ্লোরে। একমাত্র এ ঘরেই বাতি জ্বলছে।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টার দাশ কাকলিকে প্রশ্ন করে, মিস কাকলি দত্ত?

— ইয়েস। কী চান?

— এক্ষনি এ ঘরে একটা রিভলভার ফায়ার করা হয়েছে। কে করেছে, আপনি?

কাকলি দরজাটা পুরোপুরি খোলেনি। শুধু মুখটুকু বার করে কথা বলছিল। সে জবাবে বললে, এ ঘরে! রিভলভার! কী বলছেন?

— ফায়ারিঙের শব্দটা শুনতে পাননি বলতে চান?

— ফায়ারিঙ? না। আমি তো ভাবলাম রাস্তায় কোনও গড়ি ব্যাক-ফায়ার করল?

— তাই বুঝি? দরজাটা ছেড়ে দাঁড়ান। আমি ভিতরে আসব।

— কেন? মাঝরাত্রে বিনা-ওয়ারেন্টে আপনি...

— জাস্ট এ মিনিট। ঘরের ভিতর ওই বসে আছেন, উনি কে? মিস্টার পি. কে. বাসু?

বাসু ওখান থেকেই বলেন, হ্যালো-হ্যালো-হ্যালো।

ইন্সপেক্টার দাশ জোর করে ভিতরে ঢুকল। কাকলি আর বৃথা বাধা দিল না। নিখিল দাশ বললে, দিনের মধ্যে ক'বার আমাদের মুখোমুখি মুলাকাৎ হল, স্যার?

বাসু হাসতে-হাসতে বলেন, ওমা! সে কী কথা গো? আজ এই তো প্রথম দেখা হল তোমাতে-আমাতে। 'পহেলি-মুলাকাৎ হো'।

— পহেলি-মুলাকাৎ?

— নয়? এখন বারোটা বেজে সাত। দিন শুরু হয়েছে সাত মিনিট আগে। চলি....

নিখিল বাধা দেয়, না, যাবেন না। আপনার ক্লায়েন্টকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। সেটা আপনার সামনেই হওয়া ভাল।

— ক্লায়েন্ট। কে আমার ক্লায়েন্ট?

— এ ঘরের মালকিন, মিস কাকলি দত্ত! চিনতে চান না নাকি?

— আয়াম সরি, ইন্সপেক্টার। মিস কাকলি দত্ত আমার ক্লায়েন্ট নয়।

— নয়? তা হলে মাঝরাতে আপনি এখানে কেন?

— এই একটু তত্ত্বতালাশ নিতে। কাকলি বলল, অ্যাক্কাপ কফি খেয়ে যান, তাই...তা, কফি পান আমার শেষ হয়েছে। তোমরা গল্পগাছা কর বাছা, আমি চলি। রাতও অনেক হয়ে গেছে।

নিখিল দাশ বল, এ ঘরে একটি একটি রিভলভার ছোঁড়া হয়েছে। আপনি ছুঁড়েছেন?

— রিভলভার! বাই জোভ! নো!

নিখিল ঘরের চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ওর সন্ধানী চোখে বেশিক্ষণ দেরি হল না। জানলার পর্দায় একটা নিটোল গর্ত। সে নীচু হয়ে এক টুকরো কাচ কুড়িয়ে নিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দেখল। প্লেট-গ্লাসেও একটা নিটোল ছিদ্র। নিখিল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এ গর্তটা কতদিন হয়েছে? এ কাচের টুকরোটা কত দিন মেজেতে পড়ে আছে? ঘর কতদিন ঝাঁট দেওয়া হয়নি?

— কাকলি চমকিত হবার অভিনয় করে, আরে তাই তো! তাহলে তো মোটর গাড়ির ব্যাক-ফায়ার নয়। কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের মারবার জন্য ফায়ার করেছে। ওটা 'গান-ফায়ার'ই বটে!

নিখিল বলে, তাহলে আপনার মতটা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাই না, মিস দত্ত? রিভলভারের শব্দই শুনেছেন। তবে ঘরের ভিতর কেউ ফায়ার করেনি, করেছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হয়তো আপনাকে হত্যা করতে। অথবা বাসু-সাহেবকে! কেমন তো?

— তাছাড়া আর কী হতে পারে? কাচে, পর্দায় ফুটো হয়েছে। মেঝেতে কাচের টুকরোও পড়ে আছে...

নিখিল দাশ বললে, কিন্তু মুশকিল কী জানেন মিস দত্ত? আপনার থিয়োরি মেনে নিলে একথাও মেনে নিতে হয় যে, আপনাকে যে গুলি করে মারতে চেয়েছিল সে লোকটা হয় হেলিকপ্টারে চড়ে

এসেছিল, অথবা পাঁচ মিটার লম্বা রণ-পায়ে।

কাকলি জবাব দেয় না। বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখে।

ইন্সপেক্টর দাশ বলে, পর্দায় ফুটো আর কাঁচের ফুটো যোগ করে সরলরেখা টানলে তা আকাশপানে যায়। রাস্তার দিকে নয়। আপনি যদি অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আমার মতো অথবা বাসু-সাহেবের মতো পড়াশুনা করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে, কাঁচে বুলেটের ছিদ্র হলে তা পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যায় গুলিটা কোন দিক থেকে কোন দিকে গিয়েছিল।

কাকলি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। নিখিল দাশ একনাগাড়ে বলেই চলল — এবার অনেকটা স্বগতোক্তি ধরনের কথা : গুলিটা যখন ছোঁড়া হয় তখন আপনি এইখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর আপনি দশ থেকে পনের সেকেন্ড মাত্র সময় পেয়েছেন। এত তাড়তাড়ি রিভলভারটা কোথায় লুকাতে পারেন?

ইন্সপেক্টার দাশ হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচেটা দেখতে থাকে। কাকলি প্রতিবাদ করে, বিনা ওয়ারেন্টে আপনি এভাবে আমার ঘর সার্চ করতে পারেন না।

নিখিল জবাব দেয় না। আপন মনে তল্লাশিটা চালিয়ে যায়।

— কী করছেন, আপনি? গর্জে ওঠে কাকলি।

— দেখতেই তো পাচ্ছেন। রিভলভারটা খুঁজছি। জাস্ট এ মিনিট। এটা কী? সয়েলড্ লিনেন? হ্যাঁ, এটা খুব চমৎকার জায়গা। দশ সেকেন্ডের মধ্যে যন্ত্রটা লুকিয়ে ফেলার পক্ষে আইডিয়াল প্লেস।

নিখিল ব্যাগের তলা থেকে রিভলভারটা উদ্ধার করে। একগাল হেসে বলে, মিস দত্ত, যে লোকটা হেলিকপ্টার থেকে আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল সে ভুল করে যন্ত্রটা এ ঘরেই ফেলে গেছে। কিন্তু জানলা তো বন্ধ ছিল। কী করে করল?

ঠিক সেই মুহূর্তে বাসু-সাহেবের মনে হল, বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। রিভলভারটা আবিষ্কার করে অতি উৎফুল্ল না থাকলে ইন্সপেক্টার দাশও হয়তো শব্দটা শুনতে পেত। বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি এবার যাব, দাশ। অনের রাত হয়ে গেছে।

— কিন্তু আপনাকেও যে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।

— কাল সকালে। আমার [illegible] বেচনা কর, ইন্সপেক্টার।

— না, মিস দত্তের জবানবন্দি নেবার সময় আপনার উপস্থিতিটা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে রিভলভাররটা যখন খুঁজে পাওয়া গেছে।

— কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, কাকলি দত্ত আমার ক্লায়েন্ট নয়।

— সে তো আরও ভাল। তাহলে আপনি সাক্ষী দিতে পারবেন।

বাসু হেসে বলেন, তুমি হোমিসাইডে নতুন এসেছ, দাশ, তাই জান না। তোমার প্রেডিসেসার ইন্সপেক্টর বরাট এ-সব ক্ষেত্রে আমাকে ত্রিসীমানায় থাকতে দিত না। তাকে দোষও দিতে পারি না। কী জান নিখিল, আমার কিছু মুদ্রাদোষ আছে। পুলিস যখন কাউকে জেরা করে তখন আমি লক্ষ্য করে দেখি নাগরিকেরা তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিনা। বরাট মনে করত আমি তার কাজে ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত।

ইন্সপেক্টার দাশ একটু ইতস্তত করে। বাসু বলেন, ধর কাকলির কথাই। ও তো আমার ক্লায়েন্ট নয়, তবু আমি এখানে থাকলে ওকে বলব, ওর সাংবিধানিক অধিকার আছে তোমার কোনও প্রশ্নের কোনও রকম জবাব না দেওয়ার। মানে, যতক্ষণ না ওর আইন-পরামর্শদাতা উপস্থিত হন। অথবা যতক্ষণ না তুমি ওকে গ্যারান্টি দাও যে, ওকে অভিযুক্ত করবে না।

নিখিল দাশ বললে, অল, রাইট, স্যার। আপনি বাড়ি যান। হ্যাঁ, বরাট আমাকে বলেছিল বটে। আসুন আপনি....

— গুডনাইট টু য়্যু বোথ।

ধীরে-সুস্থে উনি বেরিয়ে যান ঘর থেকে। তারপর প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসেন।

রাস্তায় নেমেই দেখেন একটি ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার চালকের আসনে একজন ভদ্রমহিলা। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে তাঁর। উনি দরজা খুলে নামতে চাইছিলেন। বাসু-সাহেব বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে আসেন। ঝুঁকে পড়ে বলেন, জয়া সেন?

রীতিমতো চমকে ওঠেন ভদ্রমহিলা। বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে?

— গাড়ি থেকে নামবেন না। আমার নাম পি. কে. বাসু। আমি...

— হ্যাঁ, আপনাকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু কী বলছেন আপনি? নামতে বারণ করছেন কেন?

— আপনি এখন কাকলির কাছে যাবেন না।

— যাব না? কেন?

— শোন জয়া, কাকলি চায় আমি তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করি—

— রিপ্রেজেন্ট করেন। আমাকে? কেন? কী ব্যাপারে?

— তা আমি জানি না। কিন্তু শুনে রাখ, কাকলির ঘরে এখন যে লোকটা উপস্থিত আছে তার নাম ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ। লালবাজার হোমিসাইডের অফিসার। সে কাকলিকে জেরা করছে।

— জেরা করছে? কী বিষয়ে?

— তুমি তা জান, জয়া। জীবন হালদারের হত্যার ব্যাপারে। তোমাকে খুঁজে পেলে পুলিসে এখনই তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। তোমার যা শরীরের অবস্থা তাতে পুলিসের ইন্টারোগেশন সইতে পারবে না।

— তাহলে...মানে, কী করব আমি? বাড়িতে ফিরে যাবে?

বাসু বলেন, না। সরে বসো জয়া। আমি গাড়িটা চালাব।

জয়া আপত্তি করল না। সরে বসল। বাসু স্টার্ট দিলেন। শ-তিনেক মিটার এগিয়ে এসে দেখলেন আধা-অন্ধকারে ওঁর নিজের গাড়িটা পার্ক করা আছে। উনি তার সামনে জয়ার ফিয়াট গাড়িটা রাস্তায় ধারে পার্ক করলেন। ও গাড়ি থেকে কৌশিক নেমে এল।

বাসু জয়াকে বললেন, এর নাম কৌশিক। আমার লোক। তুমি এর কথা মতো চলবে। কেমন?

জয়া বুঝতে পারল কি না বোঝা গেল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

বাসু কৌশিককে বললেন, তুমি এ গাড়িতে চলে এস। জয়াকে নিয়ে সোজা চলে যাও 'পান্থজনসখা' হোটেলে। চেনো সেটা?

— না। কোথায়?

— আনোয়ার শাহ রোড দিয়ে টি. ভি. স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাবে। স্টেট ব্যাঙ্ক পার হয়েই দেখতে পাবে নিয়ন বাতির সাইন-বোর্ড। হোটেলটা নতুন হয়েছে। ওখানে গিয়ে জয়াকে হোটেলে একটা সিঙ্গল-বেড ঘরে ভর্তি করে দেবে। স্বনামে নয়। ওর নাম মীনাক্ষী মজুমদার। দুর্গাপুর আর্যভট্ট রোডের বাসিন্দা। তুমি ওর ছোট ভাই। দিদির একটা অপারেশন হবে। তাই দুদিন আগে এসে হোটেলে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছ, কারণ তুমি মেসবাড়িতে থাক। তোমরা দুজন দুর্গাপুর থেকে বাই-রোড এসেছ। মাঝ-রাস্তায় গাড়ি গণ্ডগোল করায় মধ্যরাত্রে পৌঁছেছ। তুমি থাক এই আনোয়ার শাহ রোডেই, তাই দিদিকে কাছাকাছি হোটেলে রাখছ।

— বুঝলাম তারপর গাড়িটা?

— দিদিকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা নিয়ে চলে আসবে আমাদের নিউ আলিপুরে। আমাদের বাড়ি থেকে এক ফার্লং দূরে যে কোনও গ্যারেজওয়ালা বাড়ির গ্যারেজের ঠিক সামনে ফাঁকা গাড়িটা পার্ক করবে। স্টিয়ারিং এবং সমস্ত গাড়িটা ভাল করে মুছবে। যেন কোন ফিঙ্গার-প্রিন্ট কোথাও না থাকে। তারপর গাড়িটা লক করে হেঁটে বাড়ি ফিরবে। ফেরার পথে পথের ধারের কোনও নর্দমার ঝাঁঝরি-মুখ গলিয়ে গাড়ির ইগনিশান কীটা ফেলে দেবে। ও. কে.?

— হোটেলের লোকজন সন্দেহ করবে না? উনি দুর্গাপুর থেকে আসছেন, অথচ সঙ্গে একটা

স্যুটকেস পর্যন্ত নেই?

জয়া এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার বলে ওঠে, স্যুটকেস তো আছে পিছনে ডিকিতে। কাকলির কাছে ক'দিন থাকব ভেবেছিলাম—

বাসু বললেন, ব্যস। সমাধান হয় গেল।

তারপর জয়ার দিকে ফিরে বলেন, তোমার নামটা যেন কী?

বাসু সাহেবের দিকে ফিরে ও বলে, জয়া সেন।

— না! ঐ ভুলটা করবে না। তোমার নাম মীনাক্ষী মজুমদার। তোমার বাড়ি যেন কোথায়?

এবার আর ভুল করল না জয়া। বলল, মনে আছে, দুর্গাপুর, আর্যভট্ট রোডে।

— ভেরি গুড। এ ছেলেটির তোমার যেন কে হয় মীনাক্ষী?

— ছোট ভাই। ও এই আনোয়ার শাহ রোডেই একটা মেসবাড়িতে থাকে।

— পারফেক্ট। শোন, মীনাক্ষী। কাল আমি এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি এই 'পান্থজনসখা'-তেই থাকবে। কারও সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করবে না। তোমার নামটা কেন বদলে দিলাম তা বুঝেছ?

— হুঁ। পুলিস আমাকে খুঁজছে।

— দ্যাটস কারেক্ট। তাই ফোন করবে না। পুলিস যেন তোমার হদিস না পায়। কাল খবরের কাগজও দেখবে না। তোমার শরীর খুব দুর্বল। সম্পূর্ণ 'রেস্ট'-এ থাকা দরকার। ওষুধপত্র তুমি যা খাও তা সঙ্গে আছে তো?

— হ্যাঁ, আমি তা নিয়ে এসেছি।

— অল রাইট। তাহলে তোমরা রওনা দাও।

কৌশিক বলল, একটা কথা, মামু। গাড়ির চাবিটা ড্রেনে ফেলে দিলে, পরে গাড়ি চালাব কী করে?

— সেসব তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

জয়া সেনকে নিয়ে ফিয়াট গাড়িটা আনোয়ার শাহ রোডের দিকে রওনা দিল। বাসু গুটিগুটি এগিয়ে গেলেন তাঁর গাড়ির দিকে।

* * *

নির্জন ঘরে ওরা দু'জন বসে আছে মুখোমুখি।

ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ আর আলোক-চিত্রশিল্পী কাকলি দত্ত।

দু'জনেই মধ্য যৌবনে, দু'জনেই সুদর্শন, দু'জনেই অবিবাহিত, কিন্তু একজন অপরজনের বিপক্ষ শিবিরে।

নিখিল দাশ অন্তত নিজের মনের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হল কাকলির সৌন্দর্য তার যৌবনের দীপ্তিতে নয় — তার ব্যক্তিত্বের মহিমায়। পুরুষশাসিত এই নিষ্ঠুর সমাজে সে লড়াই করে যাচ্ছে একা হাতে। যাদুগোপাল তাকে ঠকাতে চায়, ভৈরব দাশ তার নাকে দড়ি পরিয়ে হারেমজাত করতে চায়, আর এখন এই হোমিসাইডের ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ মধ্যরাতে এসেছে ওর হাতে একটা স্টেনলেস স্টিলের বালা পরাতে।

কাকলি বলল, মিস্টার দাশ, আমি ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত। আমার ঘুম পাচ্ছে। আপনি রাতের বাকি ক'ঘণ্টা আমাকে ঘুমাতে দেবেন? প্লীজ! কাল সকালে আমি আপনাকে ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রণ করছি।

নিখিল বললে, আয়াম সরি। বেশিক্ষণ সময় আমি নেব না, মিস দত্ত। রিভলভারটা লুকোবার চেষ্টা না করলে এতক্ষণ হয়তো আমি বিদায় নিতাম। ফলে, দোষ আমার একার নয়। আপনারও। তাই নয়? আমি আপনাকে সরাসরি দুটি প্রশ্ন করছি। আপনি এককথায় তার জবাব দিন।

— কী প্রশ্ন? কাকলি বিরক্ত। তার জোড়া-ভ্রূতে কুঞ্চন।

— প্রথম প্রশ্ন, মিস নবনীতা রায়কে বিষ-মেশানো ক্যান্ডির প্যাকেটটা কি আপনিই পাঠিয়েছিলেন?

— না।

— দ্বিতীয় প্রশ্ন জীবন হালদারকে কি আপনিই হত্যা করেছেন?

— না।

নিখিল দাশ নড়ে-চড়ে বসল। বলল, দ্যাটস ফাইন। আমি আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। আরও জানাচ্ছি যে, যদি আপনি নবনীতাকে ঐ ক্যান্ডির প্যাকেট পাঠিয়ে থাকেন কিংবা যদি আপনি জীবন হালদারকে গুলি করে মেরে থাকেন, তাহলে আমার পরবর্তী কোনও প্রশ্নের জবাব আপনি দেবেন না। এ বিষয়ে আপনার সাংবিধানিক অধিকার সম্বন্ধে আমিই আপনাকে সচেতন করে দিচ্ছি....

কাকলির নাকের পাশে একটা কুঞ্চন জাগল। বললে, আপনি কী মহানুভব! আপনার প্রশ্ন দুটির যে কোনও একটির জবাবে আমি যদি বলতাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ', তাহলে আপনি বলতেন, আপনার হাত দুটো বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কাইন্ডলি ও দুটি বাড়িয়ে ধরুন। আমি একজোড়া স্টেনলেস স্টিলের মকরমুখী বালা পরিয়ে দিই। তাই না?

নিখিল ম্লান হেসে বলল, ঠিক তা নয়। আপনার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি এ জাতীয় জঘন্য অপরাধ করতেই পারেন না।

কাকলি তিক্তস্বরে বলে, বাঃ বাঃ! এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সামান্য পুলিসের চাকরি করেন কেন? 'ভৃগু সম্রাট'-এর ভেক ধরে কালোবাজারীদের মাথায় টুপি পরালে তো আরও অনেক বেশি রোজগার হয়। সে যাই হোক, আমার মুখ দেখেই যখন বুঝতে পেরেছেন যে, আমি নির্দোষ, তখন আমাকে রেহাই দেবেন কি?

— দেব। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি নয়। যেহেতু আপনার স্বীকারোক্তি মোতাবেক আপনি দুটি অপরাধের একটাও করেননি তাই আমি আশা করব, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন — যাতে ঐ দুটো জঘন্য অপরাধের প্রকৃত অপরাধীর হাতে আমি স্টেনলেস-স্টিলের মকরমুখী বালা পরাতে পারি।

— আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

— আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে।

— কতক্ষণ চলবে আমাদের এই চাপান-উতোর?

— ধরুন আধঘণ্টা।

— তার মধ্যেই আপনি রহস্যের সমাধান করতে পারবেন?

— অন্তত প্রাথমিক কাজটা।

কাকলি বলল, বেশ। কী জানতে চান বলুন?

— এই রিভলভারটা কার?

— আমার।

— লাইসেন্স আপনার নামে?

— হ্যাঁ।

— দেখা যাচ্ছে, এতে চারটি তাজা বুলেট ভরা আছে। দুটো ফায়ার করা হয়েছে। একটার শূন্যগর্ভ টোটাটা চেম্বারে আছে, আর তার আগেরটায় নেই। অর্থাৎ সেটা থেকে ফাঁকা কার্তুজটা ফেলে দেওয়া হয়েছে। যে শূন্যগর্ভ কার্তুজটা স্বস্থানে রয়েছে সেটা কে ফায়ার করেছিল তা আমি জানতে চাইছি না। তার আগের ফাঁকা ব্যারেলের বুলেটটা কে ছুঁড়েছিল?

— কবে?

— আজ সন্ধ্যারাত্রে?

— এ সিদ্ধান্তে আপনি এলেন কিভাবে আগে তার যৌক্তিকতা বোঝান, তারপর আমার জবাব দেবার প্রশ্ন উঠবে।

— তার মানে?

— আমি যদি প্রশ্ন করি, আপনার মাজায় যে রিভলভারটা দেখতে পাচ্ছি সেটা থেকে শেষ-গুলির আগের গুলিটা কে কোথায় কবে ছুঁড়েছিল, তা বলতে পারবেন আপনি?

— গুড পয়েন্ট। না, তা বলতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি, হোমিসাইডে আসার পর এ রিভলভারটা এখনো আমাকে ব্যবহার করতে হয়নি।

— বিশ্বাস করুন, ইন্সপেক্টার দাশ — এই 'পয়েন্ট-কাউন্টার-পয়েন্ট' গেমটা মধ্যরাত্রে আমার একটুও ভাল লাগছে না। আজ — আজ কেন, কাল বিকাল চারটের পর থেকে আমার একটা 'হেকটিক' পিরিয়ড গেছে। আমার দোকানের ব্যবসা-সংক্রান্ত ঝামেলা। তাই আমি এখন ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত।

— অল রাইট, অল রাইট। দোকান-সংক্রান্ত কী জাতের ঝামেলা? আমাকে কিছুটা ইঙ্গিত দিতে পারেন?

— না, পারি না।

— ঝামেলাটা পাকাচ্ছে কে? আপনার ভগ্নিপতি যাদুগোপাল? না কি ভৈরব দাশ? আপনার দিদির শেয়ারের কাগজগুলো জীবন হালদারের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল রেসুড়ে যাদুগোপাল। সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু তার মূলে কে আছে? কী আছে? যাদুগোপালের রেসের নেশা, না জীবন হালদারের অর্থলিপ্সা, অথবা ভৈরব দাশের পৈশাচিকতা? আপনার কী মনে হয়?

কাকলি জিব দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, আপনি এতসব কথা শুনলেন কার কাছে?

— রাকেশ বাজোরিয়া। চেনেন?

— না, কে সে?

— কাল পর্যন্ত ছিল 'সোনালি স্বপন'-এর স্লীপিং পার্টনার। আজ বোধকরি সোল প্রোপ্রাইটার।

— ও বুঝেছি। নবনীতা বলেছিল বটে। নামটা জানায়নি। তা রাকেশ বাজোরিয়া এত কথা জানে?

নিখিল বললে, মিস দত্ত, বুঝতেই পারছেন, আমরা ইচ্ছে করলে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি। সবটা রাকেশ বলেনি, অন্যান্য সূত্র থেকেও আমি জেনেছি। সে সব কথাও আপনাকে জানাতে পারি। যদি আপনি খোলা মনে আলোচনা করতে রাজি হন।

— আমি রাজি হচ্ছি না।

— কেন?

— আমি কী করে বুঝব যে, আপনি আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য এভাবে ঘনিষ্ঠতা করতে চাইছেন না?

— কিন্তু আপনি তো অপরাধ দুটোর একটাও করেননি, কাকলি দেবী। শুধু অপরাধীকেই ফাঁদ পেতে ধরা যায়।

— মাঝরাতে ভারী নতুন কথাটা শোনালেন পুলিস-সাহেব। আপনারা কোনোদিন কখনো কোনও নিরপরাধকে ফাঁদ পেতে ধরে ফাঁসি-কাঠের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করেননি, তাই না?

— দ্য পয়েন্ট ইজ ওয়েল টেকন। অল রাইট, আমি আপনাকে পর পর কয়েকটা 'শব্দ' বলব আর সেই শব্দগুলি শুনে আপনার মনে যে যে কথা জাগছে, আপনি তৎক্ষণাৎ জবাবে তা বলবেন। এ একজাতের টেস্ট—

— আর এক জাতের ফাঁদ? যদি এটায় ধরা পড়ে পাখিটা?

নিখিল গম্ভীর হয়ে বলল, মিস দত্ত। আমি আপনাকে বারে বারে বলেছি যে, আপনি যদি অপরাধ দুটোর একটাও করে থাকেন তাহলে আর কোনও কথার জবাব দেবেন না। সুতরাং ফাঁদ পাতার প্রশ্নটা আসছে কোথা থেকে?

— আর আমি যে-কথাটা বারে বারে বলছি তাও যে আপনার কানে যাচ্ছে না।

— কী কথা?

— কোনও একটা অপরাধ সংঘটিত হলে পুলিস খাড়া করতে চায় একজন আসামীকে, সে অপরাধী

কি না সেটা প্রশ্ন নয়, দেখতে হবে তার বিরুদ্ধে যেসব এভিডেন্স আদালতে দাখিল করা হবে তা যেন নিশ্ছিদ্র হয়। নিরপরাধ বলেও বেটা যেন খালাস না পায়। তাহলেই পুলিস অফিসারের রেকর্ডে দাগ পড়ে যাবে। কনভার্সলি, নিরপরাধের কনভিকশন হলে পুলিস অফিসারের প্রমোশন হবার সম্ভাবনা।

— অন্তত আমি তা চাই না। আমার রেকর্ডে কী দাগ পড়ছে তা আমি ভ্রূক্ষেপ করি না, কিন্তু আমি কোনো দিনই চাইব না আমার তদন্তে কোনও নিরপরাধের শাস্তি হোক। দরকার হলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব মিস দত্ত।

কাকলি একদৃষ্টে দৃপ্তভঙ্গিতে বসে থাকা নিখিল দাশের দিকে দু-তিন সেকেন্ড তাকিয়ে কী যেন সমঝে নিল। তারপর বলল, অল রাইট। শুরু করুন 'অ্যাসোসিয়েশন-টেস্ট'।

— আপনি জানেন 'অ্যাসোসিয়েশন-টেস্ট' কাকে বলে?

— জানি। ক্রিমিনোলজি-র উপর পড়াশুনা করিনি বটে, তবে বি.এ. তে আমার সাইকোলজি ছিল।

— তাহলে তো আপনি মোটামুটি জানেনই। তবে এটা ঠিক সাইকোলজির 'অ্যাসোসিয়েশন-টেস্ট' নয়। কারণ আমি কোনও স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করছি না। আমার উচ্চারিত শব্দের জবাবে আপনার উচ্চারিত শব্দের আবির্ভাবের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতটা হচ্ছে তা আমি আদৌ মাপছি না। আপনি শুধু মনটাকে ফাঁকা করে রাখুন। যত দ্রুত সম্ভব আমার উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে যে শব্দটি উদয় হচ্ছে তা বলুন। কেমন?

— অল রাইট। শুরু করুন।

— বাড়ি?

— ভূমিকম্প!

— ফটোগ্রাফ?

— খদ্দের!— নিখিলের উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ও জবাব দিচ্ছে।

— বিবাহ?

— বিচ্ছেদ।

— নারী?

— নির্যাতন!

নিখিলের প্রশ্ন আরও দ্রুতগতিতে আসতে থাকে, যেন ওরা ক্রমে ক্রমে তেহাই-এর দিকে চলেছে। যেমন প্রশ্ন, তেমন জবাব।

— রিভলভার।

— অ্যাকসিডেন্ট!

— সোনালি?

— স্বপন।

— পুলিস?

— আপনি।

— প্যারাফিন?

— টেস্ট!

নিখিল এলিয়ে বসল চেয়ারে। হাসল। বলল, আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম মিস দত্ত—আপনাকে প্রকারান্তরে আমি স্বীকার করিয়ে নেবই।

কাকলি বিস্মিত হবার অভিনয় করে, কী? — কী স্বীকার করেছি আমি?

— আপনি স্বীকার করেছেন যে, একটি গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি অবহিত, যা একজন ফটোগ্রাফার মহিলার জানার কথা নয়। অর্থাৎ ক্রিমিনোলজিতে ইদানীং 'প্যারাফিন টেস্ট' পরীক্ষা করে বলা সম্ভব হচ্ছে সন্দেহজনক ব্যক্তি সম্প্রতি রিভলভার ছুঁড়েছে কিনা। সম্ভবত বাসু সাহেব এ তত্ত্বটা আপনাকে

জনিয়েছেন। অতি সম্প্রতি, মানে আধঘণ্টা আগে — তাই কথাটা আপনার চেতন-মন এখনো অবচেতনে গোপন করতে পারেনি। আপনি 'প্যারাফিন-টেস্টের' ব্যাপারটা জানেন।

— হ্যাঁ, জানি। তাতে কী হল? আপনিও তা জানেন, বাসু-সাহেবও তা জানেন। তাহলে কি আমরা তিনজনেই অপরাধী? এই আপনার যুক্তি?

— না। আমাদের তিনজনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। আপনার হেপাজতে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি রিভলভার, যার একটা গুলি কীভাবে খরচ হয়েছে তা আপনার স্মরণে নেই। আমাদের অবস্থা তা নয়। দ্বিতীয়ত, আমরা দু'জন 'ক্রিমিনোলজি'-নিয়ে পড়েছি — আপনার শুধু বি. এ.-তে সাইকোলজি ছিল। তাতে অ্যাসোসিয়েশন-টেস্টই পড়ানো হয়, প্যারাফিন-টেস্ট-এ বারুদের নাইট্রেট কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায় তা শেখানো হয় না। আমি নিশ্চিত যে, একটু আগে বাসু-সাহেব আপনাকে প্যারাফিন-টেস্ট-এর কথাটা বলেছেন। আর আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, সাবান দিয়ে ধুয়ে, ঝামা দিয়ে ঘষে আপনার হাতের চামড়া থেকে ঐ বারুদের চিহ্ন মুছে ফেলা যাবে না। সুতরাং যেই মাত্র আমার গাড়ির আওয়াজ শুনলেন অমনি জানলার দিকে রিভলভারটা তুলে ধরে ট্রিগার টেনে দিলেন। তাই না? এখন যদি প্যারাফিন-টেস্ট-এ আমি প্রমাণ করি যে, আপনার হাতে, আপনার তালুতে-আঙুলে বারুদ লেগে আছে অমনি আপনার ডিফেন্স কাউন্সেল বলবেন, তা তো থাকবেই। রিভলভারটা যে অ্যাকসিডেন্টালি মিস দত্তের ফায়ার হয়ে গেছিল। আর ঠিক সেই জন্যেই রিভলভার-শব্দের জবাব ছিল 'অ্যাকসিডেন্ট'। ঠিক বলছি না কি?

কাকলি বলল, বিশ্বাস করুন মিস্টার দাশ, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমাকে যদি অ্যারেস্ট করতে চান, তাহলে তাই করুন। 'প্যারাফিন- টেস্ট' শব্দটার অর্থ জেনে ফেলার মতো গুরুতর অপরাধ যখন করেই ফেলেছি তখন আমাকে অ্যারেস্ট করতে আর দেরি করছেন কেন? হাজতে একটা বিছানা দেবেন নিশ্চয়? কনভিক্টরাও তা পায়?

নিখিল উঠে দাঁড়ায়। বলে, না, মিস দত্ত। আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করছি না। তবে থানাকে না জানিয়ে আপনি কলকাতার বাইরে যাবেন না।

— 'প্যারাফিন-টেস্ট' ব্যাপারটা জেনে ফেলার মতো গুরুতর অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করছেন না। সে কী! কেন?

নিখিল বলে, আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। আপনার প্রখর ব্যক্তিত্ব। স্বীকার করছি, আপনার মতো দৃপ্ত দুঃসাহসী মহিলা আমি আগে কখনো দেখিনি। আমার একটা কৌতূহল চরিতার্থ করবেন, মিস দত্ত?

— বলুন?

— আপনি কি যুক্তিতর্ক দিয়ে আন্দাজ করতে পারছেন, কেন আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি না? এ-কথা সন্দেহাতীত ভাবে জেনেও যে, আপনি ইচ্ছা করে আমাদের প্রমাণটা লুপ্ত করবার জন্যই — প্যারাফিন-টেস্ট পরীক্ষাটা ব্যর্থ করতেই — দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়েছেন?

কাকলিও উঠে দাঁড়ায়। বলে, আয়াম সরি। ক্লান্তিতে আমার ব্রেন ঠিক মতো কাজ করছে না। আমি ঠিক মতো আন্দাজ করতে পারছি না। হয়তো আমার মতো একজন আনঅ্যাটাচড কুমারী মেয়ের প্রতি করুণাবশে আপনি আমার মাজায় দড়ি বাঁধছেন না।

— করুণা নয়, শ্রদ্ধায়। কিন্তু সেটাই একমাত্র যুক্তি নয়। আরও একটা হেতু আছে।

— সেটা কী?

— দ্বিতীয় একটা বিকল্প সম্ভাবনাও রয়ে যাচ্ছে না? — আপনার ঐভাবে দ্বিতীয় বুলেটটা খরচ করে ফেলার? স্বেচ্ছায় হাতে বারুদের অদৃশ্য চিহ্ন সংগ্রহ করার?

— সেটা কী? আমি তো ভেবেছিলাম একটাই যুক্তি। প্রথম গুলিটা আমি ছুঁড়েছি। তাই দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়ে প্যারাফিন-টেস্ট-এর অভিযোগটা নাকচ করে দেবার জন্যই আমার ঐ কাজ। দ্বিতীয় বিকল্পটা কী?

— ধরুন, আপনি জানেন কে জীবন হালদারকে খুন করেছে। হয়তো সে আপনার অত্যন্ত প্রিয় একজন। তর্কের খাতিরে ধরা যাক, তিনি আপনার দিদি। তাহলে আপনি জানেন যে, আপনার নিরুদ্দিষ্ট দিদিকে—

— আমার দিদি কি নিরুদ্দেশ?

— সেটা আপনিও জানেন, আমিও জানি। যে কথা বলছিলাম, আপনার নিরুদ্দিষ্ট দিদিকে পুলিস যদি গ্রেপ্তার করতে পারে, তাহলে 'প্যারাফিন-টেস্ট'-করে প্রমাণ করা যাবে যে, তিনি কয়েক ঘণ্টা আগে একটি গুলি ছুঁড়েছেন। আপনি অত্যন্ত দুঃসাহসিকার মতো সেই উজ্জ্ব সম্ভাবনার উপর এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছেন। এখন প্রমাণ করা কঠিন যে, প্রথম গুলিটা কে ছুঁড়েছিল। তাই নয়? আপনাদের দুই বোনের ক্ষেত্রেই 'প্যারাফিন-টেস্ট' পজেটিভ রেজাল্ট দিচ্ছে। দ্বিতীয় বুলেটটা আপনি ছুঁড়েছেন তার সাক্ষী আছে ; পি. কে. বাসু স্বয়ং। কিন্তু প্রথম বুলেটটা কে ছুঁড়েছেন তা যুক্তির বিশ্লেষণে প্রমাণ করা যাবে না। আপনার দিদিও হতে পারেন। আপনি নিজেও।

কাকলি বলে. আমি সজ্ঞানে ফাঁসির দড়িটা আমার নিজের গলার দিকে টেনে নেব? এটা কি ডারউইনের বির্বতনবাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না। 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' থিয়োরির?

— আপনি ডিকেন্সের 'আ টেল অব টু্য সিটিজ' উপন্যাসটা পড়েছেন?

— পড়েছি। হঠাৎ সে কথা আসছে কেন?

— সিডনে কার্টন চার্লস ডার্নের হয়ে গিলোটিনে মাথা পেতে দিতে গেছিল কেন?

— বিকজ নো-বডি কেয়ার্ড ফর সিডনে কার্টন....

— নেভারদ্যলেস, সিডনে কার্টন কেয়ার্ড ফর হিজ লেডি-ল্যাভ!

— অল রাইট। তাহলে আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করছেন না। আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

— আছে। এই রিভলভারটা আপনি কোথায় পেলেন?

— আমি পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। বাবা কিনেছিলেন সি. সি. বিশ্বাসের দোকান থেকে।

— না। আমি জিজ্ঞেস করছি, গতকাল রাত্রে?

— কী আশ্চর্য! গতকাল রাত্রে এটা আবার আমাকে নতুন করে পেতে হবে নাকি? বাবার পরলোকগমনে যন্ত্রটা আমি পেয়েছি। 'সি. পি.' — মানে ক্যালকাটার পুলিস কমিশনার — আমার নামে লাইসেন্সটা ট্রান্সফার করেছেন। ফলে অস্ত্রটা তো আমার কাছেই বরাবর থাকতে পারে। পারে না?

— পারে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি কাউকে বাঁচাতে চাইছেন। এমন একজন, যাকে আপনি ভালবাসেন।

— সে মানুষটি আমি নিজেও তো হতে পারি? সব চাচাই তো আপন প্রাণকে বাঁচাতে উদগ্রীব। তাই নয়?

— হ্যাঁ, তাই। সেটাও অসম্ভব নয়। আমি আগেও বলেছি আবার বলছি, আপনার মতো দুঃসাহসী, ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা ইতিপূর্বে আমার নজরে কখনো পড়েনি। আপনি অনন্যা! রিভলভারটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। এটা থেকে টেস্ট-বুলেট ছুঁড়ে দেখতে হবে যে, এই রিভলভার থেকে জীবন হালদারের মৃত্যুবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কিনা। আজ রাত্রে আপনাকে আর কোনও প্রশ্ন করব না। যতই অন্ধকার লাগুক এ রাত্রিটা, বিশ্বাস করুন কাকলি দেবী, 'নিষ্প্রভাত রাত্রি' হয় না। আবার কাল সকালে সূর্য উঠবে।

কাকলি তিক্তস্বরে বললে, আশ্চর্য নতুন কথাটা শোনালেন বটে। আর কিছু? আশা করি এর পর সকাল-বিকেল আপনি এখানে হাজিরা দেবেন?

— না, মিস দত্ত। আপনি ব্যঙ্গ করে আমাকে কাল প্রাতরাশে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে। আমি আর একবার মাত্র আসব। এই রিভলভারটা থেকে একটা টেস্ট-বুলেট ছুঁড়ে দেখার পর। তারপর আর আসব না। হয় আপনাকে চিরতরে মুক্তি দিয়ে যাব, অথবা আপনাকে ফার্স্ট-ডিগ্রি মার্ডার চার্জে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব।

কাকলি বললে, থ্যাংস আ লট।

নিখিল পকেট থেকে একটা রুমাল বার করল। রিভলভারটার ট্রিগার-এর লুপ-এ একটা ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে নিল, যাতে ওর আঙুলের ছাপ অস্ত্রটাতে না লাগে। তারপর দু-আঙুলে সেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে কাকলির দিকে ফিরে বললে, একটা শেষ প্রশ্ন মিস দত্তা।

— বলুন?

— আজ রাত্রে আমি আপনার প্রতি যে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি, — অ্যান্ড আই হেট টু ডু দিস — তাতে আপনি আমাকে একজন ভদ্রমানুষ হিসাবে দেখতে পারেন না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে ফাঁদে ফেলতে আদৌ আসিনি — আমি আসল অপরাধীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। যে অন্ধকারের কারবারী নবনীতাকে বিষ দিয়েছে, জীবন হালদারকে গুলি করেছে ; আমি জানি, সে অপরাধজীবী আপনি নন, আপনার সাহায্যে তাকে আমি চিহ্নিত করতে চেয়েছি মাত্র।

কাকলি ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আপনি একটা শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন বলেছিলেন। এটা তো প্রশ্ন হল না, এটা একটা স্বগতোক্তি, একটা স্টেটমেন্ট।

— প্রশ্নটা এই, আপনি ফটোগ্রাফার, আমি পুলিস অফিসার। এই দুইয়ের খোলসের বাইরে বেরিয়ে এসে আমরা দুজন কি বন্ধু হতে পারি না?

কাকলি তৎক্ষণাৎ বলল, তা কেমন করে সম্ভব মিস্টার দাশ? ও ছাড়াও তো একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমাদের আছে।

— কী তা?

— আমি সম্ভাব্য আততায়ী, আর আপনি সম্ভাব্য সাকসেসফুল পুলিস অফিসার! 'টম-অ্যান্ড-জেরি'র মধুর সম্পর্ক!

boiRboi.net

বারো

পরদিন সকাল সাতটায় বাসু-সাহেব আনোয়ার শাহ রোডে 'পান্থজনসখা' হোটেলে এসে হাজির। রিসেপশন থেকে জানালো, মিসেস মজুমদার আছেন দুই/সাত নম্বর সিঙ্গল-বেড ঘরে।

বাসু দোতলায় এসে সাত নম্বর ঘরে নক করলেন। কেউ সাড়া দিল না। দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। বাসু ভিতরে এলেন। দেখলেন জয়া অঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাত্রে সে দরজাটা বন্ধ পর্যন্ত করেনি। উনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন। নিচে এসে হোটেলের পাবলিক টেলিফোন কর্নার থেকে ফোন করলেন বালিগঞ্জে 'সানিসাইড নার্সিংহোমে'। নার্সিংহোম-এর রিসেপশনিস্টের মাধ্যমে ডক্টর ব্যানার্জিকে ধরলেন। বাসু-সাহেবের সাড়া পেয়েই ডক্টর ব্যানার্জি বলে ওঠেন, এত তাড়াহুড়ো করলে তো চলবে না, বাসু-সাহেব। আপনার মক্কেল, অর্থাৎ আমার পেশেন্ট, আরও একদিন ঘুমোবে। সে ভালই আছে। ব্যস্ত হবেন না।

বাসু বলেন, না ডাক্তার, আমি এখন ফোন করছি অন্য একটি পেশেন্টের ব্যাপারে!

— কী হয়েছে তার? বিষ খেয়েছে? না গুলি? নাকি বধূ-হত্যা?

— না, না সে সব কিছুই নয়। নার্ভাস ব্রেকডাউন। হয়তো কার্ডিয়াক প্রবলেমও কিছু আছে। বছর-দেড়েক আগে একটা হার্ট অ্যাটাক মতো হয়েছিল — ইসকিমিয়া বোধহয় — ঠিক জানি না। কিন্তু কাল রাত্রে ঘটনাপরম্পরায় খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। আমি চাই তুমি একবার এসে দেখে যাও...

— আপনার বাড়িতে? নিউ আলিপুরে?

— না, না, আনোয়ার শাহ রোডে। 'পান্থজনসখা' হোটেলে। রুম নং 27, রোগিণীর নাম মীনাক্ষী

মজুমদার।

— আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

— ওই হোটেলের লাউঞ্জ থেকে।

— অল রাইট। আমি নার্সিংহোমে একটা রাউন্ড দিয়ে আপনার ওখানে পৌঁছাব। ধরুন সওয়া আটটায়। তাহলে হবে?

— হবে। আমি অপেক্ষা করব।

আরও মিনিটপনের পরে বাসু-সাহেব আবার ফিরে এলেন জয়া সেনের ঘরে। এতক্ষণে সে উঠেছে। বেড টি পান করছে। এটা বোধহয় কৌশিক ব্যবস্থা করে গেছে।

— এখন কেমন আছ? — জানতে চাইলেন বাসু।

— অনেকটা ভাল। খুব ঘুমিয়েছি রাত্রে। ডবল ডোজ ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম।

— সকালে খালি পেটে ওষুধ খাও? না কিছু খেয়ে তারপর?

— খালি পেটে একটা সরবিট্রেট খাই। খেয়ে নিয়েছি সেটা।

— তুমি নিজে নিজে বাথরুমে যেতে পারবে তো?

— কাল ড্রাইভ করতে পারলাম আর আজ ওটুকু পারব না?

— দ্যাটস ফাইন। আমি একজন ডাক্তারকে 'কল' দিয়েছি। ঘণ্টাখানেক পরেই তিনি আসছেন।

— না, না, ডাক্তার কেন? তাহলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে।

— যাবে না। এঁর মাধ্যমে আমি অনেক কিছু করি। অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

— কিন্তু উনি তো আমার নাম জানতে চাইবেন।

— চাইবেন তো। মীনাক্ষী মজুমদারের নামে প্রেসক্রিপশনও লিখবেন। তুমি কি মুখ ধুয়ে আসবে এখন?

— হ্যাঁ। আপনি একটু বসুন। আমি বাথরুম ঘুরে আসি। চা খাবেন, অথবা কফি?

— না, তুমি বাথরুম ঘুরে এস প্রথমে।

মিনিট পনের পরে রাতের পোশাক পাল্টে জয়া এসে ওর খাটে উঠে বসল। বাসু ইতিমধ্যে পাইপ ধরিয়েছেন। বললেন, কালকের ঘটনাটা এখন সংক্ষেপে আমাকে বলতে পারবে?

— কাল একটা নার্ভাস শক পেয়েছিলাম। তাতেই—

— জানি। মোটামুটি সবই আমার জানা। দু-একটি মিসিং লিংক জানতে চাই আমি। তুমি অতি সংক্ষেপে বল তোমার অভিজ্ঞতা।

জয়া বলল, তাহলে আপনি আগে বলুন, আপনি কতটা জানেন। কোথায় কোথায় আপনার অজ্ঞাত ফাঁক-ফোকর।

— কাল সন্ধ্যায় কাকলি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যায়। তোমার সঙ্গে দেখা করার পরে নিচে এসে যাদুগোপালের সঙ্গে আলোচনার সময় তারা কথা কাটাকাটি করে। যাদুগোপাল উত্তেজিত হয়ে গলা চড়ায়। কিছু কিছু কথা দোতলা থেকেই সম্ভবত তোমার কানে যায়...

— না, স্যার। আসলে তা ঘটেনি। কলি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলে আমি সিঁড়ির মাথায় এসে আড়ি পেতেছিলাম। কেন ওরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না তাই জানতে চেয়েছিলাম আমি।

— বুঝলাম। মোটকথা তোমারও সন্দেহ হয় যে, শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো ভল্টে নেই। অন্যত্র আছে। তাই একটু পরে যাদুগোপাল যখন তার মোটর সাইকেলে রওনা হয় তখন তুমিও তাকে অনুসরণ কর নিজের গাড়িতে। তাই না?

জয়া কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

বাসু বললন, মোমিনপুরে জীবন হালদার খুন হয়েছে রাত নয়টার কাছাকাছি। কাকলির ধারণা ওটা তোমার কাজ।

— কাকলির ধারণা আমি ওকে খুন করেছি? ও বলেছে?

— না, বলেনি। কিন্তু সে আমাকে তোমার তরফে 'রিটেইন' করতে চেয়েছে। ফলে, কাকলির বিশ্বাস, হয় তুমি নিজেই খুনটা করেছ, অথবা তুমি জান কে করেছে — সেই প্রিয়জনকে তুমি বাঁচাতে চাইছ।

জয়া সিলিঙ-এর দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল।

— তুমি আমাকে সত্যি কথাটা জানাবে, জয়া?

— না। তা আমি পারি না।

— তুমি কি গুলিটা ছুঁড়েছিলে?

— না।

— জীবন হালদারের কাছে তোমাদের দোকানের শেয়ার গচ্ছিত রেখে যাদুগোপাল অনেক টাকা ধার নেয়। এ কথা তুমি জানতে। তাই নয়?

— ওটা ভুল খবর। শেয়ার সার্টিফিকেট কেউ গচ্ছিত রাখেনি।

— তবে সেগুলো জীবনের কাছে গেল কী করে?

— কে বললে? যায়নি তো।

— যায়নি? তাহলে শেয়ারগুলো কোথায়?

— আমার কাছে।

— তোমার কাছে! বাড়িতে? ভল্টে?

— না। ঘটনাচক্রে আমার ওই হাতব্যাগে। ব্যাগটা দিন। দেখাই আপনাকে।

বাসু সাহেব সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, এবার হিসাবটা মিলছে। সেই জন্যই কাকলি চাইছিল আমি তোমাকে 'ডিফেন্ড' করি।

— এ কথার মানেটা কী হল?

— তুমি কাল মোমিনপুর থেকে এই শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো উদ্ধার করে নিয়ে এসেছ।

— কী উল্টোপাল্টা বলছেন? এগুলো তো বরাবরই আমার কাছে আছে।

বাসু ধীরে ধীরে না-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

— কী হল? 'না' মানে?

— আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, জয়া। তোমাকে ক্লায়েন্ট বলে আমি মেনে নিতে পারছি না। ডাক্তারবাবু আসুন। তোমাকে দেখুন। তারপর...

— কেন? আমি কী অপরাধ করলাম?

— ক্লায়েন্ট খোলা মনে আদ্যোপান্ত সত্য কথা না বললে আমি সে কেস নিই না। শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো বরাবর তোমার কাছে থাকতে পারে না। তুমি যাদুগোপালের অপরাধটা ঢাকতে চাইছ।

— ও খুন করেছে বলতে চান?

—না। তা বলছি না। করে থাকতে পারে।। তুমি বা কাকলিও করে থাকতে পার। প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন এই যে, যাদুগোপাল ওই শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো জীবন হালদারের কাছে গচ্ছিত রেখে অনেক অনেক টাকা ধার নিয়েছিল। রেস খেলে উড়িয়েছে। এটা ফ্যাক্ট। সেটা তুমি গোপন করতে চাও, কর। অস্বীকার করতে চাও, কর। আমি হাত ধুয়ে ফেলব।

জয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ধীরে ধীরে সে শুয়ে পড়ল।

বাসু-সাহেবের করুণা হল। কিন্তু তিনি নির্বাক বসেই রইলেন।

ও আবার উঠে বসল। বলল, নাঃ। আপনার কাছে কিছু লুকাব না। সব কথা অকপটে স্বীকার করব।

— ও. কে.। বল। শুধু মূল তথ্যগুলো। যত সংক্ষেপে সম্ভব।

— কলি চলে যাবাব পর আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিতে চাইছিলাম, কিন্তু

আমি যে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আড়ি পেতেছি ওটা ওকে জানাতে চাইছিলাম না। আমি ঘরে ফিরে গেলাম। পোশাক বদলে নিলাম। ভেবেছিলাম, ওকে বলব গাড়িটা বার করতে। দু'জনে কোথাও বেড়াতে যাব ; সেখানেই গল্পে গল্পে প্রসঙ্গটা তুলব — মানে ওইশেয়ার সার্টিফিকেটগুলোর কথা। ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম নিচে ও কাকে যেন ফোন করছে। শেয়ার শব্দটা সে বার-দুয়েক উচ্চারণ করল। কী কথা হল জানি না, কিন্তু ওকে খুব উত্তেজিত মনে হল। তারপর ও আমাকে কিছু না জানিয়ে ওর মোটর বাইকটা স্টার্ট দিল। আমার গাড়ির চাবিটা আমার কাছে ছিল। হয়তো আমার মুখোমুখি হতে চাইছিল না বলেই ও নিজের মোটর সাইকেল নিয়ে রওনা হল। আমার জেদ চেপে গেল। শরীরে বইবে কি না একথা খেয়াল হল না। আমি গাড়ি নিয়ে ওর পিছন পিছন যাব স্থির করলাম। আমার লেডিজ ব্যাগটা তুলে নিলাম। তারপর—

দম নেবার জন্য ও থামল। বাসু একটু অপেক্ষা করলেন। তারপর বুঝলেন, ও দম নেবার জন্য মাঝপথে থামেনি। থেমেছে সঙ্কোচে। তাই তাগাদা দিলেন, তারপর?

— তারপর মনে হল রিভলভারটা সঙ্গে নেওয়া উচিত। কলি ওটা আমার কাছে রেখেছিল। সেটা যেখানে থাকে—

— বুঝেছি। সেখানে হাতড়ে দেখলে যে অস্ত্রটা নেই। তাইতো?

জয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, বুঝুন আমার অবস্থা। অস্ত্রটা কাকলি নিতে পারে না। তাহলে কে নিয়েছে? আমি মরিয়া হয়ে ওর পিছু নিলাম।

— তখনো যাদুগোপাল তোমাদের বাড়ি থেকে বহুদূরে চলে যায়নি?

— না। ওর বাইকে কী যেন গণ্ডগোল হয়েছিল। ইঞ্জিনটা খুলে দেখছিল বাড়ির কাছাকাছিই। আমি প্রায় দু'শ মিটার দূরে চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। মোট কথা, ওকে অনুসরণ করতে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি।

— রাত তখন কত?

— আন্দাজ ন'টা-সাড়ে ন'টা। আমি ঘড়ি দেখিনি।

— ওকে অনুসরণ করে তুমি যোধপুর পার্ক থেকে মোমিনপুরে চলে এলে?

— হ্যাঁ। কিন্তু একেবারে শেষাশেষি ও ঠিক কোন দিকে মোড় নিল বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু ও যে মোমিনপুরে জীবন হালদারের কাছে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেছিলাম।

— তুমি জীবন হালদারকে চিনতে? সে যে মোমিনপুরে থাকে—

— না। চিনতাম না। কিন্তু নামটা শোনা ছিল। আমার স্বামীর কাছেই। একবার ও বলেছিল মোমিনপুরের জীবন হালদারের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে। উনি নাকি খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। ওঁর মাধ্যমে ও কী-একটা ব্যবসা করতে চেয়েছিল। কিছু ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙাতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। বলেছিলাম, আগে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। তারপর ওসব ব্যবসা-ট্যাবসা....

— বুঝেছি। তারপর কী হল বল?

জয়া বিস্তারিত বর্ণনা দিতে থাকে। যাদুগোপালের মোটক বাইক ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলার পর ওর মনে হল এখন লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জীবন হালদারের বাড়িটা চিনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। একটা বাড়ির সামনে তিন-চারটে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ি নয়, বড় দোকানের সামনে। স্টেশনারি দোকান। জয়া সেখানে গিয়ে জীবন হালদারের বাড়ির সন্ধান জেনে নেয়। অনেকেই তার বাড়িটা চেনে।

— তারপর তুমি জীবন হালদারের আস্তানায় গেলে?

— হ্যাঁ।

— এখন বল তো জয়া, যাদুগোপাল তোমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার আন্দাজ কতক্ষণ পরে তুমি জীবন হালদারের বাড়িতে পৌঁছাও?

— মিনিট দশ-পনের।

— ঠিক আছে। বলে যাও...

জয়া বর্ণনা দেয়, জীবনের বাড়িতে পৌঁছে ও ডোরবেল বাজায়। একবার — দুবার। কেউ সাড়া দেয় না। অথচ বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলছে। ত্রিসীমানায় লোকজন ছিল না। হঠাৎ জয়ার লক্ষ্য হয়—দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ নয়, ইঞ্চিখানেক ফাঁক আছে।

— তুমি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলে?

— ইয়েস।

— কী দেখলে?

— আপনি তো তা জানেন...একজন প্রৌঢ় লোক...সেই বোধহয় গৃহস্বামী...টেবিলের উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পা-দুটো মাটিতে, মাথাটা টেবিলে। পিঠ থেকে একটা রক্তের ...

জয়া মাঝপথেই থেমে গেল। ওর নীল ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে।

বাসু বলে ওঠেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে...তুমি কী করলে বল।

জয়া হাত তুলে বোঝাতে চাইল সে একটু বিশ্রাম করতে চায়। মিনিটখানেক সে চোখ বুঁজে রইল। তারপর আবার ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল, কী আশ্চর্য দেখুন! ঐ বীভৎস দৃশ্যটা দেখে আমার তো 'ফেইন্ট' হয়ে পড়ে যাবার কথা। অথচ আমার কোন ভাবান্তর হল না। মানে, ঠিক তখন। আমি যেন সিনেমা দেখছি। অথবা একটা নাটক। ওখান থেকেই আমার চোখ পড়ল মেঝেতে — পড়ে আছে একটা রিভলভার। আমি চিনতে পারলাম। ওটা আমারই, মানে কলির।

— কী করে চিনলে তুমি?

— হাতলের কাছে ঝিনুকের একটা নকশা ছিল। তার একটা কোনা চটে গেছিল। তাছাড়া ওটা খুঁজে না পেয়ে আমার ধারণা হয়েছিল ওটা নিয়েই ও মোমিনপুরে এসেছে...

— অল রাইট। তখন কী করলে তুমি?

— রিভলভারটা কুড়িয়ে নিলাম। আমার হাতব্যাগে ভরে নিলাম।

— চেম্বারটা পরীক্ষা করে দেখলে না? কোনও গুলি ছোঁড়া হয়েছে কিনা?

— না, তা আমি দেখিনি।

— তোমার হাতে গ্লাভস পরা ছিল না নিশ্চয়, তুমি কি ব্যাগে ভরার আগে আঁচল দিয়ে ওটা মুছে নিয়েছিলে?

— না তো। এসব কথা আমার মনেই পড়েনি।

— তুমি ওটা কুড়িয়ে নিলে কেন? যেহেতু ওটা তোমার বোনের? তোমাকে রাখতে দিয়েছিল?

জয়া ওঁর চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, শুধু সে জন্যেই নয়। আমি জানতাম, ও আমার আগে আগে এসেছে। আমি জানতাম রিভলভারটা যেখানে রাখা ছিল সেখানে নেই। তার তো একটাই অর্থ হয়। আমি আমি...ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না?

— অল রাইট। তারপর তুমি কী নজর করলে?

— তারপর আমার নজর হল....ঐ লোকটার....মানে, জীবন হালদারের মুঠিতে এক গোছা কাগজ ধরা আছে। সেটাও চিনতে পারলাম আমি। লিথোগ্রাফির মনোগ্রাম দেখে। আমাদের দোকানের শেয়ার। আমি, সেটা ধরে টান দিলাম। অনায়াসে সেটা ওর হাত থেকে বেরিয়ে এল।

— তখনো রিগর-মর্টিস শুরু হয়নি?

— আজ্ঞে?

— ঠিক আছে। শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো কোথায়?

— তখন যে বললাম, আমার হাতব্যাগে।

— বুঝলাম। তারপর তুমি ঘর থেকে বার হয়ে এলে, কেমন? দরজাটা খোলা থাকল না বন্ধ?

— না, বাইরে বেরিয়ে এসে আমি টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

— এবং তারপর ডোর-হ্যান্ডেলে তোমার আঙুলের ছাপটা নিশ্চয় আঁচল দিয়ে মুছে দাওনি?

— আমার ওসব মনেই ছিল না।

জয়া এরপর বাড়ি ফিরে আসে। রিভলভাররটা সচরাচর যেখানে থাকে সেখানে রেখে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাদুগোপালের জন্য। কিন্তু সে ফিরে আসে না। এতক্ষণে বীভৎস ব্যাপারটা দর্শনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ও কাকলিকে ফোন করে, ফোন বেজে যায়। কাকলির ঘরের একটি ডুপলিকেট চাবি ওর কাছে থাকে। ওর আশঙ্কা হয় যে, যাদুগোপাল হয়তো রাত্রে ফিরবে না। পুলিসের ভয়ে সে পালিয়ে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে ও একা থাকতে সাহস পায় না। কারণ ক্রমেই ওর হাত-পা শিথিল হয়ে আসছিল। ও একসঙ্গে দু-দুটো সরবিট্রেট বড়ি খেয়ে আবার গাড়ি নিয়ে রওনা হয়। একটা স্যুটকেসে কিছু জামা-কাপড়, টুথব্রাশ চিরুনি নিয়ে। ও ভেবেছিল, কাকলি যদি বাড়িতে না থাকে, তাহলে তার ঘরে ঢুকে তার বিছানায় শুয়ে থাকবে। যত রাতই হোক, কাকলি গড়িয়াহাটের মেজানাইনে ফিরবেই। যাদুগোপাল হয়তো আদৌ যোধপুর ফিরবে না।

— রাত তখন কটা?

— আমি জানি না। আমি যন্ত্রের মতো কাজ করে গেছি। ঘড়ি দেখিনি। কিন্তু ঘরে আমি পৌঁছাতে পারিনি। ওর দোকানের সামনে গাড়ি পার্ক করতেই একজন ভদ্রলোক...ও, আয়াম সরি, সে তো আপনিই।

তের

বাসু বললেন, ঠিক আছে, জয়া, তুমি আমার ক্লায়েন্ট। আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথমত, তোমার অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন? ব্যাঙ্কে বা ফিক্সড ডিপোজিটে আন্দাজ কত টাকা আছে?

জয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল, মাস-ছয়েক ধরে আমি কিছুই খবর রাখি না। আমাদের সবই জয়েন্ট-অ্যাকাউন্টে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শে ও আমাকে ওসব বিষয়ে চিন্তা করতে দিত না।

— অল রাইট। কিন্তু যাদুগোপাল যখন রওনা হয় তখন সে নিশ্চয় চেক বই পকেটে নিয়ে যায়নি?

— তাও জানি না আমি। হয়তো চেক বই ওর ব্রিফকেসে আছে। সে ব্যাগটা বাইকের পিছনে ও নেয়।

— বুঝলাম। তা তোমার কাছে এখন নগদে কত টাকা আছে?

— নগদে বিশেষ কিছু নেই। শ'-দুই হবে হয়তো। ঐ তো ব্যাগটা আছে, দেখুন না। তবে 'ট্রাভলার্স চেক'-এ হাজার পাঁচেক আছে।

— এত টাকার ট্রাভলার্স চেক করেছিলে কেন?

— আমি একটু সুস্থ হলেই আমরা দু'জনে বেড়াতে যাব — এইরকম স্থির ছিল। তাই ঐ ট্রাভলার্স চেকগুলো করে রেখেছিলাম।

বাসু তাঁর মানি ব্যাগ খুলে পাঁচখানি একশ টাকার নোট বার করে জয়াকে দিলেন। বললেন, এটা রাখ, আর ট্রাভলার্স চেকগুলো আমাকে দিয়ে দাও।

কেন, কী বৃত্তান্ত, জানতে চাইল না। জয়া নিরুত্থায় নোটগুলো নিল, ব্যাগে ভরে রাখল, আর ব্যাগ থেকে এক গোছা ট্রাভলার্স চেক নিয়ে বাসু সাহেবের হাতে দিল। বাসু উঠে গেলেন টেবিলে। হোটেল স্টেশনারির একটা রাইটিং প্যাড তুলে নিয়ে লিখলেন :

'আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, নগদে সমপরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া নিম্নবর্ণিত ট্রাভলার্স চেকগুলি — যাহা

এস. বি. আই. আমার নামে ইস্যু করিয়াছে — তাহা শ্রীসুজাতা মিত্রকে অর্পণ করিতেছি এবং তাঁহাকে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে এগুলি ব্যবহারের অনুমতি দিতেছি। শ্রী সুজাতা মিত্র প্রয়োজনে আমার অছি হিসাবে এই ট্রাভলার্স চেক-এ আমার স্বাক্ষর করিয়া তাহা ভাঙাইতে পারিবেন — এ বিষয়ে তিনি আমার এজেন্ট তথা 'অ্যাটর্নি-ইন-ফ্যাক্ট'। ইতি...

হোটেল স্টেশনারির উপর দিকে ছাপানো অংশটা ছিঁড়ে ফেলে বাসু সাহেব কাগজটা জয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, নাও, পড়ে দেখ, তারপর সই কর, আজকের তারিখে। আর নিজে হাতে ট্রাভলার্স চেক-এর নম্বর এবং টাকার অঙ্কগুলো লিখে দাও।

জয়া জানতে চায় না, কেন, কী জন্যে। যথানির্দেশ লিখে কাগজটা ফেরৎ দেয়।

বাসু সাহেব নিজে থেকেই বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে তুমি এখন মীনাক্ষী মজুমদার, তাই না? হয়তো ঐ পরিচয়ে তোমাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। ফলে 'জয়া সেন'-এর সই করে তুমি এখন ট্রাভলার্স চেক ভাঙাতে পার না। আবার নগদে বেশি টাকা তোমার কাছে থাকাও ঠিক নয়। পাঁচশ দিলাম, বাকি সাড়ে চার হাজার দফায় দফায় পাবে।

— আপনাকে তো কিছু 'রিটেইনার' দেওয়ারও কথা আমার।

— না, তুমি আমাকে নিয়োগ করনি। সেসব হিসেব তোমার ছোট বোনের সঙ্গে হবে।

— কিন্তু একটা কথা। আমি আপনাকে যেমন সব কথা খুলে বলতে পারলাম, পুলিসের কাছে বলতে পারি না?

— না। কেন জান? তুমি তোমার স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে যে কাজটা করেছ তা তোমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই স্বাভাবিক। পুলিসের তা মনে হবে না। বিচারকেরও তা হয়তো মনে হবে না। লোকটা টেবিলে উল্টে পড়েছিল — সে বেঁচে আছে কিনা, তুমি দেখনি। পুলিসে একটা ফোনও করনি। উপরন্তু তার মুঠো থেকে ঐ শেয়ারের কাগজগুলো ছিনিয়ে নিয়ে...

কথাটা তাঁর শেষ হল না। ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাসু সাহেব সেটা তুলে নিতেই রিসেপশন থেকে জানালো ডাক্তার ব্যানার্জি মিসেস মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে চান।

একটু পরেই ডাক্তার ব্যানার্জি উপরে উঠে এলেন। বাসু-সাহেব ঘরের বাইরে করিডোরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ডাক্তারবাবু জানতে চান, পেশেন্ট জেগে আছে?

— হ্যাঁ। চল ভিতরে।

— কী নাম?

— মীনাক্ষী মজুমদার। দুর্গাপুরে থাকে। একটা কথা ডাক্তার, গতকাল রাত্রে ওর একটা বিশ্রী উত্তেজনা গেছে। শকটা কাটেনি। ও যে হার্ট-পেশেন্ট তা আগেই বলেছি। ফলে ওর ব্যক্তিগত...আই মীন, পারিবারিক প্রশ্ন, যত কম করা যায়...

— বুঝলাম। তা 'প্রাতিঃকালে বমি হয়', কিনা এ কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারি?

— অফ কোর্স। শারীরিক যে কোন প্রশ্ন। আমি বাইরে অপেক্ষা করব। তুমি ওকে 'থরোলি' পরীক্ষা করে আমাকে জানিয়ে যেও ওর শারীরিক অবস্থা। সত্যি কথা বলতে, আমি ওকে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে রেখেছি। তুমি যদি মনে কর, ও পুলিসের জেরা এবং গ্রেপ্তার হওয়ার ধাক্কা সামলাতে পারবে তাহলে আমি সে খেলাই খেব। কিন্তু...

— অল রাইট, অল রাইট, চলুন রুগীকে আগে দেখি—

ওঁরা দু'জনে জয়ার ঘরের ভিতর এলেন। বাসু সাহেব ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে জয়াকে বললেন, মীনাক্ষী, ডাক্তারবাবু তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষা করবেন। আমি বাইরে আছি। ও. কে.?

প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে ডাক্তার ব্যানার্জি বার হয়ে এলেন। বাসু ঘনিয়ে এলেন। ব্যানার্জি বললেন, আমি মোটামুটি অবস্থাটা বর্ণনা করছি, টেকনিকাল শব্দ যতটা সম্ভব পরিহার করে। সাধারণের ধারণা

হার্টের অসুখ মানেই 'হয়ে গেল'। আসলে তা নয়। হার্ট একটা প্রত্যঙ্গ — তাতে মাংসপেশী আছে, স্নায়ু আছে, শিরা-ধমনী এবং ভ্যালভস আছে। এর যে কোনো কিছু গড়বড় হলেই আমরা বলি 'হার্ট অ্যাটাক' হয়েছে। ঐ মেয়েটির হার্ট দুর্বল ছিলই — সম্প্রতি একটা নতুন আঘাত পেয়েছে। আমার মনে হয়, মাস- কতক আগে ওর একটা 'এন্ডোকার্ডাইটিস'-এর আক্রমণ হয়। ওর কাছে পুরানো প্রেসক্রিপশন থাকলে আরও স্পষ্ট বোঝা যেত। সে যাই হোক, অতি সম্প্রতি — আপনি বললেন গতকাল রাত্রে, তাই হবে — ওর হৃৎপিণ্ডে একটা প্রচণ্ড চাপ পড়ে। তাতে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু যত্ন নিলে উনি আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবেন।

— পুলিসের টানাহ্যাঁচড়া, গ্রেপ্তার ও সইতে পারবে?

— আমার পরামর্শ শুনুন। ওঁকে কোনও নার্সিংহোমে দেবেন না। বরং এই হোটেলে এই ঘরেই দিন-সাতেক থাকতে দিন। ঘরে একটা টি. ভি. সেট ভাড়া করে বসাতে পারলে ভাল হয়। না হলে ওঁর পছন্দমতো গল্পের বই এনে দিন। আমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। পথ্য যেন ওঁর ঘরে সার্ভ করা হয়। সাতদিন বিশ্রাম নিলেই স্বাভাবিক হয়ে যাবেন। কী জানেন, বাসু-সাহেব, আমার মতে এটা একটা 'বূন-ইন-ডিজগাইস', মানে, 'শাপে বর।'

— তার মানে?

— কাল রাত্রে কী ঘটেছে আমি জানি না, আমি জানতে চাইনি। কিন্তু আমার মনে হয়, উনি যে এই প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে থেকে নিজের চেষ্টায় বের হয়ে আসতে পেরেছেন, এতে ওঁর আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেছে। 'কার্ডিয়াক' কেস-এ এমন প্রায়ই হতে দেখা যায়। আত্মীয়-স্বজনেরা পুতুপুতু করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, রুগী মানসিক ভাবে জবুথবু হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ ঘটনাচক্রে তাকে একা হাতে লড়াই করতে হয় — এবং তখনই সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। ইয়ে...ওঁর নামটা যেন কী?

— মীনাক্ষী মজুমদার। ভাল কথা, নবনীতা কেমন আছে?

— ভালই। ইতিমধ্যে কেমিক্যাল রিপোর্ট পাওয়া গেছে। প্রতিটি ক্যান্ডিতে সাত গ্রেন করে ভেরোনল ছিল। তার মানে, ও প্রায় পঞ্চাশ গ্রেন খেয়েছে। মনে হয় আজ বিকালেই তার ঘুম ভাঙবে। না হলে কাল সকালে নিশ্চয়ই।

ডাক্তার ব্যানার্জি প্রেসক্রিপশনটা বাসু-সাহেবকে দিলেন।

বাসুও নিঃশব্দে ওঁর ফি-টা হস্তান্তরিত করলেন।

* * *

বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ বাসু-সাহেব বাড়িতে এলেন। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাননি। সবাই অপেক্ষা করছিল। উনি জয়া সেনের অবস্থার কথা জানালেন। কৌশিককে বললেন, হোটেলে গিয়ে কথাবার্তা বলতে, দিন-সাতেকের জন্যে একটা টি. ভি. ভাড়া করে ঐ ঘরে বসানো যায় কিনা। তারপর জীবন হালদারের বিষয়ে কোন সংবাদপত্রে কী ছাপা হয়েছে এই নিয়ে কিছু আলোচনা হল। কাগজে জয়া সেন বা তার স্বামীর প্রসঙ্গ কিছু আসেনি। তবে কাকলির বাড়িতে মধ্যরাত্রে পুলিস হানা দিয়েছিল এ খবর আছে।

বাসু বললেন, সুজাতা, তোমাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। এই ট্রাভলার্স চেকগুলো নাও। প্রথমে 'জয়া সেন'-এর স্বাক্ষরটা মকশো কর। একেবারে 'পার্ফেক্ট' যেন না হয়। আপাতদৃষ্টিতে যেন একই রকম লাগে। তারপর ওর ভিতর একটা হাজার টাকার ট্রাভলার্স চেক দেখতে পাবে। সেটা নিয়ে কোনও বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসে চলে যাও। আন্দাজ পঞ্চাশ টাকার জিনিস কিনে ঐ হাজার টাকার ট্রাভলার্স চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট করার চেষ্টা কর।

রানু বললেন, এ তো সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ। ও ধরা পড়ে গেলে জেল খাটবে না?

বাসু ধর্মপত্নীকে আশ্বস্ত করেন, না। খাটবে না। অন্তত আইনের দিকটুকু আমাকেই ভাবতে দাও

তোমরা। বাকি ভাবনা তোমাদের।

কৌশিক জানতে চায়, আপনার মূল উদ্দেশ্যটা কী?

বাসু সে কথার জবাব না দিয়ে সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, পঞ্চাশ টাকার জিনিস কিনে হাজার টাকার ট্রাভলার্স চেক ভাঙাতে চাইলে ক্যাশিয়ারের একটু সন্দেহ হবেই। হয়তো সে জানতে চাইবে আপনার কাছে খুচরো পঞ্চাশ টাকা নেই? অমনি তুমি লাফিয়ে উঠবে 'গুড গড! আমার হাতব্যাগ! সর্বনাশ!' ক্যাশিয়ারকে বলবে, ট্যাক্সিতে ফেলে এসছি। তার মধ্যে নগদে তিন হাজারর টাকা আছে। এই কথা বলে ট্রাভলার্স চেকটা ক্যাশিয়ারের টেবিলে ফেলে রেখে — তুমি সটকে পড়বে।

— তারপর?

— সোজা চলে আসবে বাড়িতে।

এবার সুজাতাই প্রশ্ন করে, ঠিক আছে। কিন্তু আপনার মূল উদ্দেশ্যটা কী?

— পুলিসকে বাধ্য করা তারা যাদুগোপালকে খুঁজুক।

— এখন খুঁজছে না?

— না। হোমিসাইড এখনো জানে না, যাদুগোপাল বা তার স্ত্রী নিরুদ্দেশ।

রানু বলেন, তুমি যদি পুলিসকে ও-কথা জানাও আর যাদুগোপালকে খুঁজতে বল, তাহলেও ওরা তা করবে না?

— না। এটা ওদের আত্মাভিমানে লাগবে। আমাকে ওরা পাত্তা দেবে না।

— তুমি সুজাতাকে যা করতে বলছ তা ও করলেই বা পুলিস যাদুগোপালকে খুঁজতে উঠে পড়ে লাগবে কেন?

— লজিক্যালি পর পর ভেবে দেখ। ক্যাশিয়ারের সন্দেহ হবে মাত্র পঞ্চাশ টাকার মাল কিনে ঐ ভদ্রমহিলা কেন হাজার টাকার ট্রাভলার্স চেক ভাঙাতে চাইছেন? দ্বিতীয়ত, সে হয়তো লক্ষ্য করে দেখবে, সইটা মিলছে না। তৃতীয়ত, মেয়েটি কেন চেকটা ফেলে রেখে চলে গেল? কেন সে ফিরে এসে চেকটা সংগ্রহ করল না? চতুর্থত,মেয়েটি বলে গেল তার ব্যাগে নগদে তিন হাজার টাকা আছে। তাহলে সে কেন হাজার টাকার ট্রাভলার্স চেক ভাঙাবে? ফলে, ক্যাশিয়ার ম্যানেজারকে জানাবে। ম্যানেজার পুলিসকে জানাবে। পুলিসের কাছে 'জয়া সেন' নামটা অজানা নয়। তারা ওর যোধপুর পার্কের বাড়িতে ফোন করবে, লোক পাঠাবে। তখনই জানবে যে, স্বামী-স্ত্রী কাল রাত থেকে নিরুদ্দেশ। দু'জনের তল্লাসি শুরু হবে।

কৌশিক বলে, ও, ভাল কথা। আপনাকে দু'টো খবর দেওয়া হয়নি।

— বলো?

কৌশিক সংবাদ দু'টি একে একে পেশ করে। প্রথম খবর হচ্ছে, ভোরবেলা কাকলি একটা টেলিফোন করেছিল। সে জানায় যে, তার দিদি এবং ভগ্নিপতির মধ্যে কেউই রাত্রে যোধপুর পার্কের বাড়িতে ফিরে আসেনি। টেলিফোন বারে বারে বেজে গেছে। সাড়া নেই। দ্বিতীয় খবর, কৌশিক বেলা আটটা নাগাদ গিয়ে দেখে এসেছে পুলিস ক্রেন দিয়ে জয়া সেনের ফিয়াট গাড়ির সামনের দিকটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐ গ্যারেজের সামনেটা ফাঁকা করে দিচ্ছে।

এরপরেই বিশু এসে জানালো একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসেছেন।

বাসু অগত্যা তাঁর চেম্বারে গিয়ে বসলেন। একটু পরে রানু ইন্টারকমে জানালেন, মিস্টার ভৈরব দাশ সাক্ষাৎপ্রার্থী।

— অল রাইট। পাঠিয়ে দাও।

মিনিটখানেক পরে ঘরে ঢুকল ভৈরব দাশ। বছর পঁয়তাল্লিশ। সাজ-পোশাকে যথেষ্ট পরিপাট্য। শেরওয়ানি, চুস্ত আর রিমলেস চশমা।

বাসু বললেন, সিট ডাউন, মিস্টার দাশ। আমার একটু তাড়া আছে। আপনার যা বলবার তা একটু

তাড়াতড়ি বললে সুবিধে হয়।

ভৈরব গুছিয়ে বসল। বলল, পরিচয় দিতে হবে না, আশা করি।

— না, সরাসরি বক্তব্যে আসতে পারেন।

— আমি কী জন্যে এসেছি সেটা কি আপনি আন্দাজ করতে পারছেন না?

— পারছি। তবু কথাটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

— মিস্টার বাসু, আমি সচরাচর কোনও জিনিসের প্রতি লালায়িত হই না। তবে যা চাই তা যেনতেনপ্রকারেণ হস্তগত করি। এ পর্যন্ত কখনো ব্যর্থ হইনি। এটাই আমার স্বভাব। এটাই আমার বৈশিষ্ট্য।

— আমি তো বললাম, আপনাকে, আমার সময় কম। ঐ সব ধানাই-পানাই ভূমিকা বাদ দিয়ে সোজা করে বলুন, কেন এসেছেন।

ভৈরব তিলমাত্র বিচলিত হল না। একই বিলম্বিতলয়ে বলে চলল, এবারও আমি যা চাইছি তা আমার হাতের মুঠোয় আসবে। অবধারিত ভাবে। সহজ রাস্তায় না হলে হয়তো একটু বাঁকা পথে। আপনি ঠেকাতে পারবেন না। বৃথা চেষ্টা। আমি যা করি তা আটঘাট বেঁধে করি। আমি আপনার কৃতিত্ব সম্বন্ধে অবহিত, আপনাকে একটুও আন্ডার-এস্টিমেট করছি না। আপনিও তা করলে, ভুল করবেন বাসু-সাহেব...

— ঠিক এই মুহূর্তে আপনার নজরটা কোনদিকে? গড়িয়াহাট রোডের 'সুজাতা ফটোগ্রাফিক স্টোরসের' একচ্ছত্র মালিকানা?

— মালিকানা, তবে একচ্ছত্র নয়। মাত্র ফিফটিওয়ান পারসেন্ট শেয়ার। সিনিয়ার পার্টনারশিপটুকু। ব্যস।

— কেন? বাকি ফরটিনাইন কী দোষ করল?

— আমি চাই না যে, আপনার ক্লায়েন্ট সব কিছু বেচে দিয়ে নতুন কোনো ব্যবসার নেমে পড়ুক।

— সেটাই বা কেন?

— তাহলে সেই ব্যবসাটাও তো আমাকে কিনে নিতে হবে?

— অর্থাৎ আপনি আসলে ফটোগ্রাফিক দোকানটার প্রতি অর্থনৈতিক কারণে ইন্টারেস্টেড নন, দোকানটার বর্তমান 'মালকিন'ই আপনার মূল লক্ষ্য?

— এতক্ষণে আপনি 'বুলস-আই' হিট করেছেন, ব্যারিস্টার-সাব।

— কিন্তু কেন? কেন এভাবে একটি স্বাবলম্বী স্বাধীনচেতা কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করছেন? স্বর্ণলতার দশ পার্সেন্ট শেয়ার কিনে 'সূচ' হয়ে ঢুকে এখন যাদুগোপালের মাধ্যমে 'ফাল' হতে চাইছেন। এটা সহজবোধ্য। ভেবেছিলাম, তার কারণ দোকানটা আপনি গ্রাস করতে চান শুধু টাকার জন্যই...।

— ঐখানে আপনার ভুল হয়েছে। সেই ভুলটাই ভেঙে দিতে এসেছি। দোকানটা আমার চাই। তার মালকিনসমেত।

— কিন্তু কেন? কেন এভাবে ঐ মেয়েটার...

— সেটাই তো বোঝাতে চাইছিলাম। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে আমি তাকে শুইয়ে দিই। আপনার ক্লায়েন্ট আমাকে অপমান করেছে, তাকে ক্ষমা করতে পারি না।

— আপনি বিবাহিত?

— হ্যাঁ, অতি সম্প্রতি, পূর্ব স্ত্রী বিয়োগের পর। একথা কেন?

— তাহলে, মানে, কাকলিকে...

— ঐ যে বললাম, শুইয়ে দিতে চাই।

— বাসু ইন্টারকমটা তুলে ধরে রানুর মাধ্যমে 'সুকৌশলী'-কে চাইলেন। সুকৌশলীর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির ঘরটা বারান্দার ও-প্রান্তে। একটু পরে কৌশিক সাড়া দিল, বলুন?

— কৌশিক? শোন, আমি বাসু-মামু বলছি। একটু লিখে নাও। লোকটার নাম ভৈরব দাশ, ফিল্ম প্রডিউসার বলে কেউ কেউ তাকে চেনে বটে, কিন্তু বক্স-অফিস সাকসেসফুল ছবি আজও একটাও তুলতে

পারেনি। বয়স অ্যারাউন্ড আটচল্লিশ, সাজগোজ 'ফপিশ'। চোখে রিমলেস চশমা। কথাবার্তায় একটু হামবড়াই ভাব। গট ইট? লোকটা গড়িয়াহাট রোডের 'সুজাতা ফটোগ্রাফিক স্টোরস'-এর কিছু শেয়ার সম্প্রতি কিনেছে। ঐ দোকানের প্রায় আধাআধি শেয়ারের মালিক শ্রীমতী জয়া সেন। প্রায় ইনভ্যালিড। তার স্বামী যাদুগোপাল সেন 'রেশুড়ে'। ঐ শেয়ারগুলি বন্ধক রেখে যাদুগোপাল একজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। লোকটা 'সোনালি স্বপনের' সিনিয়ার পার্টনার ছিল জীবন হালদার। আজকের কাগজে দেখে নিও, লোকটা কাল রাত্রে ফৌত হয়েছে। মার্ডার। এই ঘটনার সঙ্গে ঐ ভৈরব দাশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা। তুমি একটা ডোসিয়ার তৈরি কর — 'ফ্লপ ফিল্ম প্রডিউসার ভৈরব দাশে'র নামে। তার পুরো ইতিহাসটা আমার চাই। ভৈরব দাশের সঙ্গে জীবন হালদার, রাকেশ বাজোরিয়া অথবা নবনীতা রায়ের কোনও যোগাযোগ গত এক পক্ষকালের মধ্যে হয়েছে কিনা — ওরা পরিচিত কিনা, আমি জানতে চাই।

কৌশিক জানতে চায়, আর কিছু?

— হ্যাঁ, ঐ ভৈরব দাশ-এর অতীত ইতিহাসে কোনও দুর্বলস্থল থাকলে সেটাও আমি জানতে চাই। লোকটার হামবড়াই ভাবের কথা বলেছি। সে দাবি করে যে, এ পর্যন্ত জীবনে যা যা চেয়েছে তা যেনতেনপ্রকারেণ পেয়েছে। কথাটা মিথ্যা হতে পারে — সত্য হলে ওর অতীত জীবনে একাধিক দুর্বলস্থান থাকবে। আমি জানতে চাই। ও. কে?

ইন্টারকম অফ করে মুখ তুলে দেখলেন ভৈরব ইতিমধ্যে একটা বার্মা চুরুট ধরিয়েছে। একগাল হেসে সে বললে, দারুণ ড্রামাটিক। তবে কী জানেন, ব্যারিস্টার-সাহেব, পয়সা আপনারও আছে, আমারও আছে। প্রয়োজনে ডজনখানেক 'সুকৌশলী' গোয়েন্দা আমিও লাগাতে পারি। তা আমি লাগাবো না। কেন জানেন? যেহেতু আমার প্রয়োজন হবে না ; যেহেতু আমার কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, আপনার ক্লায়েন্ট মিস কাকলি দত্ত কাল রাত ন'টা নাগাদ মোমিনপুরে গেছিল। আনফরচুনেটলি, বাড়িটা চিনত না বলে একটা বড় স্টেশনারি দোকানে রাস্তার ডিরেকশন নেয়। আনফরচুনেটলি, সে সরাসরি প্রশ্ন করে না যে, জীবন হালদারের বাড়িটা কোথায়? কায়দা করে জানতে চায়, রবি বসুর বাড়িটা কোথায়, যে রবি বসু সুবিখ্যাত জীবন হালদারের বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতে ভাড়া থাকে। আনফরচুনেটলি এগেন, সেটা ছিল দোকানের মালিকের বার্থ-ডে পার্টি। অন্তত দশজন সাক্ষী আমি খাড়া করব, যারা আপনার ক্লায়েন্টকে আইডেন্টিফাই করবে। এরপর আপনি কী বলবেন?

— গো টু হেল!

— আজ্ঞে নরকেই আমার বাস। অ্যাদ্দিন একা ছিলাম। এবার সঙ্গী পাব। আপনাকে আর আপনার মক্কেলকে। চলি, নমস্কার।

ভৈরব সোজা দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়।

চৌদ্দ

মধ্যাহ্ন আহারের পূর্বেই সুজাতা তার ডিউটি সেরে ফিরে এসে রিপোর্ট করল। এয়ার-কন্ডিশান মার্কেটের একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে হৈচৈ ফেলে সে পালিয়ে এসেছে। আহারাদি সেরে কৌশিক গেল 'পান্থজনসখা' হোটেলে। জয়া সেনের তত্ত্বতালাশ নিতে। রাণু ওর হাতে খান-দুই-তিন গল্পের বই ধরিয়ে দিলেন। বললেন, দেখ, জয়া যদি কোনোটা পড়তে চায়।

বেলা তিনটের সময় এসে হাজির হল ইন্সপেক্টর দাশ।

— কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ?

— আপনি স্যার কাল রাত্রে আমার নাকের ডগা থেকে হাত সাফাই করলেন, আর আমি ধরতে পারলাম না।

— কী বলছ হে? কীসের হাত সাফাই?

— তখন রিভলভারটা আবিষ্কার করে আমি এতই উত্তেজিত ছিলাম যে, খেয়াল করিনি ব্যাপারটা।

— কোন ব্যাপারটা?

— আমি যখন মিস দত্তের বাড়িতে যাই তখন ওঁর বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি পার্ক করা ছিল না। অথচ আপনি নেমে আসার পরেই একটি গাড়ি স্টার্ট নিল। কী করে হয়? আপনি কি জয়া সেনের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে নেমে এসেছিলেন? না হলে বাড়ি ফিরলেন কী করে? অত রাতে ট্যাক্সি পেলেন?

বাসু বললেন, তুমি খেয়াল করনি নিখিল। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কৌশিক। রাত্রে সচরাচর সেই ড্রাইভ করে। একটু দূরে গাড়িটা পার্ক করেছিল, তাই তোমার নজরে পড়েনি।

— আপনি জয়া সেনকে কোথাও নামিয়ে দেননি?

— আরে না রে বাপু। আমার নিজের গাড়ি নিয়ে কৌশিক অপেক্ষা করছিল, সেই গাড়িতেই ফিরেছি।

সত্য কথা সন্দেহ নেই। এমনকি 'আদ্যন্ত সত্যও' বলে চলে। কিন্তু 'নাথিং বাট দ্য ট্রুথ' একে বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়।

ইন্সপেক্টর দাশ অধোবদনে নীরবে কী ভাবছিল। বাসু বললেন, কাকলি দত্ত আমার মক্কেল নয় তা কালই বলেছি, তুমি ওকে অ্যারেস্ট করলে না কেন?

নিখিল বললে, তার একাধিক হেতু। কাল যে কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করিনি সে প্রসঙ্গ থাক। আজ আমি জানি, অপরাধটা তিনি করেননি। অন্তত এটাই আমার ধারণা।

— কোন অপরাধটা? নবনীতাকে বিষ দেওয়া, না মার্ডার?

— বিষপ্রয়োগটা তো নয়ই। কারণ কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে দেখা গেছে চকোলেট বাক্সের উপর নবনীতা দেবীর নাম লেখা কাগজটা 'সোনালি স্বপন' রেস্তোরাঁর স্টেশনারির। আঠা অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে 'সেট' করে শক্ত হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, নবনীতা দেবীর নামটা টাইপ করা হয়েছে ঐ রেস্তোরাঁর টাইপ-রাইটারে।

— তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?

— এক নম্বর: কাজটা ঐ 'সোনালি স্বপন'-এর কোনও স্টাফের। দু নম্বর: কাকলি দত্ত হতে পারে না, তার সঙ্গে নবনীতার আলাপ মাত্র কয়েক ঘণ্টার....

— তাহলে বিষপ্রয়োগের উদ্দেশ্যটা কী?

— নবনীতার প্রতি কোনও কারণে ঈর্ষা। অথবা হয়তো নবনীতা এমন কোনও তথ্য জানে যাতে জীবন হালদারের হত্যাকারী ধরা পড়ে যেত। তাই একসঙ্গেই জোড়া খুনের চেষ্টা হয়েছে। নবনীতা আপনার কাছে কী বিষয়ে জবানবন্দি দিতে আসছিল তা আপনি জানেন, আমি জানি না।

— আমিও তা জানি না, নিখিল। তবে কাকলির তরফে সে সাক্ষী দিতে আসছিল। খুব সম্ভব ঐ শেয়ারগুলোর বিষয়েই — তার মানে, জীবন হালদারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওর জবানবন্দির সম্পর্ক থাকার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু তুমি যে কথাটা বলছিলে আজ কেন তোমার ধারণা হয়েছে যে, অপরাধটা কাকলি করেনি?

— অনেকগুলি হেতুতে। প্রথমত শ্রীমতী জয়া সেন এবং শ্রীমান যাদুগোপাল সেন গতকাল রাত্রি থেকে নিরুদ্দেশ। কাল রাত্রে ওঁরা বাড়িতে ছিলেন না। আজও ফেরেননি এটা আজ জেনেছি।

— গ্যারেজে গাড়িটা আছে?

— না নেই।

— তার মানে যাদুগোপাল সস্ত্রীক কোথাও গেছে। কোথায় গেছে?

— সমস্যাটা তার চেয়েও জটিল, স্যার। কারণ গ্যারেজে যাদুগোপালের মোটর সাইকেলটাও নেই।

— তার মানে তুমি বলতে চাইছ, জয়া নিজে ড্রাইভ করে — অসম্ভব মনে হচ্ছে না? সে তো হার্ট পেশেন্ট।

— তথ্যটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য সেটাই চিন্তার। কারণ এটা ইতিমধ্যে জানা গেছে যে, গতকাল রাত নটা নাগাদ মিসেস সেন ড্রাইভ করে মোমিনপুরের দিকে গিয়েছিলেন। একটি স্টেশনারি দোকানে গিয়ে জীবন হালদারের বাড়ির পথনির্দেশ নিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে ঐ দোকানে তখন একটা বার্থ-ডে পার্টির খানাপিনা চলছিল। অনেকেই স্বীকার করেছে — এক অসুস্থা ভদ্রমহিলা এসে পথনির্দেশ চেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন জয়া সেনের ফোটো দেখে তাঁকে সনাক্ত করেছে।

বাসু বলেন, এটা কী বলছ, নিখিল? কেউ যদি খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে কারও বাড়ি যায় তাহলে একটা বার্থ-ডে পার্টিতে গিয়ে পথনির্দেশ চাইবে, যাতে দশ-পনের জন মানুষ তাকে চিনে রাখে?

— কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই যে, মিসেস সেন সরাসরি জিজ্ঞেস করেননি 'জীবন হালদারের বাড়িটা আপনারা কেউ চেনেন'? তিনি জানতে চেয়েছিলেন 'রবি বসুর বাড়ি কোনটা?'

— রবি বসু। সে কে?

— ওপাড়ায় রবি বসু বলে কেউ থাকেই না।

— তাহলে ওভাবে প্রশ্ন করার মানে?

— সেটা তো সন্দেহ জাগাচ্ছে, কারণ রবি বসুর বাড়িটা কেউ চিনতে না পারায় মিসেস সেন বলেছিলেন, 'রবি থাকে জীবন হালদারের ঠিক পাশের বাড়ি। রবি বলেছিল জীবন হালদারের বাড়িটা সবাই চিনবে।' এরপর বার্থ-ডে পার্টির দু-তিনজন ওকে চিনিয়ে দেয় জীবন হালদারের বাড়ি কোনটা।

— আই সী! তুমি কি অনুমান করছ জয়া সেনই খুনটা করেছে?

— প্রথমটা তাই ভেবেছিলাম। না হলে বাড়ি থেকে রিভলভার নিয়ে যাবে কেন?

— রিভলভার? জয়ারও রিভলভার আছে না কি?

— না নেই। কাল যেটা কাকলি দেবীর বাড়ি থেকে আবিষ্কার করেছি সেটার কথাই বলছি। আমার সন্দেহ ওটা ছিল জয়া দেবীর হেপাজতে। ইতিমধ্যে টেস্ট-বুলেট পরীক্ষা করা হয়েছে। ঐ রিভলভারের গুলিতেই যে জীবন হালদার ফৌত হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আর নেই। কিন্তু রাতারাতি যন্ত্রটা কাকলির কাছে চলে গেল কী করে?

— কাকলির অ্যালেবাইটা যাচাই করে দেখেছ?

— দেখিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও দু-দুটো ক্লু আবিষ্কৃত হয়েছে। সে জন্যই আপনার কাছে আসা।

— দুটো ক্লু?

— দেখুন স্যার — আমরা যদি জয়া সেনকে সন্দেহ করতাম, তাহলে নিশ্চয় আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসতাম না। কারণ আমরা জানি, জয়া দেবী আপনার ক্লায়েন্ট। জয়া দেবীকে আসামী করলে আপনি আর আমি থাকতাম বিপক্ষ শিবিরে। কিন্তু ঘটনাচক্রে এখন আমাদের লক্ষ্যস্থলটা বদলে গেছে। আমরা এখন খুঁজছি যাদুগোপালকে।

— কেন? যাদুগোপাল আবার কী করল?

— প্রথম কথা, যাদুগোপালই শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো গচ্ছিত রেখে টাকাটা ধার নিয়েছিল — ব্যাপারটা স্ত্রীর কাছে, শালীর কাছে গোপন রেখেছিল। ক্রমে সে মরিয়া হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কথা, জয়ার গাড়িখানা পুলিশে উদ্ধার করেছে। এই নিউ আলিপুর এলাকা থেকেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সে গাড়িতে কারও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। বুঝুন কাণ্ড। স্টিয়ারিং হুইল, ডোর হ্যান্ডেল, সারা পলিশড গাড়িতে কারও আঙুলের ছাপ নেই।

— এটা কেমন করে হয়? মিসেস সেন বা যাদুগোপালের আঙুলের ছাপ তো থাকবেই। তারাই

ওটা ব্যবহার করে।

— সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু শেষ রাত্রে কেউ যদি মিসেস্ সেনের মৃতদেহটা এই পর্যন্ত নিয়ে এসে গাড়ি বদল করে লাশ পাচার করে এবং যাবার আগে যদি সব আঙুলের ছাপ মুছে দিয়ে যায়....

— জাস্ট এ মিনিট। গাড়ির পাল্লা কি খোলা ছিল না লক করা?

— দ্যাটস দ্য ভাইটাল পয়েন্ট। গাড়িটা লক করা ছিল। সব কাচ ওঠানো। অর্থাৎ যে লোকটা গাড়ি চালিয়ে এসেছিল তার কাছে শুধু ইগনিশন চাবিটাই নয়, দরজার চাবিটাও ছিল। তাই খুব সম্ভব সে যাদুগোপাল।

— তুমি দুটো ক্লুর কথা বলেছিলে। এটাই কি দ্বিতীয় ক্লু?

— না, স্যার। দ্বিতীয় ক্লু আরও রহস্যজনক। এয়ারকন্ডিশনড মার্কেটে আজ সকালে একটি মহিলা গোটা পঞ্চাশ টাকার মাল কিনে একটা হাজার টাকার ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে চেয়েছিলেন। ক্যাশিয়ারের সন্দেহ হয়, সইটা মিলছে না। ক্যাশিয়ার মহিলাটিকে বলে, আপনার কাছে পঞ্চাশ বা একশ টাকার নোট নেই? বলতেই মেয়েটি একেবারে লাফিয়ে ওঠে। বলে, তার হাতব্যাগে নগদে তিন হাজার টাকা আছে। সেটা সে ট্যাক্সিতে ফেলে এসেছে। বলেই পড়ি তো মরি ছুটে যায় ট্যাক্সির সন্ধানে।

— বুঝলাম। তার সঙ্গে যাদুগোপালের কী সম্পর্ক?

— আপনাকে বলা হয় নি, ট্রাভেলার্স চেকটা ছিল মিসেস জয়া সেনের নামে।

— বল কী! জয়া আজ এয়ারকন্ডিশনড মার্কেট গিয়েছিল?

বাধা দিয়ে নিখিল বলে, আজ্ঞে না। এ মেয়েটির বয়স বাইশ-চব্বিশ। রোগা, চটপটে, ফর্সা, প্রয়োজনে হরিণের মতো ছুটতে পারে। আর মিসেস সেন পঁয়ত্রিশের কম নয়, রং কালো, স্থূলকায়া, অসুস্থা। তাছাড়া আমরা পরীক্ষা করে বুঝেছি সইটা জাল।

— কে এই মেয়েটা?

— তা জানা যায়নি। তবে আমার আশঙ্কা সে মেয়েটি যাদুগোপালের প্রণয়িনী। স্ত্রীকে খুন করে যাদুগোপাল বাড়িতে ফিরতে পারছে না। স্ত্রীর হাতব্যাগে সে কিছু ট্রাভেলার্স চেক পেয়েছে। আপাতত তাই ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

— আমার বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না। যাদুগোপাল তার স্ত্রীকে খুন করবে কেন? বিশেষ করে এভাবে? সম্পত্তির লোভে সে তো অসুস্থ স্ত্রীকে ধীরে ধীরে...

— না স্যার। এমনও হতে পারে যে, জীবন হালদারকে খুনটা করেছে যাদুগোপাল, কিন্তু ঘটনাচক্রে জয়া সেন সেটা দেখে ফেলেছে. তাই রাতারাতি...

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল কাকলির আর্তকণ্ঠ, স্যার, আমি কাকলি বলছি। আপনি এক্ষুণি একবার আমার দোকানে আসতে পারবেন? ভীষণ জরুরি ব্যাপার।

— কী হল আবার?

— এইমাত্র দিদি আমাকে টেলিফোন করেছিল। আপনি, স্যার, এক্ষুনি চলে আসুন। অনেক কথা বলার আছে। টেলিফোনে বলা যাবে না। দিদির গলা শুনেই....

— তুমি ভুল করছ না তো? মানে...

— আমি নিশ্চিত। এ-বিষয়ে আমার ভুল হবে না। কথা বলতে বলতেই দিদির গলার আওয়াজ কেমন যেন হয়ে গেল। ঠিক তখনি স্পষ্ট শুনতে পেলাম যাদুগোপালের কণ্ঠ। ও বললে, কী হল? তুমি অমন করছ কেন? ব্যাস। তারপরেই লাইনটা ডেড।

— ঠিক আছে। হাতের কাজটা সেরেই আমি আসছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

ইন্সপেক্টর দাশ উঠে দাঁড়ায়। বলে, জরুরি ডাক মনে হল?

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, বস, বস। ওদের ওসব ফালতু কথা বাদ দাও। আমার এক ধনী মক্কেল।

শেষ সময়ে উইলটা পালটাতে চাইছেন। তাঁর ছেলে ফোন করছিল। বুড়ো এ যাত্রা মরবে না। বস তুমি। হ্যাঁ, ভাল কথা, সেই মেয়েটির কী যেন নাম? হ্যাঁ নবনীতা, তার জ্ঞান হয়েছে?

নিখিল আবার বসে পড়ে। বলে না। হলেই আমি খবর পাব। তার জবানবন্দিটা পেলে সমস্যাটা কিছু স্পষ্ট হতে পারে। কারণ জীবন হালদারের সঙ্গে মেয়েটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

— তাই নাকি? কী ব্যাপার?

নিখিল তার তদন্তের চুম্বকসার দাখিল করে। ইতিমধ্যে সে জানতে পেরেছে জীবন হালদার পাঁচ-ছয় বছর আগে কোনও এক গ্রাম থেকে নবনীতাকে ভাগিয়ে আনে। মেয়েটির বাবা-মা নেই। মামার বাড়িতে অনাদরে মানুষ হচ্ছিল। ওরা কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে, যদিও সে বিবাহ আইনত সিদ্ধ নয়, কারণ জীবনের স্ত্রী তখন জীবিত ছিল। জীবন ইলিয়ট রোডে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে নবনীতাকে স্ত্রীর পরিচয়ে রেখেছিল। তারপর ইদানীং দু'জনের মন কষাকষি, ঝগড়াঝাঁটি চলছিল। তাই জীবন ইলিয়ট রোডের বাসা ছেড়ে দিয়ে একাই মোমিনপুরের বাড়িতে চলে যায়। মোমিনপুরে সে নাকি সম্পূর্ণ একা থাকত। কোন চাকর পর্যন্ত থাকত না। এখানে দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত বিভিন্ন পার্টি-মস্তান। আর রাতের বেলা শয্যাসঙ্গিনী। নিখিল আরও খোঁজ নিয়ে জেনেছে, 'সোনালি-স্বপন'-এর একতলায় পানাহারের আয়োজন আছে বটে, কিন্তু দোতলায় কিছু নিষিদ্ধ কাজ-কারবার হয়। সম্ভবত সাট্টার আড্ডা। ঠিক তাই কিনা নিখিল এখনো জানতে পারেনি। বে-আইনি জুয়া তো বটেই, তবে তেতাস না, সম্ভবত সাট্টা ; তথ্যটা জানা যায়নি। হেতুটা বেদনাদায়ক। ও-পাড়ার কিছু পার্টি-ইন-পাওয়ার রাজনৈতিক 'দাদা' এবং উচ্চপদস্থ 'আরক্ষাচূড়ামণি' জীবনের ঐ গরিবখানায় মাঝে মাঝে পদধূলি দিয়ে থাকে। ফলে নিখিল বেমক্কা' ঠেকটা রেইড করতে সাহস পায়নি। কিন্তু নবনীতার জবানবন্দি পেলেই সন্দেহজনক মনে হলে সে সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ঐ 'সোনালি-স্বপন'কে দুঃস্বপ্ন করে ছাড়বে।

বাসু জানতে চান, নবনীতার কাছে কী জাতীয় জবানবন্দি আশা করছ তুমি?

— আমি জানি না, স্যার। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ মেয়েটাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা যে করেছে সে 'সোনালি স্বপন'-এর লোক। বিষের চকলেট প্যাকেটটা বানিয়ে সে প্রতীক্ষায় ছিল। নবনীতার কাছে বোধহয় প্রায়ই উপহার-টুপহার আসে। কারণ বিধায়ক আর আরক্ষাপুঙ্গবই নয়, দোতলার ঠেক-এ ঘোড়দৌড় মাঠের মস্তান এবং বুকিরাও নিয়মিত আসে। রেস্তোরাঁর এইসব গ্ল্যামার-গার্ল-এর মাধ্যমে 'টিপস'-এর লেনদেন হয়ে থাকে। ফলে নবনীতার একাধিক 'নাগর' থাকার কথা। ভালবাসার 'নাগর' না হলেও 'টিপস'-এর 'টিপসি' নাগর। হত্যাকারী প্রতীক্ষায় ছিল, সুযোগ মতো নবনীতাকে উপহারের সঙ্গে ঐ চকলেট-প্যাকেটটাও মিশিয়ে দিয়েছে। কাকলি দেবী একটা পলিথিন-ব্যাগে না-লেখা ডায়েরিটা পাঠিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পৃথক কাগজে শুভেচ্ছাবাণী, কাকলির স্বহস্তে লেখা। হত্যাকারী এ-সুযোগটা হাতছাড়া হতে দেয়নি। পলিথিন ব্যাগের ভিতর চকলেট প্যাকেটটাও ভরে দেয়।

বাসু বললেন; তুমি যা বলছ তা যুক্তিপূর্ণ। না হলে চকলেট প্যাকেটের উপর নবনীতার নাম লেখা যে কাগজটা আঠা দিয়ে সাঁটা আছে তার উপর ঐ টাইপ-রাইটারে লেখা নবনীতার নাম থাকবে কী করে? 'সোনালি স্বপন'-এ সন্দেহজনক কারও পাত্তা পেয়েছো?

নিখিল একটু চিন্তা করে বলল, না। যে কেউই করতে পারে, কিন্তু 'মোটিভ'টা কী? আমাদের সঙ্গে যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলাটি কথা বলেছিলেন — ইর্মা জনসন — তাঁর যথেষ্ট বয়স। নবনীতার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হবার কোনও হেতু নেই। আরও গোটা-তিনেক গ্ল্যামার-গার্ল ওখানে আসে ; কিন্তু তারাই বা নবনীতার প্রতি এতটা ঈর্ষান্বিত হবে কেন? সে তো এখন মালিকের নেক-নজরে নেই। তাই মার্ডার-ব্যাপারে আন্দাজে কোনও থিওরি খাড়া করা গেলেও চকলেটের ব্যাপারটার কোনও কূলকিনারা করা যাচ্ছে না। অবশ্য যাদুগোপালের সঙ্গে নবনীতার অন্তরঙ্গতা ছিল। এটা অনেকেই বলেছে। তবু হিসাবটা মিলছে না।

এই সময় ইন্টারকমে রাণু দেবী জানালেন, বাসু-সাহেবের কাছে একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসেছেন। নিখিল উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলাম।

বাসু সবিনয়ে বলেন, বিলক্ষণ। অনেক সংবাদও তো দিয়ে গেলে। ঠিক আছে, আবার দেখা হবে। তুমি এই দরজা দিয়ে চলে যাও, নিখিল।

এটা ব্যারিস্টার সাহেবের একটা ওকালতি-স্থাপত্য প্যাঁচ। ওঁর চেম্বারে প্রবেশপথ আর প্রস্থানপথ ভিন্ন। যাতে প্রস্থানকামী না জানতে পারে পরবর্তী সাক্ষাৎপ্রার্থী কোনজন, অথবা প্রবেশকালে কেউ না জানতে পারে পূর্ববর্তী সাক্ষাৎধন্য ব্যক্তিটি কে।

বাসুর অনুমতি পেয়ে পরবর্তী ব্যক্তিটি এসে হাত দুটি জোড় করে নমস্কার করলেন। মেদবহুল মধ্যপঞ্চাশ অবাঙালি। মাথায় কাজ-করা টুপি, কপালে তিলক।

বাসু প্রতিনমস্কার করে বললেন, বৈঠিয়ে বাজোরিয়া-সাব।

— আপনি হামাকে চিনেন?

— না, প্রত্যক্ষ চিনতাম না, নামটা শোনা ছিল।

— তব কৈসে মালুম হল কি হামিই আসিয়েছে?

— ও-ঘর থেকে আমার সেক্রেটারি আপনার নামটা ইন্টারকমে জানিয়েছেন বলে। যা হোক, আমাকে এখনি একটা জরুরি কাজে বের হতে হবে। আপনার যা বক্তব্য তা অতি সংক্ষেপে বললে আমার সুবিধা হয়।

বাজোরিয়া অতি সংক্ষেপে নিবেদন করলেন, তিনি বাসু-সাহেবকে তাঁর অ্যাটর্নি হিসাবে নিয়োগ করতে চান — প্রথমত তাঁর পার্টনারের হত্যা-মামলায়, দ্বিতীয়ত, নবনীতার বিষপ্রয়োগ কেস-এ।

বাসু জানালেন, হত্যা-মামলায় তিনি একজনের তরফে কেসটা গ্রহণ করেছেন, ফলে দ্বিতীয় ক্লায়েন্ট নিতে পারছেন না। নবনীতার কেসটা সম্বন্ধে এখনি তিনি কিছু সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। নবনীতার জ্ঞান ফিরে আসুক। তার জবানবন্দি শোনার পর উনি মনস্থির করবেন।

বাজোরিয়া বললেন, তব এক ইনকার কিজিয়ে। হমাকে জবান দিজিয়ে কি 'সোনালি স্বপন' রেস্তোরাঁর প্রেস্টিজ আপনি পাঞ্চার করিয়ে দিবেন না।

— রেস্তোরাঁর প্রেস্টিজ?

— মতলব, ঐ দুকানের নামে কোই কুছ বদনাম না করে। আপনি হমার অ্যাটর্নি না হতে পারেন, লেকিন দুকানের কৌন্সিলর হোতে পারেন। হামি আপনার ফিজ দিব।

বাসু বললেন, আপনি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন, মিস্টার বাজোরিয়া — দোকানের কাউন্সিলার আবার কী? দোকান কি আসামীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে পারে?

বাজোরিয়া জোড় হস্তে তাঁর বিচিত্র ভাষায় নিবেদন করেন যে, বাসুসাহেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি বিলক্ষণ প্রণিধান করেছেন কী উদ্দেশ্য নিয়ে বাজোরিয়া ওঁর দ্বারস্থ হয়েছেন। ইতিমধ্যে পুলিশে একবার দোকান রেইড করেছে। যদি সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে তল্লাসী করে তাহলে দোকানের বিলক্ষণ বদনাম হয়ে যাবে। জীবন ফৌত হয়েছে। এখন বাজোরিয়াই একক মালিক। জীবনের বিধবাকে — হ্যাঁ, দেশঘরে তার স্ত্রী আর নাবালকেরা আছে — বেশ কিছু অর্থদান করে বাজোরিয়া 'সোনালি স্বপন'-এর একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসতে চান। এর সঙ্গে হত্যা বা বিষ-প্রয়োগের কোনও সম্বন্ধ নেই। উনি ব্যারিস্টার বাসুকে সে কাজে নিয়োগ করতে চান।

বাসু বললেন, এসব হচ্ছে দেওয়ানী ব্যাপার। উনি এ জাতীয় কাজ করেন না, এজন্য অন্য একজাতের আইনজীবী...

বাধা দিয়ে বাজোরিয়া বলেন, হামি জানি বাসু-সাহেব। আপনি শুধু জবান দিন, হালদার হত্যা মামলায় 'সোনালি স্বপন'কে আপনি বেইজ্জৎ করবেন না। কী 'ফিজ' দেব হুকুম করেন।

বাসু বলেন, ওটাকে 'ফিজ' বলে না, মিস্টার বাজোরিয়া, বলে 'ঘুষ'! আপনি উঠুন, আমার কাছে কোনও সুবিধা হবে না।

— আপনি পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রিফিউজ করছেন?
— এই সহজ কথাটা বুঝতে এত সময় লাগছে আপনার?

পনের

ব্রিফকেস থেকে একগোছা লম্বাটে কাগজ বার করে বাসু-সাহেব রানু দেবীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এগুলো আলমারিতে তুলে রাখ তো।

সুজাতা এগিয়ে এসে বলে, মামিমা কেন কষ্ট করবেন, আমি তুলে রাখছি। দিন।

রানু ইতিমধ্যে কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে দেখেছেন। রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যান তিনি। বলেন, এগুলো তোমার কাছে এল কী করে? এ তো সেই দোকানের শেয়ার।

বাসু সুজাতার দিকে ফিরে বললেন, কাজটা যদি তোমাকে দিয়ে হত সুজাতা, তাহলে আমিই বা রানুকে কষ্ট দেব কেন? আমার ইচ্ছা ছিল ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে গোপন রাখা। কিন্তু রানু তা হতে দিল না।

রানু বলেন, সুজাতার কাছে গোপন করার কী আছে?

বাসু পাইপ আর পাউচের সন্ধানে পকেটে হাত চালিয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুঁজতে খুঁজতে বললেন, আইনজীবীর সহধর্মিণী হয়ে এটুকু তুমি বুঝতে পারলে না, রানু? তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, তাই তোমাকে বা আমাকে কেউ প্রশ্ন করলে আমরা জবাব নাও দিতে পরি, কিন্তু সুজাতাকে কাঠগড়ায় তুলে যদি প্রশ্ন করা হয় তখন ও স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

সুজাতা জানতে চায়, ওগুলো ওই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার? জয়া দেবীর অংশের শেয়ারগুলো?

বাসু ততক্ষণে পাইপটা ধরিয়েছেন। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির হলে যাদুগোপাল ওই শেয়ার গচ্ছিত রেখে জীবন হালদারের কাছ থেকে কর্জ করতে পারত না।

কৌশিক জানতে চায়, কেন?

— ছাপ্পান্ন সালের কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী। কারণ, প্রাইভেট কোম্পানির শেয়ার বোর্ড অফ ডিরেক্টার্সের অনুমতি ছাড়া কেনা-বেচা করা যায় না। ওই ফটোগ্রাফিক স্টোর্স বাস্তবে একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। তার চল্লিশ শতাংশ শেয়ার কাকলির আর সমপরিমাণ শেয়ার ছিল জয়ার। দশ শতাংশ ছিল স্বর্ণলতার, যা বর্তমানে ভৈরব হস্তগত করেছে। আর বাদবাকি দশ শতাংশ ওদের সাত-আটজন আত্মীয় বন্ধুর নামে। তা সে যাই হোক, মিসেস সেনের চল্লিশ শতাংশ শেয়ার যে আমার কাছে আছে এ-কথা তোমরা দু'জন গোপন রেখ। মানে, যতক্ষণ না কাঠগড়ায় উঠে হলফনামা নিচ্ছ।

কেউ কোন জবাব দেয় না।

বাসু আবার বলেন, কই বিশুটা কোথায় গেল? আজ বিকালে চা-টা পাওয়া যাবে না? আমাকে যে একবার বেরুতে হবে। সে অনেকক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিল।

* * *

কৌশিক গাড়িটা পার্ক করল গড়িয়াহাটা রোডে, সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোরসের কাছাকাছি। সুজাতা নামল গাড়ি থেকে। বাসু কৌশিককে বললেন, তাড়াহুড়ায় মনে ছিল না। তুমি একটু এগিয়ে কোনও দোকান থেকে একবার 'পান্থজনসখা হোটেলে' ফোন কর। রিসেপশনকে বল, মিসেস মীনাক্ষী মজুমদারকে লাইনটা দিতে। জয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হলে জানতে চাইবে এ বেলা সে কেমন আছে, আর ইতিমধ্যে সে কাকলিকে কোনো ফোন করেছে কিনা।

কৌশিক বলে, ফোনটা তো কাকলির দোকান থেকেও করা চলে মামু।

— হয় তো চলে, হয় তো চলে না। ঠিক জানি না। কাকলি ঘণ্টাখানেক আগে ওর দোকানে আসতে বলেছিল। তার এমন কিছু বক্তব্য ছিল যা টেলিফোনে বলার যোগ্য নয়। তাই আমি ও রিস্কটা নিতে চাই না। সেখানে ইতিমধ্যে কী পরিস্থিতি হয়েছে কিছুই তো জানি না।

কৌশিক ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল। ওঁরা দুজন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ফোটোগ্রাফিক স্টোরস-এ। কাউন্টারে বসেছিল সুপর্ণা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন স্যার, ফটো তোলাবেন তো?

ভিতরে একটা কাচের পার্টিশন দেওয়া ঘরে বসেছিল কাকলি। সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। সুপর্ণাকে বলল, না, ওঁরা আমার কাছে এসেছেন। আসুন স্যার।

সুপর্ণা সামলে নিল। হঠাৎ তার কৌতূহল যেন উথলে উঠল। খুঁটিয়ে দেখতে থাকে দুই আগন্তুককে।

কাকলি বাসু-সাহেবকে বলে, স্যার ও কোথায় আছে আপনি নিশ্চয় জানেন। আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চলুন।

বাসু দৃঢ়মুষ্টিতে কাকলির বাহুমূল চেপে ধরে বললেন, ব্যস্ত হয়ো না। চল, প্রথমে তোমার ঘরে গিয়ে বসি।

তিনজনে দোকানের মালিকের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে বসলেন। বড় কাচের দরজা বন্ধ হয়ে গেল ওঁদের পিছনে। ও-ঘর থেকে দোকানের বাকি অংশ, এমনকি গড়িয়াহাটা রোডও দেখা যায়। মেঝে থেকে মিটারখানেক কাঠের প্যানেল। উপর দিকটা স্বচ্ছ প্লেট-গ্লাস। বাসু জানতে চান, এ ঘরে কথাবার্তা বললে, তা বাইরে থেকে শোনা যায়? তোমার ক্যাশ-কাউন্টারের ওই মেয়েটি—

— কে? সুপর্ণা? না না, ও বিশ্বস্ত। তবে সব বিষয়েই ওর অতিরিক্ত কৌতূহল।

— বুঝলাম। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা কি ও শুনতে পাবে?

— না, না।

— তোমার সেই আগের কর্মচারী....কী নাম যেন—হ্যাঁ, স্বর্ণলতা বাসু — যার কাছ থেকে ভৈরব কিছু শেয়ার কিনেছে, তার সঙ্গে এই সুপর্ণার আলাপ আছে?

— হ্যাঁ, আছে বৈকি। কেন?

বাসু 'কেন'-র জবাব না দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করেন, আর ভৈরব দাশের সঙ্গে?

— হ্যাঁ, ভৈরব প্রায়ই এ দোকানে আসত। সুপর্ণা ওর প্রডাকশানে অভিনয় করতে ইচ্ছুক। তাই...

— বুঝেছি। শোন কাকলি তোমার দিদি কোথায় আছে তা আমি জানি। কিন্তু এখনি তোমাকে তার কাছে আমি নিয়ে যেতে চাই না। সে একটা হোটেলে ছদ্মনামে নিরাপদে আছে।

— কিন্তু কেন নিয়ে যেতে পারেন না?

— বুঝছ না? তুমি টের পাওনি, কিন্তু তুমি পুলিসের নজরবন্দি হয়ে আছ। শাদা পোশাকের পুলিস কোথায় বসে তোমাকে লক্ষ্য করছে তা না জান তুমি, না জানি আমি। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমি সেদিকে রওনা হওয়া মাত্র সে আমাদের অনুসরণ করবে। তোমার দিদিকে এখনি পুলিসি জেরার মুখে আমি ফেলতে চাই না। সে কিছুটা সামলে নিক।

হঠাৎ বাসুসাহেবের নজর হল একজন খদ্দের দোকানের সদর দরজা অতিক্রম করে সুপর্ণাকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে। তার পিছন পিছন কালো কোট পরা ছাতা-বগলে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

কাকলির ভ্রূকুঞ্চন হল। চাপা গলায় বললে, ওই লোকটা ভৈরব দাশ।

বাসু ততক্ষণে চিনেছেন। বললেন, জানি। ইতিপূর্বে মুলাকাৎ হয়েছে।

ভৈরব এগিয়ে আসে। কাকলির ঘরে কাচের দরজার ওপাশে দাঁড়ায়। শালীনতা রক্ষাকারী আনুষ্ঠানিক টোকা দিয়েই ঠেলে দরজাটা খোলে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকও বিনা আমন্ত্রণে ওর পিছন পিছন ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েন। ভৈরব একগাল হেসে বাসু-সাহেবকে বলে, সরি ফর দি ইন্টারাপশন।

তৎক্ষণাৎ পাশ ফিরে প্রৌঢ় বেঁটে লোকটিকে বলে, ইনিই।

প্রৌঢ় ছাতাটাকে নামিয়ে রাখে কাকলির টেবিলে। যন্ত্রচালিতের মতো কালো কোটের বাঁ-পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে। গড়গড় করে পড়ে যায়, মিস কাকলি দত্ত পিতা ঈশ্বর হরগোপাল দত্ত, সাকিন চুয়াত্তরের সাতের এক বি গড়িয়াহাট রোড। কলিকাতা সাত-শূন্য-শূন্য-শূন্য-এক-নয়, আপনাকে মেসার্স সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোর্সের বোর্ড অব ডাইরেক্টার্সের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিম্ন সীলমোহরাঙ্কিত আদালতের আদেশনামা মোতাবেক নোটিস জারি করা যাইতেছে যে...

সুজাতা বাকিটা শুনতে পেল না। তার মনে হল কাক্কেশ্বর কুচকুচে তার দুর্বোধ্য নোটিসটা পাঠ করে চলছে 'যথাবিহিত...কার্য ইত্যাদি, প্রভৃতি।' সে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে।

বাসু বললেন, নাও, কাকলি, আদালতের নোটিসটা সই করে নাও।

তারপর ভৈরবের দিকে ফিরে বলেন, ব্যাপারটা কী?

— মামুলী সিভিল সুট, স্যার। ওই যাকে বলে 'Complaint, summons, order to show cause, preliminary injunction and restraining order.'

বাসু বলেন, বুঝলাম। কিন্তু আপনার দাবীটা কী?

আদলতের প্রসেস-সার্ভার বাসু সাহেবকে বোঝাবার চেষ্টা করে, বাদী শ্রীভৈরব দাশ দাবী করেছেন, যে ঐ কোম্পানির কিছু শেয়ার, যার ওপর বাদীর নির্ব্যূঢ় অধিকার ও স্বত্ব বর্তমান, তা হয় নষ্ট অথবা অগ্নিদগ্ধ অথবা অপহৃত, কিংবা অনধিকারীর এক্তিয়ারভুক্ত হয়ে গেছে, যার ফলে আদালত এই রেস্ট্রেনিং ইনজাংশন মোতাবেক মিস কাকলি দত্তকে আদেশ জারি করছেন যে, ইতিমধ্যে নিম্নবর্ণিত শেয়ারগুলি...

ভৈরব মাঝপথে প্রৌঢ়কে ধমকে ওঠে, কী মায়ের কাছে মাসির গপ্পো শোনাচ্ছেন আপনি? উনি সবই বুঝেছেন। জানেন উনি কে? উনি একজন ব্যারিস্টার। তার মানে বোঝেন? বিলেতে পাশ উকিল। সারা ভারতে গুটিকতক টিকে আছে আজও।

এবার প্রসেস-সার্ভারই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বাসু বলেন, ঠিক আছে, কাকলি সই করে দিয়েছ তো? ব্যস! আর তোমার কিছু করণীয় নেই।

ভৈরব বলে, নাঃ! আর কী করণীয় থাকবে? শুধু কাল বেলা দুটোর সময় আদালতে হাজির হয়ে ওই নোটিসের জবাবদিহি করা ছাড়া। সে তো কাল।

এটা যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কাকলির কাছে তো বটেই এমনকি বাসু-সাহেবের কাছেও, এটুকু ভৈরব দাশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চাইল। তাই এবার বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে,, ব্যাপারটা অতি সরল। আসলে ওই চল্লিশ শতাংশ শেয়ারের মালিক আমি। ঘটনাচক্রে অরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলো খোয়া গেছে। ইতিমধ্যে সেগুলি কেউ যাতে উপস্থিত করে তার নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করাতে না পারে সে জন্যই এই অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন।

বাসু জানতে চাইলেন, আপনার হেপাজত থেকে শেয়ারগুলো খোয়া গেল কীভাবে?

— যে ভদ্রলোক আমার তরফে ওগুলো গচ্ছিত রেখেছিলেন তিনি গতকাল খুন হয়েছেন এবং তাঁর হেপাজত থেকে কে বা কারা শেয়ারগুলো অপহরণ করেছে।

বাসু জানতে চান, যিনি খুন হয়েছেন তিনি কি আপনার বকলমে ও শেয়ারগুলি ক্রয় করেছিলেন, নাকি আপনার ব্রোকার এজেন্ট?

ভৈরব বলে, নোটিসের কাগজগুলো পড়লেই টের পাবেন।

কাকলি বললে, মিস্টার দাশ, আপনি কি সর্বসমক্ষে স্বীকার করছেন যে, আমার ভগিনীপতিকে রেসে প্রলুব্ধ করতে আপনি ভাড়াটে টাউট নিযুক্ত করে...

ভৈরব বাধা দিয়ে বলে ওঠে, আপনার ভগিনীপতিকে প্রলুব্ধ করবার জন্য আমি কোনো ভাড়াটে টাউট নিযুক্ত করিনি ম্যাডাম। 'মদ-মাতাল' আর 'মন-মাতালে' ফারাক আছে জানেন তো? ঠিক তেমনি ফারাক আছ 'ধন-রেসুড়ে' আর 'মন-রেসুড়ে'র মধ্যে। যার টাকা আছে, রেস খেলে টাকা ওড়ায়, তাকে

বলে 'ধন-রেসুড়ে'। আর আপনার ব্রাদার-ইন-ল হচ্ছেন 'মন-রেসুড়ে' ক্লাসের। আপনমনে রেস খেলে চলেন, পকেটে টাকা থাক বা না থাক। তাতে দোষের কিছু নেই। ধরুন ত্রেতাযুগের যাদুগোপালের ভগ্নীর স্বামী cum ভাসুর-ঠাকুর। বউ-বাঁধা রেখে তিনি জুয়া খেলেছিলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা বলছি আর কি! তাহলে কলিযুগের যাদুগোপল বউ'এর পৈত্রিক সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে...

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ধমকে ওঠে কাকলি, মিস্টার দাশ! আপনার নোটিস-সার্ভিং তো শেষ হয়েছে। এবার আপনি বাইরে যান।

— না, না, কাজ আমার মেটেনি। আরও একজনের এখানে এসে পড়ার কথা। আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি। এখনি এসে যাবেন।

কাকলি গর্জে ওঠে, তার জন্যে আপনি সারা রাত অপেক্ষা করতে পারেন ; কিন্তু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। দোকানটা আমার...

ভৈরব আবার এ-কান-ও-কান হাসল। বলল, হিসাবে থোড়াসে গলতি হইয়ে গেল, মিসিবাবা। দুকান ঘরের টেন পার্সেন্ট ঠাঁই দখল করার হক হমার আছে। ব্যারিস্টার-সাবকে পুছ করে দেখুন। হামি এই এককোনায় খাড়া থাকব। টেন পার্সেন্ট এরিয়ায়।

এই সময় দরজার কাছে দেখা গেল কৌশিককে। সেও কাচের দরজায় যথারীতি টোকা দিয়ে ঢুকল। নিঃশব্দে বাসু-সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরল একটা ভাঁজ করা কাগজ। বাসু-সাহেব সেটা গ্রহণ করা মাত্র কৌশিক নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে। বাসু ভাঁজ খুলে কাগজটায় কী লেখা আছে পড়লেন : "মিসেস মীনাক্ষী মজুমদার আজ দুপুরে হোটেল থেকে চেক আউট করে চলে গেছেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে।"

বাসু-সাহেব ভাঁজ করা কাগজটা কাকলির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

কাকলি পড়ল। বুঝল। ভৈরবের উপস্থিতিতে নির্বাক রইল।

ভৈরব বলল, আমি রীয়ালি সরি ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনাদের অসুবিধায় ফেলছি জানি, তবু আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

— কার জন্যে? জানতে চাইলেন বাসু।

— সে এলেই টের পাবেন। ঐ বোধহয় এসে গেল।

সকলের দৃষ্টি আবার পড়ল সদর দরজার দিকে। কৌশিক ততক্ষণে চলে গেছে। প্রবেশ করছে ইন্সপেক্টর নিখিল দাশ, তার পাশে একজন মাঝবয়সী মহিলা। ববকাট চুল, চোখে চশমা, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। সুজাতা নিঃশব্দে তার হাতটা বাড়িয়ে দেয়। বাসু-সাহেবের হাতটা ধরে। ভৈরব স্বগতোক্তি করে, নাঃ এরা নয়। আমার লোক আসেনি। এখনি এসে পড়বে।

বাসু সাহেব সুজাতার কর্ণমূলে প্রশ্ন করেন, ক্যাশিয়ার?

সুজাতার চোখ দুটো একবার বুঁজে খুলে যায়। সম্মতিসূচক।

নিখিল কাচের দরজায় সৌজন্যমূলক টোকা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল না। দরজাটা খুলে ধরল। মহিলাটি প্রবেশ করলেন। পিছন পিছন ইন্সপেক্টার দাশ। বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে নিখিল বলল, আপনিও যে, স্যার, ঈশ্বরের মতো সর্বত্র বিরাজমান হয়ে উঠেছেন। যখন যেখানে যাই...

কথাটা তার শেষ হয় না। মধ্যবয়সী মহিলাটি হঠাৎ বলে ওঠেন, ওই তো সেই মেয়েটি। তার এই আকস্মিক ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, ইন্সপেক্টর দাশ তাকে আগেভাগে জানায়নি যে, এই ঘরে সেই মেয়েটির সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।

বাসুর মুঠোয় ধরা ছিল সুজাতার ঘামে-ভেজা হাত। তিনি মহিলাটিকে প্রতিপ্রশ্ন করেন, আপনি বলতে চান এই মেয়েটিই আপনার কাছে ট্রাভলার্স চেকটা ভাঙাতে চেয়েছিল?

ভদ্রমহিলা প্রত্যুত্তর করার আগেই নিখিল বাধা দেয় : সবার আগে আমি জানতে চাই সুকৌশলীর মিসেস্ সুজাতা মিত্র এ বিষয়ে কী বলেন?

বাসু বলেন, তার প্রয়োজন হবে না।

নিখিল দাশের ভ্রূকুঞ্চন হল। সে বেশ বিরক্ত। ভদ্রমহিলা এবার দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমি নিঃসন্দেহ। চিনতে ভুল হয়নি আমার। ঐ উনিই জয়া সেনের ট্রাভলার্স চেক ভাঙাতে এসেছিলেন।

বাসু বলেন, না, মা, মানুষ চিনতে ভুল হয়নি তোমার।

নিখিল দৃঢ়স্বরে বললে, মাপ করবেন বাসুসাহেব, আমি আবার বলছি—এ বিষয়ে মিসেস্ মিত্র কী বলতে চান তাই শুনবার জন্য অপেক্ষা করছি। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে আমি ওঁকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব।

এবারও সুজাতার হাতে চাপ দিলেন বাসু। সে নীরবই রইল। বাসুই জবাবে জানতে চান, কোন অপরাধে?

—জালিয়াতি এবং সইজাল।

বাসু বললেন, হঠকারিতা কর না, দাশ। সুজাতা 'সুকৌশলী'কে রিপ্রেজেন্ট করে। প্রাইভেট গোয়েন্দা হিসাবে ওর লাইসেন্স আছে।

নিখিল রুখে ওঠে, সেটা যাতে ক্যানসেল হয়ে যায়, তাও দেখব আমি।

বাসু আবার বললেন, তার আগে তুমি তোমাদের আইন পরামর্শদাতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিলে ভাল করতে, নিখিল। সুজাতা কোনো বেআইনি কাজ করেনি কিন্তু।

নিখিল দাশ বাসু-সাহেবের গুণগ্রাহী। 'ফ্যান'ই বলা চলে। কিন্তু এতক্ষণে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল, আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার শোভা পায় না। আপনি মস্ত ব্যারিস্টার। তবে পুলিসে চাকরি করতে কিছুটা আইন আমাকেও জানতে হয়েছে। তাতে আমি জানি যে, শ্রীমতী সুজাতা মিত্র যদি কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে একটা ট্রাভলার্স চেক ভাঙিয়ে টাকা নেন—যেটা এস. বি. আই. মিসেস জয়া সেনকে ইস্যু করেছে—এবং মিসেস মিত্র যদি সেই চেক-এ মিসেস জয়া সেনের সই জাল করেন তাহলে পেনাল-কোডের কোনো না কোনো একটা ধারা লঙ্ঘিত হয়।

বাসু শান্ত স্বরে বললেন, প্রথম কথা, সুজাতা ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে একটা নয়া পয়সাও নেয়নি। দ্বিতীয় কথা : সে ক্যাশিয়ারকে একবারও বলেনি যে, তার নাম জয়া সেন। সুজাতা ঐ ক্যাশিয়ার ভদ্রমহিলাকে শুধু বলেছিল যে, সে একটা হাজার টাকার ট্রাভলার্স চেক ভাঙাতে চায়। জেনে রাখ নিখিল : আর পাঁচটা 'চেক'-এর সঙ্গে ট্রাভলার্স চেক-এর কিছুটা পার্থক্য আছে। ডিমান্ড ড্রাফট-এর মতো এ-ক্ষেত্রেও আগে টাকাটা জমা দিতে হয়। অথচ ডিমান্ড-ড্রাফট্ সচরাচর যাকে ইচ্ছা হস্তান্তরিত করা যায় না, ট্রাভলার্স চেক যায়। যারা 'ট্রাভেল' করে তাদের সুবিধার জন্য এগুলি ইস্যু করা হয়।

—ট্রাভলার্স-চেক কাকে বলে তা আমাকে শেখাতে আসবেন না, স্যার। শুধু বলুন, আইনের কোন ধারায় বলে একজন অপর জনের সই জাল করে ট্রাভলার্স-চেক ভাঙাতে পারে।

বাসু ধীরেসুস্থে তাঁর কোটের ইনসাইড পকেট থেকে বার করলেন সেই চিরকুটখানা—যেখানা জয়া সেন তাঁকে লিখে দিয়েছিল।

নিখিল সেটা পড়ল। প্রথমটা তার মুখটা থমথমে হয়ে গেল। তারপর ধীরেধীরে তার মুখে একটা ক্রুর হাসি দেখা দিল। বলল, ঠিক আছে, স্যার। তবে ঢাক-ডুমাডুমের আগে একটু ভেবে দেখেছেন কি যে আপনি 'নরুনে'র বদলে আমার হাতে 'নাকটা' তুলে দিচ্ছেন?

—তার মানে?

—সুজাতা দেবীকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি নিজে জড়িয়ে পড়লেন।

—কী ভাবে?

—এই কাগজখানা বলছে: হয় এটা জাল, অথবা আজ আপনার সঙ্গে মিসেস জয়া সেনের সাক্ষাৎ হয়েছে। কারণ সইয়ের তলায় তারিখটা আজকের।

—হ্যাঁ, তা তো হয়েছেই। আজ সকালে। তাতে কী?

—য়্যু হ্যাভ-বিন এইডিং অ্যান্ড আবেটিং ইন দ্য কমিশন অব এ ফেলনি।

—হঠাৎ এ-কথার মানে ?

—এতে প্রমাণ হচ্ছে আপনি জেনেশুনে একজন আত্মগোপনকারী অপরাধীকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছেন।

—আমি তো জানি না মিসেস জয়া সেন কোন অপরাধ করেছেন!

—এখন তো জানলেন। আমি এখন আপনাকে জানাচ্ছি সে কথা। মিসেস সেন আত্মগোপন করে আছেন। পুলিস তাঁকে খুঁজছে। এবার বলুন : তিনি কোথায়?

—কিন্তু তার অপরাধটা কী?

—জীবন হালদারকে হত্যা করা।

—কিন্তু তুমি আজ দুপুরে আমাকে বললে না যে, জয়া সেন নয়, তার স্বামীকে হত্যাপরাধে খুঁজছে পুলিস!

—মিস্টার বাসু! আপনি ক্রমাগত কথা ঘোরাবেন না। আমার প্রশ্নের পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক জবাব দিন। জয়া সেন বর্তমানে কোথায়?

—পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক জবাব : আমি জানি না।

—এ কাগজখানা তিনি কোথায়, কখন আপনাকে দেন?

—পান্থজনসখা হোটেলে। আজ সকালে তিনি ওটা আমাকে দেন।

—ওখানে উনি স্বনামে হোটেলরুম ভাড়া নিয়েছেন?

—না, ছদ্মনামে। মীনাক্ষী মজুমদার নামে। আমারই পরামর্শে।

—আপনারই পরামর্শে?

—তাই তো বললাম।

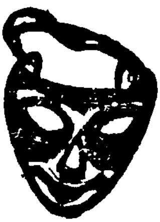

ষোলো

—আপনি স্বীকার করছেন যে, পুলিস মিসেস জয়া সেনকে হত্যাপরাধে খুঁজছে এই কথা জেনেও আপনি তাঁকে ছদ্মনামে কোনও হোটেলে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছেন?

—না, নিখিল, বরং তুমিই স্বীকার করছ না যে, তুমি আমাকে এসে বলেছিলে যে, মিসেস সেনকে নয়, তাঁর স্বামী যাদুগোপালকে পুলিশ হত্যাপরাধে খুঁজছে।

নিখিল আগুনঝড়া চোখে দশ-সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল বাসুসাহেবের দিকে। তারপর বললে, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি যে, আপনি কি কাল রাত্রে মিসেস সেনের গাড়িতে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন? আর আপনি তা অস্বীকার করলেন?

—না। কথোপকথন আমার পরিষ্কার মনে আছে। তুমি জিজ্ঞাসা করলে : 'আপনি কি জয়া সেনের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে নেমে এসেছিলেন? না হলে বাড়ি ফিরলেন কী করে? অত রাতে ট্যাকসি পেলেন?' আর আমি জবাবে বললাম, 'তুমি খেয়াল করনি, নিখিল, কৌশিক আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। একটু দুরে গাড়িটা পার্ক করেছিল, তাই তোমার নজরে পড়েনি।'

নিখিল গর্জে ওঠে, তারপর আমি জানতে চাইনি, 'আপনি জয়া সেনকে কোথাও নামিয়ে দেননি?' আর আপনি পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক বললেন : না।

—ইয়েস, তাই বলেছি আমি। আমি তো জয়াকে কোথাও নামিয়ে দিইনি। শুধু নিজের গাড়িতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমার নির্দেশে কৌশিকই মিসেস সেনকে ঐ হোটেলে পৌঁছে দেয়। ছদ্মনামে

হোটেলে উঠিয়ে দেয়।

— এটা সজ্ঞানে অপরাধীকে আড়াল করা নয়?

— আদৌ নয়। কারণ প্রথম কথা, তার আগে তুমি আমাকে জানাওনি যে, মিসেস জয়া সেনকে কোনও হত্যাপরাধে পুলিস খুঁজছে। দ্বিতীয় কথা, আমি একজন নাম-করা ডাক্তারের পরামর্শমতো আমার মক্কেলকে পুলিসের জেরার সম্মুখীন করতে চাইনি। তোমাকে আমি জানিয়ে রেখেছিলাম যে, মিসেস সেন আমার মক্কেল। তাঁর সম্বন্ধে তুমি আমার কাছে কিছু জানতে চাওনি।

— চাইনি? বারে বারে জানতে চাইনি, জয়া সেন কোথায়?

— না, চাওনি, নিখিল। তোমার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি। একবারও মিথ্যা কথা বলিনি। কিংবা একবারও বলিনি, আমি জবাব দেব না। তুমি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ।

নিখিল প্রতিটি শব্দ কেটে কেটে বললে, মিস্টার বাসু, এখন আবার আমি জানতে চাইছি : আপনার মক্কেল মিসেস জয়া সেন বর্তমানে কোথায়?

বাসুও প্রতিটি শব্দ কেটে কেটে বললেন, আমি যা জানি তা আমি তোমাকে বলেছি। এই দোকানে আধঘণ্টা আগে যখন আমি ঢুকি, তখন আমার ধারণা ছিল : মিসেস জয়া সেন 'পান্থজনসখা' হোটেলে মীনাক্ষী মজুমদারের ছদ্মনামে রয়েছেন। বর্তমানে তিনি কোথায় আছেন তা আমি জানি না।

ঠিক তখনই বাইরের দরজা দিয়ে একজন লোক দোকানে প্রবেশ করল। কাচের দরজাটা খুলে জানতে চাইল, মাপ করবেন, মিস্টার ভৈরব দাশ কি এখানে...ঐ তো আপনি...

ভৈরব তার হাত থেকে একগোছা কাগজ নিয়ে ছত্রধারী প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির হাতে দিল। তাকে বলল, ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর সঙ্গে ইতিপূর্বেই আপনার পরিচয় হয়েছে। আদালতের 'সমনটা' ওঁকে পড়ে শোনান।

প্রৌঢ় যথারীতি পাঠ করে গেলেন 'মিস্টার পি. কে. বাসু, বার অ্যাট-ল, পিতা ঈশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি, আপনাকে নিম্নবর্ণিত আদালতের নির্দেশনামা-মোতাবেক এই subpoena duces tecum হস্তান্তরিত করিয়া আদেশ জারি করিতেছি যে, আগামীকাল বেলা দুইটার সময় নির্ধারিত নিম্নবর্ণিত সিবিল সুট মামলায় — যাহা 'শ্রী ভৈরবচন্দ্র দাশ বনাম মেসার্স সুজাতা ফটোগ্রাফিক স্টোর্স' নামে চিহ্নিত — স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন। প্রকাশ থাকে যে, অত্র আদেশনামা মোতাবেক আপনি আপনার নিকট গচ্ছিৎ অথবা আপনার এক্তিয়ারভুক্ত, অথবা আপনার জ্ঞাতসারে লুক্কায়িত নিম্নবর্ণিত শেয়ারগুলি আদালতে উপস্থাপিত করিবেন। আরও প্রকাশ থাকে যে, এই শেয়ারসমূহ উক্ত কোম্পানি প্রথমে শ্রীমতী জয়া দত্তকে ইস্যু করে এবং পরে বিবাহান্তে তাহা শ্রীমতী জয়া সেনের নামে বিধিবদ্ধ ট্রান্সফার করা হয়।'

নিখিল দাশের মুখের হাসি ধীরে ধীরে আকর্ণবিস্তৃত হয়ে গেল। বলল, এবার আমরা সবাই ঐ অর্কেস্ট্রায় যোগ দিতে পারি : নরুনের বদলে নাক পেলাম টাক-ডুমাডুম-ডুম!

হঠাৎ টেবিলের ও-প্রান্তে গিয়ে নিখিল টেলিফোন রিসিভারটা ক্র্যাডল থেকে তুলে নিয়ে পর পর ছয়টা নাম্বার ডায়াল করল। ওপ্রান্ত সরব হতেই নিখিল বলল : হোমিসাইড-ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ বলছি, ডিউটিতে এখন কে আছে?...ও আচ্ছা, দাও তাকে...শোন, মুস্তাক, একটা জীপ নিয়ে এখনি চলে যাও সাউথ ক্যালকাটায় — আনোয়ার শাহ্ রোডের 'পান্থজনসখা' হোটেলে। সেটা চেন? টিভি স্টেশনের কাছাকাছি, স্টেট ব্যাঙ্ক... ও আচ্ছা, তুমি চেন! ভেরি গুড! হোটেলে মিসেস জয়া সেন আছেন। তাঁকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবে। উনি ওখানে ছদ্মনামে রেজিস্টার করে লুকিয়ে আছেন...মিসেস মীনাক্ষী মজুমদার নামে। গট ইট?...অ্যান্ড মেক ইট স্ন্যাপি—

টেলিফোনটা ধারক-যন্ত্রে নামিয়ে দিয়ে বলে, আচ্ছা চলি। উইশ য়ু অল বেস্ট অব ল্যাক!

দরজা খুলে বাইরে যাবার উপক্রম করতেই পিছন থেকে কাকলি ডেকে ওঠে ; ইন্সপেক্টর দাশ!

নিখিল ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, ইয়েস, ম্যাডাম—

— বিনা অনুমতিতে আমার টেলিফোনটা ব্যবহার করেছেন, এজন্য আমি কিছু মনে করিনি, কারণ বহু পুলিসের যে ভদ্রতা বা সৌজন্যজ্ঞান থাকে না এটা 'হে মোর দুর্ভাগা দেশে' স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু টেলিফোন কোম্পানি প্রতি 'কল'-এর জন্য আমার দোকানকে চার্জ করেন। আপনি একটা টাকা দিয়ে যাবেন।

নিখিল মানিব্যাগ খুলে একটা টাকা বার করল। কোন কথা বলল না। ঠং করে টাকাটা নামিয়ে দিল টেবিলে। কাকলি তার ব্যাগ খুলে টাকা ভরে রাখল। আর একটি দশ নয়া পয়সার মুদ্রা বার করে একই কায়দায় ঠং করে নামিয়ে দিল ভৈরব দাশের সামনে।

ভৈরব অবাক হয়ে বলে, এটার মানে?

— বুঝলেন না? আপনার দশ পার্সেন্টের হিস্যা! ওটা উঠিয়ে নিয়ে এবার বিদায় হোন!

ফোটোগ্রাফিক স্টোর্স থেকে বেরিয়ে এসে সুজাতা বলে, ইন্সপেক্টর দাশ কী করে আন্দাজ করল আমিই জয়া সেনের ট্রাভলার্স চেক ভাঙাচ্ছি?

বাসু বললেন, ছোকরা খুবই সেয়ানা। আমিই যে জয়াকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গেছি এটা ও আন্দাজ করেছে। তবে 'সওয়াল-জবাব' ব্যাপারটায় রপ্ত হতে পারেনি। তাই আমার চালাকিটা ধরতে পারেনি।

— কী চালাকি?

— ও বারে বারে জানতে চেয়েছে, 'জয়া সেন কোথায়,' আর আমি সরাসরি মিথ্যা কথা না বলেও ধানাই-পানাই জবাব দিয়ে ওকে বারে বারে বিপথে নিয়ে গেছি। বেচারি 'পান্থজনসখা'য় গিয়ে যখন দেখবে খাঁচা খালি—পাখি উড়ে গেছে, তখন আর একবার মনে মনে আমাকে গালমন্দ করবে।

— কিন্তু জয়া সেন কোথায়?

— নিশ্চয় সে আমার নির্দেশটা মানেনি। দু-চার জায়গায় ফোন করে যাদুগোপালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আর তখনই যাদুগোপাল শুরু করেছে তার নতুন রঙ্গের ভেল্কি। হোটেলে এসে জয়াকে নিয়ে আমার নাগালের বাইরে সরিয়ে ফেলেছে।

কৌশিক দূর থেকে ওঁদের দেখতে পেয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে। জানতে চায়, এখন কোথায় যাবেন?

— ব্যানার্জির নার্সিং হোমে। নবনীতার জ্ঞান হয়েছে কিনা জানতে।

নার্সিং হোমে যাওয়ার পথে বাসু বললেন, আমাকে নামিয়ে দিয়ে তোমরা গাড়িটা নিয়ে চলে যাও। 'পান্থজনসখা' থেকে ওরা দু'জন কোথায় যেতে পারে তার সন্ধান নেবার চেষ্টা কর। আমি দেখি, নবনীতার জ্ঞান হয়েছে কিনা। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব।

তারপর হঠাৎ কী ভেবে বললেন, না থাক। তোমরা আমাকে এখানেই নামিয়ে দিয়ে যাও। আমি ট্যাক্সি নিয়েই ডাক্তারের কাছে যাব।

কৌশিক জানতে চায়, হঠাৎ আপনার এই মতের পরিবর্তন?

— আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোরসের ধারে কাছে কোন প্লেন ড্রেস গোয়েন্দা পাহারায় আছেন ; পুলিসের লোক। অথবা ভৈরব দাশের। আমরা ওখান থেকে রওনা হয়েছি তো, সেও ঠিক আমাদের পিছন পিছন রওনা হয়েছে। পিছনের কোন গাড়িটায় সে আছে চেনা মুশকিল। সে জানতে চায় আমি এখান থেকে কোথায় যাচ্ছি। তুমি এক কাজ কর : বাঁদিকের লেনটা নাও। লাইন পেলেই নেক্সট ক্রসিংএ বাঁ-দিকে ঘুরে গাড়িটা দাঁড় করাবে। আমি টুক করে নেমে গেলেই তুমি স্টার্ট দেবে। যে লোকটা দু-তিনখানা গাড়ি পিছনে থেকে আমাদের ফলো করছে সে তোমাকেই ফলো করে চলে যাবে। টের পাবে না আমি নেমে গেছি। যখন পাবে তখন বোকা হবে। ও তোমাদের দু'জনকে ফলো করছে না।

কৌশিক গাড়ি চালানোর বিদ্যায় পারদর্শী। পরের মোড়ে বাঁক নিয়েই একটা স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো

মিনিবাসের সামনে গিয়ে দাঁড় করালো গাড়িটা। বাসু-সাহেব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গাড়ি থেকে নেমে উঠে বসলেন মিনিবাসে। বাসটা কোথায় যাচ্ছে না জেনেই। কৌশিক গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসালো।

বাসু-সাহেব দু-স্টপ গিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে পড়লেন। কারণ গন্তব্যস্থলের বিপরীত দিকে বাহিত হচ্ছিলেন তিনি। নেমেই একটি পাবলিক বুথ পেলেন। টেলিফোন করলেন সানি-সাইড নার্সিং হোমে। রিসেপশনিস্ট জানালো ডাক্তার ব্যানার্জি আছেন। অচিরেই যোগাযোগ হল।

বাসু জানতে চাইলেন, আমার রোগিণী কেমন আছে গো?

— এক নম্বর না দু নম্বর?

— না, না, পান্থজনসখার পেসেন্ট নয়, তোমর নার্সিং হোমে যে মেয়েটি আছে, নবনীতা?

— ভালই । কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। জেগে আছে এখন।

— মেয়েটি তোমার ওখান থেকে চুপিসাড়ে কেটে পড়তে পারবে না তো?

— অসম্ভব! এখানকার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র। তিন শিফটে পাহারার ব্যবস্থা।

— ঠিক আছে। আমি আধঘণ্টার মধ্যে নার্সিং হোমে পৌঁছে যাব। তখন নবনীতার সঙ্গে কথা বলা যাবে।

ডক্টর ব্যানার্জি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে ওঠেন, সরি, স্যার! পুলিসের ইন্সট্রাকশন আছে রোগিণীর জ্ঞান হলে সবার আগে তাদের খবর দিতে হবে। হোমিসাইডের আফিসার এসে সবার আগে ঐ নবনীতার সঙ্গে কথা বলবে।

বাসু-সাহেব বলেন, তা তুমি পুলিসকে জানিয়েছ যে, রোগিণীর জ্ঞান হয়েছে?

— না। রোগিণী যতক্ষণ নার্সিং হোমে আছে ততক্ষণ সে কখন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলবে সেটা নির্ধারণ করব আমি। নার্স আমাকে জানিয়েছে যে, নবনীতার ঘুম ভেঙেছে। এবার আমি তাকে পরীক্ষা করব। তারপর হোমিসাইড সেকশনকে জানানো হবে।

— কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে যে, আমরা ব্র্যাকেটে ফার্স্ট। দু পক্ষকেই একসঙ্গে জানানো হবে? তার কী?

— তাই তো হল। আপনাকে তো জানালাম রোগিণীর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

লাইন কেটে দিলেন ডক্টর ব্যানার্জি।

আধঘণ্টাখানেক পর ট্যাক্সি নিয়ে বাসুসাহেব এসে হাজির হলেন সানি-সাইড নার্সিং হোমে। ডাক্তার ব্যানার্জি ঘরেই ছিলেন। বাসু জানতে চাইলেন, নবনীতার জ্ঞান হয়েছে এ খবর হোমিসাইডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছ?

— হয়েছ। রোগিণীকে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। ওর পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে। একটু দুর্বল, হয়তো মাথার মধ্যে ঘুমের জড়তাটা সম্পূর্ণ কাটেনি। তবে প্রশ্নোত্তরের ক্ষমতা সে ইতিমধ্যেই লাভ করেছে। আমি ওকে একটু চিকেন অ্যাসপ্যারাগাস সুপ খাওয়াতে বলেছি। বোধহয় এখন সে তাই খাচ্ছে।

— পুলিসকে কতক্ষণ আগে জানানো হয়েছে?

— মিনিট-পাঁচেক। লালবাজার হোমিসাইডের ইন্সপেক্টর দাশকে।

— তার মানে আরও আধঘণ্টা সময় আছে। তার আগে আমি কি নবনীতার সঙ্গে একটু —

কথাটা শেষ করার সুযোগ পেলেন না। ডাক্তার ব্যানার্জি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, বাই নো মীনস্!

একটু ভেবে নিয়ে বাসু বলেন, তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। পুলিসের ইনস্ট্রাকশন তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। কিন্তু পুলিস ওকে জেরা করার আগে আমার যে নবনীতার কাছ থেকে দু-চারটে কথা জেনে নেওয়া দরকার!

ব্যানার্জি জবাব দিলেন না। একটা রিপোর্টের দিকে তীক্ষ্ণ অভিনিবেশসহ কী যেন দেখতে থাকেন।

বাসু আবার প্রশ্ন করে, এ নার্সিং হোমের ব্যবস্থাপনা আমার জানা নেই। তুমি সাজেস্ট কর। তোমাকে না ফাঁসিয়ে আমি কী ভাবে নবনীতার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

— আমাকে না জানিয়ে।

— সেটা কী ভাবে সম্ভব?

— তা আমি জানি না।

বলেই উনি কলিংবেল বাজালেন। একটি অল্পবয়সী নার্স এসে বললে, ডাকছিলেন, স্যার?

— হ্যাঁ, শোন, তুমি নবনীতার কেবিনে চলে যাও। দুশ তিন নম্বর কেবিনে। সন্ধ্যা এখন ও ঘরে ডিউটিতে আছে। তাকে বল, রোগিণীর রিপোর্টটা নিয়ে আমার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে।

—ইয়েস, স্যার। — দ্রুতপদে নার্সটি নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

ব্যানার্জি বলেন, সন্ধ্যার হেপাজতেই নবনীতা বর্তমানে আছে। সন্ধ্যা এখানে এলে আমি ওকে একটা প্রেসকৃপশন ধরিয়ে দেব। ও আমাদের ডিস্পেনসারি থেকে ওষুধটা বানিয়ে আনতে যাবে। তা মিনিট পনের লেগে যাবে। নবনীতা দোতলার তিন নম্বর কেবিনে একাই আছে। কিন্তু পুলিস এসে পড়ার আগে তার ঘরে কেউ যেতে পারবে না! এটা আমার স্ট্রিক্ট্ অর্ডার।

বাসু-সাহেব বলেন, বুঝলাম।

একটু পরেই নার্স সন্ধ্যা একটা চার্ট হাতে এসে উপস্থিত হল। ডাক্তার ব্যানার্জি তাকে দু একটা প্রশ্ন করলেন রোগিণীর সম্বন্ধে। টেম্পারেচার, ব্লাডপ্রেশারের রিপোর্ট দেখলেন। তারপর সন্ধ্যার হাতে প্রেসকৃপশনটা ধরিয়ে দিতে দিতে বাসু-সাহেবকে বললেন, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি, স্যার। পুলিসের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত মিস নবনীতা রায় কোনও ভিজিটরের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আপনি আসুন...

বাসু-সাহেব ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। একটু পরেই দেখতে পেলেন সন্ধ্যা ডিস্পেনসারির দিকে চলে গেল। উনি গুটিগুটি এগিয়ে এসে ঢুকে পড়লেন লিফটের গর্ভে।

দু মিনিট পরে বাসু উপস্থিত হলেন দু শো তিন নম্বর কেবিনের সামনে। পর্দা সরিয়ে দেখলেন, ঘরে রোগিণী ছাড়া আর কেউ নেই। নবনীতা আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে — পিঠে বালিশের ঠেকা। ওর সামনে বিছানার দু'দিকে দুটি করে পায়া রেখে বসানো আছে একটা হালকা অ্যালুমিনিয়ামের টেবিল। তার উপর চীনামাটির পাত্রে সূপ। নবনীতা একমনে সূপ খাচ্ছিল। বাসু-সাহেবকে দেখে হাসল। বলল, কখন আমাকে ছুটি দিচ্ছেন ডাক্তারবাবু?

বাসু বুঝতে পারেন ও ভুল করেছে। বাসু-সাহেবকে নার্সিং হোমের কোন ডাক্তার হিসাবে ধরে নিয়েছে। জবাবে উনি বললেন, তুমি একটু সুস্থ হলেই — এত তাড়া কিসের? হাতে-পায়ে আর একটু বল হোক। এখন ঘুমটা একেবারে ছুটে গেছে তো?

— বিলকুল!

— কাল সন্ধ্যার কথা সব মনে পড়ছে?

নবনীতা এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল। বলল, আপনি তো ডাক্তারবাবু নন।

— না, আমি এ নার্সিং হোমের ডাক্তার নই। আমার নাম পি. কে. বাসু—

— ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু?

— তা বলতে পার।

— ডাক্তারবাবু বলেছেন আপনিই আমাকে কাল উদ্ধার করেছিলেন—

— হ্যাঁ, কারণ তুমি আমাকেই ফোন করেছিলে।

— হ্যাঁ, তার কারণ আপনার সঙ্গে রাত সাড়ে নটায় আমার দেখা করার কথা ছিল। যখন বুঝলাম যে আমার পক্ষে সেটা হবে না তখন আপনাকে টেলিফোনে...

— কী করে বুঝলে যে, সাড়ে নটায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না?

— বাঃ তখন যে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে...

— আই সী! রাত তখন কটা হবে মনে হয়?

— রাত ঠিক আটটায় আপনাকে ফোন করেছিলাম।

— তুমি তোমার ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছ ক'টা নাগাদ?

— ধরুন সাড়ে সাত।

— আমি তোমার ঘরে যখন উপস্থিত হই তখন তুমি কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়েছিলে। টেলিফোন যন্ত্রটা মাটিতে নামানো। তোমার একপায়ে চটি ছিল, এক পায়ে ছিল না। তুমি কি টেবিলে বসে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে টেলিফোনসহ পড়ে গেছিলে?

— কী জানি স্যার, কিছু মনে নেই। এটুকু মনে আছে যে, আমার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঐ চকলেটের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মেশানো আছে। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। কোনক্রমে আমার ঠিকানাটা বলতে পেরেছিলাম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। বলেছিলাম, একজন ডাক্তার ডাকতে।

— ঠিক তাই। তুমি চকলেটগুলো কোথায় পেলে?

— একটা পলিথিনের ব্যাগে। কাকলি আমাকে পাঠিয়েছিল — ঐ চকলেটের প্যাকেট আর একটা শাদা ডায়েরি।

— কাকলিই যে পাঠিয়েছে তা বুঝলে কী করে?

— একটা চিরকুটে তাই লেখা ছিল।

— তুমি প্যাকেটটা পেলে কোথায়? কার কাছে?

— 'সোনালি স্বপন' রেস্তোরাঁয়। আমার নাম করে কেউ দিয়ে গিয়েছিল। দারোয়োনের হাতে। দারোয়ান কাউন্টারে জমা দেয়। দারোয়ানকে কে দিয়েছে তা আমি জানি না। তবে কাকলি আমাকে আগেই জানিয়েছিল যে, সে দোকানে ফিরেই আমাকে একটা শাদা ডায়েরি পাঠিয়ে দেবে। তার সঙ্গে এক প্যাকেট অত দামী চকলেটও যে পাঠাবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

— ওটা তোমার ভুল ধারণা নবনীতা, চকলেটের প্যাকেটটা কাকলি তোমাকে পাঠায়নি। অন্য কেউ পাঠিয়েছিল — যে তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল — কাকলির কোনও 'মোটিভ' নেই, কোনও উদ্দেশ্য নেই তোমাকে হত্যা করার! তাই নয়?

নবনীতার সূপ খাওয়া শেষ হয়েছে। বাসু-সাহেব সূপের বাটিটা খাটের নিচে নামিয়ে রাখলেন। অ্যালুমিনিয়ামের টেবিলটাও।

নবনীতা বললে, আপনি যখন বলছেন, তখন তাই। আর সে-কথাও সত্যি। কাকলি খামোকা আমাকে বিষ-মেশানো চকলেট খাওয়াতে চাইবে কেন? তার কী স্বার্থ?

বাসু সেকথার জবাব না দিয়ে বলেন, চকলেটগুলো তুমি কখন খেতে শুরু করেছিলে? সোনালী স্বপনে বসেই, নাকি বাসে আসতে আসতে?

— না, না, বাড়ি এসে তারপর আমি প্যাকেটের দড়িটা খুলে দেখি ওতে ডায়েরির সঙ্গে এক প্যাকেট চকলেটও আছে। তখনি খেতে শুরু করি।

— সে কী! তুমি সাড়ে সাতটায় বাড়িতে এসেছিলে, আর আমাকে ফোন করেছিলে রাত আটটায়। মাত্র আধঘণ্টায় ছ-ছটা পেপার কাপের অত বড় চকলেট খেয়ে ফেললে তুমি?

খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে নবনীতা। বলে, ছটা সন্দেশ বা ছটা রসগোল্লা খেতে আপনার কতক্ষণ সময় লাগে?

— ছটা মিষ্টি আমি একসঙ্গে খেতেই পারি না নীতা ; কিন্তু আমার কথা তো হচ্ছে না—

— ঠিক কথা! হচ্ছে আমার কথা! জানেন, এক সময় আমি চকলেট তৈরির কারখানায় কাজ করতাম। মালিকের সঙ্গে বা আমাদের সুপারভাইজারের সঙ্গে মন কষাকষি হলে আমি টপাটপ্ চকলেট খেয়ে শোধ তুলতাম।

বাসু বললেন, একটা কথা বুঝিয়ে বল তো নীতা। তুমি যখন আমাকে ফোন করতে করতে থেমে

গেলে তখন আমি একটা শব্দ শুনেছিলাম — চেয়ার থেকে কেউ উল্টে পড়ে গেল। সেটা নিশ্চয় তুমি। কারণ তোমাকে যখন আমি আবিষ্কার করি তখন তুমি কার্পেটের উপর লুটাচ্ছ। তোমার একপায়ে স্লিপার, অপর পায়ের চটিটা ছিট্‌কে দূরে পড়েছে। তোমার স্নানঘরে কলের জলটা পড়ে যাচ্ছে...

— হতে পারে। সবই হতে পারে। সে সময়ের কথা আমার কিছু মনে নেই।

— স্বাভাবিক। তুমি তখন ঘুমে ঢলে পড়ছ। কিন্তু একটা জিনিসের অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। তুমি উল্টে পড়ার পর তোমার হাত থেকে টেলিফোনটা নিশ্চয় ছিটকে পড়ে যায়। তাই সেটা ডেড হয়ে যায়। কিন্তু মিনিটখানেক পরে আবার আমি ডায়াল টোন শুনতে পেলাম। এটা কেমন করে হল?

নবনীতা সবিস্ময়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারছি না, স্যার!

— তোমার টেলিফোনে ডায়াল-টোন ফিরে আসা — যা আমি মিনিটখানেক পরে শুনতে পাই — তার একমাত্র অর্থ হতে পারে ; কেউ ওই টেলিফোনের জঙ্গম অংশটাকে তার স্থাবর ধারক অঙ্গে স্বস্থানে বসিয়ে দিয়েছিল। তুমি পড়ে যাবার মিনিটখানেক পরে। এটা কী করে হল?

— নবনীতা বলে, আপনি টানা একমিনিট আপনার যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে বসেছিলেন?

— হ্যাঁ, ছিলাম। আমি শুনতে চেয়েছিলাম কোনও কুকুরের ডাক, কোনও টিভির প্রোগ্রাম, কোনও মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ ওই মাটিতে পড়ে থাকা জঙ্গম অংশটার 'কথামুখ' থেকে ভেসে আসে কিনা। কারণ তোমার ঠিকানা আমার জানা ছিল না। একটা ক্লু খুঁজছিলাম। পুরো এক মিনিট।

নবনীতা নতমস্তকে কী যেন চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, কোনও 'ক্লু' পেলেন না?

— পেলাম তো! ওই 'ডায়াল-টোন'। তোমার টেলিফোন-নাম্বার জানা থাকলে আমি সেই নম্বর ডায়াল করে দেখতাম ডায়াল টোনটা রিঙিং টোনে পরিবর্তিত হয়ে যায় কি না।

নবনীতা বললে, ওতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমি ইয়েল-লক লাগানো ঘরের ভিতর কার্পেটের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি। এ নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল। যান্ত্রিক গোলযোগ। সে ক্ষেত্রে টেলিফোনটা কী করে স্বস্থানে ফিরে আসবে? অসম্ভব!

— তুমি নিজেই রাখনি তো?

— কী বলছেন! নিশ্চয় না!

— কী করে জানলে? তোমার তো সে সময়ের কোন কথাই মনে পড়ছে না। এমনকি চেয়ারে বসে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে তুমি যে পড়ে গিয়েছিলে সে কথাও তো তোমার মনে নেই। তাহলে, কী করে জানলে যে, তুমি নিজেই টেলিফোনটা ধারকযন্ত্রে বসিয়ে দাওনি?

নবনীতার ভ্রূকুটি হল। বললে, আপনি এমনভাবে জেরা করছেন যেন আমি কাঠগড়ায় উঠেছি। একটা লোক যদি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে তাহলে সেই অজ্ঞান অবস্থায় সে টেলিফোনটা স্বস্থানে বসাতে পারে? অবাস্তব কথা বলছেন কেন?

বাসু বললেন, কিন্তু একটা কথা, নীতা। আমরা যখন তোমাকে আবিষ্কার করি, তখন তালা খুলে ঘরে ঢুকে—

— তালা খুললেন কী ভাবে?

— বাড়িওয়ালার কাছে একটা ডুপলিকেট চাবি ছিল—

— হ্যাঁ, ঠিক কথা। ওটার কথা আমার মনেই ছিল না। যদি পথে-ঘাটে দরজার চাবিটা হারিয়ে ফেলি তাই ডুপলিকেট চাবিটা ওঁর কাছে রাখা ছিল বটে। আপনি ক'টার সময় আমাকে উদ্ধার করেন?

— পৌনে দশটায়। তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখি তুমি কার্পেটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা — টেলিফোনটা টেবিলে নয়। কার্পেটের উপর। আর টেলিফোনের রিসিভারটা

মাটিতে পড়ে নেই — সাবধানে ক্র্যাড্লের উপর বসানো। তার মানে, ঘণ্টাখানেক আগে আমি যে ডায়াল টোন শুনেছি তা ভুল নয়।

নবনীতা অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

তারপর অবাক হয়ে বলল, কিন্তু সেটা কী ভাবে হতে পারে? অজ্ঞান অবস্থায় আমি নিশ্চয় হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা ক্র্যাড্লের উপর স্বস্থানে বসিয়ে দিইনি। অথবা টেলিফোনটা টেবিল থেকে কার্পেটে নামাইনি।

— না, দাওনি। এটা থেকে প্রমাণ হয় যে, তুমি অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে উল্টে পড়ার পরে এবং আমি ও-ঘরে ঢোকার আগে, অর্থাৎ রাত আটটা বেজে দুই মিনিটের পরে এবং নয়টা পঁচিশের আগে কেউ-একজন তালা খুলে তোমার ঘরে ঢুকেছিল। খুব সম্ভব আটটা পাঁচের আগে, যে সময় আমি তোমার ডেড-টেলিফোনে আবার ডায়াল-টোন শুনতে পাই।

— এসব কী বলছেন আপনি?

বাসু-সাহেব এক নিঃশ্বাসে বলে চলেন, লোকটা হয়তো ঘরের ভিতরেই ছিল, ঠিক যখন তুমি পড়ে যাও।

— আজ্ঞে না। ঘরের ভিতর কেউ ছিল না। ইয়েক-লক লাগানো তালা-বন্ধ ঘরে আমি একাই ছিলাম।

— সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে লোকটা তোমার দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল। চেয়ারসমেত তোমার উল্টে পড়ার শব্দ পেয়ে সে ডুপলিকেট চাবি দিয়ে তালা খুলে ঢোকে। বাথরুমের কলটা বন্ধ করে না, তোমাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করে না, ডাক্তারকে বা পুলিসে ফোন করে না, বাতির সুইচটাও অফ করে দেয় না। শুধু, হাতে রুমাল জড়িয়ে টেলিফোনটা ক্র্যাড্লে যত্নে বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে যায়। যাবার সময় দরজাটা আবার টেনে লক করে দেয়।

নবনীতা রুখে ওঠে, এটা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব?

— না। শতকরা নিরানব্বই জনের পক্ষে অসম্ভব ; কিন্তু ওই ব্যতিক্রমটির পক্ষে সম্ভব।

— ব্যতিক্রম! ব্যতিক্রমটি আবার কে?

— যে তোমাকে বিষ-মেশানো চকলেট পাঠিয়েছিল। সে লোকটা যে কে, আমি তা জানি না, আন্দাজ করতেও পারি না। কিন্তু তুমি হয়তো আন্দাজ করতে পার : সে হয়তো তোমার চরম শত্রু। তোমার মৃত্যু কামনা করছে—

নবনীতা ধীরে ধীরে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

— বুঝলাম। এমন চরম শত্রুর কথা তুমি চিন্তাই করতে পারছ না। তাহলে আমাকে অন্যদিক থেকে প্রবলেমটা ট্যাক্‌ল করতে হবে। তোমার ডুপলিকেট চাবি ছিল বাড়িওয়ালার কাছে। তার পক্ষে কী এ কাজ সম্ভব?

নবনীতা অবাক হয়ে বলে, মেসোমশাই? তিনি আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ করেন।

— মেয়ের মতো। না পুত্রবধূর মতো? তাঁর কাছে তো তোমার পরিচয় মিসেস হালদার।

নবনীতা চমকে ওঠে। বলে, আপনি কেমন করে জানলেন?

বাসু বলেন, সে প্রশ্ন অবান্তর । কিন্তু মেসোমশাই কি 'ভাড়াটে উচ্ছেদ মানসে' ওই কাজটা করতে পারেন?

— বিষ-মেশানো চকলেট পাঠানো?

— না। তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার মিনিটখানেক পরে ঘরে ঢোকা? তোমাকে মরণোন্মুখ দেখে আশ্বস্ত হয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়া?

— আমি স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করতাম না। মেসোমশাই দেবতুল্য মানুষ।

— সে ক্ষেত্রে ওই বাড়ির কোন যুবক? বাড়িওয়ালার ছেলে, ভাইপো, ভাগ্নে, জামাই, বাড়ির

চাকর? যে তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল?

— না, না। এসব আপনার উদ্ভট কল্পনা।

— তাহলে এবার ট্রিপলিকেট চাবির প্রসঙ্গে আসতে হয়।

— ট্রিপলিকেট চাবি! মানে?

— জীবন হালদারের কাছে নিশ্চয় এ-ঘরের ট্রিপলিকেট চাবিটা আছে। মানে, সে সময়ে ছিল।

— না নেই। সে আজ মাসখানেকের ভিতর এ বাড়িতে আসেনি। আমার সঙ্গে তার দেখাই হয় না।

— তাহলে ট্রিপলিকেট চাবিটা কার কাছে আছে?

— তিন নম্বর চাবি যে আছেই এটা ধরে নিচ্ছেন কেন?

— যেহেতু এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পর — সম্ভবত আটটা তিন বা চার মিনিটে — কেউ একজন তালা খুলে ঘরে ঢুকেছিল—

— সেটাই আপনার ভুল ধারণা। ট্রিপলিকেট চাবি নেই। কারও কাছেই নেই।

— বেশ। সে ক্ষেত্রে আমাকে বুঝিয়ে বল, কীভাবে তোমার হাত থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে যাওয়া টেলিফোনের মাউথ-কাম-ইয়ার পীসটা ওই রিসিভারযন্ত্রের স্বস্থানে ফিরে গেল?

নীতা ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে দু-হাতে রগদুটো চেপে ধরে। বলে, মাফ করবেন স্যার। আমি এখনো বেশ দুর্বল। বেশি কথা বলতে, চিন্তা করতে কষ্ট হচ্ছে আমার।

বাসু ঘড়ি দেখলেন। চট করে উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, অলরাইট, প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি থাক। দুর্বলতাটা কমে গেলে তুমি বরং এ প্রশ্নের সমাধানটা ভেবে বার করার চেষ্টা কর। আর পুলিসের কাছে কী জবানবন্দি দেবে, কতটা স্বীকার করবে সেটাও ভেবে রেখ।

নীতা জবাব দিল না। বাসু দরজার কাছ থেকে আবার বললেন, আর একটা কথা : তোমার জ্ঞান হবার পর তোমাতে-আমাতে যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে এ কথা কাউকে বল না।

নীতা জানতে চায়, কেন?

— তাহলে এ নার্সিং হোমের ডাক্তারবাবুর ক্ষতি হবে। আমি লুকিয়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করেছি।

হঠাৎ কী যেন খেয়াল হয় নবনীতার। সে চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে বলে : তাই তো। এটা তো একটা কেবিন। নার্সিং-হোম। সে কী! আমার তো যে কোন সরকারি হাসপাতালের ফিমেল-ওয়ার্ডে জ্ঞান হবার কথা।

— তাই হত। আমিই তোমাকে এই নার্সিংহোমে নিয়ে এসেছি।

— সে কী! খরচ দেবে কে? আমি তো...

— সে চিন্তা করতে হবে না। খরচ আমার...

— কিন্তু কেন? আপনিই বা অপরিচিত মানুষের জন্য এত টাকা খরচ করবেন কেন?

— তার আগে তুমি বল, কলকাতা শহরে এত এত টেলিফোনওয়ালা পরিচিত লোক থাকতে জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে তুমি এই অপরিচিত আমাকেই বা ফোন করেছিলে কেন?

নীতা একটু বিহ্বল হয়ে পড়ে। বলে, আমি এতটা আশা করিনি। আপনি আমার জীবনদাতা। আমি কৃতজ্ঞ।

বাসু বললেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিস এসে তোমাকে জেরা করবে। আমি চলি। দুটো কথা আপাতত মনে রেখ। এক নম্বর, তোমাতে-আমাতে কখনো দেখা হয়নি। দুনম্বর, চকলেটগুলো কাকলি তোমাকে পাঠায়নি। ও. কে.?

নীতা স্বীকার করে গ্রীবা সঞ্চালন করল।

সতের

নকিব বিচারকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, হুজুর এবার সেই কেসটা। বিচারক দত্তগুপ্তের তা স্মরণ আছে। ওঁর এজলাসে সচরাচর ব্যারিস্টারদের আবির্ভাব ঘটে না। নুন-রিসেস-এর পরে এজলাসে প্রবেশ করেই তাঁর লক্ষ্য হয়েছে ; বাঁ দিকের কোনায় জুনিয়ারকে নিয়ে বসে আছেন পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল।

দত্তগুপ্ত আদালতের উপর নজর বুলিয়ে বললেন : অর্ডার, অর্ডার।

এজলাসের কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। দত্তগুপ্ত বললেন, আফটারনুন সেশনের প্রথম মামলা: ভৈরব দাশ বনাম সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোরস — অর্ডার টু শো কজ এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা। সলিল সেন অব 'সেন অ্যান্ড রয়' আছেন বাদীর পক্ষে আর পি. কে. বাসু প্রতিবাদীর তরফে।

সলিল সেন, একজন মাঝবয়সী অ্যাডভোকেট, সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন : বাদী প্রস্তুত হুজুর।

বাসুসাহেব হাত তুলে বললেন : প্রতিবাদী পক্ষও প্রস্তুত।

সলিল সেন অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বাসুসাহেবকে বললে, মানে? ইয়ে...আপনি বলতে চান শো কজ মামলা'য় আপনি টাইম চাইছেন না?

—ঠিক তাই। — বসে বসেই জবাব দিলেন বাসু।

বিচারকও বিস্মিত। বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে অত্যন্ত কম সময় দেওয়া হয়েছে। বস্তুত চব্বিশ ঘণ্টাও নয়। এক্ষেত্রে আপনি সময় চাইতে পারেন—

বাসু হেসে বললেন, থ্যাঙ্কু। আমি জানি ; কিন্তু আমি প্রস্তুত।

সলিল সেনকে উঠে দাঁড়াতে হল আবার, হুজুর, বাদীপক্ষ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এত অল্পসময়ের ব্যবধানে নোটিস দিলে প্রতিবাদীপক্ষ 'টাইম' চান, তা দেওয়াও হয় — এ একরকম রুটিন। তাই আমরা আশা করেছিলাম...

করুণভাবে তিনি বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন, বাসু-সাহেব নিমীলিত নেত্রে একটি 'জনসন-বাড' তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে কানের খোল নিষ্কাশনে ব্যস্ত। বিচারকও তাঁকে দেখলেন। একটু বিরক্ত হয়েই সেনকে বললেন, রুটিনমাফিক যা হয় তার ব্যতিক্রমও থাকে। এই সময়টা ধার্য করা হয়েছে বাদীপক্ষের আবেদন অনুসারে। ফলে শুধুমাত্র প্রতিবাদীই সময় চাইতে পারেন। বাদীপক্ষের সে অধিকার নেই। সো, প্লীজ প্রসীড।

তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, আপনি কি বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কাউন্টার-এফিডেভিট ফাইল করেছেন?

— নো, য়োর অনার, আমার সে সময় ছিল না...

— কিন্তু সময় তো আপনি চাইলেই পেতে পারেন। এখনো পারেন।

— আজ্ঞে এ-কথা আপনি ইতিপূর্বেও বলেছেন। সময়াভাবে আমি কাউন্টার-এফিডেভিট দাখিল করে উঠতে পারিনি; কিন্তু সে জন্য আমি 'কন্টিনুয়েন্স'ও প্রার্থনা করব না, যদি না প্রতিযোগী 'রেস্ট্রেনিং-অর্ডার ভেকেট' করার আবেদনে আপত্তি না জানান।

সলিল সেন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

জজ-সাহেব তাঁকে বলেন, বুঝেছি, বসুন মিস্টার সেন। ভেরি ওয়েল মিস্টার বাসু, আপনি সওয়াল-জবাব শুরু করতে পারেন।

বাসু বললেন, আমি প্রথমে আহ্বান করতে চাই বাদী শ্রী ভৈরব দাশকে।

ভৈরব রীতিমতো সেজেগুজে এসেছিল। যেন সে হালখাতার নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছে। অথবা পাকা দেখার। গলার সোনার হার, পরিধানে ধাক্কা-দেওয়া কোঁচানো বাহান্ন ইঞ্চি কস্তাপাড় ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে চুড়িদার কাজ করা সিল্কের পাঞ্জাবি, চোখে রীমলেস রোল্ডগোল্ড চশমা। হাতে হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা

সৌখিন ছড়ি। সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে ডান হাত তুলে সে গীতাস্পর্শ করে শপথবাক্য পাঠ করল।

— আপনিই এ মামলার বাদী শ্রী ভৈরব দাশ?

আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় সলিল সেন। বলে, জাস্ট এ মোমেন্ট, ধর্মাবতার। সওয়াল-জবাব শুরু হওয়ার পূর্বে আমি জানতে চাই, প্রতিবাদী পক্ষের কাউন্সেলার মিস্টার পি. কে. বাসু আদালতের আদেশ-মোতাবেক সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোরসের কোন শেয়ারের স্টক্-সার্টিফিকেটের গোছা নিয়ে এসেছেন কি না।

বিচারককে প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে বাসু-সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ইয়েস, য়োর অনার। subpoena duces tecum-এর নির্দেশ মোতাবেক আমি শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি নিয়ে এসেছি।

— শ্রীমতী জয়া সেন, 'নে' জয়া দত্তের নামে ইস্যু করা স্টক-সার্টিফিকেট? — সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চায় সলিল।

বাসু বলেন, এক্জ্যাক্টলি।

জজ-সাহেব কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে তাকিয়ে থাকেন।

এই সময় দর্শকের সারির পিছনের আসন থেকে একজন নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে যায়।

বোঝা গেল, সে প্লেন-ড্রেস পুলিস।

সাক্ষীর মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বাসু বলেন, আপনি বেশ কিছু দিন ধরেই 'সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোরস্'-এর শেয়ার কেনার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, তাই না?

— হ্যাঁ। তাই।

— দিন পনের আগে ওই কোম্পানির দশ শতাংশ শেয়ার আপনি শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। তাই নয়?

— হ্যাঁ। তাই।

— আপনি আরও জানতেন যে, কোনক্রমে ওই চল্লিশ শতাংশ শেয়ারের মালিক শ্রীমতী জয়া সেন, কুমারী জীবনে যিনি ছিলেন জয়া দত্ত—

— হ্যাঁ, জানতাম।

— অত তাড়াহুড়া করবেন না মিস্টার দাশ। প্রশ্নটা আমাকে শেষ করতে দিন। আপনি আরও জানতেন যে, কোনক্রমে ওই চল্লিশ শতাংশ শেয়ার ক্রয় করতে পারলে আপনিই হয়ে যাবেন সর্বাধিক শেয়ার-হোল্ডার?

ভৈরব এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য রুমাল বার করে তার রীমলেস চশমার কাচটা মুছে নিল। বলল, লুক হিয়ার, মিস্টার বাসু। সময়ের দাম আপনারও আছে, মহামান্য আদালতেরও আছে। আমি আপনার সওয়াল-জবাবটা এভাবে সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছি : আমি একজন বিজ্‌নেসম্যান, আমি লক্ষ্য করে দেখলাম মাত্র দুটি শেয়ার-হোল্ডারের কাছ থেকে তাদের যাবতীয় শেয়ার-সার্টিফিকেটগুলি ক্রয় করে নিলে 'সুজাতা ফোটোগ্রাফিক স্টোর্স'-এর পরিচালনা আমার কব্জায় এসে যাবে। দোকানটা থেকে ইদানীং দারুণ লাভ হচ্ছে। তাই আমি শ্রীমতী স্বর্ণলতার দশ পার্সেন্ট শেয়ার খরিদ করার পরেই উদ্যোগ নিলাম শ্রীমতী জয়া সেনের শেয়ারগুলি কিনে নিতে। কিন্তু মিসেস সেন আমাকে সরাসরি শেয়ার বেচতে রাজি হবেন এমন আশা আমার ছিল না। তাই প্রয়াত জীবন হালদারের দ্বারস্থ হলাম, তাকে বললাম, সে যদি কোনক্রমে ওই শেয়ার-সার্টিফিকেটগুলি হস্তগত করতে পারে তাহলে আমি ভাল মার্জিনে তা ওর কাছ থেকে কিনে নেব।

— জীবন হালদার একজন পাক্কা জুয়াড়ি একথা আপনি জানতেন?

— আই ডোন্ট নো, অ্যান্ড আই ডোন্ট কেয়ার। আমি তাকে বলেছিলাম, শেয়ারগুলো আমার হাতে তুলে দিতে পারলে আমি তাকে ভাল দাম দেব। জীবন হালদার সেই মোতাবেক শেয়ারগুলো সংগ্রহ করে এবং আমাকে জানায় যে, সেগুলো তার হেপাজতে আছে। আমি এখন এসে তা সংগ্রহ করতে

পারি।

বাসু হঠাৎ আধপাক ঘুরে কোর্ট রিপোর্টারকে বলে ওঠেন, আপনি সাক্ষীর জবাবটা একবার পড়ে শোনান তো।

কোর্ট-রিপোর্টার ওঁর অনুরোধমতো জবাবটা পড়ে শোনাল।

ভৈরব তাড়াতাড়ি সংশোধন করে বলে, তার প্রকৃত অর্থ হল আমি জীবন হালদারকে আমার বকলমে শেয়ার-সার্টিফিকেটগুলি সংগ্রহ করতে নিযুক্ত করেছিলাম।

বাসু হেসে বলেন, না, মিস্টার দাশ — আপনার প্রথম উক্তির প্রকৃত অর্থ আপনার দ্বিতীয় উক্তিটি নয়। আপনি ভেবেচিন্তে ঠিকমতো জবাব দিন : আপনি কি জীবনকে বলেছিলেন যে, সে ওই শেয়ারগুলি সংগ্রহ করতে পারলে আপনি ভাল দামে তা কিনতে রাজি, যা আপনি প্রথম দফায় বলেছেন, অথবা আপনি জীবনকে আপনার বকলমে ওই শেয়ারগুলি যে কোন দামে কিনতে বলেছিলেন? যা আপনার দ্বিতীয় দফার উক্তি।

অ্যাডভোকেট সলিল সেন উঠে দাঁড়ায় : অবজেকশন য়োর অনার। ইনকম্পিটেন্ট, ইররেলিভেন্ট অ্যান্ড ইম্মেটিরিয়াল। এ প্রশ্ন যেন তৈলটি পাত্রাধার, না পাত্রটি তৈলাধার—এ যেন ন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার হচ্ছে।

বাসু সহাস্যে বললেন, আজ্ঞে না। এই প্রশ্নটি তুলাদণ্ডের ফালক্রামের মধ্যবিন্দুর কাঁটা। আপনার মক্কেল স্বচ্ছন্দে গাছে চড়ে ফল পেড়ে খেতে পারেন। তাহলে কাঠপিঁপড়ের দংশনও তাঁকে সহ্য করতে হবে। অথবা তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে ঝড়ে-পড়া আমগুলি সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কাঠপিঁপড়ের কামড় তাঁকে সহ্য করতে হবে না। কিন্তু গাছের পাকা ফলটির দিকে হাত বাড়ানোও চলবে না। গাছেরও খাব, তলারও কুড়াব—তা চলবে না। সহজ ভাষায় : বাদী যদি জীবন হালদারকে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করে থাকেন এবং জীবনকে শেয়ারের দাম না মিটিয়ে থাকেন তাহলে এ মামলা আদপেই দাঁড়ায় না। খোয়া-যাওয়া শেয়ারগুলি সেক্ষেত্রে জীবন হালদারের ওয়ারিশের সম্পত্তি। অপরপক্ষে বাদী যদি বলেন যে, জীবন হালদার ওঁর 'বকলমে' শেয়ারগুলি সংগ্রহ করেছে তাহলে জীবনকৃত প্রতিটি অপরাধের ভাগিদার তাঁকে হতে হবে। জীবন যদি জুয়াচুরি করে, লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন করে ওই শেয়ারগুলি ভৈরব দাশের 'বকলম' হিসাবে সংগ্রহ করে থাকে, তাহলে ভৈরব দাশকে সে অপরাধের শাস্তি পেতে হবে।

সলিল বিচারকের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে দেখল।

বিচারক বললেন, মিস্টার বাসু যা বললেন সেটাই আইন।

সলিল কিছু বলার আগেই ভৈরব বলে ওঠে, য়োর অনার। আমি মিস্টার বাসুর প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত। আজ্ঞে হ্যাঁ, জীবন হালদারকে আমি আমার 'বকলমে' শেয়ার-সার্টিফিকেটগুলি সংগ্রহ করতে বলেছিলাম। অপহৃত শেয়ার সার্টিফিকেটের মালিক আমি, বাদী ভৈরব দাশ।

— তার মানে এ মামলা চলাকালে যদি প্রমাণিত হয় যে, জীবন হালদার ঐ শেয়ারগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু বেআইনি শাস্তিযোগ্য কাজ করেছে তাহলে জীবনের জীবনাবসানে বর্তমানে আপনি তার হয়ে সেই শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করতে প্রস্তুত?

ভৈরব দাশ রুখে ওঠে, নিশ্চয় নয়। দোষ করল জীবন হালদার, আর জেল খেটে মরব আমি?

একগাল হেসে বাসু বললেন, এক্‌জ্যাক্টলি। তাই খাটতে হবে। ঐ কোঁচানো ধুতি ছেড়ে, ডোরাকাটা হাফপ্যান্ট পরে। গলায় ঐ সোনার হার খুলে নম্বরী তক্তি ঝুলিয়ে — মানে যদি সশ্রম হয়!

বিচারক হঠাৎ বলে ওঠেন, মিস্টার সেন, আপনি আপনার মক্কেলকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন। আমি পাঁচ মিনিটের জন্য কোর্ট-এ রিসেস ঘোষণা করতে পারি। ভৈরব দাশ যদি দাবী করেন যে, মৃত জীবন হালদার ছিল একজন শেয়ারের দালাল, হালদারকে তিনি ঐ শেয়ার ক্রয় করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন মাত্র, তাহলে তাঁর বর্তমান মামলার দাবী আদপেই টেকে না। অপরপক্ষে হালদার যদি ওঁর বকলমে

লীগ্যাল এজেন্ট হিসেবে ঐ শেয়ারগুলি সংগ্রহ করে থাকে তবে হালদারের প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য বাদীকে দায়ী হতে হবে।

সলিল সেন এবার নিজেই জানতে চায়, জীবন হালদার যদি আমার মক্কেলকে না জানিয়ে কোন অন্যায় করে থাকে...

তাকে মাঝপথে বাধা দিয়ে বিচারক বলেন, নিশ্চয়ই। ঐ শেয়ারগুলি সংগ্রহ করতে জীবন হালদার যা যা করেছে, তার জন্য দায়ী আপনার মক্কেল। কারণ সে ওঁর 'বকলম'-এ কাজটা করেছে। জীবন হালদার সাফল্যলাভ করলে যেহেতু আপনার মক্কেলের লাভ, জীবন হালদার অন্যায় করলে সেই হেতু আপনার মক্কেল দায়ী। শুধুমাত্র যদি আপনার মক্কেল দাবী করেন যে, জীবন ওঁর 'বকলম'-এ কাজটা করেছে—

ভৈরব দাশ রুখে ওঠে, য়োর অনার। এজন্য আদালত স্থগিত রাখার কোন হেতু নেই। আমাকে কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। জীবন হালদার আমার লীগাল এজেন্ট। আমার 'বকলম'-এ সে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হোল্ডার হিসাবে ঐ শেয়ারগুলি সংগ্রহ করেছিল।

বাসু নতুন উৎসাহে শুরু করেন, অল রাইট। আপনার 'বকলম'-এ কাজ করার জন্য আপনি জীবন হালদারকে কত টাকা দিয়েছেন?

— টাকা? না টাকা কিছু দিইনি।

— বিনা আর্থিক লেনদেনে সে রাজি হয়ে গেল?

— টাকা সে পেত। সে জানত যে টাকা পাবে। তাতেই রাজি হয়েছিল।

— কত টাকা? শেয়ার ভ্যালুর কত পার্সেন্ট?

— না, পার্সেন্টেজের কথা কিছু স্থির হয়নি।

— কোনও এগ্রিমেন্ট হয়েছিল কি আপনার সঙ্গে? পাওয়ার-অব-অ্যাটর্নি-হোল্ডার জীবন হালদারের?

— না।

— এ যে "নটী বিনোদিনী"-র পালাগান শুরু হয়ে গেল দাশ মশাই। গিরিশ ঘোষের 'বকলম'-এ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গলায় ক্যানসার রোগের যন্ত্রণাটা সইছেন।

সলিল আপত্তি জানায়, অবজেকশন! দ্য কোশ্চেন ইজ ইররেলিভ্যাণ্ট, ইম্মেটিরিয়াল—

বিচারক কিছু বলার পূর্বেই বাসু বলে ওঠেন, প্রশ্ন আমি কিছু করিনি। করেছি একটা স্টেটমেন্ট। প্রশ্নটা বরং সহযোগীকেই করি, তিনি কি জীবনে এমন কোন অলিখিত পাওয়ার-অফ-আটর্নির কথা শুনেছেন?

বিচারক বাধা দিয়ে বলেন, কাউন্সেলদের মধ্যে এ জাতীয় বাদানুবাদ আদালত অনুমোদন করেন না। আপনাদের যা বক্তব্য তা সরাসরি আদালতকে জানাবেন। য়ু মে প্রসীড মিস্টার বাসু।

বাসু ভৈরবের কাছে জানতে চান, জীবন হালদারের সঙ্গে কে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল?

— তা আমার মনে নেই। জীবন হালদারকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি।

— তা তো হতেই পারে—রতনে তো রতনকে চিনবেই। কিন্তু জীবন হালদার যে জয়া সেনের শেয়ারের বান্ডিল বিশেষ কায়দায় আপনাকে কিনে দিতে পারবে এ ধারণাটা আপনার হল কোন সূত্রে?

সলিল আবার আপত্তি তোলে। এ প্রশ্ন অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক।

বাসু বলেন, ইফ দ্য কোর্ট প্লীজেস, আমি এ প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি রাখছি। আদলতের সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। তাই এ প্রশ্ন মুলতুবি রেখে আমি পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে চাই। যদি সেই পরবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, আমার ঐ মুলতুবি প্রশ্নটি অবান্তরও নয়, অপ্রাসঙ্গিকও নয়, তখন আবার আমি শ্রী ভৈরব দাশকে তাঁর বাকি সাক্ষ্য দিতে ডাকব। আপনি দয়া করে মঞ্চ থেকে নেমে আসুন মিস্টার ভৈরব দাশ। আমার পরবর্তী সাক্ষী মিস্টার রাকেশ বাজোরিয়া।

আদালতের সমন পেয়ে 'সোনালি স্বপন'-এর কর্ণধার রাকেশ বাজোরিয়া ব্যাজারমুখে উপস্থিত ছিলেন পাশের ঘরে। এদিকে তাঁর নাম ঘোষণা করায় তাঁকে আসতে হল। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রাকেশের সম্যক পরিচয় দিয়ে বাসুসাহেব প্রশ্ন করেন, আপনি আর জীবন হালদার কতদিন হল পার্টনারশিপে এ 'সোনালি স্বপন' রেস্তোরাঁ-কাম-বার খুলে বসেছেন?

— তা সাড়ে চার বছর হবে হুজুর।

— আমি শুনেছি আপনি স্লিপিং পার্টনার — টাকার যোগাড় দিয়েই খালাস, আর লাভের হিস্যা নিয়ে। অর্থাৎ দোকানের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দিকটা জীবন হালদারই দেখতেন। এ কথা সত্য?

— জী, হ্যাঁ।

— ভৈরব দাশকে আপনি কতদিন চেনেন?

এটি স্পষ্টতই লীডিং কোশ্চেন ; কিন্তু সলিল সেন আপত্তি করল না। বাজোরিয়া তাঁর দিকে একনজর দেখে নিয়ে বললেন, তাও চার সাড়ে চার বছর হোবে হুজুর।

— তার মানে বার লাইসেন্স পাওয়ার পর থেকেই ফিল্ম প্রডিউসার ভৈরব দাশ আপনাদের ঐ ঠেক-এ আসতেন?

— ঠেক? কী বলছেন স্যার?

— তাই তো বলে 'মদের দোকান'কে। বলে না? 'ঠেক'?

— জী, না। আপনি 'বঙ্গাল ভাষা' ঠিকমতো রপ্ত করতে শেখেননি। 'ঠেক' দুসরা চিজ আছে।

— আচ্ছা, না হয় 'ঠেক' নাই হল, আপনার 'বার-কাম-রেস্তোরাঁ'-য় প্রথম থেকেই ভৈরব দাশ আসতেন?

— হ্যাঁ বহুৎ দিন হুয়ে গেল।

— আপনার মনে আছে বাজোরিয়া-সাব, কার সঙ্গে ভৈরবের প্রথম আলাপ? সে আপনার মাধ্যমে 'সোনালী-স্বপন'-এ আসে, না জীবন হালদারের?

— জী, হালদারই ওঁকে পহেলি বার দুকানে নিয়ে আসে। হমার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেয়।

— আর যাদুপদ্মগোপাল সেন? তাকে কতদিন ধরে চেনেন?

এবার তড়াক করে দাঁড়িয়ে ওঠে সলিল। আপত্তি দাখিল করে, প্রশ্নটা অবৈধ, লীডিং কোশ্চেন। কিন্তু বিচারক এ বিষয়ে রুলিং দেবার আগেই গরুড় পক্ষীর মতো হাত দুটি জোড় করে বাজোরিয়া বলে ওঠে, যাদুগোপাল সেন? হামি জিন্দেগিভর তাঁকে আপনা আঁখসে দেখি নাই হুজুর!

বিচারক বললেন, ইটস সার্টেনলি এ লীডিং কোশ্চেন। তবে আমার রুলিং দেবার আগেই সাক্ষী তাঁর জবাবটা তড়িঘড়ি দিয়ে বসেছেন। এনি ওয়ে, এই সওয়াল ও জবাব আদালতের নথি থেকে কেটে বাদ দেওয়ার অর্ডার হল।

বাসু বলেন, মিস্টার বাজোরিয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন নায়ক, হিটলার, স্তালিন আর রুজভেল্টকে চেনেন? চেনা-চেনা লাগলে দয়া করে বলুন জিন্দেগিভর আপনি ওঁদের কাউকে আপনার আঁখসে দেখেছেন কিনা?

সলিল সেন পুনরায় আপত্তি দাখিল করে, অপ্রাসঙ্গিক।

বিচারক সেটা নাকচ করে দেন। কারণ এ প্রশ্ন যে ইতিপূর্বেকার বাতিল হয়ে যাওয়া লীডিং কোশ্চেনের জের টেনে তা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি।

বাজোরিয়া স্বীকার করেন, ঐ তিনজন রাষ্ট্রনায়কের নাম তিনি শুনেছেন, তাঁদের পরিচয় জানেন, চাক্ষুষ না দেখলেও।

—এবার তাহলে হুজুরকে বলুন : মিসেস জয়া সেনের স্বামী, যাদুগোপাল সেনকে আপনি সেই অর্থে চেনেন কিনা তাঁকে জিন্দেগিভর আঁখসে না দেখলেও।

বাজোরিয়া করুণভাবে বাদীর অ্যাডভোকেটের দিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু সলিল কী ভাবে প্রশ্নটায়

আপত্তি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

বাজোরিয়াকে স্বীকার করতে হল, হাঁ, হামি উনার নাম শুনিয়াছে।

বাসু বলেন, য়োর অনার। সাক্ষী ইন্টারেস্টেড পার্টি। সে খোলা-মনে সত্য উদ্ঘাটনে আদালতকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে আমি 'হোস্টাইল উইটনেস' হিসাবে চিহ্নিত করে অতঃপরে লীডিং কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার অনুমতি চাইছি।

বিচারক বললেন, ইয়েস। দ্য উইটনেস অ্যাপিয়ার্স টু বি হোস্টাইল। যু মে আস্ক হিম লীডিং কোশ্চেনস।

বাসু হঠাৎ বাজোরিয়ার খুব কাছাকাছি সরে এলেন। একটু নাটকীয় ভাবে দক্ষিণ তর্জনীটি তার নাকের ডগায় তুলে নিম্ন কিন্তু স্পষ্টস্বরে বললেন, মিস্টার বাজোরিয়া, আপনি সত্য গোপন করবার চেষ্টা করবেন না। মিথ্যা সাক্ষী প্রমাণিত হলে পার্জারি কেস-এ আপনার সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনার কোনও বেতনভুক্ত কর্মচারী কিন্তু আপনার হয়ে হাফপ্যান্ট পরে গম পিষতে আসবে না।

বাজোরিয়া ধর্মভীরু ব্যবসায়ী। সে ভয়ে শাদা হয়ে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে অ্যাডভোকেট সলিল সেন, ইয়োর অনার। সহযোগী সাক্ষীকে ভয় দেখাচ্ছেন।

বাসু বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, নো ইয়োর অনার। একটু আগে সাক্ষী যেভাবে যাদুগোপাল সেনকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বাক্‌চাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাতে আমি মনে করি—ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, হলফনামা নিয়ে সাক্ষী দেবার গুরুত্ব কী প্রচণ্ড। ওঁকে আমি যে সব প্রশ্ন করব তার মিথ্যা জবাব দিলে পরিণাম কী ভীষণ হতে পারে এই অবাঙালি ব্যবসাদারটিকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেছি বলেই ও কথা বলেছি। ভয় দেখাতে নয়।

বিচারক বললেন, এনিওয়ে, য়ু মে প্রসীড মিস্টার বাসু।

বাসু প্রশ্ন করেন, মিস্টার বাজোরিয়া, এ মামলার বাদী মিস্টার ভৈরব দাশ যখন জীবন হালদারকে এই শেয়ারগুলি সংগ্রহ করতে বলে, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তা আমি জানি, কিন্তু এ ছাড়াও চতুর্থ ব্যক্তি একজন ছিল। সে কে?

সলিল সেন লাফ দিয়ে ওঠে, অবজেকশন যোর অনার। অবান্তর প্রশ্ন।

বিচারক বাসু-সাহেবের প্রশ্নটি শুনে টেবিলের উপর ঝুঁকে এসেছিলেন। তৎক্ষণাৎ বলেন, অবজেকশন ওভাররুলড।

বাজোরিয়া বললে, জী হুজুর। সে মীটিং-এ নবনীতা রায় ভি ছিল।

— নবনীতা রায়? যে মেয়েটি কমিশন বেসিসে আপনার বার-এ 'বার্টেন্ডার'-এর কাজ করে?

— জী হ্যাঁ।

— কবে এ আলোচনা হয়?

— তারিখ মনে নাই হুজুর। সাত-দশ-দিন পহিলে—

— কোথায় আলোচনাটা হয়?

— সোনালি স্বপন-মে। আই মীন, উপরে ম্যানেজারের ঘরে।

— ঠিক কী ভাষায় কথোপকথন হয়, তা আপনার স্মরণে আছে?

— জী না। কেঁওকি বাৎচিৎ সুরু হতেই হামি নিচে নেমে যাই। উ বিজনেস জীবনের পার্সোনাল। হমার কোম্পানির নয়। ভৈরব ফটোহাউসের শেয়ার খরিদ করতে চাইল। জীবন বললে সে কোশিশ করবে। নবনীতাকে বলল কি তুমি সাকসেসফুল হলে মুনাফার টেন পার্সেন্ট কমিশন মিলবে।

— কী বিষয়ে সাকসেসফুল হলে?

রাকেশ যুক্তকরে বললে, বিশওয়াস করুন ব্যারিস্টার-সাব, হামি জানি না। ওরা তিনজনে ঘরের ভিতর শলা-পরামর্শ করছিল। আমি অচানক ঘুসে পড়ি। জীবনের সঙ্গে একঠো জরুরি বাত ছিল। তা জীবন হমাকে বলল কি বৈঠ যেতে। এক পেগ পান করে যেতে। হামি দশ মিনিটের জন্য বসে গেলাম।

ই কারণে হামি পহিলে কী বাৎচিৎ হয়েছে ; পিছেই বা কী হয়েছে সে জানি না।

— অলরাইট। তা সেই আলোচনাকালে — মানে আপনি যতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন — তার মধ্যে যদুগোপাল সেনের প্রসঙ্গ ওঠেনি?

বাজোরিয়া একটু ভেবে নিয়ে বললে, জী হাঁ, উঠেছিল। ভৈরব বাবু জানালো কি মিসেস জয়া সেনের শেয়ার উনার হাজবেন্ড যাদুগোপালবাবুর হেপাজতে আছে।

— যাদুগোপালের ছিল প্রচন্ড রেসখেলার নেশা, তাই নয়?

— তা হামি কেমন করে জানব হুজুর?

— আপনাদের ওখানে রেস মাঠের 'বুকি'রা কেউ কেউ আসে, তাই না?

— তা আমি কেমন করে জানব হুজুর? হরেক কিসিমের আদমি আসে। হামি স্লিপিং পার্টনার আছি।

অনেকটা আত্মগতভাবে বাসুসাহেব বললেন, ঠিক কথা! রেস মাঠের বুকিদের নামে এখনো সমন ধরাতে পারেনি। তবে পরের সেশনে আপনি ওদের অনেককেই চিনতে পারবেন। হিটলার, স্তালিন, যাদুগোপালের মতো—

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিচারকের মুখোমুখি হয়ে বলেন, যোর অনার, আমার মনে হয় আপনি অনুমতি করলে আজকের মতো আমরা এখানেই থামতে পারি। অর্থাৎ এবার আমি এ হিয়ারিঙের 'কন্টিন্যুয়েন্স'-এর জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি—কাল সকাল দশটা পর্যন্ত।

সলিল সেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, আমাদের তরফে কোনও আপত্তি নেই।

বিচারক সেই মর্মে ঘোষণা করে আদালত সমাপ্ত করলেন।

আঠার

মামলা অ্যাডজর্ন হবার পর বাড়িতে ফিরে এসে বাসু-সাহেবের প্রথম কাজ হচ্ছে রানুকে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া—অর্থাৎ আদালতে যা যা ঘটেছে তার চুম্বকসার দাখিল করা। আজ তার বাতিক্রম হল। উনি বাড়িতে ঢুকতেই রানু তাঁর ইনভ্যালিড চেয়ারে পাক মেরে এগিয়ে এলেন। বললেন, এদিকে একটু শোন?

সিঁড়ি বেয়ে পথের সমতল থেকে উপরে উঠে এলেন বাসু। কৌশিক ছিল ড্রাইভারের সীটে। তাকেও হাতছানি দিয়ে ডাকলেন রানু।

বাসু বলেন, কী ব্যাপার? গুরুতর কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে।

— হ্যাঁ, গুরুতর বৈকি। কাকলি এসেছে। তোমার চেম্বারে বসে আছে। বেচারি একেবারে ভেঙে পড়েছে। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

বাসু বলেন, বুঝলাম। তার মানে, জয়া সেন ধরা পড়েছে। কোথায়? কখন?

— ঠিক জানি না। তবে কাকলির আন্দাজ জয়া তোমার নির্দেশ মানেনি। এখানে-ওখানে ফোন করেছিল 'পান্থজনসখা' হোটেল থেকে। যেমন করেই হোক, যাদুগোপাল খবর পায়। সে এসে তার স্ত্রীকে...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, এসব তো বাসি খবর। ধরাটা পড়ল কখন? কোথায়?

— ওরা দু'জনে একটা ট্যাক্সিতে হাওড়া স্টেশনে যায়। সেখানেই জয়া আবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যাদুগোপাল স্টেশনের এমার্জেন্সি মেডিকেল য়ুনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুলিশ সজাগই ছিল। দু'জনেই ধরা পড়ে। জয়া আছে পুলিশ হসপিটালে আর যাদুগোপাল লক-আপে।

বাসু বলেন, চল, কাকলির কাছে যাই।

রানু বলেন, তুমি বরং মুখ-হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম...

আবার বাধা দিয়ে বাসু বলেন, বিশ্রাম নেবার সুযোগ কি দেবে ওরা? যাদুগোপাল একের পর একটা রঙ্গ দেখিয়ে চলেছে যে। এস এ ঘরে।

চেম্বারে এসে দেখলেন কাকলি ততক্ষণে একটু সামলেছে। বাসু সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, দুটোর সময় আদালতে থাকব ভেবেছিলাম, কিন্তু হল না। কী হল কেস-এর?

বাসু নিজে বসলেন, ওকেও পাশে বসালেন। বললেন, কেস-এর কথা পরে বলছি। আগে বল, তুমি কী করে জানতে পারলে যে ওরা দু'জন ধরা পড়েছে? কখন জানতে পারলে?

— আমাকে লালবাজার থেকে জানায়। দোকানে টেলিফোন করে। কারণ রোগিণী বারে বারে তার ছোট বোনকে দেখতে চাইছিল। ডাক্তারের মতে, ছোট বোনের দেখা পেলে রোগিণী কিছুটা সুস্থ হতে পারে। মানসিক শান্তি পাবে। অবশ্য ডাক্তারবাবু কাকলিকে বারে বারে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে যেন মামলার কথা একেবারেই আলোচনা না করে। খুন-পিস্তল ইত্যাদির কোনও প্রসঙ্গ নয়।

— দিদির সঙ্গে দেখা হল?

— হ্যাঁ, হল। অনেকক্ষণ ছিলাম তার কাছে। দিদি ঘুমিয়ে পড়ার পর বুঝলাম এত দেরিতে আদালতে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। আপনাকে তো ওকালতনামা দেওয়াই আছে। আমি সশরীরে উপস্থিত না হতে পারলে হয়তো ক্ষতি হবে না।

— তা হয়নি। তোমার ডাকই পড়েনি। জয়ার সঙ্গে তাহলে এই কেস নিয়ে কোনও কথা বলনি?

— আজ্ঞে না, বলেছি। মানে শুনেছি। ও কিছু একটা কথা বলবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছিল। মনে হল হয়তো কথাটা বলতে পারলে ওর বুকের বোঝাটা হালকা হয়ে যাবে। তাই ঘর নির্জন হতেই জিজ্ঞেস করলাম, দিদি, তুই কিছু বলতে চাস? ও মাথা নেড়ে জানালো : হ্যাঁ। আমি জানতে চাইলুম : কী? দিদি বলল : ও খুনটা করেনি, বিশ্বাস কর।

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, সে কথা তোমার দিদি কী করে জেনেছে তা বলেনি?

— হ্যাঁ, তাও বলেছে। বলেছে, ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এই অভ্রান্ত সত্যটা ওকে কানে কানে বলে গেছেন : স্বয়ং যাদুগোপাল।

কাকলি সারাটা দুপুর পুলিস হস্‌পিটালেই ছিল। জয়াকে একজন মহিলা পুলিসের প্রহরায় একটি কেবিনে রাখা হয়েছে। একঘুম দিয়ে জয়া একটু সুস্থ বোধ করে। ক্রমে ক্রমে সে অনেক কথাই কাকলিকে জানায়। তার কিছ কিছু বাসু-সাহেব জয়ার মুখ থেকে আগেই শুনেছিলেন পান্থজনসখা হোটেলে। কাকলিকে জয়া বলেছিল কী ভাবে মৃত জীবন হালদারের মুঠি থেকে সে শেয়ারের গোছাটা উদ্ধার করে। এবং কী ভাবে তা বাসু-সাহেবের হাতে তুলে দেয়।

বাসু জানতে চান, সে কথা জয়া কি পুলিসকে জানিয়েছে।

— নিজে থেকে জানায়নি। ওরা কায়দা করে কথাটা ওর কাছ থেকে বার করে নিয়েছে। শুধু কি তাই? পুলিস দিদিকে বলেছে, আপনি নিজে দায়মুক্ত হতে ওই শেয়ারের গোছা আবার পুলিসকেই জমা দেবেন। কী নিষ্ঠুর ওরা হতে পারে!

বাসু বলেন, পুলিসকে কিছুটা নিষ্ঠুর হতেই হয়। ওদের চোখে তোমার দিদি অপরাধী।

— কিন্তু এখনই তা কেন হবে? দিদির তো কন্‌ভিক্‌শন হয়নি। পুলিস তাকে সন্দেহ করে — এইমাত্র। ওরা যেভাবে তাকে জেরা করছে তাতে আশঙ্কা হয় মামলার ফলাফল যাই হোক, তার আগেই...

কথাটা বেচারি শেষ করতে পারে না। তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে। চোখে জল ভরে আসে। বাসু বলেন, ও কথা থাক, কাকলি। তোমাকে বরং এদিককার খবরটা শোনাই। ভৈরব দাশের অবস্থা এখন সাপের ছুঁচো গেলার মতো। না পারছে গিলতে, না পারছে উগ্‌রাতে।

— মানে? ওর দাবী টিকবে না?

— নিশ্চয় না। পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে ভৈরবের অবস্থা এখন 'ছেড়ে দে মা

কেঁদে বাঁচি'। তোমার দিদির শেয়ারের উপর তার দাবী কোনভাবেই দাঁড়াবে না। বরং ভৈরব যে স্ট্যান্ড নিয়েছে তাতে জীবন হালদারের অপরাধে তাকে ভোগান্তি ভুগতে হতে পারে।

কাকলি সখেদে বলে, যাদুগোপালের যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকত তাহলে ও দিদিকে বাঁচাতে পারত — শুধু সত্যি কথাটা স্বীকার করে। ও যদি পুলিসকে বলে যে, সে নিজেই জীবন হালদারের বাড়িতে আগে গেছিল আর দিদি তার পিছন পিছন... কিন্তু না, সে কথা ও বলবে কী করে? ও যে নিজেই জীবনকে গুলিটা করেছে। ফলে সে এমন কোন কথা বলবে না যাতে ফাঁসির দড়িটা ওর গলার দিকে এগিয়ে আসে।

বাসু বলেন, যাদুগোপাল হয়তো জানে না যে, জয়া তাকে অনুসরণ করেছিল—

— কী বলছেন! ও সব জানে! ও তো কাল দুপুরের দিকে দিদিকে 'পান্থজনসখা' থেকে বের করে আনে। আর ওরা ধরা পড়েছে আজ সকালে হাওড়া স্টেশনে। তার মানে বাড়িতে না ফিরলেও রাতটা ওরা এই কলকাতা শহরেই কাটিয়েছে। অন্য কোনও হোটেলে। দিদিকে তো চিনি। সে সব কথা আগেভাগে বক্‌বক্ করে বলেছে। আর তাতেই যাদুগোপাল নিজের ইচ্ছেমতো মিথ্যেটা সাজিয়েছে। সে নাকি মোমিনপুরের বাড়িতে আদৌ যায়নি। ওই পাড়ায় গেছিল বটে, তবে জীবন হালদারের বাসায় নয়।

— তোমার দিদি তা বিশ্বাস করল?

— করল। যাদুগোপাল যদি রঙ্গ করে দিদিকে বলে, সূর্যটা রোজ পশ্চিমে ওঠে আর পূর্বে অস্ত যায়, দিদি সেক্ষেত্রে বলবে, হয়তো তাই যায় রে কাকলি, আমরা খেয়াল করি না। ও যখন বলছে।

হঠাৎ ইন্টারকমটা বেজে উঠল। রানু দেবী বললেন, তোমার একজন দর্শনার্থী এসেছে। বসতে বলব, না পরে আসতে বলব?

— দর্শনার্থীটি কে? রাকেশ বাজোরিয়া না ভৈরব দাশ?

— ওঁদের দুজনের একজনও নয়। ইন্সপেক্টর নিখিল দাশ।

— ও আচ্ছা। পাঠিয়ে দাও তাকে।

— কাকলিকে এ ঘরে ডেকে নেব?

— কী দরকার? নিখিল যা বলতে চায় তা কাকলির সামনেই বলতে পারে। যদি না সে জনান্তিক সাক্ষাৎ চায়।

একটু পরেই নিখিল এল এ ঘরে। কাকলি উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। নিখিল সেটা লক্ষ্য করল। লক্ষ্য না করার ভান করে এসে বসল একটা চেয়ারে। বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে, দুঃসংবাদটা পেয়েছেন নিশ্চয়। আপনার মক্কেল এবং তাঁর স্বামী দু'জনেই ধরা পড়েছেন।

— হ্যাঁ, কাকলির কাছে এইমাত্র শুনলাম। জয়া এখন কেমন আছে?

— ডাক্তারবাবু বলছেন, অবস্থা এখনো ক্রিটিকাল। আমাদের জেরা করতে অনুমতি দিচ্ছেন না এখনো।

— কী দুঃখের কথা! — কাকলি স্বগতোক্তি করে।

নিখিল এবার তার দিকে ফিরে বলে, আমরা কী করতে পারি বলুন? আপনার দিদিকে আপনি যদি পুলিস প্রহরায় অন্য কোনও নার্সিং হোমে, কোনও বিশেষ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রাখতে চান তাতেও আমারা আপত্তি করব না।

কাকলি বলে, পুলিস কী মহানুভব!

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, সে সব কথা পরে হবে। আপাতত তুমি আমার কাছে এসেছ কী উদ্দেশ্য নিয়ে?

নিখিল বললে, আমি দুঃখিত স্যার, কিন্তু এ কাজটা আমাকে করতেই হচ্ছে। আপনি আজ প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করেছেন যে, জীবন হালদারের ঘর থেকে অপহৃত শেয়ারের গোছাটা বর্তমানে আপনার জিম্মায় আছে...

— ওমা! ও কথা কখন স্বীকার করলাম আমি? আমি তো শুধু বলেছি যে, জয়া সেনের নামে এন্ডোর্স করা শেয়ারের গোছাটা আমার কাছে আছে। সেটা যে জীবন হালদারের ঘর থেকে অপহৃত হয়েছে এমন দাবী তো কেউ করেনি। এমন প্রমাণও কেউ দেয়নি।

— কিন্তু আপনিও জানেন, আমিও জানি — ওই শেয়ারের গোছাটাই হচ্ছে জীবন হালদারের মৃত্যুর মূল হেতু।

— তুমি তা কী করে জেনেছ তা তুমিই জান। আমি তা জানি না। এবং মানি না।

— ঠিক আছে স্যার। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। আমাকে বড়কর্তা যে আদেশ করেছেন চাকরির খাতিরে তুমি সেটুকুই পালন করব।

— কর। কিন্তু কী আদেশ করেছেন তোমার বড়কর্তা?

— ওই শেয়ারের গোছাটা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করে আপনাকে একটা রসিদ দেওয়া। ওগুলো জীবন হালদার মার্ডার-এর এক্‌জিবিট্‌ হিসাবে আমাদের দরকার হবে। পুলিস কাস্টডিতে থাকবে।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, আয়াম সরি ইন্সপেক্টর দাশ। আমি ওগুলো তোমাকে দেব না। দিতে পারি না।

— এটা কিন্তু ভাল করছেন না স্যার। ওগুলো মার্ডার কেস-এর এভিডেন্স। ওগুলো যে আপনার হেফাজতে আছে তা আপনি প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছেন। আপনি এভাবে পুলিসের কাজে সজ্ঞানে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন না, স্যার। আয়াম সরি, আই ওয়ার্ন য়ু।

— তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে? এবার তাহলে তুমি যেতে পার।

— বড়কর্তাকে গিয়ে কি বলব?

— ট্রুথ, হোল ট্রুথ, অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ — বলবে, আমি মিস্টার বাসুকে 'ওয়ার্ন' পর্যন্ত করেছি। তিনি জবাবে বলেছেন : গো টু হেল। য়ু অ্যান্ড য়োর বস্‌।

নিখিল একটু ইতস্তত করে বলল, বড়কর্তা যদি জিজ্ঞাসা করেন, কী কারণে আপনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না? তাহলে কী বলব?

— বলবে যে, আমার উপর আদালতের আদেশ আছে ওই শেয়ারগুলো নিয়ে আদালতে উপস্থিত থাকতে। আমি আজ বেলা দুটোয় তাই গিয়েছিলাম। তারপর কোর্ট অ্যাডজর্নড হয়েছে মাত্র — কেস ডিসমিস্‌ হয়নি — কাল সকালে আমাকে আবার ওই শেয়ারের বান্ডিল সমেত আদালতে উপস্থিত হতে হবে। তোমার বড়কর্তা যদি চান তাহলে আদালত থেকে অর্ডার করিয়ে আনুন। না হলে কাল সকালে খালি হাতে আদালতে গেলে আমার পক্ষে আদালত অবমাননা করা হয়ে যাবে।

— এটাই আপনার শেষ কথা।

— না নিখিল। এটাই আমার শেষ কথা নয়। আমি একটা ডীল করতে রাজি আছি, যদি তোমার বড়কর্তা রাজী থাকেন।

— 'ডীল' মানে?

— কিছু দেওয়া, কিছু নেওয়া।

— আই সী। আপনি পরিবর্তে কী চান?

— তুমি টেলিফোনে তোমার বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার। তোমার বড়কর্তা যদি এক ঘণ্টার মধ্যে আমার মক্কেলকে জামিনে মুক্তি দিতে রাজি থাকেন তাহলে আমি ওই শেয়ারের বান্ডিল এখনি তোমাকে হস্তান্তরিত করতে রাজি।

— তা হবে না স্যার। উনি রাজি হবেন না। কেসের বর্তমান পরিস্থিতিতে মিসেস জয়া সেনকে জামিন দেওয়া চলবে না।

— তার মানে যাদুগোপাল নয়, তার স্ত্রীকেই তোমরা আসামীর কাঠগড়ায় তুলতে চাও। 'সব বেটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে বেটাকে ধর'। যেহেতু হার্টের অসুখে সে হতভাগিনী এমনিতেই আধমরা!

— আমাদের কোন গত্যন্তর নেই স্যার। ওঁর স্বামী ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছেন...

— বাঃ। চমৎকার। — হঠাৎ বলে ওঠে কাকলি।

— নিখিল তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে ; না, মিস দত্ত। এটা মোটেই আনন্দদায়ক খবর নয়। অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে...

বাসু বলেন, কেন...কেন? তোমর ব্যক্তিগত আপত্তি করার কী হেতু হল?

— লোকটাকে আমার একেবারেই বরদাস্ত হচ্ছিল না। ওই যাদুগোপালকে। টিপিকাল শয়তান। ওর একটা কথাও বিশ্বাস হয়নি আমার।

— আগে শুনি, সে কী বলেছে। অবশ্য সেটা যদি পুলিসের গোপন তথ্য না হয়।

— টু হেল উইথ গোপন তথ্য। লোকটা পাক্কা শয়তান আর একসেলেন্ট অভিনেতা। স্ত্রীর অবস্থা দেখা মাত্রই হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। প্রথমে দু-হাত আকাশে তুলে বললে, আমাকে মেরে ফেল, কেটে ফেল, আমি ওর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলব না। আর তার দশ মিনিটের মধ্যে হড়বড় করে সব কথাই স্বীকার করে বসল। ওর স্ত্রী মনে করেছিল ও মোটরবাইক নিয়ে মোমিনপুরে জীবন হালদারের বাসায় যাচ্ছে। তাই মিসেস সেন গাড়িটা নিয়ে ওকে অনুসরণ করেন। তারপর ও নিজে যখন উল্টোদিকে চলে যায় তখন মিসেস সেন টের পান না। ভিড়ের মধ্যে স্বামীর বাইকটা হারিয়ে ফেলেন। তাই কাছাকাছি একটা বাড়িতে গিয়ে জীবন হালদারের বাড়ি কোনটা তা কায়দা করে চিনে নেন। তারপর জীবন হালদারের বাড়িতে যান।

— যাদুগোপাল এত কথা জানল কি করে?

— মিসেস সেনই তাকে বলেছেন।

— কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে কী বলেছে তা তোমরা কোন্ অধিকারে জানতে চাইলে? এতো 'প্রিভিলেজড' অ্যান্ড 'কনফিডেন্সিয়াল' কথাবার্তা।

— আমরা কেন জানতে চাইব? ও তো নিজে থেকেই হড়বড় করে একনিঃশ্বাসে সব কথা বলে গেল।

কাকলি বলে ওঠে ; তাই তো বলবে ও। না হলে অপরাধটা কী করে সহধর্মিণীর স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া যায়?

বাসু বলেন, নিখিল, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ কেন যাদুগোপাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এত কথা বলে গেছে?

— নিজের অপরাধটা গোপন করতে?

— সেটা ঠিক কিনা জানি না। আরও একটা জোরালো কারণ আছে — সেটা নজরে পড়ল না?

— কী জোরালো হেতু?

— হিসেব কষে দেখ। ওর স্ত্রী হাইপারটেনশনে ভুগছে দীর্ঘদিন। উত্তেজনা তার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। নার্ভাস স্ট্রেন আর দুশ্চিন্তা আরও খারাপ।

— কী বলতে চাইছেন আপনি?

— জয়া সেনের ওয়ারিশ কে? যোধপুর পার্কের বাড়ির আধখানা, গাড়িটা গোটা, দোকানের অর্ধেক মালিকানা, হয়তো জয়েন্ট ইন্‌শিওরেন্সও আছে? স্থাবর-অস্থাবর সব কিছুরই তো সেই ওয়ারিশ।

— আপনি কি বলতে চান, সজ্ঞানে পিশাচটা স্ত্রীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

— সজ্ঞানে বধূহত্যা করতে কাউকে দেখনি বুঝি এর আগে? ক'দ্দিনের চাকরি তোমার?

— কিন্তু এই পদ্ধতিতে?

— কেন পদ্ধতিটা খারাপ কিসের? আর্সেনিক—ছুরি—পিস্তল—গলা টিপে ধরা—গায়ে আগুন লাগানোর চেয়ে এটা অনেক বেশি নিরাপদ, অথচ ফল একই।

— কিন্তু আমরা কী করতে পারি?

— তোমরা কোন্ আক্কেলে শেষ পর্যন্ত জয়া সেনকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলতে চাইছ সেটা আগে বোঝাও? তার কী স্বার্থ থাকতে পারে?

— কেন? ওই শেয়ারের গোছা?

— কী পাগলের মতো বকছ নিখিল? শেয়ারের গোছা উদ্ধার করতে গিয়ে যাদুগোপাল জীবন হালদারকে খুন করলেও করতে পারে। কারণ সে যে ওই শেয়ারের গোছা বন্ধক রেখে রেস খেলে টাকা উড়িয়েছে। তার সেই লজ্জার কথাটা সে স্ত্রীর কাছ থেকে, শালীর কাছ থেকে গোপন রেখে এসেছে। কিন্তু জয়া সেন? ওই উদ্দেশ্যে এমন দুর্বল শরীরে রিভলভার নিয়ে নিজে ড্রাইভ করে সিংহের বিবরে সে মাথা গলাতে পারে?

— তিনি যে নিজে ড্রাইভ করে গেছিলেন, রিভলভারটাতে তাঁর আঙুলের ছাপ আছে এসব তো প্রতিষ্ঠিত তথ্য। আদালতে আপনি তা অপ্রমাণ করবার চেষ্টা করলেও......

— থামো, নিখিল। জয়া সেনের চরিত্রটা তুমি বিচার করে দেখবে না? সারকাম্‌স্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সগুলোই বড় হল? জয়া সেন যদি টের পেত যে, তার স্বামী শেয়ারের গোছা বন্ধক রেখে জুয়া খেলে ফতুর হয়েছে, তাহলে তার কর্তাকেই বলত : ছি ছি, অমন দুষ্টুমি আর কখনো কর না। যাও লক্ষ্মীটি। ওগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে এস। এই নাও নগদ টাকা। আর কখনো অমন জুয়ো খেল না, কেমন? সোনাছেলে!

নিখিল একমিনিট স্থিরদৃষ্টিতে শূন্যে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, আপনিই জিতেছেন। কিন্তু খুনটা তাহলে করল কে? যাদুগোপাল? অঙ্কটা মেলাবেন কেমন করে?

বাসু বললেন, অঙ্ক তুমি কষতে পারছ না কেন জান? কারণ তুমি ভুলে গেছ আমাদের অঙ্কটাতে দু-দুটো অজানা ফ্যাক্টর আছে। শুধু 'এক্স' নয়। 'এক্স অ্যান্ড ওয়াই'।

— তার মানে?

— নবনীতাকে বিষ মেশানো চকলেট কে পাঠিয়েছিল সেই প্রশ্নটার জবাব নিয়ে তোমার কোন মাথাব্যথা নেই। না তোমার, না তোমার বড়কর্তার। তোমাকে প্রথমে বলতে হবে নবনীতা অজ্ঞান হয়ে যাবার পর এবং আমরা তাকে উদ্ধার করার আগে ওর রুদ্ধদ্বার কক্ষে কে ঢুকেছিল? কী করে ঢুকেছিল?

— সেটা কী রকম? কেউ যে আদৌ ঢুকেছিল তার প্রমাণ কী?

বাসু বিস্তারিত বুঝিয়ে বলেন সব কথা। নবনীতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে উনি চেয়ার উল্টে পড়ার একটা শব্দ শুনতে পান। বেশ বুঝতে পারেন নবনীতা হাতে টেলিফোনটা ধরেই মাটিতে পড়ে যায়। উনি ফোনটা কানে ধরেই থাকেন। আশপাশের কোনও শব্দ শুনতে পান কিনা পরখ করতে। কিন্তু ফোনটা পুরো পঞ্চাশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট ডেড হয়ে রইল। তারপর ও প্রান্তের টেলিফোনটা ক্র্যাড্‌লে ফিরে গেল। আবার ডায়াল টোন শুনতে পেলেন।

নিখিল বলে, কারেক্ট। আমরা যখন ডুপলিকেট চাবি দিয়ে ওর ঘরের তালা খুলে ঢুকি তখন টেলিফোনটা ছিল মাটিতে। দুটো অংশই।

— তোমার মনে আছে?

— আছে। কারণ আমি ওই বাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে বলেছিলাম, ওই টেলিফোনটা ব্যবহার করা যাবে না। আমরা টেলিফোনে ফিঙ্গার-প্রিন্টও নিয়েছিলাম। নবনীতা ছাড়া আর কারও আঙুলের ছাপ পাইনি।

— নবনীতারটা পেয়েছ?

— ন্যাচারালি। ওটা তো ওর নিজেরই ফোন।

বাসু সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহলে বোধহয় সমাধান হয়ে গেছে। ইন্‌টারকমটা তুলে সুজাতা আর কৌশিককে চাইলেন। বললেন, একটু বেরুব। এক্ষুণি। তোমরা দুজনও এস।

নিখিলের দিকে ফিরে বললেন, তুমি কী করবে? আসবে আমাদের গাড়িতে ?

— না, স্যার। তবে আপনার সঙ্গ ছাড়ছি না। আমি নিজের জীপ নিয়ে এসেছি। তাতেই যাব। কোথায় যাচ্ছি আমরা?

বাসু সে কথার জবাব না দিয়ে কাকলিকে বললেন, তুমিও কি আসছ?

— আসব না? আপনি বলছেন সমাধানের পথে চলেছেন। মূল সমস্যাটা তো আমারই।

— না কাকলি। শুধু তোমার নয়, তোমার, জয়ার, নবনীতার—নিখিল আর আমার তো বটেই। মোটামুটি সমাধানের একটা ছক তৈরি করেই ফেলেছিলাম। এইমাত্র নিখিল এমন একটা জব্বর ক্লু দিল যাতে মনে হচ্ছে আমার অনুমানটাই ঠিক।

— ক্লু! কী ক্লু দিলাম আমি?

— ওই যে তুমি বললে, 'ন্যাচারালি! ওটা তো ওর নিজেরই ফোন'।

— এর মধ্যে ক্লু কোথায়? আপনার টেলিফোনে আপনার নিজের আঙুলের ছাপ থাকবে এটা কী এমন আশ্চর্যের ব্যাপার?

— দ্যাটস্ দ্য ফাইনাল ক্লু। উটের পিঠের শেষ কুটো। চল। অভিযানে বেরিয়ে পড়া যাক।

উনিশ

কৌশিক ড্রাইভ করছে। পাশের সীটে তার মামু। পিছনের আসনে বসে আছে কাকলি আর সুজাতা। কৌশিক গাড়ি চালাতে চালাতে রিয়ার-ভিয়ু আরশিতে দেখতে পায় পিছন পিছন আসছে নিখিলের জীপ।

সুজাতা পিছনের সীট থেকে প্রশ্ন করে, আপনি তো আজ নবনীতাকে জেরা করলেন না?

— ওতো আদালতে ছিল না। ওকে সমনই ধরাইনি আমি।

— কিন্তু কেন?

— নবনীতাকে ক্রস্ করতে হবে জীবন হালদার হত্যা মামলায়। এখনো ওকে ডাকবার মতো অবস্থা হয়নি। আজ সকালেও আমি জানতাম না, নবনীতাকে কে, কেন ঐ চকলেটের প্যাকেটটা পাঠিয়েছিল।

কাকলি বলে, কে পাঠিয়েছে তা জানি না, কিন্তু কেন পাঠিয়েছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ওকে হত্যা করতে।

বাসু ঘাড় ঘুড়িয়ে এদিকে ফিরে বললেন, না কাকলি, সমস্যাটা অত সহজ নয়। হত্যার উদ্দেশ্য থাকলে আরও তীব্র কোন বিষ চকলেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিত লোকটা। প্রতিটি চকলেট-এ মাত্র পাঁচ গ্রেন করে ভেরোনাল মেশাতো না। ভেবে দেখ, নবনীতা আধঘণ্টার মধ্যে ছয়টা চকলেট ওভাবে খেয়েছিল বলেই মরতে বসেছিল। কিন্তু যে লোকটা ওকে খুন করতে চায় সে কেমন করে জানবে — নবনীতা কত তাড়াতাড়ি চকলেটগুলো খাবে? ও যদি চার-পাঁচ দিন ধরে রোজ দুটো-তিনটে করে খেত তাহলে একটু ঘুম ঘুম লেগে থাকত ক'দিন, আদৌ টের পেত না যে এই ক'দিনে সে ষাট গ্রেন ভেরোনাল খেয়েছে।

সুজাতা বলে, তাহলে লোকটার উদ্দেশ্য কী? ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা? তারও তো কোন অর্থ হয় না। কারণ ও কখন চকলেট খাবে তা আততায়ী জানে না।

বাসু বললেন, কারেক্ট। ঠিক লাইনেই চিন্তা করছ। এভাবেই সমাধানে পৌছাবে।

কাকলি বলে, আপনি সমাধানে পৌছেছেন? জানেন কে কেন ওকে ওই বিষাক্ত চকলেটগুলো পাঠিয়েছিল?

বাসু নির্লিপ্তের মতো বলেন, হ্যাঁ, কাকলি, এখন আমি তা সন্দেহাতীতভাবে জানি।

কৌশিক গাড়ি চালাতে চালাতে আলোচনায় যোগ দেয়, আর জীবন হালদারকে কে কাকলি দেবীর

রিভলভার দিয়ে গুলিটা করেছে তাও বোধহয় আপনি ইতিমধ্যে সন্দেহাতীতভাবে জেনে ফেলেছেন?

— না কৌশিক, সেটা নিশ্চিতভাবে এখনো জানি না, কিন্তু কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তিটি সেটা সন্দেহাতীতভাবে জানে, সেটুকু অন্তত আমি জানি — যদি সে নিজেই খুনটা না করে থাকে।

বাসু-সাহেবের নির্দেশ মতো আগুপিছু দুখানি গাড়ি এসে দাঁড়াল ইলিয়ট রোডে, নবনীতার বাড়ির সামনে। আজ তিনতলাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। ওঁরা কি সপরিবারে কোথাও গেছেন? দোতলায় একটা জানলা থেকে আলোর আভাস আসছে।

সবাই গাড়ি থেকে নামলেন। বাসু বলেন, কাকলি, তুমি দোতলায় উঠে গিয়ে কলবেলটা বাজাও। আমরা মিনিটখানেক পরে উঠছি। নবনীতা দোর খুলে দিলে তুমি ভিতরে থাকবে। ফলে মিনিটখানেক পরে আমরা ডোরবেল দিলে তুমি দরজা খুলে দিতে পারবে। তখন আমি আর সুজাতা ঢুকব। সব শেষে কৌশিক আর নিখিল এসে কলবেল বাজাবে, তখন আমরা ভিতর থেকে দরজা খুলে দেব।

ইন্সপেক্টর দাশ বলে, এভাবে 'বাই ব্যাচেস' কেন? আপনার স্ট্র্যাটেজিটা কী?

— টেম্পোটা ধীরে ধীরে তোলা। একের পর এক মানুষজনকে এভাবে আসতে দেখলে ও ঘাবড়ে যাবে, যদি ও সত্যিই গিল্টি-কনশাস হয়। কাকলি, তোমার সঙ্গে নবনীতার তো আজ সারাদিনে দেখা হয়নি, তাই নয়? মানে ও নার্সিংহোম থেকে ফিরে আসার পরে?

— না স্যার, হয়েছে। নবনীতা নিজের থেকেই আমার দোকানে এসেছিল। আজ সকালে। এগারোটা নাগাদ।

— ও! তা সে যাই হোক, এবার তুমি উপরে যাও।

কাকলি দোতালায় উঠে এল। ঘরের ভিতরে যে লোক আছে তা বোঝা যায়। আলো জ্বলছে। কাকলি ডোরবেল বাজালো। ম্যাজিক আইয়ের ভিতর দিয়ে নবনীতা দেখে নিয়ে দরজার লক খুলে বলল, কী ব্যাপার? কাকলি যে!

— কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।

— ও, এস। ভিতরে এসে বস।

কাকলি ঘরের ভিতরে ঢুকতেই নবনীতা ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বললে, চা খাবে? অথবা কফি?

— না, নীতা। তুমি কি লেটেস্ট খবরটা পেয়েছ?

— কী বিষয়ে?

— আমার! দিদি আর জামাইবাবুকে পুলিসে গ্রেফতার করেছে।

— না শুনিনি। কী অপরাধে?

— সকালে তোমাকে যে কথা বলেছিলাম : জীবন হালদারের খুনের মামলায়।

নবনীতা নয়ন নত করল।

কাকলি জানতে চায়, জীবন হালদারের মৃত্যুতে তোমার মনে....

নবনীতা ওকে কথাটা শেষ করতে দেয় না। মাঝপথেই বলে ওঠে, না! এককালে ওকে ভালোবেসেছিলাম এটা যেমন সত্য, তেমনি তার ইদানিংকালের দুর্ব্যবহারে আমি তাকে যে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম, সেটাও মিথ্যা নয়।

— তোমার বাড়িওয়ালা তো জানেন তুমি মিসেস হালদার। ফলে....

— জানি। নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসে দেখি তিনতলার ওঁরা সদলবলে দুর্গাপুরে গেছেন একটা বিয়ে উপলক্ষে। জানি না, ওঁরা খবরের কাগজে অমন খবরটা দেখেছেন কিনা। না হলেও দু-একদিনের মধ্যে টের পাবেন। এখানে থাকলে আমাকে বিধবা সাজতে হবে। সেজন্যই আজ সকালে তোমার কাছে গিয়েছিলাম জানতে যে এই বিবর্তিত পরিস্থিতিতে তুমি কি আমাকে তোমার দোকানে কাজটা দেবে? রাতে তোমার মেজানাইন ঘরে থাকতে....

— কিন্তু কই সে সব কথা তো তুমি তখন বললে না।

নবনীতা নতনেত্রে বললে, না, বলিনি।

— কিন্তু কেন?

— তোমার কাউন্টারে-বসা মেয়েটিকে দেখে আমার সব গুলিয়ে গেল।

— কেন বল তো? ও কী দোষ করল?

— না, না, দোষ কিছু করেনি। আমার মনে হল, আমি বুঝি ওর চাকরিটা খাচ্ছি, ওকে পথে বসাচ্ছি.....

— কেন? তোমাকে তো আমি সেদিন বলে রেখেছিলাম যে, সুপর্ণাও একটা ভাল চাকরির অফার পেয়েছে। ও চলে যাবে পরের মাসে। বলিনি?

নবনীতা একটু ভেবে নিয়ে বললে, কী জানি বলে থাকলেও তা আমার তখন মনে পড়েনি।

ঠিক তখনই আবার কল-বেল বেজে উঠল। নীতা বলল, তুমি বস, আমি গিয়ে দেখছি।

এগিয়ে এসে ম্যাজিক-আইতে চোখ লাগিয়ে বলল, মিস্টার বাসু। তোমরা...মানে? তুমি কি ওঁরই গাড়িতে এসেছ?

কাকলি জবাব দিল না। নিঃশব্দে দরজাটা ভিতর থেকে খুলে দিল।

বাসু আর সুজাতা ঘরে ঢুকলেন। বাসু নবনীতাকে এড়িয়ে কাকলিকে বললেন, কাকলি যে। কতক্ষণ এসেছ?

কাকলি বোধহয় জলজ্যান্ত মিথ্যায় অভ্যস্ত নয়। শুধু বলল, এই তো কিছুক্ষণ।

নবনীতা পর্যায়ক্রমে তিনজনকে দেখতে থাকে। তার চোখে সন্দেহ। বাসু বললেন, এর সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই নবনীতা, এ আমার ভাগ্নী — সুজাতা। 'সুকৌশলী' ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির পার্টনার।

নবনীতা কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বললে, আপনি একেবারে ডিটেক্‌টিভ সঙ্গে করে আমার বাসায় এসে হাজির হয়েছেন যে? কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে?

— তা আছে। চরম বিপদে পড়ে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তুমি এত লোক থাকতে আমাকেই টেলিফোন করেছিলে! আমি কি তোমাকে এত সহজে ছাড়তে পারি?

নবনীতা জবাব দিল না। বাসু নিজেই একটা বেতের চেয়ারে বসলেন। বললেন, তোমরা সবাই বস। কিছু কথা আছে।

বাকি তিনজনও বসল। নবনীতা বলে, এবার বলুন?

— আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি এ কথা বলতে যে তোমাকে বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে। হয়তো অতর্কিতে আবার তোমাকে চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

নবনীতা জানতে চায়, হঠাৎ এমন ধারণা হল কেন আপনার?

— একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। মাত্র দুদিন আগে তোমাকে কোন একজন অজ্ঞাত আততায়ী বিষ মেশানো চকলেট পাঠিয়েছিল — নিঃসন্দেহে তোমাকে হত্যা করতে। তুমি ঘটনাচক্রে বেঁচে গেলে। জীবন হালদারের মৃত্যু ছাড়া পরিস্থিতির আর কোনও পরিবর্তন তো হয়নি। জীবন তোমাকে ওভাবে চকলেট পাঠাবে না। তাহলে আততায়ী জীবিত। সে তোমাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করতে চাইবে না, এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন?

নবনীতা একটু ইতস্তত করে বললে, কথাটা আমি ওভাবে দেখিনি।

— আর যে প্রশ্নের উত্তরটা সময়মত ভেবে রাখতে বলেছিলাম, সেটা? তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পর অন্য চাবি দিয়ে দরজা খুলে কে ভিতরে আসতে পারে?

— না, সে সমস্যার সমাধান হয়নি। আসলে আমি সে বিষয়ে আর চিন্তা-ভাবনাই করিনি। এত সমস্যা চারিদিকে—

— কিন্তু ওটাই তোমার সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা নয়?

— কোনটা?

— ওই তোমার মরণ-বাঁচন সমস্যাটা। আমি তো হিসাব কষে দেখছি—যে লোকটা আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল তার মানসিক পরিবর্তন ঘটাবার মতো কোনও ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেনি।

নবনীতা একটু হাসবার চেষ্টা করল। বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার, আমার বিপদের কথা আপনি কিন্তু আমার চেয়ে বেশি বেশি ভাবছেন!

— হয়তো তাই। দুটো কারণে। প্রথমত, আমার বিশ্বাস, যে-লোকটা তোমাকে বিষমাখানো চকলেটের বাক্স পাঠিয়েছিল, সেই লোকটাই জীবন হালদারকে খুন করেছে।

নবনীতা বাসুসাহেবের চোখে-চোখে তাকালো। একটু ভেবে নিয়ে বললে, দুটো হেতুর কথা আপনি বলেছিলেন। দ্বিতীয়টা?

— দ্বিতীয়টার কথা আমি বলব না। কারণ ঘরে উপস্থিত আমাদের চারজনের মধ্যে দু-জন সেটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল — তুমি আর তুমি।

নবনীতা জবাবে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দরজার কলবেলটা বেজে উঠল। রীতিমত চমকে উঠল নীতা। বলল, বসুন আপনারা, আমিই দেখছি।

উঠে গিয়ে ম্যাজিক-আইতে চোখ লাগিয়ে সে এদিকে ফিরল। বাসু-সাহেবকে বলে, আপনারা কি দল বেঁধে এসেছেন? সেই পুলিশ অফিসারটি।

— কোন্ পুলিস অফিসারটি?

— নার্সিং হোমে জ্ঞান হবার পর যিনি আমাকে জেরা করেছিলেন।

এবার বাসু-সাহেব জবাব দেওয়ার আগে আবার ডোরবেলটা বেজে উঠল।

বাসু বলেন, ইন্সপেক্টর দাশ? দরজাটা খুলে দাও নীতা। পুলিস রুদ্ধদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত নয়।

নবনীতা ভিতর থেকে দরজার লকটা খুলে দিল। পাল্লাটা খুলতেই ঘরে প্রবেশ করল নিখিল আর কৌশিক। নিখিলের হাতে টুপিটা। বললে, গুড ইভনিং মিসেস চৌধুরী। কয়েকটা কথা জানতে এলাম, কিন্তু এখানে একটা কনফারেন্স হচ্ছে দেখছি।

নবনীতা বললে, আমার নাম আপনাকে আগেই বলেছি — মিস নবনীতা রায়, মিসেস চৌধুরী নয়।

— অলরাইট। অ্যাজ য়ু প্লীজ। আমরা দু'জন কি বসতে পারি?

প্রশ্নটা বাহুল্য, কারণ জবাব দেবার আগেই দু'জনে ওর সোফা-কাম-বেডে ঠাশাঠাশি করে বসেছে। ইন্সপেক্টর দাশ বললে, আপনারা কী একটা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। আমরা এসে পড়ায় সেটায় বাধা পড়ে গেল বোধহয়...

বাসু আবার খেইটা ধরিয়ে দেন। বলেন, আমি নবনীতাকে বলছিলাম, আমার ধারণায় যে লোকটা নবনীতাকে চকলেটের বাক্সটা পাঠিয়েছিল — সে যেই হোক — সেই লোকটাই জীবন হালদারকে খুন করেছে।

নিখিল দাশ প্রশ্ন করে, এমন কথা মনে করার কী যুক্তি আপনি দেখাবেন?

— প্রথমত, নবনীতাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওর জীবনে এমন কোনও প্রবল শত্রু আছে কিনা যে, ওর মৃত্যু কামনা করে। তা সে যে কারণেই হোক। কোনও গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কায়, অর্থনৈতিক কারণে, ব্যর্থপ্রেমিকের উন্মাদনার তির্যক প্রকাশ — তা নবনীতা বলল, তেমন কোনও লোকের কথা ও মনে করতে পারছে না। অথচ আমাদের সন্দেহের গণ্ডিটা খুবই ছোট্ট — ঐ 'সোনালি স্বপন' রেস্তোরাঁর চৌহদ্দির ভিতর। যে 'সোনালি স্বপন'-এর মালিক ছিলেন জীবন হালদার।

নবনীতা দেরাজ খুলে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে। কাউকে বিশেষভাবে অফার করে না। সামনে টিপয়ে রাখে। নিজে একটি স্টিক তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, কেন? 'সোনালি স্বপন'-এর বাইরের কোন মানুষ আমাকে চকলেটের প্যাকেটটা প্রেজেন্ট করতে পারে না কেন?

বাসু বলেন, নিখিল, তুমি ওকে বুঝিয়ে দাও ব্যাপারটা। কারণ আবিষ্কারটা তোমাদের।

নিখিল নবনীতার প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট তুলে নিল। পকেট থেকে লাইটার বার করে বাসু-সাহেবকে বললে, উইথ য়োর পারমিশন, স্যার।

নিজে সিগারেটটা ধরালো, নবনীতার লিপস্টিকরঞ্জিত ওষ্ঠাধরে ধৃত সিগারেটের সামনে অগ্নিশিখাটা ধরে দিল। নবনীতার আঙুলদুটো কাঁপছে। নার্ভাস আঙুলে সে সিগারেটটা ধরালো। একমুখ ধোঁয়া টেনে নিয়ে নাকমুখ দিয়ে ছাড়ল। বলল, বলুন, মিস্টার দাশ?

— চকলেট ক্যান্ডির প্যাকেটটার মোড়কের উপর আপনার নামটা লেখা ছিল আলাদা আঠা দিয়ে সাঁটা একটা কাগজে, টাইপ করা অবস্থায়। হাতের লেখায় নয়। আমরা পরীক্ষা করে বুঝেছি যে, আপনার নামটা টাইপ করা হয়েছে 'সোনালি স্বপন'-এর দোতলায় ম্যানেজারের ঘরে টেবিলে রাখা টাইপ-রাইটারে।

— তা কি আবার বোঝা যায় নাকি?

— যায়, মিস রায়। হস্তরেখাবিদ যতটা সন্দেহাতীত ভাবে বলতে পারেন দুটি হস্তাক্ষর একই ব্যক্তির কিনা, তার চেয়ে সুনিশ্চিতভাবে টাইপ-রাইটার স্পেশালিস্ট আজকাল বলে দিতে পারেন যে দুটি টাইপ করা কাগজ একই টাইপ-রাইটারে টাইপ করা কিনা। যদি না অবশ্য টাইপ-রাইটার দুটি আনকোরা নতুন হয়।

নবনীতা সিগারেটে আবার একটা মোক্ষম টান দিয়ে বললে, এমন অদ্ভুত কথা শুনিনি।

কৌশিক হঠাৎ বলে ওঠে, আপনি না শুনলেও এটা অপরাধবিজ্ঞানীরা সারা পৃথিবীতে মেনে নিয়েছেন। মানুষের হস্তাক্ষরের সঙ্গে হুবহু মিল দেখা গেলেও দেখা যেতে পারে, কিন্তু অন্তত ছ'মাস ব্যবহৃত হয়েছে এমন দুটি টাইপ-রাইটার কোন বিশেষজ্ঞকে ঠকাতে পারে না। ছাব্বিশটা অক্ষরের মধ্যে দু-একটা একটু অস্পষ্ট হয়ে যায়, কোনও আখর লাইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাণ ওপরে উঠে যায়, কেউ নিচে নেমে আসে। কোন কোন অক্ষরের—যেমন ধরুন d, b, o, e প্রভৃতির ঘেরা জমিটা ভরাট হয়ে যায়, হয়তো ক্যাপিটাল T, L, I, প্রভৃতির মাথার টুপি বা পায়ের জুতো ক্ষয়িত হয়ে যায়...

নবনীতা ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি ব্যক্তিটি কে?

বাসু তৎক্ষণাৎ বলেন, ওর নাম কৌশিক মিত্র, 'সুকৌশলী' গোয়েন্দা-সংস্থার সিনিয়র পার্টনার। টাইপ-রাইটারের ওই ব্যাপারটা নিয়ে ও একটা স্পেশাল কোর্সও করেছে। বলা যায়, ও এ বিষয়ে একজন এক্সপার্ট!

কৌশিক তার পকেট থেকে ওর নামাঙ্কিত একটা কার্ড বার করে সিগারেটের প্যাকেটের উপর রাখল। নবনীতা ভ্রূক্ষেপ করেও দেখল না। নীরবে ধূমপান করতে থাকে। নিখিল বলে, দ্বিতীয় কথা, যে কাগজটা দিয়ে ওই চকলেটের বাক্সটা জড়ানো ছিল সেই কাগজটা...

— সেই কাগজটা কী?

— বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করে বলেছেন, চকলেট ক্যান্ডিগুলি কোন নামকরা দোকান থেকে কেনা — ফ্লুরি, ক্যাথলিন বা সমপর্যায়ের কোনও খানদানী দোকান থেকে চকলেট ক্যান্ডিগুলো কেনা হয়েছে। ওই সব নামকরা দোকানে নিজস্ব র‍্যাপিং পেপার থাকে, দোকানের নামছাপা কাগজ। আপনার ওই খানদানী চকলেটগুলো খানদানী দোকানের, কিন্তু বাক্সটা জড়ানো ছিল যে কাগজে সেই র‍্যাপারটা বিলকুল সফেদ...

নবনীতা বলে, সেটাই তো প্রত্যাশিত। যে লোকটা প্রতিটি চকলেটে ওই কী যেন বিষ মিশিয়েছে সে র‍্যাপারটা খুলতে বাধ্য হয়েছে। হয়তো খুলতে গিয়ে সেটা ছিঁড়ে গেছে। তাই তাকে বাজার থেকে শাদা কাগজ কিনে ফের মুড়তে হয়েছে।

বাসু বিচিত্র হেসে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ নীতা, তবে সবটা ঠিক নয়। অর্থাৎ চকলেট-এ বিষ মেশানোর প্রয়োজনে আততায়ী র‍্যাপারটা ছিঁড়ে ফেলতে বাধ্য হয়। কিন্তু শাদা-কাগজ সে বাজার থেকে

কেনে না। 'সোনালি স্বপন'-এর গুদাম ঘরে যে র‍্যাপিং কাগজের বান্ডিল রাখা আছে, তার মাথার দিকের অংশটা ছিঁড়ে বাকি কাগজটা সে ব্যবহার করেছে।

নবনীতা বলে ওঠে, সেটা কিভাবে আন্দাজ করেছেন?

— না, না, আন্দাজ নয়, নীতা। আদালতে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। প্রতিটি কাগজের র‍্যাগ্-কন্টেন্ট, প্রতি বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের ওজন, কেমিক্যাল কম্পোজিশন এবং ট্রেড-মার্ক পৃথক। ট্রেড-মার্কটাকে ওয়াটার-মার্কও বলা হয়। এইসব পরীক্ষা করে বোঝা গেছে যে, আততায়ী 'সোনালী স্বপন'-এর ম্যানেজারের ঘরের টাইপ-রাইটারই শুধু ব্যবহার করে থামেনি, গুদাম থেকে র‍্যাপিং কাগজও সংগ্রহ করেছিল।

— আর কিছু?

— হ্যাঁ, র‍্যাপারটা যে আঠা দিয়ে জোড়া হয় তার কেমিক্যাল 'সোনালি স্বপন'-এর ম্যানেজারের ঘরে টেবিলে রাখা আঠার শিশির রাসায়নিক কম্পোজিশনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

— তা থেকে কী প্রমাণিত হয়?

— প্রমাণিত হয়, যে তোমাকে বিষমেশানো চকলেটগুলো পাঠায় সে তোমার অত্যন্ত কাছের লোক। সে ছায়ার মতো 'সোনালি স্বপন'-এর বিভিন্ন অংশে তোমাকে অনুসরণ করে। কী? আন্দাজ করতে পার লোকটা কে?

কুড়ি

নবনীতা নিশ্চুপ বসে রইল।

ইন্সপেক্টর দাশ তাগাদা দেয়, কী হল? হ্যাঁ, না, কিছু একটা বলুন?

নবনীতার হয়ে বাসু-সাহেব নিজেই বলে ওঠেন, না নিখিল, এমন মারাত্মক শত্রুর কথা ও মনে করতে পারছে না। কোনো আন্দাজও করতে পারছে না। আমি আগেও প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু 'সোনালি স্বপন' এস্ট্যাবলিশমেন্টের ভিতর এমন কোন জাতশত্রুকে ও চিহ্নিত করতে পারছে না। আমি বরং অন্যদিক থেকে প্রশ্নটা ট্যাক্‌ল্ করি।

নবনীতার দিকে ফিরে বললেন, আমাদের কেমিস্টের কথা শুনে ডিটেক্‌টিভদের মনে হয়েছে যে লোকটা চকলেট-এ বিষ মিশিয়েছে সেই আততায়ীর চকলেট কারখানায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। কারণ প্রথমে চকলেট-ক্যান্ডির মাথা থেকে নিপুণ হাতে ব্লেড দিয়ে ক্রীমটা এমনভাবে কেটে নেওয়া হয়েছে যাতে সেটা ভেঙে বা ফেটে না যায়। তারপর ক্রীমের টুপিটা সরিয়ে চকলেট-কেকের মাঝখানে ড্রিলার দিয়ে সিকি ইঞ্চি ব্যাসের একটা ফুটোও তাকে নিপুণ হাতে করতে হয়েছে — নজর রেখে যে কেকটা যেন ভেঙে না যায়। এরপর ভেরোনাল ট্যাবলেট চূর্ণ মিশিয়ে মেরামত করে ক্রীমের টুপিটা আবার পরিয়ে কাপে বসানো হয়েছে, যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়। লোকটা রীতিমত এক্সপার্ট। বারোটা চকলেটের ভিতর অন্তত শেষের ছটার একটাও ফেটে যায়নি।

নবনীতার সিগ্রেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা সে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললে, এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?

— না, মানে, আমি তোমার ওপিনিয়নটা চাইছি। যে তোমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছে সে একজন অভিজ্ঞ চকলেট-কর্মী। তাই নয়?

— তা আমি কেমন করে জানব?

— বাঃ। তুমিই তো জানবে নীতা। তুমি নিজেই যে কয়েক মাস চকলেট কারখানায় কাজ করেছ। সে কথাই না বলেছিলে সেদিন?

নবনীতা এবার সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, লোকটার এলেম আছে। আমি যে ছয়টা চকলেট খাই সেগুলোর মধ্যেও কোনটা ভাঙা বা ফাটা ছিল না।

— অথচ লোকটা তোমাকে হত্যা করতে চায়নি।

— চায়নি? কেমন করে বুঝলেন? তবে বিষ মিশিয়েছিল কেন?

— সে কেমন করে জানবে যে, তুমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ছয়-ছয়টা চকলেট-ক্যান্ডি খেয়ে ফেলবে? প্রথম ক্যান্ডিটা তো তুমি বাড়িতে পৌঁছানোর পর খাও। তাই তো বলেছিলে সেদিন?

— হ্যাঁ, সোনালি স্বপন-এ বা বাসে আমি খুলে দেখিনি প্যাকেটে কী আছে।

— কারেক্ট। কিন্তু আমাকে যখন ফোন করতে শুরু কর ততক্ষণে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলে যে, চকলেটগুলোতে বিষ মেশানো ছিল? তখন তো তুমি ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছিলে।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ততক্ষণে আমি সে কথা বুঝতে পেরেছিলাম।

— কিন্তু আমার টেলিফোন নাম্বারটা তুমি পেলে কোথায়?

নবনীতা রুখে ওঠে, আপনি একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, স্যার। আপনার নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার তো গাইড-বইতেই আছে।

— কারেক্ট। আমার প্রশ্নটা তা নয়। আমি ব্যাপারটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছি। তুমি সাতটা নাগাদ 'সোনালি স্বপন'-এ ওই প্যাকেটটা পাও। সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়িতে চলে এসেছিলে। পাঁচ সাত মিনিট কেটে যায় মুখ-হাত ধুতে। তারপর সাতটা পঁয়ত্রিশ থেকে প[illegible] মিনিটের মধ্যে ছয়টা চকলেট ক্যান্ডি খেয়েছিল — কারণ আমাকে ফোন করেছিলে ঠিক আটটা[illegible]নালি স্বপন'-এ অন্তত দুই পেগ ভদ্‌কা খেয়েছিলে, যদি না আগে ও দু-এক পেগ খেয়ে থাক। ফলে একটু টিপ্‌সি ছিলেই। মদের নেশায় মিষ্টি ক্ষতিকারক। তার উপর চকলেট ক্যান্ডি[illegible]নিয়া নেশাতেও তুমি ঢলে পড়ছিলে। তুমি বুঝতে পেরেছিলে যে, চকলেটে বিষ আছে। [illegible]ঘুরছিল। এমন অবস্থায় তোমার পক্ষে কোন্‌টা স্বাভাবিক?

নবনীতা অবাক চোখে তাকিয়ে বলে, কোনটা?

— আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়া। সবার আগে টেলিফোন ডাইরেক্টরির প্রথম পাতায় যেসব এমার্জেন্সি নম্বর আছে — পুলিসের, অ্যাম্বুলেন্সের, সেই জাতের ফোন নম্বর ডায়াল করা। অথবা তোমার পরিচিত কোন ডাক্তারকে। সব চেয়ে বড় সম্ভাবনা দরজার ইয়েল লকটা খুলে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে চিৎকার করে তিনতলার মেসোমশাইকে ডাকা। সেই মুহূর্তে তুমি ডাইরেক্টরি হাতড়ে নম্বর খুঁজে খুঁজে আমাকে ফোন করলে কেন, নীতা?

— আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে পারব না, এই কথা জানাতেই ফোনটা করেছিলাম। কিন্তু ফোনটা করতে করতে যখন মনে হল আমার শরীরে বিষক্রিয়া হচ্ছে তখন তো আমি আপনাকেই অনুরোধ করলাম অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে।

কেউ কোন জবাব দিল না। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা ঘিরে ধরল ঘরটাকে। নীতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, কী হল? কেউ কিছু বলুন?

বাসু বলেন এ পর্যন্ত যেটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি বরং তার একটা চুম্বকসার দাখিল করি। তা থেকে পরবর্তী যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের জন্য হয়তো নতুন সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। যে লোকটা তোমাকে বিষাক্ত চকলেটের প্যাকেট পাঠিয়েছে তার 'সোনালী স্বপন' রেস্তোরাঁয় বিভিন্ন অংশে যাতায়াত আছে — ম্যানেজারের ঘর, গুদামঘর। ম্যানেজারের টাইপ-রাইটার ব্যবহারও করে — ফলে, সে ওই রেস্তোরাঁর ভিতরের কেউ একজন। দ্বিতীয়ত, তার চকলেট ফ্যাক্‌ট্রিতে কাজ করার অভিজ্ঞতাও বিলক্ষণ আছে, না হলে অমন সুনিপুণভাবে প্রতিটি চকলেটে সে বিষ মেশাতে পারত না। তৃতীয়ত, লোকটা তোমাকে খুন করতে চায়নি, কারণ তুমি যে আধঘণ্টার ভিতর ছয়টা চকলেট খেয়ে ফেলবে এটা সে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারে না। তুমি যদি দৈনিক তিনটে করে চারদিনে বারোটা বিষাক্ত

ক্যান্ডি খেতে তাহলে রাতে গাঢ় ঘুম ছাড়া আর কিছুই হত না তোমার। সবটা মিলিয়ে আমি দেখছি, এ পৃথিবীতে একটি মাত্র ব্যক্তিই এই সবগুলি শর্ত পূরণ করতে পারে — যে 'সোনালি স্বপন'-এর সর্বত্র যেতে পারে, যে চকলেট কারখানায় কাজ করেছে এবং যে তোমাকে হত্যা করতে চায় না বটে, তবু তোমাকে বিষাক্ত খাদ্য পাঠিয়েছে একটা বিশেষ হেতুতে।

নবনীতা রুখে ওঠে, এমন লোক আপনার নজরে পড়েছে?

— হ্যাঁ — তুমি নিজে।

নবনীতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, আবার বসে পড়ে। অস্ফুটে বলে, বাঃ! আমি নিজেই!

— হ্যাঁ, নীতা। এছাড়া আর কোন সমাধান নেই। তুমিই 'সোনালি স্বপন'-এর টাইপ্-রাইটারে নিজের নাম টাইপ করেছ। চকলেটগুলো ট্যাম্পার করেছ, দোকানের গুদাম থেকে শাদা র‍্যাপার কাগজে প্যাকেটটা জড়িয়েছ। তার উপর আঠা দিয়ে নিজের নাম লেখা কাগজটা সেঁটেছ। অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে। কাকলি তোমাকে ওই ডায়েরিটা উপহার দেওয়ায় তোমার সুযোগ হয়ে গেল। ভাবখানা, তুমি যেন ধরে নিয়েছ চকলেট-ক্যান্ডি কাকলি পাঠিয়েছে।

নবনীতা ব্যঙ্গোক্তি করে ওঠে, বাঃ! কী চমৎকার সমাধান। আমি নিজেই আমাকে বিষাক্ত চকলেট পাঠিয়ে তা গবগব করে খেয়েছি। কেন? আমি কি পাগল?

ইন্সপেক্টর দাশ কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। তাকে ধমকে ওঠেন বাসু, শাট আপ। তোমার সময় এখনো আসেনি ইন্সপেক্টর দাশ। শী ইজ স্টিল মাই গেম।

তারপর নবনীতার দিকে ফিরে বললেন, না, নীতা। তুমি বিষাক্ত ক্যান্ডি একটাও খাওনি।

— ও! খাইনি। নার্সিংহোমের ডাক্তার আমার স্টম্যাক পাম্প করে চকলেট আর ভেরোনাল পাননি? আমি ডাক্তারকেও বোকা বানিয়েছি? টেম্পারেচার বাড়িয়ে, ব্লাডপ্রেশার নামিয়ে। নাকি তিনি মিথ্যা কথা বলছেন? কিন্তু কেন? কেন এসব করেছি আমি বা ডাক্তারবাবু?

— কেন করেছ সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপাতত বলি, — না, বিষাক্ত ক্যান্ডি তুমি খাওনি। সময় ও সুযোগমতো মেজারিং গ্লাসে মেপে অনেকটা ভেরোনাল অবশ্য তুমি খেয়েছিলে। আর চকলেট — যা বিষাক্ত নয়।

নবনীতা উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনাদের সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ধন্যবাদ। এবার দয়া করে আসুন। কারণ আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি বেরুব।

বাসু সে কথায় কান না দিয়ে একই ভঙ্গিতে বলেন, তোমার জবানবন্দি অনুসারে তুমি এঘরে পৌঁছবার পর, রুদ্ধদ্বার কক্ষে চকলেট-ক্যান্ডিগুলো খেতে শুরু কর। আধ ঘণ্টায় ছয়টা চকলেট খেয়েছ তুমি। ফর য়োর ইনফরমেশন, তুমি নার্সিং-হোমে চলে যাবার পরে আমরা তোমার ঘর, তোমার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, কিচেনের ময়লাফেলা টুকরি এবং জানলার বাইরে গলিপথটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও ছয়টা কাগজের কাপের একটাও অংশ খুঁজে পাইনি। তুমি কি বলতে চাও যে, চকলেটের সঙ্গে কাগজের কাপগুলোও তুমি খেয়ে ফেলেছিলে? তাও কিন্তু তোমার স্টম্যাক ওয়াশে পাননি ডক্টর ব্যানার্জি।

নবনীতা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

বাসু বলেন, এটা তোমার প্রকাণ্ড ভুল। দু-নম্বর ভুল হচ্ছে, আমার সঙ্গে কথোপকথনের শেষে টেলিফোনের রিসিভারটা স্বস্থানে বসিয়ে দেওয়া। তখনো তোমার পুরো জ্ঞান ছিল। তোমার অন্তত উচিত ছিল আঁচল দিয়ে টেলিফোনের ফিঙ্গার-প্রিন্টগুলো মুছে দেওয়া। কারণ অন্য কোন লোক, যদি তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর তোমার ঘরে ঢোকে — ডুপ্লিকেট বা ট্রিপলিকেট চাবি দিয়ে দোর খোলে, তাহলে — সে আততায়ী হলে টেলিফোনটা ক্র্যাডলে বসিয়ে যাবে না। যদি নিতান্তই যায়, তাহলে সব প্রিঙ্গার-প্রিন্ট মুছে যাবে। তা সে যায়নি। তার মানে, তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর অন্য কেউ তোমার ঘরে আসেনি। তুমি নিজেই অভ্যাসবশে ওই টেলিফোনের জঙ্গম অংশটা তার স্থাবর ধারক অংশে বসিয়ে

দিয়েছিলে। তাতে শুধুমাত্র তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টই পাওয়া গেছে। আততায়ীর নয়।

নবনীতা একে একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার মনে হল, ওর ঘরে পাশাপাশি যারা বসে আছে তারা রক্তমাংসের জীব নয়, মাদাম তুসোর মোমের নিষ্প্রাণ মূর্তি।

রীতিমতো নার্ভাস হয়ে সে আবার একটা সিগ্রেট ধরালো। জ্বলন্ত কাঠিটা নাড়তে নাড়তে ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। এখন সে বাসু-সাহেবের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। নতনেত্রে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললে, আপনি বদ্ধ উন্মাদ! আমি নিজেই কেন নিজেকে বিষ মাখানো চকলেট পাঠাব? আমার উদ্দেশ্যটা কী?

বাসু-সাহেব সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, কারণ তোমার একটা জব্বর অ্যালেবাই দরকার ছিল।

— অ্যালেবাই! কীসের অ্যালেবাই?

— জীবন হালদারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার।

এতক্ষণে মেয়েটি ওঁর চোখে চোখে তাকায়। বলে, ও, ও! বুঝেছি। তার মানে আপনি একটা থিয়োরি খাড়া করেছেন যে, আপনার ধনী মক্কেল নয়, আমিই খুনটা করেছি। তাই নয়? কিন্তু খুনটা হয়েছে মিস কাকলি দত্তের রিভলভারে। আপনি ভুলে গেছেন যে, চকলেটে যখন ভেরোনাল মেশানো হয় — তা সে যেই মেশাক, তখনো আমার সঙ্গে কাকলি দত্তের আলাপই হয়নি। তার রিভলভার আমি পেলাম কোথায়? কীভাবে?

বাসু ধীরে-সুস্থে পাইপটা ধরালেন। বললেন, বিশ্বাস কর নীতা, এ ঘরের ভিতর অন্তত তিনজন তা জানে। একজন তুমি, একজন ইন্সপেক্টার দাশ, আর একজন আমি। তুমিই সেটা আর সবাইকে জানাও।

নীতা নির্বাক কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। তারপর ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, কিন্তু জীবন হালদার খুন হয়েছে — ওই পুলিসের ডাক্তারের মতে রাত নটার সময়, আর আপনার হিসাবমতো আমি আপনাকে এ ঘর থেকে ফোন করি রাত আটটায় ; আপনি এই রুদ্ধদ্বার ঘরের দরজা ডুপলিকেট চাবি দিয়ে খুলে আমাকে উদ্ধার করেন রাত নটা পঁয়তাল্লিশে। টাইম ফ্যাক্টরে একটু গড়বড় হয়ে যাচ্ছে না, স্যার? আপনি নিজেই সাক্ষী যে, জীবন হালদারের মৃত্যুর সময়ে আমি এই রুদ্ধদ্বার ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি।

— না, নীতা ; সেটাই প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা তুমি করেছিলে — বজ্র-বাঁধুনি অ্যালেবাই — কিন্তু কয়েকটা ফসকা গেরো পড়ায় সেটা আটকালো না। অ্যালেবাইটা দাঁড়াচ্ছে না।

— ফসকা গেরো মানে?

— ওই টেলিফোনের রিসিভারে টেলিফোনটা ফিরে যাওয়া, ওই ক্যান্ডি-চকলেটের কাগজগুলো তোমার ঘরে ফেলে না রাখা, ওই 'সোনালী স্বপন'-এর কাগজ-আঠা-টাইপ-রাইটার ব্যবহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবনীতা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, জীবন হালদারকে আমি খুন করব কেন? ওই শেয়ারের গোছাটার জন্য? তা তো চুরি করেছে আপনার মক্কেল।

— না, নীতা। জীবন হালদারকে তুমি খুন করতে চেয়েছিলে ভিন্ন কারণে। তার হাত ধরেই তুমি একদিন গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলে, অনেক 'সোনালি স্বপ্ন' বুকে করে। এসে দেখলে এ এক আজীব 'সোনালি স্বপন' — যেখানে তোমাকে সাকীর চরিত্রে অভিনয় করতে বলা হল। জীবন হালদার তোমাকে মদ ধরালো, সিগ্রেট ধরালো, ড্রাগ ধরাবার চেষ্টা নিশ্চয় করেছিল, পেরেছিল কিনা তা তুমিই জানো। কারণ তোমার দেহটা ভোগ করার পর সে চেয়েছিল তোমার অকুণ্ঠ বশ্যতা অথবা মৃত্যু। তুমি অপ্রতিবাদ বশ্যতা মানতে রাজি হলে না — 'কলগার্ল' হতে, দেহোপজীবিনী হতে স্বীকৃতা হলে না — জীবন তোমাকে ত্যাগ করে মোমিনপুরের বাসায় গিয়ে ডেরাডাণ্ডা গাড়ল।

নবনীতা রুখে ওঠে, ওসব অবান্তর অবোল-তাবোল কথা বাদ দিয়ে বলুন, রাত নয়টায় আমি কী ভাবে....

— বলছি নীতা। অত অধীর হয়ো না। ওতে তোমার গিল্ট-কনশাস মনের প্রতিচ্ছবিই ধরা পড়ছে। তুমি যদি এসব না করে থাক তাহলে নির্লিপ্তভাবে গল্পটা শুনেই যাও না। উত্তেজিত হচ্ছ কেন? এসব সত্য না হলে আমি তো প্রমাণ করতে পারব না।

— কী সব সত্য না হলে?

বাসু-সাহেব একই ভঙ্গিতে বলে চলেন, কেন তুমি জীবনকে খুন করতে আগ্রহী তোমার সেই মোটিভটার কথা বলেছি। এবার বলি কাজ হাসিলের পন্থাটা : 'মোডাস অপারেন্ডি'। জীবন হালদার তোমার জীবনে শনির মতো প্রবেশ করে সব কিছু ছারখার করে দিয়েছে। গ্রামে বা সমাজে ফিরে যাবার পথ তোমার নেই। তুমি বারে বারে শিকল কেটে বার হতে চেয়েছ — চকলেট তৈরির কারখানায়, অন্যত্র; কিন্তু ফিরে আসতে হয়েছে 'সোনালি স্বপন'-এর কারাগারে। এখানে কেউ তোমার দিকে হাত বাড়াতে সাহস পায় না — কারণ সবাই জানে : তুমি জীবন হালদারের সম্পত্তি। অথচ বাস্তবে তুমি তা নও। এজন্য তুমি চরম প্রতিশোধ নিতে চাইলে। কিন্তু জীবন হালদার মস্তান-পার্টির 'গুরু'। সর্বদা দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত, সর্বদাই হাতিয়ার-বন্দ্। সে তোমার ঘরেও আসে না যে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে খতম করবে। এই সময় তোমাকে দেওয়া হল একটা নতুন কাজ। যাদুগোপালকে কব্জা করে শেয়ারগুলো হাতানো। তাহলে তুমি নাকি মুনাফার টেন পার্সেন্ট পাবে। কী দুর্ভাগ্যের কথা! তুমিই যাদুগোপালকে তাতিয়ে শেয়ারগুলো আদায় করে দিলে, অথচ জীবন হালদার তোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালো। বরং খবর পেলে সে নতুন পুতুল খেলায় মেতেছে। কাকলিকে তুমি বলেছিলে, মেয়েটি জীবন হালদারের ফ্ল্যাটে সারারাত ধরে ইন্টারভিয়্যু দেবে।

বাসু-সাহেব দম নিতে থামলেন। আসলে তাঁর পাইপে আগুনটা নিবে গেছিল। সেটা ধরিয়ে নিতে বিশ সেকেন্ড সময় লাগলো। কিন্তু কেউ কোন শব্দ করল না। পাইপে একটা টান দিয়ে বললেন : পর পর ছপ্পড় ফুঁড়ে-দু-দুটো সুযোগ এসে গেল তোমার হাতে — এক নম্বর রিভলভারটা, দু নম্বর সময়মতো পাঠানো কাকলির ডায়েরি এবং আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট!

এবার কাকলি কথা বলে উঠে, রিভলভার বলতে? কোন্ রিভলভার?

বাসু এদিকে ফিরে বললেন, তোমারটাই কাকলি। সেটা অনেকদিন আগেই যাদুগোপাল তোমার দিদির বেড-লকার থেকে হস্তগত করেছে। লোডেড অবস্থায় ওটা নিয়েই সে ঘোরাফেরা করত। তুমি বা তোমার দিদি টের পাওনি। 'বিজলি' সিনেমার সামনে যেদিন অ্যাকসিডেন্ট হয় সেদিনও লোডেড রিভলভারটা ছিল ড্যাশ-বোর্ডের গ্লাভ্ কম্পার্টমেন্ট-এ। কলিশনের ধাক্কায় ওই পাল্লাটা খুলে যায়। যাদুগোপাল তখন রাস্তায় নেমে পুলিস, জনতা এবং অপর গাড়ির মালিকের সঙ্গে তকরার করছে। নবনীতা বসেছিল ড্রাইভারের পাশের সীটে। তার হঠাৎ নজরে পড়ে যায় যন্ত্রটা। দ্রুত হাতে সে ওটা নিজের ব্যাগে ভরে নেয়।

সুজাতা বলে, আপনি এত কথা কেমন করে জানলেন?

— আস্ক নিখিল। ধরা পড়ার পর যাদুগোপাল কনফেস করেছে। রিভলভারে কী করে তার আঙুলের ছাপ এল তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে। সে স্বীকার করেছে, অ্যাকসিডেন্টের পর ওর গাড়ির লাইট ভাঙে, মাডগার্ড তুবড়ে যায়, কিন্তু গাড়িটা চালু ছিল। পুলিসের অনুমতি পেয়ে সে গাড়িটা রিপেয়ার-শপে জমা দিতে গিয়ে টের পায় রিভলভারটা খোয়া গেছে। ও সন্দেহ করেনি যে, নবনীতা সেটা নিয়েছে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে যাওয়াটাই ও বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে। কারণ ওই রিভলভার 'ক্যারি' করার অধিকার ওর ছিল না। আর মালটা ওর চোরাই — নিজের নয়, শালীর।

হঠাৎ নিখিলের দিকে ফিরে বলেন, নাকি যাদুগোপাল বুঝতে পেরেছিল যে, ধাক্কা লেগে গ্লাভস

কম্পার্টমেন্টের পাল্লাটা খুলে যায় আর নীতাই সেটা নিয়েছে?

ইন্সপেক্টর দাশ বললে, বুঝতে পেরে থাকলেও সে কথা স্বীকার করেনি। সে শুধু বলেছিল : ওই দিন যন্ত্রটা খোয়া যায়। রিভলভারে তার আঙুলের ছাপ কী করে এল এটুকুই তো সে কৈফিয়তে বোঝাচ্ছিল।

বাসু বললেন, কী নবনীতা, তুমি স্বীকার করছ এ কথা?

নবনীতা বলল, আপনি কোন অধিকারে আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে এসব আবোল-তাবোল প্রশ্ন করছেন?

বাসু-সাহেব জবাব দেবার আগেই ইন্সপেক্টর দাশ বলে, আর ওঁর বদলে প্রশ্নটা যদি আমি করি?

নবনীতা উঠে দাঁড়ায়। বলে, সেক্ষেত্রে আমার নামে আগে ওয়ারেন্ট বের করে আনুন। আমাকে অ্যারেস্ট করুন। নাউ, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন! ঘরটা আমার! আপনারা এবার আসুন। আমি একটু বেরুব।

উত্তেজনায় নবনীতা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর সবাই যে-যেমন বসে।

ইন্সপেক্টর দাশ গম্ভীর স্বরে বললে, মিস রায়, আপনি যদি আমাকে বাধ্য করেন তাহলে আসুরিক চিকিৎসার ব্যবস্থাই আমাকে করতে হবে। অর্থাৎ এখান থেকে টেলিফোন করে আধঘণ্টার মধ্যে লালবাজার থেকে আপনার বডি-ওয়ারেন্ট করিয়ে এনে। আমি সৌজন্যবোধে সেটা এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম। কারণ হয়তো আপনি ঘটনাটায় জড়িয়ে পড়েছেন মাত্র। অর্থাৎ নির্দোষ। এভাবে হাতকড়া পরিয়ে পুলিস হাজতে আপনাকে টেনে নিয়ে যাওয়াটা সেক্ষেত্রে নিরর্থক। অপরপক্ষে মিস্টার বাসু যা বলছেন তা লজিকাল, যুক্তিপূর্ণ ঘটনা-পরম্পরা। আপনি যদি আপনার তরফে যা বক্তব্য, বাস্তবে যা সত্যি সত্যি ঘটেছিল সেটুকু স্বেচ্ছায় বলেন, তাহলে এই আসুরিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে না। এই আর কি। বসুন।

নবনীতা ওর শেষ নির্দেশটা অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, ওঁর ঐ আষাঢ়ে গল্পের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে আমি নিজেই নিজেকে মামলায় জড়িয়ে ফেলি এটাই আপনি চাইছেন। সেটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে আছে, মিস্টার দাশ। আমি কোন কথা বলব না।

কেউ কোন জবাব দেয় না। নবনীতা দাঁড়িয়ে। বাকি সবাই মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে।

মিনিটখানেক পরে নবনীতাই আবার বলে ওঠে, এটা কী হচ্ছে? নতুন ধরনের 'থার্ড ডিগ্রী'? আমার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা? আপনাদের আর কারও কিছু বক্তব্য না থাকলে যে-যার বাড়ি যান।

ইন্সপেক্টর দাশ বললেন, আমরা প্রতীক্ষা করছি নবনীতা দেবী। আপনার জবাবের, আপনার কৈফিয়তের, আপনি কেন নিজেই নিজেকে বিষাক্ত চকলেটগুলো প্রেজেন্ট করেছিলেন?

নবনীতা রুখে ওঠে, বেশ, প্রতীক্ষা করুন। শবরীর মতো। জন্মজন্মান্তর। আমি কোন জবাব দেব না।

এবার সে বসে পড়ে তার চেয়ারে।

বাসু-সাহেব এই অচলাবস্থায় আর একবার নৌকার হালটার দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, শোন নবনীতা, তুমি আমার থিয়েটারিটাকে আষাঢ়ে গল্প বলেছ। তার দুটো হেতু হতে পারে। প্রথমত : যেহেতু তুমি নিজেই কাহিনীটার মধ্যমণি তাই তা তোমার কাছে বাস্তবে আজগুবি না লাগলেও তাই লাগছে বলে মতামত দিয়েছ। দ্বিতীয় সম্ভাবনা : আমার গল্পটা শেষ করার সুযোগ আমি পাইনি। গল্পের মাঝখানেই নানান কথাবার্তা উঠে পড়ায় কাহিনীটা অসমাপ্ত আছে। হয়তো, সেজন্যই এটাকে তোমার আষাঢ়ে আজগুবি লাগছে। তাই আমার প্রস্তাব : আমার গোটা গল্পটা শোন। না, না, কথা বল না নবনীতা, কোনও কথা বল না। কথা যত বলবে ততই তুমি নিজেই নিজেকে হয়তো 'ইনক্রিমিনেট' করে ফেলবে — নিজের ফাঁদেই নিজে জড়িয়ে পড়বে। বোবার তো আর শত্রু নেই। তুমি নিশ্চুপ বাকি গল্পটা

শুনে যাও।

রিভলভারটা হস্তগত হবার পর তুমি বিষাক্ত চকলেটটা বানাও। না কি তার আগে? কী জানি! তার প্রমাণ নেই। আমার ধারণা, রিভলভারটা হস্তগত হবার পরেই তুমি অ্যালেবাই-এর জন্য প্রস্তুত হও — ঐ চকলেটগুলো কিনে আনো। তুমি ঐ বাক্সের নিচের সারির ছয়টি চকলেটের প্রতিটিতে পাঁচ গ্রেন করে ভেরোনাল মেশাও। ওপরের ছয়টিতে নয়। আই রিপীট, ওপরের ছয়টি চকলেটে নয়। যেদিন সন্ধ্যায় কাকলি তোমার সঙ্গে 'সোনালি স্বপন'-এ দেখা করে সেদিনই সকালে তুমি — এটাও আমার আন্দাজ — দু-দুটি মানসিক আঘাত পেয়েছিলে। প্রথমত, জীবন হালদার পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক জানিয়ে দিয়েছিল শেয়ারভ্যালুর প্রতিশ্রুত দশ-পার্সেন্ট বখরা সে তোমাকে দেবে না। দ্বিতীয়ত, কোন একটি সূত্রে তুমি জানতে পেরেছিলে তোমার স্থলাভিষিক্ত হতে বসেছে যে নবযৌবনা সে সেই রাত্রেই জীবন মস্তানের মোমিনপুরের ডেন-এ একরাতের জন্য ইন্টারভিয়ু দিতে আসছে। এ জন্যই তোমার মনমেজাজ খারাপ ছিল। কাকলির সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই তুমি কয়েক পেগ ভদ্‌কা পান করে বুঁদ হয়ে বসেছিলে। কাকলি যখন তোমাকে অনুরোধ করল সাড়ে নটার সময় আমার চেম্বারে আসতে, আমার বিশ্বাস তখনই তুমি সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেল। কাকলির ডায়েরি পাবার পর তুমি ইলিয়ট রোডে চলে এসেছিলে। সম্ভবত জীবনকে একটা টেলিফোন করে জেনে নিতে যে, সে মোমিনপুরের বাসায় আছে কিনা, একা আছে কিনা। হয়তো তুমি ওখানে গিয়ে মুখোমুখি কথা বলতে চেয়েছিলে, জীবন দৃঢ়স্বরে তোমাকে নিষেধ করে। তাতেই তুমি বুঝতে পার, জীবন তার নতুন খেলনার জন্য প্রতীক্ষায় আছে : যে মেয়েটি সারারাত ইন্টারভিউ দিতে আসছে। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি বুঝতে পারলে যে, জীবন নিশ্চয় একাই আছে, দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে কেউ নয়া চাকের মধু আস্বাদন করে না। তুমি দেখলে ঘড়িতে তখন আটটা বাজতে পাঁচ। টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতড়ে আমার নম্বর বের করে আমাকে ফোন করলে। পতন ও মূর্ছার অভিনয় শেষ করে অভ্যাসবশে টেলিফোনটা ক্র্যাডলে রেখে তুমি ঘর ছেড়ে বার হলে। সঙ্গে যাদুগোপালের গাড়ি-থেকে-উদ্ধার করা রিভলভারটা, তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে ছয়টা নির্দোষ চকলেট, একটা পকেট-টর্চ আর একটা ছোট্ট শিশিতে ষাট-গ্রেন ভেরোনাল। ট্যাক্সিতে আসতে আসতে ছয়টা নির্দোষ চকলেট তুমি খেয়ে ফেল, জানলা দিয়ে পেপার কাপগুলো ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে। জীবনের বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে ট্যাক্সি থামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছিলে। যাতে, পরে পুলিস অফিসার ট্যাক্সিচালককে সাক্ষী হিসাবে আদালতে না তুলতে পারে। তারপর অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে তুমি ওর বাসায় গিয়েছিলে। সেখানে কী হয়েছিল তার বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মোটকথা, মৃত জীবন টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় তুমি ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আস। রিভলভারটা অকুস্থলে ফেলে রেখে। নিজের আঙুলের ছাপ মুছে দিয়ে এবার রাস্তায় এসে আবার একটি ট্যাক্সি ধর। ট্যাক্সিতে উঠেই ষাট গ্রেন ভেরোনাল গলায় ঢেলে শিশিটা ফেলে দাও। ইলিয়ট রোডে পৌছে সাড়ে নয়টা নাগাদ যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছ তখন তোমার ঘুম-ঘুম পেতে সবে শুরু করেছে। দ্বিতলে উঠে এসে তালা খুলে ঘরে ঢোক। সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পড়।.....তুমি জানতে যে, তোমার ঠিকানা আমি জানি না। সাড়ে নটার আগে কাকলির পাত্তাও আমি পাব না। কাকলির পাত্তা পেলে বড় জোর 'সোনালি স্বপন'-এর ঠিকানাটা জোগাড় হবে, কিন্তু সেখানে কেউ তোমার বাড়ির ঠিকানা জানে না। ফলে, তোমাকে উদ্ধার করতে করতে মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। তার মানে, রাত আটটা থেকে সারারাতের জন্য তোমার বজ্রবাঁধুনি অ্যালেবাই পাক্কা! ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর অ্যালেবাই। অটোপ্সি-সার্জেন মৃত্যুর সময় আটটা থেকে বারোটা যাই বলুন না কেন।

একুশ

বাসু থামলেন। কেউ কোন কথা বলে না। দায়টা ইন্সপেক্টর দাশের। ফলে তাঁকেই বলতে হল, মিস রায়, বাসু-সাহেবের আষাঢ়ে গল্পটা শেষ হয়েছে। এনি কমেন্টস্? কিছু বলবেন?

নবনীতা এতক্ষণে সামলেছে। বললে, সরি স্যার, নো কমেন্টস্।

— তা'হলে লালবাজারে হোমিসাইড সেকশনে ফোন করে আপনার বডি-ওয়ারেন্ট করিয়ে আনবার ব্যবস্থা করি?

— করুন। কিন্তু সেখানে গিয়েও কোন লাভ হবে না। কারণ আমি কোন কথা বলব না। এমনকি আমার নাম কী এ প্রশ্নের জবাবও দেব না। বাসু-সাহেবের মতো পণ্ডিত আমি নই। তবে সাংবিধানিক অধিকার সম্বন্ধে আমারও কিছু ধারণা আছে। যতক্ষণ আমার তরফের আইনজীবী উপস্থিত না হচ্ছেন ততক্ষণ আমি বোবা-কালা।

বাসু বলেন, ফেয়ার এনাফ। এ বিষয়ে নিশ্চিত তোমার সাংবিধানিক অধিকার আছে। যদি তুমি স্বহস্তে স্বেচ্ছায় জীবন হালদারকে খুন করে থাক তাহলে নিশ্চয় তুমি বোবা-কালা হয়ে একরাত হাজতে কাটিয়ে দেবে, যতক্ষণ না তোমার আইনজীবী উপস্থিত হন। কিন্তু নবনীতা, যদি তুমি আত্মরক্ষার্থে গুলি করে থাক, অথবা কোন দুর্ঘটনাজনিত-কারণে তোমার রিভলভার নিক্ষিপ্ত গুলিতে জীবন হালদারের মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে কিন্তু এখনই তা বলতে হবে।

— কেন? এখনি কেন?

— কারণ, এখন যদি তুমি নীরব থাক, এবং পরে বলতে চাও যে, আত্মরক্ষার্থে বা ঘটনাচক্রে জীবন হালদার তোমার হাতেই খুন হয়েছে, তখন তা বিশ্বাস করানো অত্যন্ত কঠিন হবে। আদালত স্বতই মনে করবেন, তুমি তোমার পক্ষের উকিলের পরামর্শ মতো সাজানো একটা 'আষাঢ়ে গল্প' বলে চলেছ।

— এখন তো আপনারা বলতে পারেন, আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি।

— বানিয়ে বলতে পার, কিন্তু এই তাৎক্ষণিক জবানবন্দি 'শেখানো বুলি' এ অভিযোগ কেউ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, — আমি জানি না কিন্তু তুমি জান, সত্যিই যদি আত্মরক্ষার্থে বা অ্যাকসিডেন্টালি তুমি গুলি করে থাক তাহলে তার তৃতীয় কোনও সাক্ষী থাকলেও থাকতে পারে। হয়তো সে নিজের জান বাঁচাতে নীরব আছে। লুকিয়ে আছে। পুলিস যদি এখনি টাটকা : টাটকি সে রকম সাক্ষীকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে যে, তোমার এই তাৎক্ষণিক প্রদত্ত এজাহার সত্য, তাহলে তার অসীম মূল্য। তিন দিন পরে সেই এভিডেন্সটা প্রমাণ করা হলে আদালত স্বতই মনে করতে পারে যে, এ এক ভাড়া করা মিথ্যাসাক্ষী, উকিলের শেখানো বুলি তোতাপাখির মতো কপচে যাচ্ছে।

নবনীতা পুরো একমিনিট স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর মুখ তুলে বলে, আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথাই বলছেন, স্যার। আমি এক দুর্ভাগিনী। আজ্ঞে না, আত্মরক্ষার্থে গুলিটা আমি করিনি। এটা নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা—পিওর অ্যাকসিডেন্ট। নিজেকে নির্দোষ আমি বলব না, কারণ হত্যার সিদ্ধান্ত আমি একসময় নিয়েছিলাম। কিন্তু ওকে নিজে হাতে খুন করার সৌভাগ্য আমার হল না। নিতান্ত দুর্ঘটনায় শেষ হয়ে গেল শয়তানটা।

বাসু ঝুঁকে পড়ে বলেন, ঐ দুর্ঘটনার কোনও সাক্ষী নেই, না নবনীতা?

: না, স্যার, আছে। তাকে আমি চিনি, কিন্তু সে আমাকে চেনে না। তাই সব কথা আমি এখনই বলে যাব। তার নাম-ঠিকানাও জানাব, আপনারা সেই সাক্ষীকে ডেকে এখনই যাচাই করে দেখুন।

নবনীতা থামল। কেউ কোন প্রশ্ন করে না। একটু গুছিয়ে নিয়ে নবনীতা প্রায় স্বগতোক্তির মতো তার জবানবন্দী দিয়ে যায়।

বেচারি সত্যই হতভাগিনী। গাঁয়ের মেয়ে। জীবনলালের প্রেমে পড়ে গ্রাম ছাড়ে। তারপর একদিন টের পায় জীবন বিবাহিত, তার সংসার আছে। সে জীবনের রক্ষিতা মাত্র। গ্রামে কুমারী জীবনে দূর

থেকে যাকে মনে হয়েছিল দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া রাজকুমার, শহরে এস দেখল সে পার্টি মস্তান। কিছুদিনের মধ্যেই জীবনের কাছে নবনীতার নারীত্ব পুরোনো হয়ে গেল। জীবন বাসা বদলাল। নতুন শয্যাসঙ্গিনীর সন্ধানে। নবনীতাকে পরামর্শ দিয়েছিল 'সোনালি স্বপন'-এর কলগার্ল হতে। এসব কথা ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন বাসু-সাহেব। তখন থেকেই নীতা চেয়েছিল জীবনকে একেবারে খুন করে ফেলতে, চরম প্রতিশোধ নিতে। দুর্দান্ত সুযোগ হয়ে গেল হঠাৎ পথদুর্ঘটনায় যাদুগোপালের গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে রিভলভারটা হস্তগত করায়। চকলেট কিনে জব্বর অ্যালেবাইয়ের ব্যবস্থাও করে ফেলে। এক ডাক্তারবন্ধুর কাছ থেকে জেনেছিল ষাট গ্রেন ভেরোনাল খেলে মানুষ মরে না। প্রচণ্ড ঘুমায়। চকলেট কারখানাতেই ভ্যানিলা বা অন্যান্য সুগন্ধি গ্রেন হিসাবে মাপতে শিখেছিল। ওটাও বাসুসাহেবের নির্ভুল আন্দাজ, মানে কখন চকলেটগুলো খায়, আর কখন ভেরোনাল। ও জানত ডাক্তার ওর স্টম্যাক ওয়াশ করাবেই। তখন তার অর্ধজীর্ণ খাদ্যাংশের ভিতর চকলেট আর ভেরোনাল থাকা দরকার। তবে ওর ঘরের ভিতর চকলেটের ঐ কাগজের কাপগুলোর অনুপস্থিতি যে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে এটা তার খেয়াল হয়নি।

টেলিফোনের রিসিভারটা স্বস্থানে থাকার হেতুটা অন্যরকম। বাসু-সাহেব তাঁর কাহিনী-বিন্যাসে বর্ণনা করেছেন যে, জীবন হালদারকে ফোন করে নিশ্চিন্ত হয়ে নবনীতা বাসু-সাহেবকে টেলিফোন করেছিল। বাস্তবে তা হয়নি। বাসু-সাহেবকে ফোন করে, পতন ও মূর্ছার অভিনয় করার পরেই ওর খেয়াল হয়েছিল : জীবন হালদার তার বাড়িতে যদি একা না থাকে? এ-কথাটা তার আগে খেয়াল হয়নি। তাই বাসু-সাহেবকে ফোন করার পরে সে টেলিফোনটা কার্পেটে নামিয়ে জীবনকে একটা ফোন করে। কথাবার্তায় বুঝতে পারে জীবন একাই আছে, তার নয়া-চিড়িয়ার প্রতীক্ষায়। কারণ নবনীতা বলে, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে, পাঁচ মিনিটের জন্য যাব?

জীবন ওকে বারণ করেছিল।

নবনীতা জানতে চায়, কেন? তোমার চ্যালা-চামুণ্ডারা কেউ আছে?

— না, নেই। তাহলেও এখন আমার সময় হবে না।

নবনীতা বলেছিল, জানি! আমার বদলিতে যাকে বহাল করতে চাও তার প্রতীক্ষায় আছ, তাই না? আজ রাতে তার ইন্টারভিয়ু? ঠিক বলছি?

: তবে তো তুমি সবই জান? অহেতুক বিরক্ত করছ কেন?

লাইনটা কেটে দেয় জীবন হালদার।

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে নবনীতার। ঐ লোকটা কতরকম মিঠে-মিঠে বুলি কপচিয়ে ওকে গ্রাম থেকে ভাগিয়ে এনেছিল। আর আজ তাকে শূন্যগর্ভ মদের বোতলের মতো ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলছে। নবনীতা মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় টেলিফোনের স্থাবর অংশটা টেবিলের উপর আর মাউথপিসটা মাটিতে পড়ে থাকার কথা। অভ্যাসবশে সেটাকে ক্র্যাডলে বসিয়ে দিয়ে টানা-ড্রয়ার খুলে যাদুগোপালের গাড়ি থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্রটা বার করে আনে।

হ্যাঁ, সওয়া আটটা নাগাদই সে ইলিয়ট রোড থেকে রওনা হয়। ট্যাক্সি নিয়ে মোমিনপুরের দিকে। বাসু-সাহেব ঠিকই আন্দাজ করেছেন, ওর সঙ্গে ছিল টর্চ, ছয়টা নির্বিষ চকলেট আর ভেরোনালের শিশি। তবে তা ছাড়াও তার সঙ্গে ছিল আরও তিনটে বিচিত্র জিনিস : একটা রেনকোট, একজোড়া গ্লাভস আর চড়কের মেলায় সখ-করে-কেনা একটা রাক্ষসের মুখোশ। সব কিছু ভরে নেয় একটা 'বিগ-শপার'-এ। মোমিনপুরে জীবনের বাড়ি থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয়। ও চায়নি, ট্যাক্সিচালক জানতে পারুক ও কোন্ বাড়িতে যাচ্ছে। সে সময় ওপাড়ায় লোড-শেডিং চলছে। একটি বাড়িতে জেনারেটার বা অন্যান্য বিকল্প আলোর ব্যবস্থায় পাড়াটা আলো-আঁধারি। টর্চের আলোয় পথ দেখে নবনীতা জীবনের বাড়ির কাছাকাছি চলে আসে। বাড়ির সামনে একটা বারান্দা। নবনীতা সেখানে উঠে ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে। না, জনমানবের কোনও চিহ্ন নজরে পড়ে না। অন্ধকারেই তখন সে

রেইনকোট, দস্তানা, আর মুখোশটা পরে নেয়। জীবনের ঘরের ভিতর জেনারেটারের আলো জ্বলছে। সদর দরজায় গোদরেজের ইয়েল-লক। তার ফুটোয় চোখ দিয়ে নবনীতা দেখতে পায় ভিতরে আলো। এবার সে কল-বেলটা বাজায়। ভিতরে একটা মিঠে সুরের বাজনা বাজল।

ভিতর থেকে সদা-সাবধানী জীবন হাঁকড় পাড়ে, কে?

নবনীতা কৃত্রিম আধো আধো ন্যাকামি-মেশানো গলায় বলে, আমার তো আসার কথাই ছিল। রাত নয়টায়। দোর খুলে দেখুন না, কে এসেছে।

জীবন আঁধারের কারবারী। সর্বদা তাকে সাবধান হয়ে থাকতে হয়। মস্তানে মস্তানে এলাকা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকে। তাই জীবন ম্যাজিক-আইয়ের ভিতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। বৃথা। ঘরের ভিতর জোরালো আলো, বাহিরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। জীবন ভিতর থেকে প্রশ্ন করে, তোমার নাম কী?

নামটা জানা ছিল নবনীতার। কিন্তু এককথায় স্বীকার করল না। বললে, ন্যাকা! এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বংশ পরিচয় দিতে থাকব না কী?

জীবন বলে, তোমার সঙ্গে আর কে আছে?

— আবার কে থাকবে? আমি একাই। দোর খুলুন। ট্যাক্সিটাও ছেড়ে দিয়েছি। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার ভয় করছে।

জীবন গর্জে ওঠে : নিজের নামটা বল, না হলে দোর খুলব না।

নবনীতা তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নামটা উচ্চারণ করে।

জীবন এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ল্যাচ-কীটা খুলে দেয়। দরজার পাল্লা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে একলাফে নবনীতা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। তার হাতে উদ্যত রিভলভার।

আগন্তুককে দেখেই জীবন দু-পা পিছিয়ে গেছে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বলে, কে?....কে তুমি?

নবনীতা ততক্ষণে ঘরের ভিতর। দরজাটা বাঁ-হাতে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। জীবনের ঘরে ডায়নামোর জোরালো বাতি। সেই আলোতে জীবন দেখতে পাচ্ছে আগন্তুককে। বর্ষাতি গায়ে, মুখে রাক্ষসের মুখোশ, হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র।

জীবন-মস্তান সম্ভবত দুটি সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিল। প্রথমত, আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে, উচ্চতায়, দৈহিক তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় যে, সে স্ত্রীলোক। দ্বিতীয়ত, আগ্নেয়াস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিটির বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, ওর হাতে ওটা খেলনা-পিস্তল নয়, খাঁটি মাল। পয়েন্ট টু টু বোর স্প্যানিশ রুবি। জীবন সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেল এইটে দেখে যে, আগন্তুকের হাতে গ্লাভস। অর্থাৎ প্রয়োজনে সে যন্ত্রটা ব্যবহার করতে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। স্ত্রীলোক হলেও প্রফেশনাল। ফিঙ্গার-প্রিন্ট সম্বন্ধে সচেতন।

আগন্তুক বিকৃত কণ্ঠস্বরে বললে,মাথার ওপর হাত তোল...

জীবন ওর আদেশ পালন করে। কিন্তু প্রশ্নটা আবার পেশ করে, তুমি, তুমি কে?

আগন্তুক সে-কথার জবাব দেয় না। বলে, এবার পিছু হটে ঐ টেবিলটার দিকে যাও, কোন চালাকি করার চেষ্টা কর না জীবন মস্তান। তাহলে এই ঘরের ভিতরেই তোমার লাশ ফেলে দেব।

'লাশ ফেলে দেওয়া' মস্তানদের একটা বাঁধা লব্‌জ্। জীবন আগন্তুকের জাতি নির্ণয়ের চেষ্টা করতে করতে পিছু হটে নির্দেশ মতো টেবিলের দিকে পিছিয়ে যায়। তার দু-হাত মাথার ওপর তোলা। ঐ টেবিলের ডান দিকের প্রথম ড্রয়ারে আছে ওর নিজের মারণাস্ত্রটা। ছয়টা চেম্বারই লোডেড। ভুল! প্রচণ্ড ভুল হয়ে গেছে তার, মেয়েলী মিঠে কণ্ঠস্বরে! যন্ত্রটা হাতে না নিয়ে ল্যাচ-কী খুলে দেওয়াটা একটা মারাত্মক ভ্রান্তি।

জীবন এবার প্রশ্ন করে, কী.....কী চাও তুমি? টাকা?

...শুনতে শুনতে সুজাতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নবনীতাকে প্রশ্ন করে, একটা কথা। তুমি তো ওকে খুন করতেই গেছিলে। তাহলে প্রথম সুযোগেই একেবারে খতম করে দিলে না কেন?

নবনীতা হঠাৎ চমকে ওঠে।

এতক্ষণ সে ঘরভর্তি শ্রোতার উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়েছিল। যেন আপনমনে সে রাত্রের ঘটনার সোচ্চার স্মৃতিচারণ করছিল। এতক্ষণে সে সচেতন হয়ে একে একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে। ম্লান হেসে বলে, হেতুটা বিচিত্র! ইতিমধ্যে ঘাতকের মৃত্যু হয়েছে। আমার মনে হল....

বাসু-সাহেব বিরক্ত হয়েছিলেন সুজাতার ঐ হঠাৎ পেশ করা প্রশ্নে। এখন প্রায় ধমকের সুরে নবনীতাকে বলেন, তোমার কী মনে হল তা আমরা জানতে চাইছি না, নীতা! তুমি পর পর ঠিক কী করলে তাই শুধু বলে যাও।

কোথাও কিছু নেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় কৌশিক। ছাত্রজীবনে যে ছিল স্বভাবকবি। যে অভদ্র আচরণের কথা ওর দুঃস্বপ্নেরও অগোচর, তাই করে বসল হঠাৎ। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বসল তার পরমশ্রদ্ধেয় বাসু-মামাকে। বললে, আপনি থামুন তো? এটা আপনার আদালত নয়....। হ্যাঁ, তুমি কী বলছিলে বলে যাও, নীতা। ঠিক কী মনে হল তোমার? 'ঘাতকের মৃত্যু হল' ঠিক কোন মুহূর্তটাতে? কেন?

ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ আড়চোখে তাকিয়ে দেখল : বাসু-সাহেবের মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। সে টুঁ শব্দটি করল না।

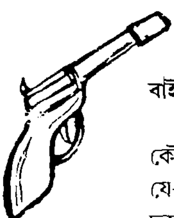

বাইশ

নবনীতা ওদিকে তাকিয়ে দেখল না পর্যন্ত। ওঁদের যেন কোন পাত্তাই দিল না। কৌশিক-সুজাতার দিকে ফিরে বলল, শুনুন, বুঝিয়ে বলি : 'ঘাতকের মৃত্যু' হয়েছিল যে-সন্ধ্যায় কাকলি এসেছিল সোনালি স্বপন-এ। তার আগেই আমার সব পরিকল্পনা ছকা হয়ে গেছে। রেনকোট-গ্লাভস্-মুখোশ আমার আলমারিতে মজুত। ছয়টা চকলেটে ভেরোনাল মেশানো আছে। যাদুগোপালের লোডেড রিভলভার আমার দেরাজে। যে পিশাচটা আমাকে ভুল বুঝিয়ে গ্রাম থেকে শহরে ফুসলে নিয়ে এসেছিল : স্বামী-সংসার-সন্তানের লোভ দেখিয়ে : তার স্বরূপটা বুঝে ফেলেছি আমি ; তার মৃত্যুদণ্ড মনে মনে ঘোষণা করে বসে আছি। এমনকি তার মৃত্যু-মুহূর্তে আমি যে অজ্ঞান হয়ে ঘরের ভিতর পড়ে আছি এটা প্রতিষ্ঠা করার আয়োজনও সম্পূর্ণ। ভেবেছিলাম, পুলিশ স্টেশনে ফোন করে জানাব আমাকে কেউ বিষ মেশানো চকলেট পাঠিয়ে হত্যা করতে চায়। পরে মনে হল, পুলিশে ফোন করার চেয়ে অনেক ভাল হবে যদি ব্যারিস্টার-সাহেবকে ফোন করে কথাটা বলি।

কিন্তু আমার সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিল কাকলি, যখন সে আচমকা বাড়িয়ে দিল তার বন্ধুত্বের হাত। কাকলি জানতে পেরেছিল—ওই বার-এর এই 'বারটেন্ডার' মদের দোকানে একা বসে মদ্যপান করে, সে সিগ্রেট খায়, সে মদিরা-তিয়াসীদের রূপযৌবনের আকর্ষণে উৎসাহিত করে মদ্যপ হতে। ক্রমে এ কথাও জানল যে, সে গাঁয়ের এক হায়ার সেকেন্ডারী-পাস কুমারী মেয়ে, যাকে এক সমাজবিরোধী পার্টি-মস্তান গ্রাম থেকে শহরে ফুসলে নিয়ে এসেছিল, যার অনিবার্য অন্তিম পরিণাম এই কল্লোলিনী কলকাতার কোন 'রেড-লাইট' এলাকা, এমন একটি 'নষ্ট' চরিত্রের মেয়েকে ওই খানদানী

ঘরের কাকলি দত্ত অনায়াসে বলতে পারল, আমরা এক ঘরে পাশাপাশি চৌকিতে শোব। তুমি আমার এঁটো বাসন ধুয়ে দেবে, আমি তোমার এঁটো বাসন ধুয়ে দেব : কী, পারবে না?... কী বলব? আমার কানে কথাগুলো মন্ত্রের মতো কাজ করল। একটা অজানা অচেনা পৃথিবীর সিংহদরজা যেন আচমকা আমার চোখের সামনে খুলে গেল। আমার মনে হল : ওই তো প্রায় আমার বয়সী একটি কুমারী মেয়ে এই পুরুষ-শাসিত সমাজে দেয়ালে পিঠ দিয়ে একা হাতে লড়ে যাচ্ছে। বাঘিনীর মতো। ভৈরব দাশ, যাদুগোপাল, জীবন-মস্তানের দল ঝাঁক-বাধা নেকড়ের মতো ওর দেহটা ছিঁড়ে খেতে চায়। ও হার মানেনি। ও ভয় পায়নি। ও লড়ছে। তাহলে আমিই বা পারব না কেন? — ঠিক সেই মুহূর্তেই হল 'ঘাতকের মৃত্যু'। ওদিকে যেহেতু আমার ছক তৈরি, তাই আমি মনস্থির করলাম : জীবন-মস্তানকে আমি খুন করব না, তার চেয়ে বড় আঘাত হানব। ওকে নতজানু করব! সিংহের গুহায় ঢুকে সিংহশাবককে পিস্তল দেখিয়ে অপহরণ করে আনব। দশ পার্সেন্ট হিস্যা চাওয়াতে যে লোকটা বলেছিল —'ওকে গলায় দড়ি দিতে বল' সে লোকটা প্রাণের ভয়ে নতজানু হয়ে গোটা শেয়ারের গোছাটা আমার হতে তুলে দেবে। আর আমি তা তুলে দেব কাকলিকে, আমার বন্ধুত্বের উপহার...

আবার আগ্রহের আতিশয্যে সুজাতা প্রশ্ন করে বসে : জীবন-মস্তান সেটা দিয়েছিল?

— দিত, নিশ্চিত দিত! কিন্তু বিধি বাম। ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। নতজানু অবস্থায় জীবনের মুঠিতে শেয়ারের গোছাটা ধরা। ও বললে, কই, এস, নিয়ে যাও....

আমি বললাম, চালাকি কর না জীবন-মস্তান! শেয়ারের গোছাটা আমার দিকে ছুঁড়ে দাও!...

আমাদের দু'জনের মাঝখানে তখন তিন হাতের ব্যবধান। এই তিন হাত দূরত্ব দুর্ধর্ষ সমাজবিরোধী জীবন-মস্তান অতিক্রম করতে পারছে না। কারণ আমার হাতে উদ্যত পিস্তল। আমি ওকে বললাম, আমি তিন গুনব। তার মধ্যে যদি...কথা আমার শেষ হল না। পিছনে খুট করে শব্দ হল...

দুর্ভাগ্য নবনীতার। ঘরে ঢুকে সে বাঁ-হাতে সদর দরজাটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছিল বটে, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেনি ইয়েল-লক বন্ধ হয়েছে, কি হয়নি। পিছনে খুট করে শব্দ হতেই নবনীতা পাশ ফিরে দেখে। পিস্তলের লক্ষ্যমুখ কিন্তু তখনো জীবনের দিকে। জীবন হিসহিসিয়ে ওঠে : ধর্। ধর্ হারামজাদিকে!

নবনীতা দেখতে পায় নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে একটি অচেনা মেয়ে। বছর আঠারো-উনিশ : অর্থাৎ যে বয়সে ও নিজে গ্রাম ছেড়ে অজানা গাঙে নাও ভাসিয়েছিল, ঐ জীবন-মস্তানের হাত ধরে। মেয়েটার হাতে একটা ছোট ওভারনাইট ব্যাগ : নীল রঙের। সুন্দরী নয়, তবে যৌবন টলটল করছে। জাপানী সিল্কের একটা জঙলা শাড়ি, ওই রঙেরই এয়ারহোস্টেস ব্লাউজ। চিনতে অসুবিধা হয়নি ওই অচেনা মেয়েটাকে। এরই আজ সারারাত ইন্টারভিয়ু দেবার কথা। মুখোশ পরা নবনীতাকে দেখে সে প্রথমটা ঘাবড়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই বাঘিনীর মতো ঝাঁপ খেয়ে পড়ে সামনের দিকে। দু হাতে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে নবনীতার ডান হাত। নবনীতা চাপা গর্জন করে ওঠে, ছেড়ে দাও। এক্ষুনি ফায়ার হয়ে যাবে।

দু'জনে হাত কাড়াকাড়ি করতে থাকে। দু'জনের কারও খেয়াল হয় না যে, ঘরে একজন তৃতীয় ব্যক্তিও আছে। সে কী করছে, তা ওরা জানে না। জানবার অবকাশ পায়নি। সেই নতজানু লোকটা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তমধ্যে ওদের দিকে পিছন ফিরে টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারটা টেনে খুলেছে, যার ভিতর রাখা আছে ওর নিজের আত্মরক্ষার অস্ত্রটা। কিন্তু সেটা টেনে বার করার অবকাশ পায়নি অনেক-অনেক হত্যাকাণ্ডের নায়ক জীবন-মস্তান।

অন্ধকার রাত্রির নৈঃশব্দ খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে নবনীতার মুঠিতে ধরা রিভলভারটার গর্জনে।

দু'জনেই এদিকে ফেরে। দেখে, গুলিটা লেগেছে পিছন-ফেরা জীবনের পিঠে। সে উবুড়

হয়ে পড়েছে টেবিলের উপর। তার পিঠ দিয়ে গলগল করে নেমে আসছে তাজা রক্তের একটা ধারা।

নবনীতা জানে না, এরপর তিন-চার সেকেন্ড ঠিক কী ঘটেছে। যখন সংবিত ফিরে পায় তখন দেখতে পায় ঘরে সে একা। আর ওর জীবন-যৌবনের অভিশাপ জীবন-মস্তানের মৃতদেহ। মেয়েটা কখন নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। মেঝেতে পড়ে আছে রিভলভারটা, আর ওই মেয়েটার ফেলে যাওয়া সেই নীল রঙের ওভারনাইট ব্যাগ।

নবনীতাও নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে পথে নামে। এবারও তার ভুল হয়ে যায় দরজাটা টেনে ইয়েল-লকটা বন্ধ করতে। তবে ওর বিগ-শপারটা নিতে ভোলেনি। বাইরের বারান্দায় বার হয়ে এসে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখে। জনমানবের সন্ধান পায় না। অপর মেয়েটি যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। নবনীতা মুখোশ, গ্লাভস আর বর্ষাতিটা খুলে বিগ-শপারের ভিতর ভরে নেয়। তখনও লোড-শেডিং চলছে ও তল্লাটে। পাশেই সশব্দে কোনও জেনারেটার চলছে, যেজন্য পিস্তলের শব্দ পাড়াপড়শির কানে যায়নি। টর্চের আলোয় পথ দেখে ও বড় রাস্তায় এসে পড়ে। একটা ফ্লাইং ট্যাক্সি পেয়ে যায়। তাতে করে ও বাড়ি ফিরে আসে। ট্যাক্সিতে উঠেই ও ভেরোনালের শিশিটাকে বার করে ব্যাগ থেকে। সবটা ওষুধ গলায় ঢেলে দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে শিশিটা জানলা গলিয়ে ফেলে দেয়।

দম নেবার জন্য এবার নবনীতা থামে।

ইন্সপেক্টর দাশ বলে, মেয়েটি কে? যে আপনার হাত চেপে ধরেছিল? তাকে চেনেন?

নবনীতা বললে, হ্যাঁ, চিনি। সে রাত্রে শুধু তার নামটুকুই জানতাম। আজ তার পরিচয়টাও জানি।

— সে কে?

— কাকলির দোকানের কাউন্টার গার্ল।

কাকলি চাপা আর্তনাদ করে ওঠে, সুপর্ণা?

— হ্যাঁ, ভাই। কী বিচিত্র ঘটনাচক্র দেখ। সুপর্ণা আমার চাকরিটা খেতে আসছিল, আর আমি তার চাকরিটা....

— তুমি কি আজ আমার দোকানে এসে তাকে চিনতে পারলে?

— হ্যাঁ, আর সেই জন্যেই তোমার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছিলাম না। আমি জানি যে, সুপর্ণার কাছে আমি অপরিচিতা। সে রাত্রে আমার মুখে মুখোশ পরা ছিল, কিন্তু কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না।

ইন্সপেক্টর দাশ বললে, আপনার সেই মুখোশটা কোথায়?

নবনীতা নিঃশব্দে উঠে গেল। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে দেওয়ালের গা-আলমারিটা খুলে একটা বড় বাজারের থলে বের করে আনল — বিগ-শপার ব্যাগ। তা থেকে টেনে বার করলে তিনটে জিনিস — একটা বর্ষাতি, একজোড়া গ্লাভস আর একটা মুখোশ।

নিখিল দাশ হাতঘড়িতে সময় দেখে কাকলিকে বলল, আপনার ফোটোগ্রাফির দোকান অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার কর্মচারী সুপর্ণার ঠিকানাটা কি মনে আছে আপনার?

কাকলি বলল, ঠিকানাটা মুখস্ত নেই, তবে বাড়িটা চিনি।

— আপনি কাইন্ডলি আমার জীপ-এ আসবেন? বাড়িটা চিনিয়ে দিতে?

কাকলি বলে, আপনি এখনই যেতে চান?

— নিশ্চয়ই। তার বক্তব্যটা আজ রাত্রেই টেপ করতে হবে, সে উকিলের পরামর্শ নেওয়ার আগে।

কৌশিক বলে, একটা কথা। ঘটনাস্থলে কোন নীলরঙের মেয়েলি ওভারনাইট-ব্যাগ কি পুলিস উদ্ধার করেছিল?

— তা করেছে। তাতে যে সব জিনিস ছিল তা থেকে মালকিন-এর হদিশ পাওয়া যায়নি। আমি কিন্তু এই বিগ-শপার ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছি।

শেষ কথাটা সে বলে নবনীতার দিকে ফিরে।

নবনীতা বলে, স্বচ্ছন্দে।

— মিস দত্ত? আপনি কি আসছেন?

কাকলি এককথায় রাজি হয় না। বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখে।

বাসু নিখিল দাশের দিকে ফিরে বলেন, তার আগে তোমার একটা কাজ যে বাকি আছে, নিখিল?

— কী কাজ?

বাসু-সাহেব হাত বাড়িয়ে নবনীতার টেলিফোনটা ক্র্যাডল থেকে তুলে ইন্সপেক্টর দাশের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, লালবাজারকে জানিয়ে দাও যে, মিসেস জয়া সেনকে তোমরা ছেড়ে দিচ্ছ। তুমি কাকলিকে নিয়ে সুপর্ণার বাড়ির দিকে রওনা হলেই আমি গাড়ি নিয়ে রওনা দেব আমার ক্লায়েন্টকে ছাড়িয়ে এনে ডক্টর ব্যানার্জির নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিতে।

ইন্সপেক্টর দাশ টেলিফোনটা গ্রহণ করে বললে, মোস্ট সার্টেনলি, স্যার।

*　　　　*　　　　*

তিনজনে গাড়ি নিয়ে চলেছেন জয়া সেনকে পুলিস-হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে আনতে। গাড়ি চালাচ্ছে কৌশিক, তার পাশে সুজাতা। পিছনের সীটে বাসু-সাহেব এতক্ষণে পাইপ ধরিয়েছেন। গাড়ি চালাতে চালাতে কৌশিক বলে, আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, মামু। তখন সর্বসমক্ষে আমি যে ব্যবহার করেছি...

— সেটা ভাগ্নেজনোচিত না হলেও কবিজনোচিত হয়েছিল। তুমি এককালে কবিতা লিখতে, আমার মনে আছে। ইন ফ্যাক্ট, প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছিল : ঠিক কোন মুহূর্তে 'ঘাতকের মৃত্যু' হল, কিন্তু সে প্রশ্নটা আমার প্রফেশনাল এথিক্সকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি, এই যা।

সুজাতা জানতে চায়, জীবন হালদারের হত্যার মূলে যে নবনীতার হাত থাকতে পারে এটা আপনি কখন আন্দাজ করেন, মামু?

— ওকে চাক্ষুষ দেখার আগেই। যখন ওর পতন ও মূর্ছার এক মিনিট পরে ওর টেলিফোনে ডায়ালটোন ফিরে এল....

— সেটা তো যান্ত্রিক কারণেও হতে পারত।

— পারত। কিন্তু ওকে যখন অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করলাম তখন স্বচক্ষে দেখলাম — টেলিফোনে ডায়াল-টোন ফিরে আসার হেতু : ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পরে কেউ টেলিফোনের জঙ্গম অংশটা ফের ক্র্যাডল-এ বসিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ওর কথা সত্যি হলে ঘরের ভিতর বা বাইরে গলিপথে দু-একটা চকলেটের কাগজের কাপ খুঁজে পাওয়ার কথা। তা ছিল না কিন্তু। তখনই আমার সন্দেহ হয়, নবনীতা একটা শক্তপোক্ত অ্যালেবাই বানাবার জন্য নিজেই বিষাক্ত চকলেট খেয়েছে। জীবন হালদারকে হত্যা করার মোটিভটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ; কিন্তু কাকলির রিভলভারটা সে কেমন করে হাত করল এটাই বুঝে উঠতে দেরি হল।

সুজাতা বললে, একটা কথা মামু, আমার মনে হল ইন্সপেক্টর নিখিল দাশ কাকলির প্রতি একটু বেশি ইন্টরেস্টেড। আপনারও কি তা মনে হয়নি?

: হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমারও নজরে পড়েছে? তবে এসব বিষয়ে মেয়েদের ইনটুইশন বেশি। তাই তোমাকেই প্রশ্ন করছি। কী মনে হয়? একটা মিলনান্তক পরিণতি হতে পারে এই কণ্টকিত কাহিনীর?

কৌশিক গাড়ি চালাতে চালাতে বলে, আমার তো তাই ধারণা।

— তোমার কী ধারণা তা তো জানতে চাইনি আমি। তুমি গাড়ি চালাচ্ছ গাড়ি চালাও। আমি মহিলাদের ইন্টুইশনে বিশ্বাস করি, তোমার মতো অনড্বানের নয়। তাই আমি সুজাতার মতামতটা জানতে চাইছি....

সুজাতা বলে, আমার মতে অন্তিম পরিণতিটা বিয়োগান্তক হবে, মামু।

— বিয়োগান্তক! কেন? আমার তো মনে হল নিখিল আর কাকলি দু'জনেই দু'জনকে.....

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, ও আয়াম সরি। আপনি ওদের কথা বলছেন বুঝি? আমি ভুল বুঝেছি। কারণ কাকলি তো আর আপনার ক্লায়েন্ট নয়। ক্লায়েন্ট হচ্ছে : জয়া সেন। তাই আমি ভেবেছিলাম, যাদুগোপাল আর জয়া সেনের কথা। এর পরের কেস যেটা আপনার হাতে আসছে তা তো 'সেন-ভার্সেস-সেন' ডির্ভোস পিটিশন। যাদুগোপালের রঙ্গ দেখানোটা বন্ধ করার আদালতী ভানুমতীর খেল। তাই না?

বাসু প্রাণখোলা হাসি হাসেন : তা বটে!

boirboi.net

উৎসর্গ

তোকে একটা মজার গল্প শোনাই, শোন, সুনীল :

বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার কথা। তখন আমি পূর্ত-বিভাগে বর্ধমান ভুক্তির অধিক্ষক বাস্তুকার। ঐ যাকে শাদা-বাংলায় বলে পি. ডাব্‌লু. ডি. র সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার, বার্ডওয়ান সার্কেল। জীপে করে (তখনো এস. ই.-দের অ্যাম্বাসাডার জোটেনি।) জি. টি. রোড বরাবর ইন্সপেকশানে যেতে হত। আসানসোলে পৌঁছে স্টেশান রোড পার হয়ে বাঁদিক ঘেঁষে জীপটা দাঁড়িয়ে যেত। অনিবার্যভাবে। ঠিক ই. আই. আর. স্কুলের সামনে। ড্রাইভার হাজারে-সিং জানত, ঐখানে একটি বিশেষ দোকান থেকে আমার জন্য তাকে সিগ্রেট কিনে আনতে হবে। নিত্যকর্মপদ্ধতি। ঐ বিশেষ দোকানেই। আমার ধারণা ছিল, হাজারে কোনদিন জানতে পারেনি যে, ওকে স্থানচ্যুত করে আমি জীপ থেকে নেমে দাঁড়াতাম। মাথা নিচু করে মনে মনে স্মরণ করতাম সেই সব হারিয়ে-যাওয়া আজব মাস্টারমশাইদের : হরিদাস গোসাঁই, শরদিন্দুবাবু, ভূপেনবাবু, কেদারবাবু, ক্ষিতিনবাবু, পণ্ডিতমশাইদের। যে সব কুমোরদের হাতে-গড়া পুতুল—তুই-আমি, সতু-জীতেন, সন্তোষ-ভনা, প্রভাত- শশাঙ্ক, আরও কত কে!

...আমি টের পাইনি যে হাজারে সিং ঠিক টের পেত! তার ধারণা : তার স্যারের মাথায় দু-একটা 'স্কুপ' ঢিলে। কিন্তু সে-কথা তো বলা যায় না! কৌতূহলটাকে সে বারবর চেপে রেখেছিল।

...সেটা টের পেলাম রিটায়ারমেন্ট-এর দিনে। ফেয়ার-ওয়েল সেরে হাজারে সিং-এর গাড়িতেই ফিরে এলাম বাড়িতে। শেষ বিদায় জানিয়ে হাজারে বললে, এক বাত পুঁছু, স্যার?

আমি সহাস্যে বলি, পুছো না, ক্যা সওয়াল?

সওয়াল যা করল তার জবাব দিতে আমি হিমসিম। আসানসোল বাজারের কাছে মন্দির-উন্দির তো কুচ্ছু নেই আছে, না? তাহলে আমি বে-ফাজুল নমস্তে করতাম কাকে?

বললুম, ঐ আসানসোল স্কুলেই আমি পড়তুম, হাজারে। মাস্টারমশাইদের কাছে মাফি মাংতুম, সিগ্রেট কিন্‌ছি বলে।

হাজারে সিং খাল্‌সা শিখ। সম্‌ঝে নিতে তার অসুবিধা হল না। গুরু নানক, গুরু গোবিন্দেরও নিষেধ আছে ধূমপানে।

এবার গল্পের 'মরাল'টা শোনাই : হে পাঠক! মাস্টারমশাইদের উপদেশ, গুরুজনদের পরামর্শ, গুরু নানক-গুরু গোবিন্দের দোহাই উপেক্ষা করলেও শেষমেশ ও কু-অভ্যাসটাকে ছাড়তেই তো হবে। তবে ধরা কেন? এই দেখ আমাকে! হার্ট-অ্যাটাকের পর ক'বছর খাচ্ছি না! দিব্যি আছি!

নববর্ষের দিনে **'রিস্তেদারের কাঁটা'** তোকে আর তোর বউকে উৎসর্গ করে তৃপ্তি পেলাম।

শ্রীসুনীল কুমার রায়
শ্রীসবিতা রায়
আসানসোল

নারায়ণ সান্যাল
১/১১/৯১

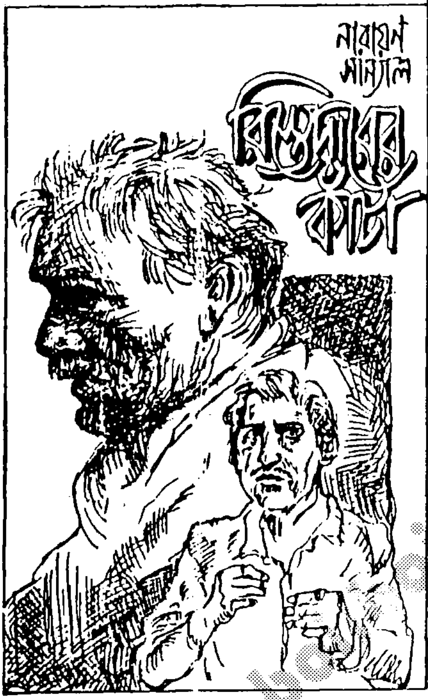

রিস্তেদারের কাঁটা

রচনাকাল : 1990

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি 1991

প্রচ্ছদশিল্পী : অনুপ রায়

উৎসর্গ : সুনীলকুমার রায়

গাড়িটাকে গাড়ি-বারান্দার নিচে পার্ক করতে গিয়ে নজর হল সেখানে একটা ট্যাক্সি মিটার ডাউন করে দাঁড়িয়ে আছে। টুকটুক করে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এলেন বাসু-সাহেব। নজরে পড়ল বারান্দার শেষ প্রান্তে বেতের টেবিলটা ঘিরে বসেছে চায়ের আসর। কৌশিক আর সুজাতা দুজনেই আছে, আর হুইলচেয়ারে রানী দেবী। টেবিলে কাপ, টি-পট, বিস্কিটের প্লেট। বাসু-সাহেব ওদিক পানেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বাধা পেলেন রানী দেবীর কথায় : তোমার অপেক্ষায় একটি মেয়ে বসে আছে লাইব্রেরী ঘরে।

দাঁড়িয়ে পড়লেন বাসু। পকেট হাৎড়ে পাইপ-পাউচ বার করতে করতে বললেন, মেয়ে? না, মহিলা?

রানী চায়ের কাপে লীকার ঢালতে ঢালতে বললেন, কৌশিকের হিসাবে হয়তো মহিলা, আমার কাছে বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে — মেয়েই।

— ক্লায়েন্ট?

— তাই তো মনে হল। বলছে, তার যা বক্তব্য তা শুধু তোমাকেই জানাবে, আর কাউকে নয়।

— অ। তা নাম-ঠিকানাটুকু অন্তত জানিয়েছে নিশ্চয়ই?

কৌশিক আগবাড়িয়ে বললে, তা জানিয়েছে। আর সেই সূত্রে আমার ডিডাক্‌শনটাও শুনে রাখুন মামু — আপনার ক্লায়েন্ট হয় 'পসথিউমাস চাইল্ড' অথবা আঁতুড়েই হারিয়েছে ওর মাকে।

বাসু-সাহেব ইতিমধ্যে পাইপে তামাক ঠেশে পাউচটা পকেটজাত করেছেন। কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, ডিডাক্‌শনের সূত্র?

— ওর নাম। রানী মামিমার মারফতে জেনেছি। আপনার ক্লায়েন্টকে আমি এখনো চোখেও দেখিনি।

— আই সী। কী নাম?

— স্মরণিকা সেন।

*　　　　*　　　　*

প্রখ্যাত ক্রিমিনাল-সাইডের ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুকে যাঁরা চেনেন তাঁদের কাছে ওঁর পরিচয় দিতে যাওয়া বাহুল্য। যাঁরা চেনেন না তাঁদের শুধু এ-কথাই বলতে পারি তিনি ই. স্ট্যানলে গার্ডনারএর বিশ্ববিশ্রুত চরিত্র 'প্যেরি মেসন'এর ছায়া দিয়ে গড়া কলকাতাবাসী একজন আইনজীবী। নিউ আলিপুরের দোতলা বাড়িতে আছেন পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে। ওঁরা থাকেন একতলায়। দ্বিতলে তাঁদের স্নেহধন্য কৌশিক আর সুজাতার বাস। চারজনের একই হেঁসেল। কৌশিক আর সুজাতা একটি প্রাইভেট গোয়েন্দা অফিস চালায় ঐ বাড়িতেই, একতলায়। বাসু-সাহেব তার নামকরণ করেছিলেন : সুকৌশলী—সুজাতার 'সু' আর কৌশিকের 'কৌ' — বাকি 'শলী'টুকু নাকি পাদপূরণের 'খলু'। বাসু-সাহেব একটু বিচিত্র কায়দায় প্র্যাকটিস করেন। জুনিয়ার ব্রীফ সাজিয়ে দেবে আর আদালতে গিয়ে সওয়াল করবেন এমন ব্যারিস্টার তিনি নন। ফলে বাসু-সাহেব কেস পেলে 'সুকৌশলী'কেও ব্যস্ত হতে হয়। রানী দেবী দু'-তরফের রিসেপশনিস্ট। টেলিফোন আর ইন্টারকমে মাঝে-মাঝে দু'-পক্ষের হাল ধরতে হয় তাঁকে। বাসুর আবার কিছু বাতিক আছে। যদি তিনি নিজে সিদ্ধান্তে আসেন যে, তাঁর ক্লায়েন্ট নির্দোষ, তখনই তার 'কেস' উনি হাতে নেন। যদি মনে করেন সে দোষী, তাহলে ক্লায়েন্টকে পরামর্শ দেন দোষ স্বীকার করে শাস্তি গ্রহণ করতে অথবা অন্য কোনও আইনজীবীর দ্বারস্থ হতে। তা থেকে এমন অবস্থা হয়েছে যে, কলকাতা হাইকোর্টের সব বিচারকই জানেন, বাসু-সাহেব যার কেস নিয়ে সওয়াল করছেন, সে দোষী-নির্দোষ যাই হোক, বাসু-সাহেবের দৃষ্টিতে : নির্দোষ। তা থেকে আরও একটা ঝামেলা হয়েছে — সত্যিকারের অপরাধী ইদানীং ভুলেও বাসু-সাহেবের দ্বারস্থ হয় না, কারণ ঐ আইনজীবীর দ্বার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে আদালতে তার অবস্থা সঙ্গীন!

বাসু-সাহেবের বিষয়ে আর একটি কথা বলা দরকার, তাঁর একটি আন্‌ব্রোকন রেকর্ড আছে — তাঁর কোনও মক্কেল, খুনী-আসামী, আজ পর্যন্ত সাজা পায়নি!

লাইব্রেরি ঘরে উনি ঢুকতেই স্মরণিকা উঠে দাঁড়ালো। টেবিলটা পাক দিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল বাসু-সাহেবকে। উনি বাধা দিলেন না। এসব ভারতীয় শিষ্টাচার ভালই লাগে নিখুঁত সাহেবী-কেতার মানুষটির। নিজে আসন গ্রহণ করে বললেন, তোমার নাম 'স্মরণিকা সেন' এটুকুই জেনেছি। নাম থেকে মনে হয়েছে জীবনের প্রারম্ভেই তোমার কোনও প্রিয়বিয়োগ ঘটেছে, নামটা ঠাকুর্দা'র দেওয়া, না দাদামশায়ের?

স্মরণিকা হাসি লুকিয়ে বললে, দুজনের একজনও নন, জেঠুর। আমার শৈশবে একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে বাবা ও মা দুজনেই একসঙ্গে মারা যান।

— বুঝলাম। এবার বল, আমার কাছে এসেছ কি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো? নাকি কেউ পরামর্শ দিয়েছে?

— জেঠুই একটা চিঠি লিখে আপনার কাছে আসতে বলেছেন।

— চিঠি লিখে? কেন? তোমরা দুজনে কি দু জায়গায় থাক?

— আজ্ঞে না। তবে আমি কিছু দিনের জন্য ভারতের বাইরে গেছিলাম...

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, তোমার জেঠুর কী নাম? কত বয়স?

— জেঠুর বয়স পঁচাত্তর। তাঁর নাম শ্রীসত্যানন্দ সেন।

— আর তোমার বাবার নাম? যিনি বছর পঁচিশ আগে মারা যান?

স্মরণিকা হাসল। বললে, আমার বয়স বাইশ। বাবা মারা যান একুশ বছর আগে। তাঁর নাম ছিল সত্যপ্রিয় সেন। জেঠুর চেয়ে তিনি আঠারো বছরের ছোট ছিলেন। আমি জেঠুর কাছেই মানুষ।

— তোমরা কয় ভাই-বোন?

— আমি বাবা-মার একমাত্র সন্তান।

— আর তোমার জাঠতুতো ভাই-বোন?

— না, জেঠু কনফার্মড ব্যাচিলার।

— তাহলে তোমাকে মানুষ করলেন কে? বাবা-মা যখন মারা যান তখন তোমার বয়স তো মাত্র এক, জেঠুও ব্যাচিলার...তাহলে?

— মামণি, মানে শান্তি মাসি...না, না মানে তিনি আমার নিজের মাসি নন। দাঁড়ান, বুঝিয়ে বলি...

— বল। তবে আমি দাঁড়াতে পারব না বাপু। বসে বসেই শুনব।

স্মরণিকা আবার হাসে। বোঝে, এঁর সামনে প্রতিটি কথা ওজন করে বলতে হবে। জবানবন্দিতে সে যা বলল তার সারমর্ম এই রকম : সত্যানন্দ সেন একজন সফল ব্যবসায়ী। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন জীবনে। সংসার করেননি। ছোট ভাইটির বিবাহ দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়েই তাঁর জীবন কেটে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত সেটা হয়নি। শান্তি মাসির সঙ্গে সেন-পরিবারের কেনও রক্তের সম্পর্ক নেই। তিনি ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছিলেন সেন-সাহেবের আশ্রিতা। শান্তি দেবীর স্বামী সুহাস দত্ত ছিলেন সত্যানন্দের ফার্মের একজন কর্মচারী। বস্তুত তাঁর প্রতিষ্ঠানের একজন দক্ষ কর্মী। সত্যানন্দই উৎসাহ করে তার বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের পরেই সুহাসের কী-যে হ'ল, রাতারাতি সংসারত্যাগ করল সে। সত্যানন্দ নিজেকেই দায়ী করলেন খানিকটা। তাঁর সহকারীর যে ধর্ম-ধর্ম বাতিক ছিল এটা তিনি জানতেন। গরিবের ঘর থেকে সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এসে তাকে নিয়ে সংসার বাঁধতে চেয়েছিলেন। সুহাসের হঠকারিতায় সব ভেঙে গেল। ঠিক একই সময়ে তাঁর নিজের সংসারেও ঘটল মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা। ভাই ও ভাই-বউ মারা গেল মোটর অ্যাকসিডেন্টে। তিনি নিজে বিবাহ করেননি। এক বছরের ভাইঝিটিকে মানুষ করার প্রয়োজনে বাড়িতে একজন গভর্নেস-জাতীয় মহিলাকে এনে রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। শান্তি দেবীকে তিনি সসঙ্কোচে প্রস্তাবটা দিলেন। শান্তি রাজি হলেন। বয়সে তিনি সত্যানন্দর চেয়ে ষোলো বছরের ছোট। তিনি এসে ঐ অনাথ শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। তাকে মানুষ করে তোলেন। মাত্র তিন বছর আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এখন স্মরণিকাই সংসারটা দেখে। তারপর মাসখানেক আগে টুরিস্ট-ভিসা নিয়ে সে ইয়োরোপ বেড়াতে যায়। সেখানেই সে জেঠুর জরুরি চিঠিখানা পায়। পত্রপাঠ সে ফিরে আসে ভারতে...

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, কবে এলে তুমি ভারতে?

- ঘণ্টাকতক আগে। আজই। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আপনার কাছে এসেছি। এখনো বাড়ি যাইনি।

— সে কী! কেন গো?

— চিঠিখানা পড়লেই সেটা বুঝতে পারবেন। আগে এটা পড়ুন...

বাসু হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন। উপরে স্মরণিকার নাম, লন্ডনের এক ঠিকানা : বি. কে. চতুর্বেদী। বাসু জানতে চান — তিনি কে?

— চৌবে কাকুর রিস্তেদার!

— অবভিয়াসলি। যেহেতু চৌবে আর চতুর্বেদী সমার্থক। কিন্তু এই চৌবে কাকুটি কে?

— জেঠুর ভাই হন সম্পর্কে। চৌবেকাকু আবার জেঠুর, মানে আমাদের রিস্তেদার।

— সেটা তো সহজে হজম করতে পারছি না, স্মরণিকা। 'চৌবে' একটি বিহারী ব্রাহ্মণের টাইটেল, তোমরা 'সেন'। কায়স্থ, বদ্যি না সোনার বেনে?

— কায়স্থ।

— তাহলে? চৌবে কোন সূত্রে তোমাদের রিস্তেদার হয়?

— আপনি স্যার, প্রথমে চিঠিখানা পড়ুন।

বাসু-সাহেব চিঠিতে মনোনিবেশ করলেন। পাকা হতের লেখা। তবে একটু যেন কাঁপা-কাঁপা। মনে হয়, পত্রলেখক বয়সের ভারে ক্লান্ত। ঠিকানা নিউ আলিপুরেরই। তবে অন্য ব্লকের। তারিখ প্রায় পক্ষকাল পূর্বেকার।

"স্নেহের টুকু-মা,

তুই তাড়াতাড়ি ফিরে আয়। আমার আর ভাল লাগছে না। কিন্তু কলকাতা পৌঁছে সোজা বাড়ি আসিস্ না। আমি যা বল্‌ছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তারপর বাড়ি আসবি। আমি দমদম এয়ারপোর্টে তোকে রিসিভ করতে যেতে পারব না। সম্ভবত বাড়ির গাড়িও যাবে না। সেটা এখনো সিংজীর রিপেয়ার-গ্যারেজে পড়ে আছে। তুই দমদমে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে যাবি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর বাড়িতে। তাঁর এই নিউ-আলিপুরেরই ঠিকানা ও-পাতায় লিখে দিলাম। বাসু-সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবি। এই চিঠির সঙ্গে যে চেকটা পাঠাচ্ছি সেটা ভাঙাবি। টাকাটা বাসু-সাহেবকে দিয়ে বলবি সেটা এমনভাবে লুকিয়ে ফেলতে যাতে কেউ না টাকাটার সন্ধান পায়। এ-কাজটা শেষ হলে বাড়িতে আসবি, তার আগে নয়। বাড়ি এসে হয়তো এমন কিছু দেখবি যা তোর চিন্তার বাইরে। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিস। রাগের মাথায় কিছু বোকামি করে বসিস না। পি. কে. বাসু-সাহেবকে বলিস, আমার জন্যে একটা উইল তৈরী করতে। আমার সর্বস্ব আমি তোকে দিয়ে যেতে চাই। উইলটা যেন সংক্ষিপ্ত হয়, এবং অনতিবিলম্বে প্রস্তুত হয়। তৈরী হলেই দুজন সাক্ষী সমেত, আর, হ্যাঁ, একজন ডাক্তার সমেত, বাসু-সাহেব যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন। এ বাড়িতে ঢুকতে কোন বাধা পেলে যেন তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। বাড়ি আমার। আমার আমন্ত্রণেই তিনি আসবেন। উইলে সই হয়ে গেলে তিনিই সেটা সংরক্ষণ করবেন। আমার অবর্তমানে উইলটি কার্যকরী করার জিম্মাদারীও তাঁর। সব কিছু যেন অত্যন্ত গোপন থাকে। শেষ কথা : টুকু-মা! একটা কথা ভুলিস না। যাই ঘটুক না কেন, বিশ্বাস রাখিস, এই দুনিয়ায় তোকেই সবচেয়ে আমি ভালবাসি।

আশীর্বাদক জেঠু"

চিঠিখানা পড়া শেষ করে বাসু বললেন, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জরুরী। কী ব্যাপার কিছু আন্দাজ করতে পার?

— আজ্ঞে না। ঐ চিঠিখানা পেয়েই আমি ফেরার ব্যবস্থা করি। চৌবেকাকুর রিস্তেদার, মিস্টার চতুর্বেদী — মানে, যাঁর বাড়িতে আমি গেস্ট হয়ে ছিলাম লন্ডনে — তিনি আমার জন্য একটা স্কটিশ্-টুরও ঠিক করেছিলেন। আমি রাজি হইনি। সোজা চলে এসেছি। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল — চৌবেকাকু আর কাকিমা...

— এবার বল, তাঁরা কোথা থেকে উদয় হলেন।

অগত্যা আবার কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে হল স্মরণিকাকে। প্রায় মাস-তিনেক আগে ধানবাদ থেকে ওঁরা আসেন — ধনঞ্জয় চৌবে, তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা কাকিমা আর বিলাসসিং যাদব।

— সবাই তোমার জেঠুর রিস্তেদার?

— আজ্ঞে না। বিলাস সিং হচ্ছেন চৌবেকাকুর বন্ধু। ইন ফ্যাক্ট, আপনি ঠিকই ধরেছেন—চৌবেকাকু অথবা সুভদ্রা কাকিমার সঙ্গেও আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আমার ঠাকুর্দা, মানে জেঠুর বাবা সত্যপ্রসন্নের দুই বিয়ে। চৌবেকাকুর মা জেঠুর বিমাতা। দাদু বিহার-শরিফে যখন বদলি হয়ে যান, তখন ঐ বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সে আমলে বামুন-কায়েতের বিয়ের সামাজিক অনুমোদন না থাকায় জেঠুর বিমাতা কোনদিনই কলকাতায় আসেননি। তবে শুনেছি : চৌবেকাকু দাদুর সম্পত্তির অংশ পেয়েছিলেন। ওঁরা তিনজনে সম্প্রতি কী কাজে কলকাতায় আসেন। আমাদের বাড়িতেই ওঠেন। তারপর থেকে এখানেই আছেন। জেঠুর সেবাশুশ্রূষা করতে করতে আমি খুব কাহিল হয়ে পড়েছি এই কথা বলে চৌবেকাকুই আমার বিলেত যাবার ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর দাদার বাসায় ছিলাম লন্ডনে।

নিজের দাদা নয়, রিস্তেদার। পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট-মিকিট সব কিছুই চৌবেকাকু আর বিলাসকাকু করে দেন। জেঠু শুধু খরচটা দেন।

— বুঝলাম। এবার চেকটা দেখি...

বাসু-সাহেব হাতটা বাড়িয়ে দেন।

চেকটা নিয়ে সেটা দেখেই সোজা হয়ে বসেন। স্মরণিকার দিকে তাকিয়ে বলেন, এর মানে কি? গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের উপর সওয়া লক্ষ টাকার চেক!!

— জানি স্যার! আমিও ওর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি।

— কিন্তু আমি যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছি, টুকু! তোমার জেঠুকে কিছু একটা খোঁচাচ্ছে! না হলে ও-কথা কেন লিখবেন — "বাড়ি আমার, আমার আমন্ত্রণেই তিনি আসছেন'। তাঁর বাড়িতে ঢুকতে আমি বাধা পেতে পারি, এ-কথা কেন মনে হল ওঁর? চল, প্রথমে ব্যাঙ্কে যাই। তোমাকে ব্যাঙ্কের কেউ চেনে? না চিনলেও ক্ষতি নেই। সঙ্গে তোমার পাসপোর্ট আছে, তাতেই তোমার সনাক্তিকরণ!

— না, না, ব্যাঙ্কে অনেকেই আমাকে চেনেন। জেঠুর যাবতীয় ব্যাঙ্কের কাজ তো আমিই করতাম এতদিন।

— কী মনে হয়, সওয়া লাখ টাকা ঐ অ্যাকাউন্টে আছে তো?

— আছে। আমি যখন বিলেত যাই তখন ঐ অ্যাকাউন্টে দেড় লাখের উপর ছিল। কত আর খরচ হবে ছয় সপ্তাহে?

— তুমি তোমার জেঠুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখ্‌ভাল কর? জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট?

— না, না। অ্যাকাউন্ট জেঠুর নামে। আমি চেক লিখি, জেঠু সই করেন।

— ঠিক আছে। চল। তোমার মালপত্র কি ঐ ট্যাক্সিতে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— মালপত্র নামিয়ে চল ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়া যাক। আমরা হেঁটেই যাব। ব্যাঙ্ক এমন কিছু দূরে নয়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমাকেও চেনে। কিন্তু একটা কথা। সওয়া লক্ষ টাকা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে তুমি তো ট্যাক্সিতে ঘোরাফেরা করতে পারবে না টুকু। তোমার ডাকনাম তো 'টুকু'? না কি? তোমার জেঠুর চিঠি পড়ে তাই তো মনে হল।

— আজ্ঞে না। আমার ডাকনাম 'টুকু' নয়। একমাত্র জেঠুই ঐ নামে মাঝে মাঝে ডাকেন। আপনিও ঐ নামে ডাকলে আমি সাড়া দেব, আপত্তি করব না। কিন্তু যে-কথা হচ্ছিল, জেঠুই তো বলেছেন — টাকাটা আপনি আপাতত গচ্ছিৎ রাখবেন।

— তা বলেছেন। কিন্তু আমি তো এ জাতীয় কাজ করি না। সে যাহোক, সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা পর্যন্ত টাকাটা না হয় আমার কাছেই গচ্ছিৎ থাকল। কথা হচ্ছে, ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দেবার মতো টাকা তোমার কাছে আছে তো?

টুকু রাঙিয়ে ওঠে। বলে, আজ্ঞে না। বস্তুত আমার কাছে ভারতীয় মুদ্রা কিছুই নেই। সামান্য কিছু শিলিং-পেন্স ভাঙানি আছে। আপনিই ভাড়াটা মিটিয়ে দিন স্যার, চেকটা ভাঙানো হলেই...

— ঠিক আছে, ঠিক আছে। চলো।

গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের নিউ আলিপুরের শাখা ওঁর বাড়ি থেকে হাঁটাপথের দূরত্বে। তা হোক, সওয়া লক্ষ টাকা হাতব্যাগে নিয়ে এটুকু পথও পাড়ি দেওয়া উচিত নয়? যা দিনকাল পড়েছে! বাসু-সাহেব তাঁর ভল্টের চাবিটা সঙ্গে নিয়ে নিলেন। নগদ টাকাটা ঐ ব্যাঙ্কে তাঁর ভল্টে রেখে দেবেন চেকটা ভাঙিয়ে।

সত্যই এ জাতীয় কাজ তিনি করেন না। কিন্তু মেয়েটির বিচিত্র ঘটনাপরম্পরা তাঁকে দূরন্ত কৌতূহলী করে তুলেছে। এ সমস্যার শেষটুকু না দেখে তাঁর তৃপ্তি নেই। দেখাই যাক না — ঘটনা কোন্ দিকে গড়ায়, ভাবখানা এইরকম।

বেলা এখন সাড়ে এগারো। ব্যাঙ্কে লোকজন যথেষ্ট। স্মরণিকা টেলার কাউন্টারে গিয়ে কিউ-এ

সামিল হল। একটু পরেই সামনের ক'জন কাজ সেরে সরে গেলেন। স্মরণিকা কাচের ফোকর দিয়ে চেকটা বাড়িয়ে ধরল। ভিতরে যে ব্যাঙ্ক-কর্মচারী হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন তিনি প্রশ্ন করলেন, কবে ফিরলেন, মিস্ সেন?

বাসু বুঝতে পারেন, স্মরণিকা ঐ কর্মচারীর পরিচিত। সে যে ভারতের বাইরে গেছিল এ খবরটাও রাখে। তবে টুকুকে জবাব দিতে হল না। কেরানী ভদ্রলোক ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, গুড হেভেন্স! নগদে? এত টাকা?

এবারও স্মরণিকা জবাব দেবার সুযোগ পেল না। ভদ্রলোকই পুনরায় বললেন, এক্সকিউজ মি। আমি এখনি আসছি...

চেকটা হাতে করে তিনি কাউন্টার ছেড়ে ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই আবার ফিরে এলেন। তাঁর হাতে চেকটা ধরা। এতক্ষণে স্মরণিকার সঙ্গীটিকে ওঁর নজরে পড়ে। বলেন, গুড মর্নিং স্যার। আপনি কি ওঁর সঙ্গে আছেন?

বাসু বলেন, ইয়েস। শী ইজ মাই ক্লায়েন্ট।

কর্মচারী বলেন, আয়াম সরি মিস্ সেন। চেকটা বাউন্স করছে, মানে, অত টাকা ঐ অ্যাকাউন্টে নেই।

— নেই? কত টাকা আছে?

— আপনি জানেন মিস্ সেন, কত টাকা আছে, তা শুধু অ্যাকাউন্ট-হোল্ডারকেই জানানো চলে। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা আপনাকে জানাতে পারি, ইতিমধ্যে কোর্ট-অর্ডারে ঐ অ্যাকাউন্টের সব টাকাই তুলে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে।...আমার মনে হয়, মিস্ সেন, আপনি এখনি আপনার জেঠার সঙ্গে দেখা করুন চেকটার ব্যাপারে। ব্যারিস্টার-সাহেব আপনাকে আইনের দিকটা বুঝিয়ে দেবেন।

বাসু বলেন, ব্যারিস্টার-সাহেব নিজেই কিছু বুঝছেন না, ক্লায়েন্টকে কী বোঝাবেন? ঠিক কী ঘটেছে বলুন তো?

— আদালত মিস্টার সেন-এর জন্য একজন কন্জার্ভেটার নিযুক্ত করেছেন। আদালত্ত-নিযুক্ত কন্জার্ভেটর জানতে চান ঐ অ্যাকাউ[illegible] ব্যালেন্স আছে। সেটা জেনে ব্যাঙ্কিং রুল্সের মিনিমাম ব্যালেন্সের মাত্র পাঁচশ' টাকা রেখে সমস্ত টাকাই ঐ কন্জার্ভেটর তাঁর নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছেন।

— কী নাম আদালত-নিযুক্ত কন্জার্ভেটরের?

— মিস্টার ধনঞ্জয় চৌবে। মাত্র পর্শু দিন।

— আই সী।

কেরানী ভদ্রলোক স্মরণিকার দিকে ফিরে পুনরায় বললেন, আয়াম রিয়ালি সরি, মিস সেন। কিন্তু ঐ চেকখানাও মোস্ট আন-ইউজুয়াল।

স্মরণিকা বললে, জানি! কিন্তু, মানে জেঠু...

— যা হোক, এখন কেমন আছেন আপনার জেঠু?

— এখন কেমন আছেন মানে? কী হয়েছে তাঁর?

ক্লার্ক ভদ্রলোক ততক্ষণে চেয়ারে বসে পড়েছেন। পরের চেকখানি গ্রহণ করেছেন। বাসু-সাহেব মেয়েটির বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করেন। একটু দূরে সরে এসে বলেন, চেকটা আমার কাছেই থাক টুকু। তুমি ওর পিছনে ইতিমধ্যে স্বাক্ষরও করেছ। ওটা প্রায় নগদ টাকার সামিল। তোমার ব্যাগে ওটা থাকা সেফ নয়, যদিও অ্যাকাউন্টে অত টাকা নেই। তা হোক! তুমি বরং একবার তোমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে এস। তোমার মালপত্র আমার বাড়িতেই থাক। চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

মেয়েটি রাজি হল না। বললে, না, আমি একাই বাড়ি যাব। ঐ একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ওটা ধরি। একটু পরে ফিরে এসে মালপত্র আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে আসব।

— দ্যাট্স অল রাইট। চেক আর চিঠিখানা দাও। আর এই খুচরো টাকাটা রাখ। ট্যাক্সিভাড়া।

স্মরণিকা চেক আর চিঠিখানা বাসুসাহেবকে দিল, কিন্তু টাকাটা নিল না। বললে, আর টাকার দরকার হবে না। জেঠুর কাছেই তো যাচ্ছি। তাঁর কাছ থেকে ট্যাক্সি-ফেয়ারটা নিয়ে নেব।

বাসু-সাহেব খপ্ করে ওর মণিবন্ধটা চেপে ধরেন। বলেন, জানি না সেটা সম্ভবপর হবে কিনা। দুই সপ্তাহ আগে তোমার জেঠু সুস্থ-সবল ছিলেন, এই চিঠিখানা তারই প্রমাণ। কিন্তু ইতিমধ্যে গুরুতর কিছু ঘটে গেছে বলে আশঙ্কা করছি। ঠিক কতটা ঘটেছে তা জানি না, কিন্তু বাড়ি গিয়ে তুমি অপ্রত্যাশিত কিছুর মুখোমুখি হবে, টুকু। মনকে এখন থেকেই তৈরী করে রাখ। শোন, বাড়ি পৌছে আমাকে একটা ফোন কর। জানিও জেঠু কেমন আছেন, আর কখন তোমার মালপত্র নিতে আসবে, সেটাও জানিও। নাও, টাকাটা ধর। না লাগে, টাকাটা পরে আমাকে ফেরৎ দিও।

স্মরণিকা বিহ্বল ভাবে টাকাটা নিল। ট্যাক্সিটার দিকে এগিয়ে গেল।

দুই

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরের কথা। বাসুসাহেব অফিসে বসে একটা এফিডেবিটের ড্রাফ্ট্ পড়ে দেখছিলেন। ইন্টারকমে শোনা গেল রানী দেবীর কণ্ঠস্বর, 'মেয়েটি ফিরে এসেছে!'

— কে? স্মরণিকা? পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল মেয়েটি। ওর চোখ দুটো লাল। বেশ বোঝা যায়, এতক্ষণ কাঁদছিল। বাসু জানতে চান, খারাপ খবর মনে হচ্ছে। জেঠুকে কেমন দেখলে?

— দেখিনি। জেঠু ওখানে নেই। ওরা তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাসু বললেন, বস, এইরকম কিছু একটা ঘটবে বলে আশঙ্কা ছিল আমার। র'স, আগে কৌশিক আর সুজাতাকে ডাকি। ওরা একটা প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সি খুলেছে। এই বাড়িতেই ওদের অফিস। থাকেও এখানে। তুমি নিজেকে ততক্ষণ একটু সামলে নাও বরং। উই মাস্ট ফাইট ব্যাক।

ইন্টারকমে ওদের দুজনকে ডেকে পাঠালেন।

স্মরণিকা তার মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা পেশ করল।

ব্যাঙ্ক থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সে নিজের বাড়িতে যায়। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেখে সদর দরজা হাট করে খোলা। ও এগিয়ে যায়। কাউকে দেখতে পায় না। বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। মায় এতদিনের পুরনো ঝি-চাকর কাউকেও নজরে পড়ে না। হঠাৎ ওপাশ থেকে একজন অচেনা লোক এগিয়ে আসে, বলে, ক্যা চাহিয়ে মাইজি?

স্মরণিকার মনে হল, লোকটা দারোয়ান। নতুন বহাল হয়েছে। কিছু জবাব দেবার আগেই ওপাশ থেকে সুভদ্রা কাকিমা এগিয়ে এসে বলেন, তুম্ আপনা কামমে যাও যোগিন্দার। ম্যায় দেখতি...

স্মরণিকার দিকে ফিরে বলেন, কবে ফিরলে কলকাতায়? কোথায় উঠেছ?

— কোথায় উঠেছি মানে? নিজের বাড়ি ছেড়ে...

— না, জিনিসপত্র কিছু সঙ্গে নেই তো। তাই ভাবলাম, কোন হোটেলে উঠে দেখা করতে এসেছ বুঝি।

স্মরণিকা বলে, জেঠু, কোন ঘরে?

— উনি এ বাড়িতে নেই স্মরণিকা। উনি একটা মেন্টাল স্যানিটেরিয়ামে আছেন।

— মেন্টাল স্যানিটেরিয়াম! কেন? কী হয়েছে জেঠুর? মাথার গণ্ডগোল?

— সে অনেক কথা। মোটকথা তিনি অসুস্থ। তোমার জিনিসপত্র তোমার ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা আছে। পাছে সেসব বেহাত হয়ে যায়, তাই আমিই ঘরটা তালা দিয়ে রেখেছি। তুমি কাল-পর্শুর-মধ্যে

এসে তোমার মালপত্র নিয়ে যেও। তোমার কাকু এ বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেবার কথা ভাবছেন। নাও, চাবিটা ধর।

স্মরণিকা আকাশ থেকে পড়ে! বলে, মানে? আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব কেন? এটা আমার বাড়ি। আমি এখানে জন্মেছি, মানুষ হয়েছি। তাছাড়া জেঠু যদি অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনিও তো দুদিন পরেই ফিরে আসবেন, নাকি? চৌবেকাকু বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেবেন এ কথার অর্থ কী?

হঠাৎ যেন আমূল বদলে গেল ওর সুভদ্রাকাকিমা। দাঁতে দাঁত দিয়ে বললে, কাল সন্ধ্যার মধ্যে তুমি তোমার জিনিসপত্র না নিয়ে গেলে আমরা তা রাস্তায় বার করে দেব, পর্শু সকালে। জেঠুকে কব্জা করে গোটা সম্পত্তিটা গ্রাস করার খেলা তোমার শেষ হয়ে গেছে স্মরণিকা। এবার নিজের পথ দেখ!

রাগে-দুঃখে-অপমানে ও কেঁদে ফেলে। জেঠু কোন পাগলাগারদে আছেন জানতে চায়। সুভদ্রা-কাকিমা সে ঠিকানাও ওকে দেয় না। বলে, সত্যানন্দ সেন মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। তাঁর সাথে বাইরের লোকের দেখা করা বারণ। টুকু জানতে চায়, আমি কি বাইরের লোক?

সুভদ্রা বলে, তোমার সঙ্গে বসে বসে তর্ক করার সময় আমার নেই। এবার এস তুমি।

স্মরণিকা বেরিয়ে আসে রাস্তায়। ট্যাক্সিটা ততক্ষণে চলে গেছে। ও বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে সামনে পার্কে। প্রতিবেশী দু-একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা মনে হয়। তাঁরা নিশ্চয় জানেন, জেঠুর ঠিকানা। কিন্তু তারপর মনে হয়, জেঠুর শেষ নির্দেশ ছিল বাসু-সাহেবের শরণাপন্ন হওয়া। তাই হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছে।

বাসু বললেন, ঠিকই করেছ, টুকু। ঠিক কী ঘটেছে জানি না ; কিন্তু আন্দাজ করতে পারি। সে-কথা বলছি। তার আগে তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। তোমার জেঠুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কত হতে পারে?

— আমার ধারণা নেই। ওঁর বাড়ি একখানাই, এই নিউ আলিপুরের বাড়িটা। গাড়ি একটা, এখন পড়ে আছে রিপেয়ার শপে। কোম্পানির কাগজ, য়ুনিট ট্রাস্ট, ফিক্সড ডিপসিট মিলিয়ে পাঁচ-সাত লাখ টাকা হতে পারে।

— বুঝলাম। ঐ চৌবে-কাকু কতদিন পরে কলকাতায় এসেছে? তোমার জেঠুর সঙ্গে তাদের কী রকম সম্পর্ক? তার ব্যাকগ্রাউন্ড কী? ধানবাদে কী করে?

স্মরণিকা যতটুকু জানে তা জানায়। চৌবে-কাকু দু-তিন বছর অন্তর কলকাতায় এলে এ বাড়িতেই উঠত। একতলায় একটা গেস্টরুম আছে। সেখানেই থাকে। সুভদ্রা-কাকিমা এর আগে কখনো আসেনি। মাস-তিনেক আগে জেঠু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। জনডিস্। এত বেশি বয়সে জনডিস্ দুরারোগ্য অসুখ। সুভদ্রা প্রাকবিবাহ জীবনে ছিল হাসপাতালের নার্স। তাই তাকে নিয়ে চৌবেকাকু চলে আসে কলকাতায়। জেঠু সামলে ওঠার পর ওরাই উৎসাহ করে স্মরণিকাকে বিদেশে পাঠায়। জেঠুর সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে ও সত্যিই খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। সুভদ্রা বৃদ্ধের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়। স্মরণিকা রাজি হয়ে যায়। টুরিস্ট ভিসা নিয়ে মাসখানেকের জন্য চৌবের রিস্তেদারের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। লন্ডনে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ খুব বেড়ায়। প্রতি সপ্তাহে জেঠুর চিঠি পেয়েছে। কোন আশঙ্কাই হয়নি তার। তারপর হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! জেঠুর ঐ চিঠি আর চেক। ট্রাঙ্ককলে জেঠুর সঙ্গে কথা বলতে চায়। যোগাযোগ করতে পারে না। ও তখন কালবিলম্ব না করে পরের প্লেনে ফিরে আসে।

বাসু বললেন, শোন টুকু, তোমার বয়স কম, অভিজ্ঞতাও অল্প। যে ঘটনা তোমাদের বাড়িতে ঘটেছে তার ছকটা অতি পরিচিত। যুগে যুগে দেশে দেশে এই নাটকটা অভিনীত হয়ে গেছে! তুমি একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছ। তোমার চৌবেকাকু উদ্যোগী হয়ে তোমার পাসপোর্ট-ভিসা বানিয়েছিল, তার আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়েছিল, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। পরিকল্পনার ছকটা সবক্ষেত্রেই এক

রকম। অগাধ সম্পত্তির মালিক বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়েন — হয়তো তখন তিনি বিপত্নীক, নিঃসন্তান। সম্পত্তির লোভে দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা এসে জোটে। যারা এতদিন বৃদ্ধের দেখ্‌ভাল করছিল — হয়তো অর্থের বিনিময়ে, অথবা ভালবেসে — তাদের নানান ছুতোয় দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। এটায় সামাজিক না থাক, আইনের অনুমোদন থাকে। পাড়া-প্রতিবেশী শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে! নৌকোর হালটা কব্জা করার পরেই রিস্তেদারেরা দাবী করে, বৃদ্ধ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন! নিজের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা আর তাঁর নেই। যারা এতদিন ছিল বৃদ্ধের কাছাকাছি, তারা আর তাঁর কাছে ভিড়তে পারে না। সদ্যআগত রিস্তেদারেরা আদালতের শরণাপন্ন হয়। আদালত ওদেরই একজনকে সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করে। এখানে নাটকের প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি। দ্বিতীয় অঙ্কে বৃদ্ধকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোনও আরোগ্য-নিকেতনে, নার্সিং হোমে, কখনো বা মানসিক রোগীর উন্মাদাগারে। সেই বিখ্যাত আরবীয় উটের ক্লাসিকাল কাহিনীটি পুনরভিনীত হয়। আত্মীয়েরা স্থায়ীভাবে সম্পত্তির দখল নেয় — আর উট হয়ে যায় অবনঠাকুরের আঁকা উট! এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। তোমার জেঠুর বুকে বিঁধেছে রিস্তেদারের কাঁটা।

স্মরণিকা প্রতিবাদ করে, কিন্তু পনের দিন আগেও তিনি সুস্থ ছিলেন। চিঠিখানা তারই প্রমাণ!

— তোমার দৃষ্টিতে! তোমার চৌবেকাকু হয়তো ঐ চিঠিখানাই প্রমাণ হিসাবে দাখিল করতে চাইবে — তোমার জেঠুর মানসিক ভারসাম্যের অভাব দেখাতে। ব্যাঙ্কের কেরাণি ভদ্রলোকের কথাটা নিশ্চয় মনে আছে তোমার — 'দ্যাট্‌স এ মোস্ট আন্‌য়ুজুয়াল চেক!' তাও তো ভদ্রলোক জানতেন না যে, তোমার জেঠু একটা সাধারণ খামে ভরে ঐ সওয়া-লক্ষ টাকার বিয়ারার-চেকখানা লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন ডাকযোগে! তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ টুকু, তোমার সুভদ্রাকাকিমা ট্রেন্‌ড নার্স! নিজে হাতে ইনজেকশন দিতে পারে। এমন ঔষধ আছে যার সাহায্যে সুস্থ সবল লোককে মানসিক ধৈর্যচ্যুত করা চলে, কোনও বয়স্ক লোক তাতে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে! হয়তো ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যাবে তিনি সত্যই উন্মাদ! কী-ভাবে তা হয়েছেন তা কেমন করে প্রমাণ করা যাবে?

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি।

ইতিমধ্যে হুইল-চেয়ার চালিয়ে রানী দেবীও এসে জুটেছেন ওখানে। তিনি বাসু-সাহেবকে ধমকে ওঠেন, তুমি থাম দেখি! অহেতুক ওকে ভয় দেখাচ্ছ!

তারপর হুইল-চেয়ারে একটা পাক দিয়ে ঘনিয়ে আসেন। টুকুর পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন, এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না, টুকু। যারা তোমার জেঠুকে পাগল করে তুলেছে তাদের ষড়যন্ত্রজাল ভেদ করতে হবে। তোমার মেসো কেসটা নিয়েছেন। তাঁকে সব দিক থেকে সাহায্য করার দায় যে তোমার!

স্মরণিকা তার অশ্রুআর্দ্র মুখখানা তুলে বললে, কিন্তু আমি যে ওঁকে ফি-টাও দিতে পারব না, মাসিমা। আমি তো পথের ভিখারি — আজ রাতে কোথায় মাথা গুঁজব...

— সে চিন্তা করতে হবে না। তুমি আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

স্মরণিকা নিজে থেকেই সামলে নেয় নিজেকে। বলে, না মাসিমা! আমার এক বান্ধবী আছে, একাই থাকে, এক-কামরার ফ্ল্যাটে। চাকরি করে। আমি তার কাছে থাকব। কিন্তু সম্পত্তি উদ্ধার করতে না পারলে ওঁর ফী...

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, ও-কথা বল না টুকু। ধরে নাও আমি একটা জুয়া খেলছি। তোমাকে বাজি রেখে। যদি ঐ রিস্তেদারের কাঁটাখানা উচ্ছেদ করতে পারি, তাহলে তুমি আমার 'ফী' মেটাবে...

— না হলেও আমি গ্র্যাজুয়েট, টাইপিং জানি...নিশ্চয় কোন কাজকর্ম যোগাড় করতে পারব। ধীরে ধীরে শোধ করে দেব...

— দ্যাটস দ্য স্পিরিট! হেরে যাবার আগেই হার স্বীকার করবে কেন?

স্মরণিকা জানতে চায়, একটা কথা! জেঠু তো আপনাকে বলেছেন উইল তৈরী করে তাঁর সঙ্গে

দেখা করতে...

— এটাই ঐ নারকীয় পরিকল্পনার 'বিউটি-টাচ'! আদালতের ঘোষণায় তিনি 'ইন্‌কম্পিটেন্ট'-রূপে চিহ্নিত হয়ে যাবার পর স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে আর তাঁর অধিকার থাকবে না। সেটা মহানন্দে অতঃপর ভোগ করবে তারাই, যারা তাঁকে 'ইনকম্পিটেন্ট'-রূপে চিহ্নিত করেছে! উত্ত্যক্ত করে, উত্তেজিত করে, ইনজেকশন দিয়ে!

— কিন্তু জেঠু তো 'ইনকম্পিটেন্ট' নন, সারাটা জীবন নিজের বিষয় সম্পত্তি নিজেই দেখ্-ভাল করেছেন। আমি ক-সপ্তাহ আগেও দেখে গেছি তিনি মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ — শারীরিক ভাবে দুর্বল হলেও!

— তোমার জেঠু স্বরাষ্ট্রের সম্রাট ছিলেন এতদিন। তুমি আর ঝি-চাকরেরা মান্য করতে, শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে! এতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ রাতারাতি তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল তুমি বিলেত যাবার পরেই। এক একে বিশ্বস্ত সেবকেরা বিদায় নিল। হয়তো চৌবে, তার স্ত্রী আর বিলাস সিং যাদব বৃদ্ধকে ক্রমাগত মানসিকভাবে উৎপীড়ন করছিল — তাঁর উপর ঔষধ, ইনজেকশন চলছিল। ঐ বয়সের একজন বৃদ্ধ — সদ্য যিনি জনডিস থেকে ভুগে উঠেছেন — তাঁর পক্ষে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া তো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা—

— কিন্তু জেঠু সে-সব কথা তো আমাকে চিঠিতে লেখেননি।

— হয়তো তোমার বিদেশ ভ্রমণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চান না বলেই। আমার আশঙ্কা, তোমাকে লেখা ঐ চিঠিখানার ফাঁদেই উনি আটকা পড়েছিলেন। চৌবে ওখানা দেখেছে, হয়তো জেরক্স-কপি রেখে ডাকে পাঠিয়েছে। এটাই হয়তো আদালতে ওর ব্রহ্মাস্ত্র ছিল।

— বুঝলাম না। ঠিক কী বলতে চাইছেন?

— ঐ চিঠির জেরক্স-কপি আদালতে পেশ করে ওরা বলেছে — 'এই দেখুন ধর্মাবতার — এই বৃদ্ধ সওয়া লক্ষ টাকার বেয়ারার-চেক অর্ডিনারি পোস্টে তার ভাইঝিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলছে টাকাটা এমনভাবে লুকিয়ে ফেলতে যাতে কেউ না জানতে পারে টাকাটা কোথায় রাখা হল। এ তো বদ্ধ উন্মাদ! এর সম্পত্তি দেখ-ভাল করার জন্য একজন 'কন্‌জারভেটর' এখনি বহাল করা দরকার।'

কৌশিক হঠাৎ বলে বসে, মিস্টার সেনের ওটা নির্বুদ্ধিতা হয়েছিল!

— সার্টেনলি নট! — গর্জে ওঠেন বাসু-সাহেব। ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে আধাপাক দিয়ে কৌশিকের মুখোমুখি হয়ে বলেন, তুমি সেই অসহায় বৃদ্ধের অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারছ না কৌশিক! তিনি বুঝতে পেরেছিলেন — ঐ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৈশাচিক পরিকল্পনাটা! ওরা তাকে পাগল করে তুলছে। উত্ত্যক্ত করে, উত্তেজিত করে, ঔষধ প্রয়োগে, ইনজেকশন দিয়ে! কিছু করার নেই! বিশ্বস্ত সেবকদের ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। উনি বুঝতে পারছিলেন — ওরা দুদিনেই ওঁর বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করবে। বুঝতে পারছিলেন, ওরা তাঁকে পাগল করে তুলছে! তাই স্মরণিকা ফিরে এলে 'ফাইট-ব্যাক' করার জন্য কিছুটা অর্থ উনি সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন — একটা চান্স নিয়েছিলেন। জানতেন, চেকটা বেহাৎ হলেও আশঙ্কার কিছু নেই। গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক একটা বেগানা লোককে সওয়া লক্ষ টাকা নগদে দেবে না — বেয়ারার-চেক হওয়া সত্ত্বেও! বিশেষ — 'পেয়ীকে', মানে মিস্ স্মরণিকা সেনকে — ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ব্যক্তিগতভাবে চেনেন! সেটা কেটে অন্য নাম লেখা হলে চেকটার পেমেন্ট কিছুতেই হত না! 'রেফার টু ড্রয়ার' হয়ে যেত।

স্মরণিকা জানতে চায়, ঐ চিঠিখানার জন্যই কি জজ-সাহেব জেঠুকে 'ইনকম্পিটেন্ট'-রূপে চিহ্নিত করেছেন?

— খুব সম্ভবত তাই। তবে নিশ্চিতভাবে জানি না। আগামীকাল জানতে পারব, জজ-সাহেবের সঙ্গে কথা বলে। চীফ জাজ ভাদুড়ীর সঙ্গে কাল বেলা দুটোর সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।

স্মরণিকা অবাক হয়ে যায়। চীফজাজ ভাদুড়ীর এজলাসেই নিশ্চয় ঐ কেসটা উঠেছিল, কিন্তু উনি

তা কী করে জানলেন? বেচারি জানত না, ব্যাঙ্ক থেকে ফিরেই বাসু হাইকোর্ট-পাড়ায় ফোন করেছিলেন ওঁর জুনিয়ারকে। তার মাধ্যমে কোর্ট-রেকর্ড থেকে জেনেছেন সত্যানন্দ সেনের কেসটা কোন জজ-সাহেব বিচার করেন। তথ্যটা সংগ্রহ করে চীফজাজ সদানন্দ ভাদুড়ীর পেশকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি আগামীকাল বেলা দুটোর সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। সওয়া দুটোয় ওঁর এজলাস বসবে। অবশ্য বিচারক ভাদুড়ী জানেন না — বাসু কী বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান।

কৌশিক আর সুজাতা বাসু-সাহেবের গাড়িতে করে স্মরণিকাকে পৌঁছে দিয়ে এল বেহালায়, তার বান্ধবীর যদু-কলোনির ফ্ল্যাটে। গীতা কর একটি বিখ্যাত ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পার্সোনাল সেক্রেটারি। কোম্পানির খরচে তার ফ্ল্যাটে একটি টেলিফোন আছে। গীতা বিবাহিতা, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে বর্তমানে একলা থাকে। সে ফ্ল্যাটে ছিল। মালপত্রসমেত টুকুকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে কৌশিক আর সুজাতা ফিরে এল।

তিন

চীফজাজ ভাদুড়ী একাই ছিলেন। কাঁটায়-কাঁটায় দুটোর সময় পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু।

— হ্যালো মিস্টার বাসু। আসুন, বসুন। আপনি বহাল তবিয়তে আছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মিসেস বাসু কেমন আছেন?

— ভালই। একটা জরুরী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

— বলুন?

— একটা 'কন্টেস্টেড ম্যাটারে' আপনার এজলাসে আমাকে 'অ্যাপিয়ার' করতে হতে পারে। ফলে, সে সম্বন্ধে এখানে জনান্তিকে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই না। আপনার-আমার দুজনের স্বার্থেই। তবে যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে কিছু 'হিস্ট্রি' সংগ্রহ করে নেব, অর্থাৎ আপনি যে অর্ডার করেছেন তার পশ্চাতে কী জাতের তথ্য পেশ করা হয়েছিল।

— কোন্ কেসটা বলুন তো?

— নিউ আলিপুরের বৃদ্ধ সত্যানন্দ সেনের তরফে ধনঞ্জয় চৌবেকে অছি নিযুক্ত করা...

— আই সী। সে তো দিন-সাতেক আগের ঘটনা।

— পাঁচদিন আগেকার।

— আপনার মনে হয়েছে যে, কোথাও কিছু...ইয়ে...গড়বড় হয়েছে?

— মাপ করবেন, তথ্য ইতিহাসের বাইরে আমরা কোন কিছু আলোচনা করতে পারি না। করবও না।

— বৃদ্ধের 'গার্ডেইয়ানশিপ' সম্বন্ধে আমি সাময়িক আদেশ দিয়েছি মাত্র। নতুন কোন তথ্য যদি আদালতে পেশ করা হয়, আমি শুনতে, প্রয়োজনে আমার পূর্বকৃত আদেশ পরিবর্তিত করতেও পারি। দেখুন ব্যারিস্টার-সাহেব — তথ্য কী বলছে? পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ, আমি তাঁকে দেখেছি। প্রতি কথাতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। কথাবার্তার পারম্পর্য ছিল না। উনি যে আদালত-কক্ষে আছেন এই সহজ কথাটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তদুপরি দেখলাম, সওয়া লক্ষ টাকার একটা বেয়ারার চেক উনি একটি মেয়েকে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন টাকাটা লুকিয়ে ফেলার জন্য। সবটা মিলিয়ে স্বতই মনে হয়েছে এই ধনী বৃদ্ধটির একজন অছি নিযুক্ত করার প্রয়োজন আছে। মিস্টার চৌবে তাঁর নিকটতম আত্মীয় — বৈমাত্রেয় ভাই। অবশ্য আপনি যদি কোনও নূতন তথ্য দাখিল করতে চান...

— আমি তাই চাই।

— অল রাইট। কাল সকালে আমার একটা কেস মুলতুবি হয়েছে। আমি না হয় সাড়ে দশটায় আদালত বসাব। আপনার অ্যাডিশনাল এভিডেন্স শুনতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না নিশ্চয়। কাল সকালের মধ্যে কি আপনার কেস তৈরী হবে?

— হবে। তাহলে ও-পক্ষকে আমি সেই মর্মে নোটিস জারীর ব্যবস্থা করছি।

— করুন। তবে একটা কথা। সত্যানন্দ সেনকে আদালতে হাজির করার দরকার নেই। শুনেছি তিনি নার্সিং হোমে আছেন। তাই থাকুন। বৃদ্ধের রেস্ট নেওয়া দরকার।

হাইকোর্টের অদূরে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের একটি দ্বিতল বাড়িতে বাসু-সাহেবের চেম্বার। কয়েক দশক ধরে এখানে উনি এসে বসতেন, আদালত বসার আগে আর পরে, রিসেস্ পিরিয়ডে। এখানেই তাঁর কর্মজীবনের শুরু, প্রখ্যাত ব্যারিস্টার এ. কে. রে-র জুনিয়ার হিসাবে। এখন বাসু-সাহেব এখানে রোজ হাজিরা দেন না — ক্বচিৎ কখনো হাইকোর্ট-পাড়ায় এলে তাঁর ইজিচেয়ারটায় এসে বসেন। এখন তাঁর জুনিয়ারেরা এটা ব্যবহার করে। না, ইজিচেয়ারখানা নয়। ঘরটা। তাদের একজনকে উনি বললেন, অপর পক্ষকে নোটিস সার্ভ করাবার ব্যবস্থা করতে। ও পক্ষের উকিল 'দত্ত অ্যান্ড দত্ত'। তার সিনিয়ার পার্টনার সলিল দত্তের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন।

ইতিমধ্যে আদালতের আফটার-নুন সেসান্স শুরু হল। হ্যাঙার থেকে গাউন পেড়ে নিয়ে উকিলবাবুরা একে একে সজ্জিত হলেন। সার বেঁধে চললেন যে-যার আদালতকক্ষে। ঘর খালি হতে বাসু-সাহেবের নজর হল কৌশিক দূরে একখানা চেয়ার দখল করে বসে আছে। উনি জানতে চান, কী সুকৌশলী টিকটিকি? কিছু খবর-টবর যোগাড় হল? সাক্ষী-টাক্ষি?

— তা হয়েছে মামু। আপনার তরফে এক নম্বর সাক্ষী হতে রাজি আছেন মিস্টার সি. এস. রঙ্গনাথন—

— রঙ্গনাথন? মানে গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার? সে কী বলবে?

— সত্যানন্দ বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। বহুদিন ধরে তিনি নানান শেয়ার কেনাবেচা করে শেয়ার-বাজারের হালচাল খুব ভাল বোঝেন। তাঁর অ্যাকাউন্ট ক্রমে ক্রমে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। নানান ইনভেস্টমেন্টে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর তরফে 'কনজারভেটার' নিষ্প্রয়োজন।

— সব পাস্ট-টেন্স কৌশিক! সবই অতীতের গল্প! 'মা কী ছিলেন!' আদালত শুধু জানতে চায় : 'মা কী হইয়াছেন!' উনি বর্তমানে কোথায় আছেন, জান?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ। ডায়মন্ডহারবার রোডে বড়িশা-বেহালার কাছে একটি ওল্ড-এজ হোম-এ। নাম 'শান্তিধাম'। মালিকের নাম ডক্টর নিত্যানন্দ রথ। উনি আছেন সতের নম্বর কেবিনে। টেলিফোন আছে। ফোনে ওরা কোনও খবর জানাচ্ছে না। যদি বলেন নিজে গিয়ে দেখতে পারি।

— বলছি। তার আগে বল, ধনঞ্জয় চৌবে আর বিলাসসিং যাদবের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিছু জানতে পেরেছ?

সে কথাও জানায় কৌশিক। ধনঞ্জয় ছিল ধানবাদে এক কারখানার ফিটার। প্লাম্বিঙের কাজ ভালোরকম জানে। কী-একটা অপরাধে বছরখানেক আগে সে চাকরি খোয়ায়। ইউনিয়ন ওর কেসটা লড়তে চায়নি। আর বিলাসসিং যাদব ছিল ওদের ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা। বস্তুত ধানবাদের একজন নামকরা ট্রেড ইউনিয়ান লীডার। বিস্তারিত সঠিক জানতে পারিনি। তবে এটুকু জানা গেছে, তহবিল তছরূপের মামলায় দুজনেই জড়িত। বিলাসসিংএর ধারণা টাকাটা ধনঞ্জয় সরিয়ে ফেলেছে। টাকার কিছুটা ছিল কোম্পানির, কিছুটা ট্রেড ইউনিয়নের ক্যাশ। ধানবাদের কয়েকজন গুণ্ডার হাত থেকে আত্মগোপন করতেই নাকি দুজনে পালিয়ে এসেছে কলকাতায়।

চার

ঠিক সাড়ে দশটার সময় চীফজাজ ঘোষণা করলেন, আদালত বসছে।

প্রথমেই শ্রীসত্যানন্দ সেনের তরফে অছিনিযুক্তিকরণ বিষয়ে আলোচনা। পূর্ববর্তী আদেশে বলা হয়েছিল শ্রীসেনের তরফে সাময়িকভাবে শ্রীধনঞ্জয় চৌবেকে অছি নিযুক্ত করা হল। কাউন্সেলার পি. কে. বাসু আমাকে জানিয়েছেন ঐ বিষয়ে তিনি কিছু অ্যাডিশনাল তথ্য পেশ করতে চান। আদালত তা শুনতে প্রস্তুত। আদালত দেখতে পাচ্ছেন সাময়িকভাবে নিযুক্ত অছি শ্রীচৌবে এবং তাঁর কাউন্সেলর আদালতে উপস্থিত। সুতরাং আদালত কাউন্সেলর পি. কে. বাসুকে তাঁর অতিরিক্ত নূতন তথ্য দাখিল করতে অনুমতি দিচ্ছেন।

বাসু-সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি দুটি এফিডেবিট দাখিল করব, ধর্মাবতার। প্রথমটি দাখিল করছেন শ্রীমতী স্মরণিকা সেন। তিনি বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীসত্যানন্দ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। উল্লেখ্য, শ্রীমতী সেনের পিতৃদেব স্বর্গত সত্যপ্রিয় সেন ছিলেন সত্যানন্দের সহোদর ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন। শ্রীমতী সেন তাঁর এফিডেবিটে বলেছেন, মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে তিনি যখন টুরিস্ট ভিসায় লন্ডনে বেড়াতে যান তখন তাঁর জেঠামশাই বহাল তবিয়তে, সুস্থ মস্তিষ্কে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে ছিলেন। ফিরে এসে তিনি দেখেছেন, জেঠামশাই 'মেন্টাল নার্সিংহোমে', তাঁর বাড়ির পুরাতন সেবকবৃন্দ—যে সব ঝি-চাকর-পাচক শ্রীসত্যানন্দ সেনকে গত কয়েক দশক ধরে সেবা করে এসেছে—তারা সকলেই বিতাড়িত। পুরনো লোক একটিও নেই। নূতন চাকর-বাকরদের নিযুক্ত করেছেন শ্রীসত্যানন্দ সেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, যাঁর হেপাজতে থাকার সময় মাত্র পাঁচ সপ্তাহে বৃদ্ধ সেন-মশাই মানসিক স্থৈর্য হারিয়েছেন। দ্বিতীয় এফিডেবিট দাখিল করেছেন নিউ আলিপুরের গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীসি. এস. রঙ্গনাথন। তিনি শ্রীসত্যানন্দ সেনকে দীর্ঘসময় ধরে চেনেন। তাঁর মতে শ্রীসেন বিগত দশ বছর গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রেখেছেন। ব্যবসায়ে এবং শেয়ার কেনাবেচায় তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। এফিডেবিটে তিনি আরও বলেছেন যে, শ্রীসেনের ভাইঝি শ্রীমতী স্মরণিকা সেন বিদেশে যাওয়ার ঠিক পরে শ্রীধনঞ্জয় চৌবে তাঁর কাছে জানতে এসেছিলেন শ্রীসেনের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স কত। শ্রীরঙ্গনাথন তাঁকে তা জানাতে অস্বীকার করায় তিনি নানা কর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। শ্রীরঙ্গনাথন তখন সন্দিগ্ধ হয়ে মিস্টার সেনকে বাড়িতে টেলিফোন করেন। কিন্তু তাঁকে টেলিফোনে পান না। বলা হয়, শ্রীসেন অসুস্থ। সুতরাং আমরা আদালতের কাছে এই আর্জি রাখছি যে, যদি আদালতের মতে শ্রীসত্যানন্দ সেন মানসিকভাবে নিজ সম্পত্তির দেখাশোনা করতে অশক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর দীর্ঘদিনের সহচরী, সেবিকা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী স্মরণিকা সেনকে অছি নিযুক্ত করা হোক। তিনি যে ধনঞ্জয় চৌবের চেয়ে বাঞ্ছনীয় অছি এটা প্রমাণ করতে আমি শ্রীধনঞ্জয় চৌবেকে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়াতে বলছি। তাঁকে কিছু প্রশ্ন করার আছে।

বিচারক ভাদুড়ী কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে চৌবেকে বললেন, আপনি সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ান। ইতিপূর্বেই আপনি হলফ নিয়েছেন, তবু ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে এবং সাক্ষ্যের গুরুত্ব বোঝাতে আমি আবার ওঁকে হলফনামা পড়াতে বলছি।

ধনঞ্জয় সাক্ষীর মঞ্চে উঠে হলফনামা পাঠ করে। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। মাথায় চকচকে টাক। চোখ দুটো মর্মভেদী। দেখলে মনে হয়, এ লোক দু'-ঘা নিতেও পারে, দু'ঘা দিতেও পারে।

বাসু-সাহেব তাঁর জেরা শুরু করেন, আপনার নাম শ্রীধনঞ্জয় চৌবে? আপনি শ্রীসত্যানন্দ সেনের বৈমাত্রেয় ভাই এবং অছি-নিযুক্ত আবেদনে আপনিই মূল নিয়ামক, কেমন তো?

— হ্যাঁ তাই।

— আপনি কতদিন আগে ঐ বাড়িতে এসেছেন?

— প্রায় তিন মাস। দাদার জনডিস হয়েছে খবর পেয়ে। সঙ্গে আমার স্ত্রীও এসেছিলেন। তিনি পাশ করা নার্স।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলে ওঠেন, আপনাকে যা প্রশ্ন করা হচ্ছে শুধু সেটুকুর জবাব দিন। অহেতুক কথা বাড়াবেন না।

বাসু প্রশ্ন করেন, আপনাদের সঙ্গে মিস্টার বিলাসসিং যাদবও ধানবাদ থেকে এসেছিলেন, তাই নয়?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— এবং ঐ নিউ আলিপুরের বাসাতেই এই তিন মাস ধরে আছেন, তাই নয়?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— তিনি কি পাসকরা নার্স বা ডাক্তার অথবা শ্রীসেনের আত্মীয়?

— আজ্ঞে না। তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, মানে আমাদের বন্ধুস্থানীয়। দাদার অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠায় তাঁর ফিরে যাওয়া ঘটে ওঠেনি।

— আপনার দাদার অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠার সঙ্গে যাদব-সাহেবের কী সম্পর্ক?

— কিছুই নয়, আবার সবই। মানে বন্ধুকৃত্য। আমার বিপদে সাহায্য করা।

— আপনার তো কোন বিপদ ঘটেনি এই কয় মাসে? ঘটেছে?

— না, মানে দাদার বিপদ মানেই আবার আমার বিপদ। দাদাকে সবাই মিলে যেভাবে দোহন করছিল, তিনি তো দুদিন পরেই পথের ভিখারী হয়ে যেতেন।

— তাই নাকি! কে দোহন করছিল আপনার দাদাকে।

— আপনি জানেন না? তিনি সওয়া লক্ষ টাকার বিয়া[illegible] পাঠিয়ে চিঠি লিখে একজনকে বলেছিলেন টাকাটা গাপ করে ফেলতে।

— আই সী। আপনি চিঠিটা কোথায় দেখলেন?

— সেটা ডাকে দেওয়ার আগেই। দাদার দেরাজে।

— আপনি ভেবেছিলেন চিঠিটা আপনা[illegible] লেখা?

— তা কেন ভাবব? খামের উপর [illegible] লেখাই ছিল।

— খামটা খোলা ছিল, না বন্ধ?

— তা আমার মনে নেই।

— তাহলে অপরের চিঠি আপনি পড়লেন কেন?

— জানতে যে, বিদ্যেধরী আমার দাদাকে কতটা মোহগ্রস্ত করেছেন!

— 'বিদ্যেধরী' মানে কী? আপনি কি আপনার দাদার ভাইঝি স্মরণিকা সেনের কথা বলছেন?

— আমি স্মরণিকার কথাই বলছি, তবে সে 'সেন'ও নয়, দাদার ভাইঝিও নয়। তার নাম স্মরণিকা দত্ত!

পি. কে. বাসু জাঁদরেল ব্যারিস্টার; তৎক্ষণাৎ বুঝে নেন ও পক্ষের আস্তিনের তলায় একটা অ্যাটম বোমা লুকানো আছে। উপায় নেই! এখন সেটা বিস্ফোরিত হবেই। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতটা তাঁকে বুক পেতে সহ্য করতে হবে, অবিচলিত চিত্তে, কিন্তু টুকু কি পারবে আঘাতটা সইতে?

তাঁকে প্রশ্নটা করতেই হল, স্মরণিকার বাবার নাম কী?

— আমি জানি না।

— তবে ওর 'দত্ত' উপাধি হল কি করে?

— যেহেতু ওর মায়ের উপাধি দত্ত। ওর মায়ের নাম শান্তিরানী দত্ত — তিনি আমার দাদার সংসারে গভর্নেস হিসাবে দীর্ঘদিন ছিলেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করেন, মিস্টার চৌবে, আপনি যে অ্যালিগেশান উপস্থিত করেছেন তার প্রমাণ নিশ্চয় দিতে পারবেন?

চৌবে বিচারকের দিকে ফিরে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। প্রসঙ্গটা এমন অপ্রীতিকর যে, বাধ্য না হলে তা আমি আদালতে উপস্থিত করতাম না। বিশেষ, স্মরণিকার মা জীবিতা নেই!

বিচারক বলেন, উপায় নেই, প্রসঙ্গটা আপনি এতদূর টেনে এনেছেন যে, তারপর এ প্রশ্ন করতেই হবে। আপনি অভিযোগ এনেছেন মিস্টার সেন যাঁকে সওয়া লক্ষ টাকার চেক লিখে দিয়েছিলেন তিনি ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী নন। এক্ষেত্রে মাঝপথে আপনি থামতে পারেন না। মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

চৌবে নিখুঁত কায়দায় প্রসঙ্গটা অবতারণা করে জিজ্ঞাসিত হল। এবার সে স্মরণিকার জন্মবৃত্তান্তের কথা সবিস্তারে বলতে থাকে। তার জ্ঞানমতে — সত্যপ্রিয় সেন সস্ত্রীক মটোর অ্যাক্সিডেন্টে যখন মারা যান তখন তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। তার কয়েক মাস আগে শান্তিরানী দত্ত সেন-পরিবারে এসেছেন। স্বামীত্যক্তা, সদ্যোবিবাহিতা এবং গর্ভে সন্তান! বস্তুত শান্তি দেবী নাকি বিবাহ করেন গর্ভে সন্তান নিয়ে। আর সেজন্যই তাঁর স্বামী — সুহাস দত্ত, বিবাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। সত্যানন্দ তখন এই ব্যবস্থা করেন। শান্তি দেবীর সন্তানকে তিনি ভাইঝি সাজান। কারণ সুহাস দত্তের পরিবার ঐ মেয়েটিকে কিছুতেই গ্রহণ করত না। তাছাড়া শান্তিদেবীর পক্ষে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর ছিল না। এইভাবে ঐ অবৈধ কন্যাটিকে একটা নাম দেওয়া গেল, সামাজিক মর্যাদাও। না হলে তাকে স্কুলে ভর্তি করাই মুশকিল হত।

— আপনি এসব কথা প্রমাণ করতে পারবেন? — প্রশ্ন করেন বিচারক।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ধর্মাবতার। দাদার সে-আমলে লেখা চিঠি আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে। আমাদের তিনি অনুরোধ করেছিলেন ব্যাপারটা গোপন রাখতে। তাই এতদিন রেখে এসেছি আমরা; কিন্তু এখন, যখন দেখা যাচ্ছে রক্তের সম্পর্করহিত ঐ মেয়েটি দাদার সম্পত্তি গ্রাস করতে চাইছে, তখন আমাদের সবকিছু প্রকাশ্যে বলতে হচ্ছে।

— স্মরণিকা পাসপোর্ট পেল কীভাবে?

— দাদার এফিডেবিট-বলে। তিনি মিথ্যা এফিডেবিট করেছিলেন যে, ওঁর ভাইঝির বার্থ-সার্টিফিকেট দেশের বাড়িতে পড়ে আছে। দেশ বলতে 'বাংলাদেশ'। ওঁরা যখন চলে আসেন তখন তা ছিল পূর্বপাকিস্তান। আমরা এতদিন কোনও উচ্চবাচ্য করিনি, কিন্তু যখন দেখলাম ঐ সুযোগসন্ধানী মেয়েটি দাদার গোটা সম্পত্তিটা গ্রাস করতে চায় তখন দাদার স্বার্থেই আমাদের চলে আসতে হল কলকাতায়...

— শুধু দাদার, না আপনাদের নিজেদেরও? — প্রশ্ন করেন বাসু।

— 'ইফ্ দ্য কোর্ট প্লীজ', উঠে দাঁড়ান অ্যাডভোকেট সলিল দত্ত — 'দত্ত অ্যান্ড দত্ত'-ফার্মের সিনিয়ার পার্টনার। ধনঞ্জয় চৌবের কাউন্সেল। বলেন, আমরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে একতরফা শুনে যাচ্ছিলাম, ধর্মাবতার। কারণ ঐ অল্পবয়সী মেয়েটির অবৈধ জন্মপ্রসঙ্গটা আমরা উত্থাপন করতে চাইনি। কিন্তু অবস্থা এখন যেখানে এসে ঠেকেছে তাতে আমরা আদালতের সামনে এই আর্জিই পেশ করব যে, শ্রীমতী স্মরণিকা দত্ত — যাঁকে কেউ-কেউ স্মরণিকা 'সেন' নামে জানে — এই পরিবারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিরহিত। শ্রীসত্যানন্দ সেনের এস্টেটের অছি-নিযুক্তিকরণ সংক্রান্ত মামলায় ঐ বহিরাগতার কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। ফলে, কাউন্সেল পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল-র কোনও 'লোকাস-স্ট্যান্ডাই' নেই। তিনি এইমাত্র যে প্রশ্নটি করেছেন সে প্রশ্ন করার অধিকারই তাঁর নেই।

চীফজাজ ভাদুড়ী বলেন, এই আর্জি বিষয়ে আমি এখনই কোন সিদ্ধান্তে আসছি না। শ্রীমতী স্মরণিকা সেনের জন্মবৃত্তান্ত এখনও প্রমাণিত হয়নি, ফলে তিনি সেন-পরিবারভুক্ত কিনা এটা এখন তর্কের বিষয়। সে প্রশ্ন সরিয়ে রেখে আমি সাক্ষীকে সরাসরি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হতে চাই। প্রথম প্রশ্ন, কবে কী করে আপনার মনে হল ঐ মেয়েটি — শ্রীমতী স্মরণিকা — আপনার দাদার বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করতে চাইছে?

— এবার কলকাতা এসে, হুজুর। আমরা এসে দেখলাম দাদার স্টীল আলমারির চাবি ঐ মেয়েটির হেপাজতে আছে। টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে দাদাই ওর কাছ থেকে তা চান, মেয়েটি

আলমারি খুলে টাকা এনে দেয়। ব্যাঙ্কের খাতাপত্র, এন. এস. সি. ভল্টের চাবি, সব কিছুই থাকে ঐ আলমারিতে।

— আপনাদের আশঙ্কা হল যে, দাদা তাঁর সম্পত্তি থেকে আপনাদের বঞ্চিত করে — ঐ মেয়েটাকে ওয়ারিশ করে উইল করতে চান?

ধনঞ্জয় হঠাৎ সিঁটিয়ে গেল। একটু ভেবে নিয়ে বললে, আজ্ঞে না, হুজুর। অতটা আমরা আশঙ্কা করিনি।

— আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ নিয়ে কখনো আলোচনা হয়নি।

— আজ্ঞে না।

— যখন দাদার এস্টেটে একজন 'কনজারভেটর' নিযুক্ত করার আবেদন করেন, তখনো কি আপনার মনে পড়েনি যে, আদালত সেই মর্মে নির্দেশ দিলে আপনার দাদার উইল করার অধিকারটাও কেড়ে নেওয়া হবে?

যেন এখন এইমাত্র সে বিষয়ে সচেতন হল এমনিভাবে চমকে উঠে চৌবে বললে, আজ্ঞে না, হুজুর। সে-কথা আমরা ভেবেই দেখিনি কোনদিন।

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান। একটি বাও করে বলেন, ইওর অনার! আমি বর্তমানে আমার স্ট্যাটাসটাও ঠিকমতো জানি না। আপনার তদন্তের মাঝখানে বাধা দিচ্ছি অন্য একটি হেতুতে। যেহেতু ইতিপূর্বেই বর্তমান সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে, স্মরণিকা দেবীকে লেখা সত্যানন্দের চিঠিখানি তিনি দেখেছেন তাই আমার মনে হয় আদালতের জানা প্রয়োজন সে চিঠিতে কী লেখা ছিল। মূল চিঠিখানি আমি আদালতের হস্তান্তরিত করতে চাই।

জজ-সাহেব চিঠিখানি আদ্যন্ত পড়ে ধনঞ্জয় চৌবের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন আপনি বলছেন যে, আপনার বৈমাত্রেয় দাদা আপনাকে বঞ্চিত করে একটি উইল প্রণয়ন করতে পারেন এ-কথা কখনো আপনার মনে উদয় হয়নি?

চৌবে নড়ে-চড়ে বসল। ইতস্ত [illegible] লে, না...মানে...

— মানে?

— আজ্ঞে না।

— প্রথমবারে আপনার উত্তর ছিল বিনা দ্বিধায় 'না'। এবার কণ্ঠস্বরে কিছুটা দ্বিধা দেখছি। তা সত্ত্বেও আপনার জবাব : 'না'?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ। 'না'!

— অথচ আমার হাতে যে চিঠিখানা রয়েছে, আপনি ইতিপূর্বে স্বীকার করেছেন যে, ডাকে দেওয়ার আগেই তা আপনি পড়েছেন। তাতে আপনার দাদা স্পষ্টাক্ষরে স্মরণিকা দেবীকে জানাচ্ছেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে দিতে চান। তা পড়েও...

— আজ্ঞে ঐ চিঠি পড়ার পরে তা আমরা বুঝেছি বৈকি।

— অথচ একটু আগে বললেন, দাদার এস্টেটে কনজারভেটর নিযুক্ত করার আবেদন যখন করেন তখনো সে আশঙ্কা আপনাদের ছিল না?

— না...মানে...

— মিস্টার সত্যানন্দ সেন বর্তমানে কোথায়?

— একটি আরোগ্য-নিকেতনে। বড়িশা-বেহালায় ডঃ নিত্যানন্দ রথের স্যানিটোরিয়ামে — 'শান্তিধাম'। দাদার চিন্তাধারায় এখন কোনও পারম্পর্য নেই — মানুষজনও ঠিক চিনতে পারছেন না। আমার স্ত্রীর মতে — উনি একজন ট্রেইন্ড নার্স — দাদা যে অসুখে ভুগছেন তার নাম 'সেনাইল ডিমেনশিয়া'।

দর্শকদলের মধ্যে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন একজন স্থূলাঙ্গী মহিলা। বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ,

ধর্মাবতার। আমি তাই বলেছি।

চীফজাজ ভাদুড়ী বলেন, আপনার হলফনামা নেওয়া নেই। তা হোক, এখন আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি মাত্র। আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যখন আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন তখন বলুন, চিঠিখানা কি আপনিও দেখেছিলেন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মাবতার, দেখেছিলাম।

— কে আপনাকে দেখান?

— আমার স্বামী।

— মিস্টার সেনের ড্রয়ার থেকে খামটা বার করে?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ।

— খামটা তো আঠা দিয়ে বন্ধ ছিল, ছিল না?

— আজ্ঞে আমি যখন দেখি তখন খোলাই ছিল।

— অর্থাৎ তার আগে বন্ধ ছিল? কে খুলেছিল খামটা?

সাক্ষী মর্মান্তিক দৃষ্টিতে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখে। জবাব যোগায় না তার কণ্ঠে।

মিস্টার ভাদুড়ী বলেন, আজ এইখানেই থামতে হচ্ছে। কারণ এর পরের মামলার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ফয়শালা হওয়া দরকার। পেশকারের দিকে ফিরে জানতে চান, কবে ডেট দেওয়া যায়, বৈকুণ্ঠ?

— শুক্রবার আফটারনুনে টি. এন. বিশ্বাস ভার্সেস স্টেট-গভর্নমেন্ট কেসটায় আপনি ডেট মঞ্জুর করেছেন, হুজুর।

— অল রাইট। এই তথ্যানুসন্ধানের মামলা শুক্রবার বেলা দুটোয় শুরু হবে। তখন শ্রীসত্যানন্দ সেনকে আদালতে উপস্থিত করতে হবে।

ধনঞ্জয় হাতদুটি জোড় করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, সেটা যে একান্তই অসম্ভব ধর্মাবতার। উনি খুবই অসুস্থ...মানে একেবারে ইয়ে...ডক্টর রথের মতে...

জজসাহেব ভাদুড়ী ওকে মাঝপথে থামিয়ে বলে ওঠেন, অল রাইট। কাল পর্শুর মধ্যে আদালত-নিযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক-বিশেষজ্ঞ ঐ স্যানিটেরিয়ামে গিয়ে মিস্টার সেনকে পরীক্ষা করবেন। আদালত এজন্য ডক্টর কৈলাশনাথ দাশগুপ্ত, এম. ডি.-কে নিযুক্ত করছেন। তিনি যদি মনে করেন যে, মিস্টার সেনকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না — তবে তা গ্রাহ্য হবে। নচেৎ মিস্টার সেনকে আদলেতে হাজির করতে হবে। ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁর 'ফাইন্ডিংস'-ও ঐদিন আদালতে পেশ করবেন — অর্থাৎ মিস্টার সেনের মানসিক অবস্থা কী, তাঁর আদৌ কোন অছির প্রয়োজন আছে কিনা। এবার কাউন্সেল সলিল দত্ত যে আর্জিটি পেশ করেছেন সেই প্রসঙ্গে আসতে হয়। শ্রীমতী স্মরণিকা — তা তিনি সেনই হন অথবা দত্ত — দুই দশক ধরে ঐ বৃদ্ধের দেখ্‌ভাল করেছেন এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। তদুপরি শ্রীধনঞ্জয় চৌবের এজাহারে দেখা যাচ্ছে মিস্টার সেন — যে সময় তাঁর মানসিক স্থৈর্য অবিকৃত ছিল — ঐ মেয়েটিকে বিশ্বাস করে তাঁর স্টিল আলমারির চাবি গচ্ছিৎ রেখেছিলেন। ঐ আলমারিতেই রাখা ছিল সেন-মশায়ের সমস্ত কাগজপত্র, যা এই দুই-দশকের ভিতর তছনছ হয়নি। তাই আদালত এখনি ঐ ইংরেজি প্রবচনটি মেনে নিতে পারছেন না — 'ব্লাড ইজ থিকার দ্যান ওয়াটার'! ফলে কাউন্সেলার পি. কে. বাসুর 'লোকাস-স্টান্ডাই' নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে তার বৈধতা বিষয়েও আদালত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ আগামী সিটিং পর্যন্ত স্থগিত রাখছেন। আদালত এক্ষেত্রে মিস্টার বাসুকে রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখতে ঐদিন আদালতে উপস্থিত থাকতে বলছে amicus curiae হিসাবে...অর্থাৎ আদালতের স্বার্থ দেখতে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী হিসাবে...আগামী শুক্রবার বেলা দুটোয় এ মামলা পুনরায় উঠবে।

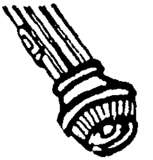

পাঁচ

'হোম দে ব্রট হার ওরিয়র ডেড্!'

টেনিসান-এর বিখ্যাত কবিতাটির কথাই বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল ওঁর। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিহত বীর সেনানায়কের মরদেহ নিয়ে আসা হল তাঁর বাড়িতে। সমস্ত পাড়ার লোক ভিড় করে এসেছে তরুণ শহীদকে শেষ দর্শনের বাসনায়। তারা অবাক হয়ে দেখল, মৃত সেনানায়কের তরুণী পত্নী স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। তার চোখে জল নেই। কান্নায় ভেঙে পড়ছে না সে, অথবা মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে না স্বামীর বুকের উপর। কথাও বলছে না। কেন? কেন? ওরা বুঝতে পারেনি, হতভাগিনী মনে মনে তখন শুধু ভাবছে — আগুন, ফাঁসির দড়ি, না বিষ? সেটা বুঝে নিল বুড়ী ধাই-মা। মনে মনে বললে, 'শী মাস্ট সূন অর আটার ক্রাই!' ওকে কাঁদানো দরকার! নিঃশব্দচরণে উঠে গেল ঘরের ভেতর। ফিরে এল পরমুহূর্তেই। সদ্যোবিধবার ক্রোড়ে ফেলে দিল তার বাচ্চাটাকে। অবোধ শিশু ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল চিৎকার করে। যেন রেজনেন্স জাগল এবার মাতৃবক্ষে। বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সদ্যোবিধবা হু-হু করে কেঁদে উঠল : 'সুইট চাইল্ড! আই লিভ্ ফর দী!'

গাড়ি চলেছে ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে দক্ষিণ-মুখো। মধ্যম গতিতে। পিছনের গাড়ি কাছাকাছি আসলেই ভিয়ু-ফাইন্ডারে নজরে পড়ছে। অমনি ডান হাতখানা বাড়িয়ে ইঙ্গিত করছেন তাকে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে বলছেন। বাসু-সাহেব স্পিডোমিটারের কাঁটাটাকে পঞ্চাশোর্ধে যেতে দেন না। তাই বাঁ-দিকের কিনার ঘেঁষে চলেছেন। উপায় নেই। গাড়ি চালাতে চালাতেই তিনি চিন্তা করছিলেন। সমস্ত ঘটনা পরপর সাজিয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন। এ সময় স্পিডোমিটারের কাঁটার কোন উচ্ছ্বাস বরদাস্ত করেন না ঐ ভুক্তভোগী ড্রাইভার। এ জাতীয় ভুলেই জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাতটা পেয়েছেন যে! এক ভুল জীবনে দুবার করবার মতো মানুষ নন উনি।

ড্রাইভারের পাশের সীটে নিশ্চুপ বসে আছে টুকু।

আদালতে যখন ধনঞ্জয় চৌবে [illegible]ন্তের ইতিকথা শোনাচ্ছিল তখন বাসু-সাহেব বার-বার আড়চোখে ওকে লক্ষ্য করেছিলেন। আশ্চর্য! কোনও অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেনি ওর মুখে। না বিস্ময়, না লজ্জা, না দুঃখ, না হতাশা! একটি বিশ-বাইশ বছরের অনূঢ়া তরুণী যদি হঠাৎ হারিয়ে ফেলে তার পিতৃপরিচয়, তাহলে তার কী জাতের প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক? বাসু-সাহেবের মনে পড়ে গেছিল অতিবৃদ্ধা ধাই-মার নিদান — 'শী মাস্ট সূন অর আটার ক্রাই'। আদালত ভাঙার পর ওঁরা সকলে গিয়ে বসেছিলেন ওঁর সেই চেম্বারে। তখনো স্মরণিকা ভাবলেশহীন। সুজাতা প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা মামু, ওরা বানিয়ে বানিয়ে একটা গপ্পো ফাঁদছে না তো? সম্পত্তিটার দখল নিতে?

জবাবে বাসু-সাহেব বলেছিলেন, খুব সম্ভবত নয়। অকাট্য প্রমাণ আস্তিনের তলায় লুকানো না থাকলে এতবড় ডিফামেশানের ঝুঁকি সলিল দত্ত চৌবেকে নিতে দিত না। ধনঞ্জয় চৌবে একটি বাস্তুঘুঘু। সম্পত্তিটার দখল নেবার পরিকল্পনা তার আজকের নয়। তাই বিশ-বাইশ বছর ধরে চিঠিগুলি সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছে ফাইলে।

বলে আবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছিলেন মেয়েটির দিকে। কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য হয়নি। মেয়েটি কি জানত? সম্ভবত নয়। ওর এই নির্বিকার অনাসক্তির পিছনে অন্য জাতের কার্যকরণ। সেই বৃদ্ধা ধাই-মার সাবধান-বাণীটা আবার মনে পড়ে গেছিল বাসু-সাহেবের : 'শী মাস্ট সূন অর আটার ক্রাই!'

কৌশিক এই পর্যায়ে জানতে চায়, একটা কথা, মামু। সত্যানন্দ সেন যদি ঐ কোর্ট-অর্ডারের আগে কোনও উইল রেখে গিয়ে থাকেন, স্মরণিকা দেবীকে তাঁর ওয়ারিশ করে, তাহলে আইনের চোখে তা কি সিদ্ধ হবে?

বাসু-সাহেব জবাব দেবার আগেই সুজাতা বলে ওঠে, প্রশ্নটা অবান্তর। তাঁর চিঠিখানাই বলে দিচ্ছে তেমন কোন উইল বানানো হয়নি। কারণ চিঠিতে তিনি স্মরণিকাকে নির্দেশ দিচ্ছেন মামুর সাহায্যে একটি

উইল বানাতে ; তাই নয়? আর ঐ চিঠি লেখার পর তিনি যে কোনও সুযোগ পাননি এ তো বলাই বাহুল্য। কারণ চিঠিখানা ডাকে দেবার আগেই ওঁর রিস্তেদারেরা জেনে ফেলেছে তাঁর মনোবাসনা। ফলে তাঁকে সর্বক্ষণ নজরবন্দী রেখেছে। অন্য কোনও উকিলও বাড়িতে মাথা গলাতে পারেনি নিশ্চয়।

বাসু বললেন, তোমার যুক্তি কারেক্ট, কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট নয়!

— কেন নয়? — জানতে চায় সুজাতা।

— সেন-মশাই একা ঘরে শুতেন। রাত্রে। কেউ পাহারা দিত না নিশ্চয়। উনি যদি মধ্যরাত্রে উঠে একখানি স্বহস্ত-রচিত উইল তৈরী করে যেতেন তবে তা আইনত সিদ্ধ হত। তার তলায় কোনও সাক্ষীর স্বাক্ষর থাক-না-থাক।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ, তাই। তবে কতকগুলি শর্ত-সাপেক্ষে অমন উইল সিদ্ধ হবে।

— কী শর্ত?

— প্রথম কথা, একখানি সাদা কাগজে আদ্যন্ত উইলনির্মাণকারীর স্বহস্তে লিখিত হওয়া চাই। 'লেটার-হেড'-এ যদি তারিখের আধখানা ছাপা থাকে তাহলে চলবে না, উইল-প্রণয়নকারীর স্বহস্তে লেখা তারিখ থাকা চাই। উইলের বক্তব্যে পারম্পর্য থাকা প্রয়োজন এবং লেখক যে সুস্থ দেহে-মনে, কারও প্ররোচনা, নির্দেশ বা অনুরোধ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় সেটি প্রস্তুত করছে এ-কথার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা চাই। সেটি যে তার ঐ তারিখে লেখা শেষ-উইল, এ কথাও!

অবশ্য ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের সেকশন 63 অনুযায়ী উইলে অন্তত দু-জন সাক্ষী আবশ্যক। তবে একবার যদি উইলখানা বেনিফিশিয়ারির হস্তগত হয় তাহলে এদেশে দুটো কেন, পয়সা ফেললে বিশটা লোক মিলতে পারে যারা সাক্ষী হতে রাজি হবে আর পরে বলবে আমি উইল-কর্তাকে সই করতে দেখেছি।

কৌশিক বলে, তেমন উইল তিনি লিখে থাকলেও কোন সুরাহা হত না। কারণ ওঁকে বিদায় করে ওরা তিনজনে নিশ্চয় তন্নতন্ন করে সব কিছু হাতড়েছে। ওঁর বিশ্বস্ত চাকর-বাকরদের তো আগেই তাড়ানো হয়ে গেছে। ফলে...

বাসু-সাহেব বললেন, একটা ভুল কর না, সুজাতা! টুকুর সামনে পড়ে আছে সমস্ত জীবন। তার দেহে আছে শক্তি, মনে আছে বল। দু-ঘা নিতে আর দু-ঘা দিতে সে পিছ্‌পাও হবে না। লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি থেকে স্বয়ং যীজাস ক্রাইস্ট-এর জীবনী সে জানে। ওর কথা আমি তাই ভাবছি না মোটেই। আমি ভাবছি, উন্মাদাশ্রমে বন্দী সেই অসহায় বৃদ্ধটির কথা! সে বেচারি কীসের জোরে লড়বে?

হঠাৎ নড়ে-চড়ে বসল স্মরণিকা। বললে, আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন?

যেন সেই দ্বিতীয় শৈশবপ্রাপ্তের উদ্দেশে স্বগতোক্তি : 'সুইট চাইল্ড! আই লিভ ফর দী!'

— আলবাৎ! এখনই। গেট আপ্!

কৌশিক বলেছিল, সুজাতা মিনিবাসে বরং বাড়ি ফিরে যাক। আমরা তিনজনে...

— তুমি থাম তো! না। আমরা দুজনে যাব। তোমরা দু-জন বরং একটা ট্যাক্সি নিয়ে ডক্টর কৈলাশনাথের চেম্বারে চলে যাও। এখন পাঁচটা বাজে। উনি পাঁচটা থেকে সাতটা চেম্বারে থাকেন। আমাকে ভাল রকমই চেনেন। আমার নাম করে জানতে চেও, আগামীকাল কটার সময় উনি মিস্টার সেনকে দেখতে যাবেন। আর জিজ্ঞাসা কর, ওঁর পরীক্ষার সময় আমি যদি উপস্থিত থাকি তাহলে কি ওঁর আপত্তি আছে?

কৌশিক বলেছিল, জজ-সাহেব আদালতে ওঁকে স্পেশালিস্ট হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। উনি তো এখনো কোর্ট-অর্ডার পাননি।

— না, পাননি। কিন্তু আজ মঙ্গলবার ; শুক্রবার যখন হিয়ারিঙ-ডেট দিয়েছেন তখন জাজ ভাদুড়ী টেলিফোনে ডাক্তার দাশগুপ্তকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা নিশ্চয় করেছেন! স্পেশাল কুরিয়ার-সার্ভিসে

কোর্ট-অর্ডার ডঃ দাশগুপ্ত ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

স্মরণিকাকে নিয়ে অতঃপর বার হয়ে পড়েছেন দক্ষিণমুখো।

*   *   *

ধনঞ্জয় তার এজাহারে বলেছিল, সেটা 'ওল্ড-এজ-হোম'। তার নাম 'শান্তিধাম'। বাড়িটা দেখে তা মনে হল না। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা যেন একটা কারাগার। মানুষভর উঁচু পাঁচিলের উপরে কাঁটাতারের নিরাপত্তা! কেন? 'শান্তিধাম' থেকে বৃদ্ধদের কি পাঁচিল টপকে পালানোর আশঙ্কা আছে? গেটে দারোয়ান। ভিতরে ইতস্তত ছড়ানো ছোট-ছোট এক-কামরার চালাঘর। পলেস্তারাহীন কাদার-গাঁথনির দেওয়াল, টিনের দো-চালা। মুলিবাঁশের ঝাঁপওয়ালা জানলা! গেট দিয়ে কম্পাউন্ডে ঢুকেই একটা বাগানের আভাস। সেখানে একটি পাকা ছাদের বাড়ি। অফিস, রিসেপশন প্রভৃতি। দারোয়ানের হেপাজতে রাখা খাতায় নাম-ঠিকানা লিখে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেল।

'অফিস'-চিহ্নিত ঘরখানিতে একটিমাত্র টেবিল। খান-চারেক চেয়ার। টেবিলে একটি তেকোনা বুলারের মতো কাঠের ফলক। তাতে লেখা 'রিসেপশন'। ঘরে কেউ নেই। পাশে একটি নোটিস বোর্ড। তাতে নানান বিজ্ঞপ্তি। জানানো হয়েছে, 'ভিজিটিং আওয়ার্স' বিকাল চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা। নোটিস বোর্ডে একটি 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপনও নজরে পড়ল। গৃহকর্ম-নিপুণা একটি 'আনট্রেইন্ড-নার্স' চাইছেন কর্তৃপক্ষ। অস্থায়ী পদ, অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বিদ্যেই যথেষ্ট। প্রার্থীকে প্রত্যয়িত সার্টিফিকেটসহ সাক্ষাৎ করতে বলা হয়েছে। নিম্নতম বেতন কত প্রত্যাশা করেন তাও তাঁকে মৌখিক বলতে হবে।

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। বার-কয়েক আর্তনাদ করার পর পিছনের দ্বার দিয়ে একটি মধ্যবয়সী মহিলা দ্রুতপদে প্রবেশ করে তার [illegible] বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রফেশনাল হাসি হেসে ভিজিটার্স-চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে টেলিফোনটা তুলে নিলেন। তার 'কথামুখে' বললেন: ইয়েস, স্পিকিং।...না, উনি এখন নেই...না, কখন ফিরবেন তাও বলে যাননি...অ্যাঁ? কী বললেন? কোর্ট-অর্ডার?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি।...কী নাম বললেন? ডক্টর কৈলাশনাথ দাশগুপ্ত?...আই সী।...আচ্ছা, উনি ফিরে এলে তাঁকে বলব...

যন্ত্রটা রিসিভারে নামিয়ে রেখে চিন্তিত মুখে ভদ্রমহিলা তাঁর সীটে বসলেন। হঠাৎ যেন তাঁর খেয়াল হল সামনের চেয়ারে বসে আছেন একটি প্রৌঢ়। তাঁর হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড। সেটা দেখে নিয়ে বললেন, ইয়েস? বলুন মিস্টার বাসু? আমরা কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি?

বাসু-সাহেব তাঁর সঙ্গিনীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই মেয়েটি আমার ক্লায়েন্ট। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। মেয়েটি বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় না। ওর স্বামীর অগাধ সম্পত্তি; কিন্তু মেন্টালি একটু 'ইয়ে' মতন...ওর দেওর চাইছে ডিভোর্স হয়ে যাক...কিন্তু এ তা চায় না। ওর স্বামীকে কিছুদিন এখানে রাখা যায়?

স্তম্ভিত স্মরণিকা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, যায়। যদি খরচপত্র করতে রাজি থাকেন।

— সেদিকে আটকাবে না। সে কিন্তু বৃদ্ধ নয় আদৌ।

— ন্যাচারালি। আপনার ক্লায়েন্টকে দেখেই তা বোঝা যায়।

— আরও একটা কথা। এর স্বামী আসলে পাগল নয়, বুঝেছেন? অগাধ সম্পত্তির মালিক তো, সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেই সর্বনাশকে ঠেকাতেই আমরা চাইছি তাকে কিছুদিন এখানে...মানে, কী-ভাবে যে কথাটা বুঝিয়ে বলব...?

ভদ্রমহিলা একগাল হেসে বললেন, আপনাকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে হবে না ব্যারিস্টার-সাহেব। এমন কেস তো আজকাল আখছার হচ্ছে। ঘরে ঘরে। বিশেষ করে ঐ যাদের — কী যেন কথাটা বললেন আপনি? — হ্যাঁ, 'অগাধ সম্পত্তি'। আপনারা একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করুন। প্রয়োজনে

এবং ফী দিলে আমরাই ডাক্তারের নাম জানাব। তারপর পেশেন্টকে এখানে পৌঁছে দিন, রেজিস্টারে নিকটতম আত্মীয় হিসাবে আপনার ক্লায়েন্ট সই দিন, ব্যস্! বাকি দায়-দায়িত্ব আমাদের...

— আপনাদের সব পেশেন্টই কি পাগল?

মহিলা বিচিত্র হেসে প্রতিপ্রশ্ন করেন, আপনার ক্লায়েন্টের স্বামী কি পাগল?

— অন্তত ওঁর মতে তাই!

— একজ্যাক্টলি! আমাদের সব পেশেন্টের নিকট আত্মীয়ের মতেও তাই।

— আপনাদের মাসিক চার্জ কত?

— সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে।

— যেমন?

— যেমন, আপনারা আমাদের কাছে ঠিক কী-জাতের সার্ভিস চান তার উপর। কিন্তু সেসব বিস্তারিত আলোচনা আপনারা ডক্টর রথের সঙ্গে বরং করবেন। উনি এখানে নেই...

— সে তো এইমাত্র শুনলাম। আপনি যখন টেলিফোনে বললেন...

ভ্রূকুঞ্চন হল ভদ্রমহিলার। বললেন, কিন্তু আমি তো টেলিফোনে ডক্টর রথের নামটাও উচ্চারণ করিনি। আপনি কী করে বুঝলেন?

— তাতে কী হল? আপনি তো টেলিফোনে এ কথাও বলেননি যে, কোর্ট-অর্ডারটা হয়েছে সত্যানন্দ সেনের কেস-এ। তাই বলে আমি কি বুঝতে পারিনি সেটা?

ভদ্রমহিলা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কথা যোগালো না তাঁর মুখে।

— এবার বলুন, মিস্টার সত্যানন্দ সেন কি সতের নম্বর কেবিনেই আছেন?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন উনি। সামলে নিয়েছেন এতক্ষণে। বললেন, সে-খোঁজে আপনার কী প্রয়োজন?

— বাঃ! তিনিও আমার ক্লায়েন্ট যে। দেখা করা দরকার।

দাঁতে দাঁত চেপে উনি বললেন, বুঝেছি! আয়াম সরি। ভিজিটিং আওয়ার্স পার হয়ে গেছে।

— তা গেছে। কিন্তু আজ এখানে ভিজিটার্সদের ভিড় তো তেমন নজরে পড়ছে না। কুল্লে আমরাই দুজন। এতদূর থেকে আসছি। না হয় ক্ষমাঘেন্না করে...

— আয়াম সরি, স্যার!

— য়ু অট টু বি।...অ্যাট্ লীস্ট য়ু উড বি ইন ফিউচার! তাহলে কাল বিকাল চারটের সময়েই আসতে বলছেন?

— না! কারণ মিস্টার সেনের কেবিনে 'নো-ভিজিটার্স' বোর্ড টাঙানো আছে। ফলে আমি কিছুই বলছি না।...

— আহাহা! সে তো এখন বলছেন না। পরে তো বলতে হবে? যখন আমার সমন পেয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াবেন। তখন তো অনেক কথাই আপনাকে বলতে হবে, না কি? মায় কী জাতের সার্ভিসের জন্য কী রকম চার্জ?

ভদ্রমহিলা আগুন-ঝরা চোখের দৃষ্টি মেলে শুধু নির্বাক তাকিয়ে থাকেন।

গেটের বাইরে এসে গাড়িতে উঠতে উঠতে স্মরণিকা বললে, আপনি আমাকে ম্যান্টন রোডের মোড়ে নামিয়ে দিন। ওখান থেকে খুব কাছেই গীতার ফ্ল্যাট।

— তা হোক। বাড়িটা আমাকে চিনে রাখতে হবে। শোন, শুক্রবার হিয়ারিঙের ডেট। তার আগে যে কোন সময় ডক্টর দাশগুপ্ত তোমার জেঠুকে দেখতে আসতে পারেন। কাল অথবা পর্শু যে কোন সময়। টাইমটা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু নাইন্টি-নাইন পার্সেন্ট চান্স উনি আমাকে সেসময় উপস্থিত থাকতে বলবেন। আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাব। এ দুদিন তুমি গীতা করের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে কোথাও যেও না।

স্মরণিকা রাজি হল।

বাসু-সাহেব যখন নিউ আলিপুরের বাড়িতে এসে পৌছলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কৌশিক আর সুজাতা তখনো ফেরেনি। রানী দেবী একাই বসেছিলেন বাইরের বারান্দায়। বাসু-সাহেব ঘনিয়ে এসে বসলেন। ছোকরা কম্বাইন্ডহ্যান্ড বিশে চায়ের ট্রে রেখে গেল। একটু পরেই বাইরের ঘরে টেলিফোন বাজল। বাসু উঠে গিয়ে ধরলেন : বাসু স্পিকিং...

— গুড় ঈভনিং ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনার দূত-দম্পতি আমার সামনে বসে আছে। আপনার প্রস্তাবটা আমি শুনেছি। আমার প্রত্যুত্তরটা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই বলে ফোন করছি...

— বলুন, ডাক্তার-সাহেব?

— দেখুন বাসু-সাহেব, কেসটা সাব-জুডিস। আপনি একপক্ষের কাউন্সেলার। শুনলাম আদালত আপনাকে amicus curiae হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করতে চায় — কিন্তু এখনো করেনি। মেয়েটির কাউন্সেলার হিসাবে আপনার স্ট্যাটাসকেও নাকি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, এবং জজ-সাহেব তাঁর সিদ্ধান্ত মুলতুবি রেখেছেন। এক্ষেত্রে আমি মনে করি...

বাধা দিয়ে বাসু বলে, য়ু আর পার্ফেক্টলি রাইট, ডক্টর দাশগুপ্ত। আমি শুধু নিশ্চিন্ত হতে চাই — বুড়োটা যেন একটা 'ফেয়ার চান্স' পায় প্রমাণ করতে যে...

— আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি কাল বিকালে, চারটের সময় মিস্টার সেনকে দেখতে যাব। ঐ ওল্ড-এজ হোমকে টেলিফোন করে জানিয়েছি ওরা যেন কোন সিডেটিভ না দেয়। তাতে ওখানকার ইন চার্জ জানান রোগী খুব রেস্টলেস. তার ঘুম হচ্ছে না — হেভি সিডেটিভ দিতে হবেই। 'হেভি সিডেটিভ' কথাটা নিয়ে সেই ভদ্রলো... আমার কিছু মতপার্থক্যজনিত বৈজ্ঞানিক বাকবিতণ্ডাও হয়ে গেছে। যাহোক কতটা ঘুমের ওষুধ দিতে পারে তার লিমিট আমি জানিয়েছি। আমি নিজস্ব নার্স নিয়ে যাব। একান্তেই পরীক্ষা করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, বৃদ্ধের মানসিক ভারসাম্য কতটা বজায় আছে তা সম্঱্ঝে নিতে কোন ত্রুটি হবে না।

— থ্যাঙ্কয়ু ডক্টর! এখন বুঝতে পারছি জাজ ভাদুড়ী কেন আপনাকেই দায়িত্বটা দিয়েছেন।...একটা কথা, ঔষধ খাইয়ে বা ইনজেকশন দিয়ে...

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে ডক্টর দাশগুপ্ত বলে ওঠেন, এসব বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আপনি যেমন আপনার কাজটা বোঝেন, আমিও তেমনি বুঝি আমার কাজটা। হ্যাঁ, আছে। এমন ইনজেকশন আছে যা ইন্ট্রাভেনাস প্রয়োগে রোগীর মানসিক ভারসাম্য সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়ে যায়, দিনকতক উল্টোপাল্টা কথা বলে, লোকজন চিনতে পারে না...

— পরীক্ষা করে তা বোঝা যায় না?

— যায় এবং যায় না। ব্লাড টেস্ট-এ কখনো তা ধরা পড়ে, আবার কখনো কনক্লুসিভ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আদালতে প্রমাণ না করা গেলেও ডাক্তার বুঝতে পারে কী জাতের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করব। প্রয়োজনে বৃদ্ধকে অন্য একটি নার্সিং হোমে সরিয়ে নিয়ে দিন-সাতেক পরে আবার পরীক্ষা করব...

— থ্যাঙ্ক য়ু ডক্টর।

* * *

ছয়

পরদিন সকালে বাসু-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এল গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সি. এস. রঙ্গনাথন। ইংরেজিতে বললে, মিস্টার বাসু, আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে পরামর্শ করতে এলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছি।

—বলুন?

রঙ্গনাথন ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারে বসে। বিরলকেশ মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, এ জাতীয় ঘটনা ব্যাঙ্কে যে ঘটে না তা নয়, তবে এবার অবস্থাটা একটু পিকুলিয়ার! আমানতকারীর স্বার্থ এ ক্ষেত্রে কী-ভাবে রক্ষিত হবে সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। খুলে বলি সব কথা। মিস্টার সত্যানন্দ সেন আমাদের ক্লায়েন্ট — তাঁর বিশ বছরের পুরানো অ্যাকাউন্ট। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিস্টার ধনঞ্জয় চৌবে — কনজারভেটর — একজন অপরিচিত ব্যক্তি, বস্তুত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি...

— কিন্তু তিনি মহামান্য আদালতের আদেশে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত!

— কারেক্ট! অ্যান্ড 'দ্যাটস্ দ্য মোস্ট আনকাইন্ডেস্ট কাট অফ অল'! কিন্তু তিনি একটু বিশেষ জাতের আদালত-নিযুক্ত কনজারভেটর —

— কী রকম?

— প্রথমত ধরুন, কনজারভেটর নিযুক্ত হবার পূর্বেই তিনি আমার দ্বারস্থ হয়েছিলেন, মিস্টার সেনের ভাই হিসাবে জানতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর দাদার অ্যাকাউন্টে ঠিক কত টাকা আছে। আমি তা তাঁকে জানাতে অস্বীকার করায় তিনি আমার কর্মচারীদের মাধ্যমে বেআইনি পথে সংবাদটা সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তৃতীয়ত, কনজারভেটর নিযুক্ত হওয়া মাত্র তিনি আমার ব্যাঙ্ক থেকে সমস্ত টাকা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছেন...

বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, সেটা কী রকম সমস্ত টাকা সরিয়ে নিয়ে গেলে ওঁর অ্যাকাউন্টটা কী ভাবে টিকে আছে?

রঙ্গনাথন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়।

সচরাচর আদালত থেকে নিযুক্ত কনজারভেটর কোর্ট-অর্ডারের একটি প্রত্যয়িত কপি পাঠিয়ে ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করে যে, তার স্বাক্ষরই শুধু মাত্র অতঃপর গ্রাহ্য হবে। এ ক্ষেত্রে ধনঞ্জয় যদি তাই করত তাহলে গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে টাকাটা থাকত। কিন্তু চৌবে তা করেনি। কোর্ট-অর্ডারের কপি নিয়ে সে পুনরায় ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এবার রঙ্গনাথন জানাতে বাধ্য হয় যে, সত্যানন্দ সেনের অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স হচ্ছে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশ পঁচিশ টাকা। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ একটি চেক কেটে অন্য ব্যাঙ্কে তার নিজের অ্যাকাউন্টে সমস্ত তুলে নেয়, শুধু ব্যাঙ্কের আইনমোতাবেক মাত্র পাঁচশ টাকা ঐ অ্যাকাউন্টে ফেলে রেখে।

— এটুকু করুণা কেন? — জানতে চান বাসু-সাহেব।

— আদালতের আদেশকে মর্যাদা দিতে। কারণ আদেশনামায় বলা হয়েছে, সত্যানন্দের ঐ অ্যাকাউন্ট থেকে কনজারভেটরের স্বাক্ষরে টাকা ওঠানো যাবে যতদিন না অ্যাকাউন্ট-হোল্ডার আদালতের আদেশ-বলে মানসিকভাবে সুস্থ বিবেচিত হন। ফলে অ্যাকাউন্টটা যদি ক্লোজ করে দেওয়া হত প্রকারান্তরে তা হত কোর্ট-অর্ডারকে অগ্রাহ্য করা।

— বুঝলাম। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আপনার তো কিছু করণীয় নেই!

— না, সে ব্যাপারে নয়। ইতিমধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘটেছে। মাত্র গতকাল বিকালে ব্যাপারটা আমার গোচরে এসেছে। শুনুন...

রঙ্গনাথনের ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল, গতকাল রাকেশ জৈন নামে একজন ব্যবসায়ী সত্যানন্দ সেনের অ্যাকাউন্টে বেমক্কা পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়ে বসেছেন। কী ব্যাপার? তদন্ত করে রঙ্গনাথন জানতে পারে, প্রায় ছয় মাস পূর্বে ঐ রাকেশ জৈন সত্যানন্দর কাছ থেকে একটি ভূসম্পত্তি

ক্রয় করেন। স্থির হয় ক্রেতা তিনটি ইনস্টলমেন্টে বিক্রয়মূল্য দেড় লক্ষ টাকা ছয় মাসের মধ্যে প্রদান করলে সম্পত্তির দখল পাবেন। দুটি কিস্তি ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়ে গেছিল। রাকেশ এই কোর্ট-অর্ডারের কথা কিছুই জানেন না। বোম্বাই থেকে গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ঐ বিশেষ অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক পাঠিয়েছেন এবং চেকটি ক্যাশ হয়ে ঐ অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। ফলে ঐ অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স আবার হয়ে গেছে পঞ্চাশ হাজার পাঁচশ টাকা।

বাসুর দু-হাতের দশটা আঙুল হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর গ্লাসটপ টেবিলে টরে-টক্কা বাজাতে থাকে। চোখ দুটি বুঁজে তিনি বললেন, অঙ্কশাস্ত্র মতে তাই হবার কথা। সিম্পল ম্যাথমেটিক্স! পঞ্চাশ হাজার প্লাস পাঁচশ, ইজুক্যালটু পঞ্চাশ হাজার পাঁচশ। কিন্তু আপনার সমস্যাটা কী?

— আইনত ব্যাঙ্ক কি খবরটা কনজারভেটরকে জানাতে বাধ্য?

— সেটাই প্রত্যাশিত। আপনি ব্যাঙ্কে ফিরে যান এবং কনজারভেটরকে জানিয়ে দিন ব্যাপারটা।

রঙ্গনাথন ব্যাজার-মুখে বসে থাকে।

— কী হল? পরামর্শটা আপনার পছন্দ হল না মনে হচ্ছে?

— কী করে হবে বাসু-সাহেব? এ-জাতের সমাধানের সন্ধানে তো আপনার কাছে আসিনি। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, মিস্টার সেন সুস্থ থাকলে আপনার এই সিদ্ধান্তে আদৌ খুশি হতেন না।

— আপনি ভুল করছেন মিস্টার রঙ্গনাথন। সিদ্ধান্তটা আমার নয়, মহামান্য আদালতের। ঐ অ্যাকাউন্টে যা জমা পড়বে তা নয়-ছয় করার অধিকার ঐ 'ছপ্পড়ফোঁড়' কনজারভেটর ধনঞ্জয় চৌবেতে বর্তেছে। আপনি-আমি কিছুই করতে পারব না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া!

— কিন্তু আগ-বাড়িয়ে ব্যাঙ্ক কেন কনজারভেটরকে জানাতে যাবে সে কথা?

— যেহেতু সৌজন্যের তাই নির্দেশ। দু-দশ হাজার হলে ব্যাঙ্ক না জানাতেও পারত ; কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি কারও অ্যাকাউন্টে জমা প[illegible]ঙ্ক নিজে থেকেই তা পার্টিকে জানায়। বিশেষ, এ-ক্ষেত্রে আপনারা সদ্যই আদালতের নির্দেশ পেয়েছেন।

রঙ্গনাথন উঠে দাঁড়ায়। বলে, এবার স্বীকার করি, আমাদের লিগ্যাল অ্যডভাইসারকেও আমি সকালে টেলিফোন করেছিলান। তিনিও [illegible]রে পরামর্শ দিয়েছেন।

— ন্যাচারালি। কিন্তু লিগ্যাল অ্যাডভাইস পাওয়ার পরেও আপনি আমার কাছে তাহলে এসেছেন কেন?

— যেহেতু আপনি পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল! আমি আশা করেছিলাম, আপনি নিশ্চয় কোন ফন্দি-ফিকির বার করবেন।

— তাই কি পারি? ছিঃ! আদালতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। চলুন, আপনার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাই। আমারও কিছু কাজ আছে ওখানে।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন ব্যাঙ্কে। পথে আসতে আসতে বাসু-সাহেব প্রশ্ন করেন, মিস্টার রঙ্গনাথন, আমি আপনাদের ব্যাঙ্ক থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা কর্জ করতে চাই। আজই। সম্ভবপর হবে?

— তা হবে না কেন? কী আমানত রাখবেন?

— ধরুন আমার ঐ নিউ-আলিপুরের বাড়িটা যদি বন্ধক রাখি?

রঙ্গনাথন বলে, কিছু মনে করবেন না বাসু-সাহেব, কতদিন লাগবে শোধ দিতে? আই মীন, জাস্ট য়োর গেস্, আন্দাজে বলুন?

— ধরুন দশ থেকে পনের মিনিট।

রঙ্গনাথন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, মানে? সেই দশ-পনের মিনিটে কী করবেন পাঁচত্তর হাজার টাকাটা পেলে?

— আপনাদের ব্যাঙ্ক-প্রেমিসেস-এর বাইরে টাকাটা আদপে আসবেই না। ঐ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমি আবার জমা করে দেব সত্যানন্দ সেনের অ্যাকাউন্টে।

— আপনার কী মাথা...

'খারাপ' কথাটা উচ্চারণের আগেই হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল রনাথন।

আচমকা বাসু-সাহেবের বাহুমূল চেপে ধরে বললে, বুঝেছি! আসুন!

— কী বুঝেছেন?

— সিম্পল ম্যাথমেটিক্স। পঞ্চাশ হাজার প্লাস পাঁচাত্তর হাজার ইজিক্যাল্টু এক লাখ পঁচিশ!

ব্যাঙ্কে নিজের বাতানুকূল-করা চেম্বারে ঢুকেই রঙ্গনাথন ডেকে পাঠাল তার স্টেনোকে। বাসু-সাহেব ততক্ষণে ভিজিটার্স-চেয়ারে পাইপ ধরাতে ব্যস্ত। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার তাঁকে বলল, কিছু মনে করবেন না বাসু-সাহেব। সবার প্রথমে আমি মিস্টার ধনঞ্জয় চৌবেকে একটা জরুরী চিঠি ডিক্‌টেট করতে চাই...

বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, আমার মনে হয় আপনি বরং চিঠিটা মিস্টার সত্যানন্দ সেনকেই লিখুন, শ্রীধনঞ্জয় চৌবে, কনজারভেটরের প্রযত্নে...

— আই গেট দ্য পয়েন্ট। প্রযত্নে! এ গুড বেঙ্গলি ওয়ার্ড! প্রকৃষ্টরূপে যত্ন নেওয়া, তাই নয়?

ইতিমধ্যে স্টেনো-টাইপিস্ট এসে বাসু-সাহেবের পাশে বসেছে। নোটবই বার করে ম্যানিকিওর-করা আঙুলে উদ্যত-কলম প্রতীক্ষা করছে।

রঙ্গনাথন ডিকটেশন দিল :

— ডিয়ার মিস্টার সেন, কেয়ার অফ মিস্টার ধনঞ্জয় চৌবে, কনজারভেটর, আপনার গড়িয়ার জমিটা নিয়ে যে চুক্তিনামা হয়েছিল সেই বিক্রয়-কোবালা মোতাবেক বোম্বাইবাসী শ্রীরাকেশ জৈন আপনার উপরিলিখিত অ্যাকাউন্টে শেষ কিস্তির পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন। প্যারা। টাকাটা ক্যাশ হয়ে আপনার অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে। বিনয়াবনত ইতি—

স্টেনো তার খাতাপত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠে যেতেই বাসু বললেন, এবার তাহলে আমার ঐ পাঁচাত্তর হাজার টাকার লোনটার ব্যবস্থা করতে হয়।

— বটেই তো। বসুন। ব্যবস্থা করছি।

লোন-ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান করণিক খাতাপত্র নিয়ে এলেন। বিনা আমানতে পাঁচাত্তর হাজার টাকা কর্জ দেওয়া যে বাঞ্ছনীয় নয়, এ বিষয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে অবহিতও করলেন।

রঙ্গনাথন তাঁর পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। ব্যাজার-মুখে প্রধান করণিক বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করেন, কতদিনের জন্য টাকাটা ধার নিচ্ছেন স্যার?

— দিন নয়, মিনিট। পনের মিনিট! — বাসু-সাহেবের চট্‌-জলদি জবাব।

করণিক আঁৎকে ওঠার অবকাশ পেল না রঙ্গনাথন হুমড়ি খেয়ে পড়ায়। রঙ্গনাথন বললে, ওটা প্রাথমিকভাবে এক মাস বলে খাতাপত্রে দেখানো হোক।

তাই দেখানো হল। ঋণপত্রে স্বাক্ষর করার মিনিট পনের পরে ম্যানেজারের ঘরেই টাকাটা পেমেন্ট করা হল।

দেড়শটি পাঁচশ টাকার নোট।

বাসু টাকাটা পকেটজাত করে বেরিয়ে এলেন। ডিপজিট-কাউন্টারে তখনো ভিড় হয়নি তেমনি। ক্যাশ-ডিপজিট ফর্ম ভর্তি করে কাউন্টারে পাঁচাত্তর হাজার টাকা দিতে ভদ্রলোক বললেন, সরি এই অ্যাকাউন্টটা কোর্ট-অর্ডারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বাসু বললেন, সরি, আমি এইমাত্র ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে এসেছি অ্যাকাউন্টটা জীবিত।

ভদ্রলোক উঠে গেলেন। ম্যানেজারের ঘর থেকে ঘুরে এসে টাকাটা নিয়ে আবার ব্যাঙ্ক-ভল্টের দিকে উঠে গেলেন।

এবার বাসু-সাহেব ফিরে এলেন টেলার-অ্যাকাউন্ট কাউন্টারে। সেদিনের সেই করণিক ভদ্রলোকই বসে আছেন। তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন সত্যানন্দ সেনের সওয়া লক্ষ টাকার চেক — 'পেয়ী' স্মরণিকা সেনের স্বাক্ষর করা আছে যার পিছনে। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, সেদিনই তো বললাম স্যার,

অ্যাকাউন্টে অত টাকা নেই।

— শুধু তাই নয়, আপনি বলেছিলেন, 'দিস্ ইজ অ্যান আনইউজুয়াল চেক'!

— তাও বলেছিলাম বটে। আপনি কি তা মনে করেন না?

— কথা সেটা নয়। কথা হচ্ছে চেকটা ভাঙানো যাবে কিনা।

ভদ্রলোকের মনে পড়ল, বাসু-সাহেবের বাহুমূল চেপে ধরে একটু আগেই ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ঘরে ফিরেছেন। ভদ্রলোক ম্যানেজারে ঘরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, আপনিই ঠিক বলেছেন স্যার, অ্যাকাউন্টে যে-টাকা আছে তাতে চেকটা অনার করা যাবে।

— তবে তাই যাক। আমি পাঁচশ আর একশ টাকার ডিনোমিনেশনে নেব। দশ-কুড়ি-পঞ্চাশের নোট যেন দেওয়া না হয়।

ভদ্রলোক ভল্টে উঠে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন টাকা নিয়ে।

দু-পকেট-উপচীয়মান বাসু ফিরে এলেন ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের ঘরে। বললেন, মিস্টার রঙ্গনাথন, একটু আগে আমি আপনাদের ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচাত্তর হাজার টাকা কর্জ করেছি। ওটা আর দরকার হচ্ছে না।

— সে কী! হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত? — ম্যানেজার আঁতকে ওঠার অভিনয় করেন।

— যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'যে অঋণী, অপ্রবাসী সে শাকান্ন ভক্ষণ করলেও সুখী'। আমি ঋণমুক্ত হতে চাই মিস্টার রঙ্গনাথন।

পাঁচাত্তর হাজার টাকা প্রত্যর্পণ করে বাসু-সাহেব ঋণমুক্ত হলেন। বললেন, এবার এই নগদ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দয়া করে গ্রহণ করুন এবং নয়খানা ব্যাঙ্ক ড্রাফট আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। প্রতিটি পাঁচহাজার টাকার। 'পেয়ী' — শ্রীমতী স্মরণিকা সেন। তাকে চেনেন আশা করি?

— নিশ্চয়ই। আপনার ক্লায়েন্ট। মিস্টার সত[illegible]ের অ্যাকাউন্টে অনেকবার টাকা তুলেছেন, জমা দিয়েছেন। তাকে চিনি বইকি। তারপর [illegible] করে বললেন, কিন্তু এবার যে অঙ্কশাস্ত্রটা ঠিক মিলছে না, বাসু-সাহেব। পাঁচ হাজা[illegible]টতি হচ্ছে —

— ওটা স্মরণিকাকে নগদে দিতে চাই। তার হাতখরচ...

— বুঝলাম। সব কাজই সুসম্পন্ন। শ্রীল শ্রীযুক্ত কনজারভেটর চৌবে মহাশয়কে লেখা চিঠি ডাকে পোস্ট করা হয়েছে। সওয়া লক্ষ টাকার চেকটা ভাঙানো গেছে। আপনিও ঋণমুক্ত হয়েছেন। শুধু একটি কাজ এখনো বাকি আছে, ব্যারিস্টার সাহেব।

— আবার কী?

— আমার ক্ষমাপ্রার্থনা। মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল'র উপর আমি যে খণ্ডমুহূর্তের জন্যও আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম সেজন্য আমি দুঃখিত।

বাসু তখন মিটিমিটি হাসছেন।

সাত

পরদিন সকালে এগারোটা নাগাদ বাসু-সাহেব টেলিফোন পেলেন। সলিল দত্ত, দত্ত অ্যাণ্ড সলিসিটর্স ফার্মের সিনিয়র পার্টনার।

— হ্যালো মিস্টার দত্ত, বলুন, কী খবর?

— কী খবর সেটা তো আপনি ভালো ভাবেই জানেন মিস্টার বাসু। রাকেশ জৈন আমার ক্লায়েন্টের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিল...

— এক্সকিউজ মি! আপনার ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে? ঠিক জানেন?

— কেন আপনি জানেন না, চৌবে ঐ অ্যাকাউন্টের কনজারভেটর!

— তাহলেও আইনত অ্যাকাউন্টটা চৌবের হয় না। যা হোক, তারপর?

— তারপর আপনি আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে টাকাটা তুলে নিলেন।

— আদালতের কোন আদেশ?

— য়ু নো বেটার! মিস্টার বাসু, এটা আমি ভালো চোখে দেখছি না!

— নাকি? আমি মর্মাহত! তা হলে তো কোর্টে ব্যাপারটা মুভ করা দরকার!

— তা তো করবই। আপনাকে টেলিফোনে শুধু বলতে চাই — এটাকে বলে 'শার্প প্র্যাকটিস' — আপনার তরফে!

— ভুল বললেন মিস্টার দত্ত! এটাকে বলে 'ডাল প্র্যাকটিস', আপনার তরফে!

— দেখা যাক, আদালত কী বলেন!

— কারেক্ট! দেখা যাক, আদালত কী বলেন!

কৌশিক সরেজমিনে তদন্ত করতে ধানবাদ রওনা হয়ে গেছে। শুক্রবার সকালের মধ্যে তাকে তদন্ত-রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। চৌবে এবং ঠাকুরের কেস কী জাতের। পাড়ায়, কর্মস্থানে, ট্রেড-ইউনিয়ন পার্টিতে তাদের কী সুনাম বা দুর্নাম। সুজাতাও বসে নেই। বাসু-সাহেবের ফরমাশ মতো কলকাতার এখানে-ওখানে দৌড়াদৌড়ি করছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা পেয়ে বাসু-সাহেব গিয়েছিলেন যদু কলোনিতে। গীতা ফ্ল্যাটে ছিল না — অফিস গেছে। কিন্তু স্মরণিকা ছিল। ব্যাঙ্ক ড্রাফট দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, কোথা থেকে কী করলেন মেসো? বাসু ওকে বুঝিয়ে দিলেন, এ টাকা সেই চেক ভাঙানোর। নয়খানা পাঁচ-হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্ ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা দুর্দিনের জন্য। আর এই নগদ পাঁচ হাজার দিয়ে লড়াই কর।

— আপনার ফী?

— দূর পাগলি! কেসটা মিটুক। ফী তো নেব তোমার জেঠুর কাছে! আর একটা কথা। তোমাকে বলেছিলাম যে, ডক্টর দাশগুপ্ত যখন মিস্টার সেনকে দেখতে যাবেন তখন আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। ডক্টর দাশগুপ্ত একান্তে রোগীকে পরীক্ষা করতে চান।...

— তাহলে ভিজিটিং আওয়ার্সে গিয়ে আমি একাই জেঠুর সঙ্গে দেখা করি?

— সেটা পণ্ডশ্রম। ওরা তোমাকে ঢুকতেই দেবে না। শুনলে না, কাল সেই রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা বললেন, ডক্টর রথ ওঁর ঘরে বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে — 'নট টু বি ডিস্টার্বড।'...আমার কি মনে হয় জানো টুকু? ঐখানে যে কয়জন বন্দী আটক পড়ে আছেন তাঁরা সবাই ধনী, কেউ পাগল নয়, নিজ নিজ রিস্তেদারের কাঁটায় গাঁথা, জিওনো কইমাছ! তোমার জেঠুর কথাই ধর — পাঁচ-সাত-দশ লাখ টাকার মালিক। এই গরমে পড়ে আছেন ফ্যানহীন টিনের চালা-ঘরে, ঝাঁপের জানলা, বৃষ্টিতে হয়তো ঘরে জল ঢোকে। সাপখোপ যে ঢোকে না এই যথেষ্ট।

স্মরণিকা কোন জবাব দিল না।

— শুক্রবার বেলা দুটোয় আমাদের কেসটা উঠবে। পৌনে দুটোর মধ্যে তোমাকে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। তোমাকে কি পিক-আপ করার ব্যবস্থা করব, নাকি তুমি নিজেই চলে যাবে।

— আমি নিজেই চলে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন তো টাকার অভাব নেই।

বিকাল চারটের সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু-সাহেব দুপুরে ঘুমান না, তবে মিনিট-কুড়ি চোখ বুজে বিশ্রাম করেন শবাসনে। তারপর বই পড়েন। সাড়ে চারটেয় বিশে চা নিয়ে আসে। চায়ের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। হঠাৎ বৈঠকখানায় টেলিফোনের কর্কশ কণ্ঠ।

শয়নকক্ষে টেলিফোনের একটা এক্সটেনশন আছে। রানী হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে শুনলেন। কথা-মুখে হাত চাপা দিয়ে কর্তার দিকে ফিরে বললেন, ডক্টর কৈলাশনাথ। তোমাকে খুঁজছেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর — যদি আমার অনুমান সত্য হয় — প্রমাণ দেয়, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত — ধর।

বাসু-সাহেব বিছানাটা পাক দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলেন, বাড়িসুদ্ধ সবাই 'টিকটিকি' হলে

আমরা কোথায় যাই?

— হ্যালো ডক্টর? দিস্ ইজ বাসু।

— মিস্টার বাসু, আমি বড়িশা-বেহালার সেই 'স্বর্গধাম' না 'শান্তিনীড়' থেকে কথা বলছি। নিজের নার্সকে নিয়ে কথামতো ঠিক চারটেয় পৌঁছেছি। মিস্টার সত্যানন্দ সেনকে পরীক্ষা করতে...

— কেমন দেখলেন?

— কই আর দেখলাম? সতেরো নম্বরের কেবিনে কেউ নেই!

— মানে? ওরা কি তাঁকে অন্য কোথাও শিফ্‌ট করেছে?

— স্বীকার করছে না। বলছে রোগী 'পালিয়ে গেছে'। বুঝুন কাণ্ড! চারদিকে মানুষভর পাঁচিল, তার উপর কাঁটা-তারের বেড়া, গেটে দারোয়ান। বন্দীর বয়স পঁচাত্তর, সে নাকি সর্বদা রেস্টলেস, তাই তার হেভি সিডেশন দরকার — তবু সে পালিয়ে গেছে! রূপকথার গপ্পোটা হজম করতে পারছেন?

পাশ থেকে মিনমিনে গলায় কে যেন কী বলল, ঠিক বোঝা গেল না। টেলিফোনে ভেসে এল ডক্টর দাশগুপ্তের হুঙ্কার : শাট আপ! আপনারা যা বলার পুলিসকে বলবেন...লুক হিয়ার মিস্টার বাসু...আপনি কি একবার এখানে আসতে পারবেন? পুলিস আসার আগে? সবকিছু ট্যাম্পার হবার আগে?

— কিন্তু ওঁরা কি আমাকে ঢুকতে দেবেন? 'নট টু বি ডিসটার্বড' বোর্ড টাঙানো আছে শুনলাম, সতের নম্বরের কেবিনে?

— ওরা বাধা দেবার কে? আমি কোর্ট-অর্ডারে এখানে এসেছি। আমার অর্ডারই কোর্ট-অর্ডার! আপনি এখনি চলে আসুন। সম্ভব হলে আপনার সেই দূত-দম্পতিকেও পাঠিয়ে দিন। 'সুকৌশলী' না কি-যেন নাম? তারা এসে তদন্ত শুরু করে দিক। আপনি কতক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছতে পারবেন?

— বিশ মিনিট।

এবার আপ্যায়ন অন্যরকম। গাড়িটা গেটের সামনে দাঁড়াতেই দারোয়ান উঠে স্যালুট করল। খাতাখানা বাড়িয়ে ধরল না আদপেই। অন্যমনস্কের মতো এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দারোয়ানটি হিন্দুস্থানীতে জানতে চায়, আপনার গাড়িতে মাইজী আসেননি?

— কোন মাইজি?

— বহ্ নার্স মাইজি।

বাসু-সাহেব বুঝতে পারেন দারোয়ান ভুল করছে। প্রথমদিন তিনি যখন স্মরণিকাকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন তখন ঐ অশিক্ষিত দারোয়ানটা ধরে নিয়েছিল তিনি একজন 'ডাগডরবাবু' এবং তাঁর সঙ্গিনী একটি নার্স। তিনি সংক্ষেপে বললেন, না, তিনি আমার সঙ্গে আসেননি।

গাড়ির শব্দে অফিস-ঘর থেকে বার হয়ে এল একটি মেয়ে। অল্পবয়সী। সেদিনের সেই চোখে-মুখে-কথা মাঝ-বয়সী মহিলাটি নন। এর নার্সের পোশাক। এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে, আসুন, আসুন, স্যার, ডাক্তারবাবুরা সতের নম্বর কেবিনে অপেক্ষা করছেন।

বাসু বলেন, আপনাদের সেই মধ্যবয়সী রিসেপশনিস্ট মহিলাটি কই?

— উনি রিসেপশনিস্ট নন স্যার, স্বয়ং মালকিন, মিসেস রথ।

— আই সী! তা তিনি কোথায়?

— ট্রাঙ্ককলে কী-যেন দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি কটকে না ভুবনেশ্বরে চলে গেছেন।

— বুঝেছি। যাতে তাঁকে সমন ধরানো না যায়।

— আজ্ঞে?

— আজ্ঞে! চল, সতের নম্বরটা কোনদিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

* * *

ঘরের কাছাকাছি এসে দেখা গেল সতের নম্বর কেবিনের দরজা খোলা। ভিতর থেকে দু-জাতের ধ্বনি-গুচ্ছ নির্গত হচ্ছে—একটি তারায়, একটি উদারায়। একটা ভারী, দরাজ, ধমকের গাম্ভীর্যে ভরপুর,

অপরটি মিনমিনে কৈফিয়তের সুর। বাসু-সাহেবকে দেখতে পেয়ে ওঁরা ঘর ছেড়ে বারান্দায় বার হয়ে এলেন। ডক্টর দাশগুপ্তের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দাড়ি, গোঁফ কামানো। পরিধানে সুট। ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা, মেরুদণ্ড বিলকুল সোজা। দ্বিতীয়জন — নিশ্চয় ডক্টর রথ — বেঁটে-খাটো স্থূলাঙ্গ। কণ্ঠস্বর মেয়েলী। তবে জব্বর একটা গোঁফ আছে, বোধ করি পৌরুষের ব্যঞ্জনা দিতে। একটি নার্স। বোধহয় কৈলাশনাথের সঙ্গে এসেছেন।

কৈলাশনাথ বাসুকে ডেকে বললেন, আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই মিস্টার নিত্যানন্দ রথ...

— ডক্টর রথ, প্লীজ!

— ও ইয়েস, 'ডক্টর' রথ! কটকে বাড়ি। ডাক্তারীটা কোথা থেকে পাশ করেছেন আমার জানা হয়নি, তবে 'ডক্টর' সম্বোধনটাই উনি পছন্দ করেন!

নিত্যানন্দ বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, গুড-আফটারনুন, স্যার! এই মেন্টাল-হোমটা পরিচালনার দায়িত্ব আমার। আমার নামেই লাইসেন্স...

কৈলাশনাথ বাধা দিয়ে বললেন, কারেক্ট! তবে সেটা আর কতদিন বহাল থাকবে প্রভু জগন্নাথ জানেন! যাক সে কথা...আমি জানতে চেয়েছি এ কয়দিন মিস্টার সত্যানন্দ সেনকে কী খাওয়ানো হয়েছে, ঔষধ এবং পথ্য, তা ওঁরা কিছুই বলতে পারছেন না। কোন রেকর্ডই নেই...

— এটা রেগুলার হাসপাতাল নয়, স্যার! রেস্ট-হোম মাত্র — মিনমিনের কৈফিয়ৎ।

— তাই বলে কোন রোগীর কী চিকিৎসা হচ্ছে তার রেকর্ড থাকবে না?

— সাধারণত আবাসিকদের নিজস্ব ডাক্তারেরা আসেন। তাঁরা যা ঔষধ ও পথ্য প্রেসক্রাইব করেন, তাই আমরা সার্ভ করি—

— অল রাইট! এই সতের নম্বরের আবাসিককে কোন ডাক্তার ঔষধ ও পথ্য প্রেসক্রাইব করেছেন? তাঁর নাম-ঠিকানা কী?

— আয়াম সরি, স্যার। তিনি আউট-সাইডার। তা আমরা জানি না। ওঁর আত্মীয়, যিনি ভর্তি করে দিয়ে যান, তিনিই সে-সব জানেন।

— অল-রাইট! সেই ঔষধ ও পথ্য যিনি সার্ভ করেছেন তিনি তো আর আউট-সাইডার নন, তাঁর নাম কী? তাঁকে ডাকুন!

— আয়াম সরি এগেন! এই সতের নম্বরের আবাসিককে সার্ভ করতেন আমার ওয়াইফ নিজেই। ঔষধ ও পথ্য। পরশু রাত্রে কটক থেকে একটি জরুরী ট্রাঙ্ক-কল পেয়ে তিনি সেখানে চলে গেছেন। তাই বিস্তারিত জানাতে পারছি না।

বাসু এই চাপান-উতোরে কান খাড়া রেখে ঘরটার ভিতরে ঢুকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন চারিধার। ঘরের মাপ প্রায় চার মিটার বাই তিন-মিটার। পাকা মেঝে, দেওয়ালে আস্তর নেই। মুলি-ঝাঁপের জানলা, টিনের চাল, সিলিং নেই। ঘরের মাঝখানে একটা স্টিলের হসপিটাল-বেড। তার উপর গদি নেই, তোষক পাতা। চাদরটা বেশ ময়লা। স্টিলের ফোল্ডিং টেবিল, খান দুই ফোল্ডিং চেয়ার। সংলগ্ন বাথরুমে কল আছে, শাওয়ার নেই। ইন্ডিয়ান-টাইপ প্যান-সাইফন আছে, ফ্লাশিং-সিসটার্ন নেই। টিনের একটা হলদে-হয়ে-যাওয়া বালতি, মগের বিকল্প একটি ডালডার টিন আর রঙ-চটা ওয়াশ-বেসিন, যার ডিসচার্জ পিট্‌টা চোক হয়ে জলে ভর্তি, অকেজো। দেওয়ালে সাঁটা একটা মেডিসিন ক্যাবিনেট — কোনও ওষুধপত্র সেখানে নেই। একটা কাঠের আলনা, তাতে একটা নীল-সাদা ডোরাকাটা পায়জামা আর একই রঙের বুশ-কোট। আবাসিকদের চিহ্নিত পোশাক। অর্থাৎ সত্যানন্দের পরিত্যক্ত পোশাক।

তদন্ত করে ফিরে এসে বাসু-সাহেব বললেন, ঘরে বা বাথরুমে তো মিস্টার সেনের কোনও জিনিসপত্র দেখছি না? জামা-কাপড়-শেভিংসেট-স্লিপার-টুথ-ব্রাশ বা তোয়ালে?

ডক্টর রথ বলে ওঠেন, জিনিসপত্র উনি কিছুই নিয়ে আসেননি। প্র্যাকটিক্যালি খালিহাতেই এসেছিলেন...

— সে কি! এই ক'দিন তিনি দাঁত মাজেননি? জামা-কাপড় বদলাননি? তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছেননি?

— না, না। আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন না। আমি বলছি, প্রথমদিন যখন আসেন তখন খালিহাতে এসেছিলেন। পরে ওঁর ভাই মিস্টার চৌবে সুটকেসে করে সে-সব পৌঁছে দেন — পাজামা, গেঞ্জি, টুথব্রাশ, পেস্ট...

— শেভিং সেট?

— আজ্ঞে না। ওটা আমরা পেশেন্টের ঘরে রাখতে দিই না। রোজ সকালে নাপিতে এসে আবাসিকদের কামিয়ে দিয়ে যায়।

— বুঝলাম। তার মানে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম যেদিন বাড়ি ছেড়ে বের হন সেদিন তিনি স্বপ্নেও বুঝতে পারেননি যে, শান্তিনীড়ের কারাগারে বন্দী করে রাখবার জন্য ওরা তাঁকে নিয়ে আসছে!

নিত্যানন্দ বাধা দিয়ে বললেন, 'বন্দী' বা 'কারাগার' বলেছেন কেন? এটা তো একটা স্যানিটেরিয়াম। উনি তো এখানে দু-এক সপ্তাহের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন মাত্র।

— দু-এক সপ্তাহের জন্য কেউ যদি কোথাও বিশ্রাম নিতে যায় তবে 'একেবারে খালিহাতে' যায় না। একটা সুটকেস অন্তত তার সঙ্গে থাকে। তাতে তার দৈনিক প্রয়োজনের জিনিস গুছানো থাকে —

— কিন্তু উনি তো মানসিকভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক ছিলেন না।

বাসু-সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, হল না! এ কৈফিয়ৎ যথেষ্ট নয়। দৈহিক বা মানসিক অসুস্থ মানুষ যখন দুই-এক সপ্তাহের জন্য নার্সিংহোমে বা স্যানিটেরিয়ামে যায়, তখন তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ঝি-চাকর কেউ না কেউ একটা সুটকেস গুছিয়ে দেয়। রোগীকে অচৈতন্য অবস্থায় স্ট্রেচারে করে রিমুভ করা হলেও! এ ক্ষেত্রে তা হয়নি। তার একমাত্র অর্থ : বৃদ্ধকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে এনে বন্দী করা হয়েছিল।

নিত্যানন্দ বুখে ওঠে, 'ভুলিয়ে' এনেছিলেন কি 'ভালিয়ে' এনেছিলেন তা জানি না। তাঁর রিস্তেদারেরা সুটকেস গুছিয়ে না দিয়ে যদি অন্যায় করে থাকেন সেজন্য আমার প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়!

বাসু-সাহেবের কী খেয়াল হল। চেয়ারখানা টেনে নিয়ে গেলেন বাথরুমে ; মেডিসিন-ক্যাবিনেটের গায়ে লাগিয়ে চেয়ারে উঠে দাঁড়ালেন। গা-আলমারিটার মাথার উপর — যেখানে দৃষ্টি যায় না — অবলীলাক্রমে হাত চালিয়ে দিলেন।

ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, ও কী করছেন? ওখানে বিছে-ফিচে...

ততক্ষণে বাসু-সাহেব ঐ গর্ত থেকে বার করে এনেছেন চামড়ার একজোড়া স্ট্র্যাপ। নিত্যানন্দের নাকের ডগায় মেলে ধরে বলেন, এটা কী?

— চামড়ার স্ট্র্যাপ।

— সে তো দেখাই যাচ্ছে। ও দুটো ওখানে লুকানো ছিল কেন? কী হয় ও দিয়ে?

— লুকানো ছিল না, রাখা ছিল। পেসেন্টকে যখন কিছুতেই ম্যানেজ করা যায় না, তখন টেম্পরারিলি ঐ চামড়ার স্ট্র্যাপের সাহায্যে খাটের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়।

ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, ওয়ান্ডারফুল! কী ওষুধ দেওয়া হয়েছে জানেন না, কী ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে জানেন না, কী পথ্য দেওয়া হয়েছে জানেন না! আর পঁচাত্তর বছরের বুড়োটাকে কী দিয়ে বেঁধে রাখা হত তা ঠিক জানেন! কী, 'ডক্টর' রথ?

বাসু-সাহেব বলেন সত্যানন্দ সেনকে তাহলে ঐভাবে লোহার খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হত? দিবারাত্র?

— না, না, দিবারাত্র নিশ্চয় নয়। তাছাড়া মিস্টার সেনকে আদৌ কোনদিন বাঁধা হয়েছিল কিনা তা আমি জানি না। আমি বলতে চাইছি — কোনও পেশেন্ট আনম্যানেজেবল হলে এটার ব্যবহার করা হয়, এই আর কি! মিস্টার সেনকে যদি আদৌ ওটা দিয়ে কখনো বাঁধা হয়ে থাকে, তবে সেটা নিতান্ত

সাময়িক ভাবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ওটা খুলে রাখা হয়েছে!

— আজ্ঞে না! খুলে রাখা হয়নি। অত্যন্ত ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। জাস্ট লুক অ্যাট ইট!—

নিত্যানন্দের নাকের ডগায় আবার সেই চামড়ার স্ট্র্যাপজোড়া মেলে ধরেন বাসু।

নিত্যানন্দ এবার সত্যই অবাক হল : মাই গড! এটা কী করে হল?

ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, দ্যাটস্ দ্য মিলিয়ন-ডলার কোশ্চেন!

বাসু বলেন, শুনুন মশাই। আপনাদের থিয়োরি-মোতাবেক তিনি যদি পালিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে ধরে নিতে হবে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য পেয়েছেন। নাহলে লোহার খাটের সঙ্গে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটি পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ কীভাবে বন্ধনমুক্ত হতে পারেন? ধারালো অস্ত্র দিয়ে যে বাঁধনটা কেটেছে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনার প্রতিষ্ঠানের কেউ হতে পারে...

— পারে না! এখানে সবাই বিশ্বস্ত!

— অথবা বাইরের কেউ হতে পারে...

— পারে না! আমাদের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র!

— তবে কী করে তিনি অপসারিত হলেন?

— অপসারিত হননি। তিনি স্বেচ্ছায় গেছেন। তিনি যে খাটের সঙ্গে বাঁধা ছিলেন এটা প্রমাণিত হয়নি, আপনাদের অনুমান মাত্র।

কৈলাশনাথ বজ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন, অল রাইট মিস্টার লাইসেন্স-হোল্ডার! আই উইল কোট য়ু ভার্বাটিম বিফোর দ্য জাজ! আপনি আগামীকাল সকালে ঐ আদালতে উপস্থিত থাকবেন। মিস্টার বাসু, আপনি সামন্স ধরিয়ে দেবেন, কাইন্ডলি!

রথ আঁৎকে ওঠে। বলে, আগামীকাল! অসম্ভব!

— লুক হিয়ার, ম্যান! আপনার স্বীকৃতি-মতে আপনি একটি পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধকে এই সতের নম্বর কেবিনে এক সপ্তাহ ধরে আটকে রেখেছিলেন — আপনার স্বীকৃতি-মতে তিনি নিজের দায়-দায়িত্ব নিজে নিতে অশক্ত, তাঁর চিন্তাশক্তির পারম্পর্য নেই ; মানুষজন চিনতে পারেন না। তিনি রেস্টলেস, তাই তাঁকে 'হেভি সিডেটিভ' দিয়ে সব সময় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হত। কেমন তো? ঐরকম একটি বৃদ্ধকে আপনারা লোহার খাটের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন — যেহেতু আপনাদের মতে তিনি পাগল! তিনি হুডিনি, গণপতি বা পি. সি. সরকার নন! অথচ দেখা যাচ্ছে সেই তথাকথিত পাগল নিজের চেষ্টায় এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে কারও সাহায্য ছাড়াই নিজের জামা-কাপড় সব গুছিয়ে নিয়েছেন। তারপর ঐ অবস্থা থেকে পালিয়ে গেছেন। এবং যদিচ তাঁর পকেটে একটি পয়সা নেই তবু তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। অলরাইট! এই গপ্পোটাই আপনি জজ-সাহেবকে শোনাবেন।...নাউ, পুলিশে খবরটা কে দিচ্ছে?

বাসু বলেন, আমি দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

— থ্যাঙ্কস্! কোর্টে দেখা হবে। এস সরমা...

নিজের নার্সকে নিয়ে কৈলাশনাথ গেটের দিকে রওনা দিলেন। সেখানে তাঁর গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

গাড়িটা ডায়মন্ড-হারবার রোডের দিকে রওনা হয়ে গেলে বাসু বলেন, এবার আপনার অফিস-ঘরে চলুন। পুলিশে খবরটা দিতে হবে।

নিত্যানন্দ সঙ্কুচিত হয়ে বললে, মিস্টার চৌবেকে না জানিয়ে পুলিশে খবর দেওয়াটা কি ঠিক হবে?

বাসু-সাহেব দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, ক্লায়েন্ট-এর প্রতি আপনার নিষ্ঠা দেখে আমি অভিভূত, ডক্টর রথ! কিন্তু আপনি কি চান পুলিশ আপনার মাজায় দড়ি বেঁধে থানায় ধরে নিয়ে যাক?

— মাজায় দড়ি বেঁধে?

— এবং থানায় কোন লোহার খাটের সঙ্গে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখুক? ঠিক যেমন আপনি

বেঁধে রেখেছিলেন সত্যানন্দকে?

এবার আর জবাব যোগায় না। রথ স্রেফ ঢোক গেলে।

— তাহলে আমার পিছন-পিছন অফিসে আসুন। মিসিং পার্সন্স স্কোয়াড-এ ফোন করুন। ভুলে যাবেন না, আপনিই লাইসেন্স-হোল্ডার, আপনার ক্লায়েন্ট নয়।

অফিসে এসে নিত্যানন্দ নিজেই থানায় ফোন করে জানালো তার শান্তিনীড়ের একজন আবাসিক নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। নিরুদ্দেশের প্রাবল্যে পুলিশ স্টেশনে আজকাল এ খবরে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। নিত্যি ত্রিশদিন মানুষজন হারাচ্ছে। বুড়ো-বাচ্চা সবাই। কিশোরী মেয়ে, কচি বউ, বুড়ি ঠান্‌দি। নির্বিচারে। কেউ পরীক্ষায় ফেল করে, কেউ ব্যর্থ প্রেমে, কেউ ঝগড়া করে, কেউ বা সংসারের যাঁতাকলের পেষণে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। পুলিশ-স্টেশনে যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি খিঁচিয়ে ওঠেন, তা একটি বুড়ো নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে ফোনে বিরক্ত করছেন কেন? লিখিত এজাহার দিতে হবে না? সই দিতে হবে না? সেটা কি টেলিফোনে হবে? দশ কপি ফটো নিয়ে থানায় চলে আসুন।

নিত্যানন্দ এতক্ষণে গরুড়-পক্ষীর ভঙ্গিতে বললে, প্লীজ ব্যারিস্টার-সাহেব, আমাকে সমন ধরাবেন না। আমার ওয়াইফের বোন, মানে আমার শালী, কটকে মরণাপন্ন। যে কোন সময় ট্রাঙ্ক-কল আসতে পারে।

— কটকে আপনার শালীর বাড়িতে টেলিফোন আছে?

— আছে। ফোন করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হবে না।

— টেলিফোন-নাম্বার আর নাম-ঠিকানা সব লিখে দিন।

— কেন স্যার? কী হবে?

— আপনার ওয়াইফকে সমন ধরাতে হবে। কেন? আপনার ওয়াইফ বলেননি? আমার একটি ক্লায়েন্টের স্বামীকে পাগল সাজিয়ে এখানে আটক রাখতে চাই — এ-কথা বলেননি? আমাকে তো বলেছিলেন আপনার সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলবেন। আপনিই জানাবেন — কী জাতের সার্ভিসে কীরকম চার্জ দিতে হবে!

রথ চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিম্নস্বরে বলল, একটা কথা বলব স্যার? আপনি যা ভেবেছেন তা ঠিক নয়। এটা সত্যিই একটা স্যানিটেরিয়াম। আমি ভিনদেশী মানুষ। আপনাদের কলকাতায় এসে রুজিরোজগার করছি। এখানেই লেখাপড়া শিখেছি, আমি বাঙালীই হয়ে গেছি! আপনি এভাবে আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার!

বাসু পাইপটা ধরিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। আপনি যদি সহযোগিতা করেন, তবে আমি নিজের থেকে আপনাকে ফ্যাসাদে ফেলব না। হয়তো সমনই ধরাবো না...

— বলুন স্যার? কী জানাতে হবে?

— আপনার শালী কটকে সত্যই অসুস্থ?

— আজ্ঞে না। আপনি সেদিন যে ভয় দেখিয়ে গেছেন, তাই আমার ওয়াইফ পালিয়ে বসে আছেন। যাতে আপনি সমন ধরাতে না পারেন!

— এবার বলুন, সত্যানন্দকে কে সরিয়ে নিয়ে গেছে — ধনঞ্জয় না তার বন্ধু বিলাস সিং?

— প্রভু জগন্নাথের দিব্যি স্যার! আমি সত্যিই কিছু জানি না। বুড়োটা নিশ্চয় নিজে নিজেই পালিয়ে গেছে। ওদের দুজনের কেউ নয়...

— সেটা যে অসম্ভব তা আপনি নিশ্চয় বুঝছেন। বাথরুমে ব্লেড বা ক্ষুর ছিল না। বৃদ্ধ স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা ছিলেন খাটের সঙ্গে...

— না, স্যার। এটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওটা আপনাদের অনুমান।

বাসু-সাহেব উটে দাঁড়ান। বলেন, অল-রাইট! সমনটা তাহলে সার্ভ করি! আদালতেই তাহলে ফয়শালা হবে।

নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ গরড়ু পক্ষী : মেনে নিলাম, স্যার। বুড়োটা খাটের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধাই ছিল!

— তাহলে বাইরের কেউ এসে তাঁকে মুক্ত করেছে। আপনার প্রতিষ্ঠানের কেউ নয়? আপনি নিশ্চিত? অলরাইট, অলরাইট! এখানে কে কে আছে বলুন — ঠাকুর, চাকর, ঝি নার্স, দারোয়ান। বিস্তারিত সব বলে যান।

বিস্তারিত শুনে গেলেন চোখ বুজে। তারপর বললেন, এদের মধ্যে দু-তিন মাসের মধ্যে বহাল হয়েছে কে কে?

— কেউ নয় স্যার। সবাই আমার পুরানো কর্মী।

— অলরাইট। এর আগে যেদিন এসেছিলাম সেদিন আপনাদের নোটিস বোর্ডে একটি কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি দেখেছিলাম। আজ সেটা নেই। কেন? লোক পেয়েছেন? একটি আনট্রেন্ড নার্স?

— পেয়েছি।

— তাকে ডাকুন দেখি—

— সরি স্যার। সে নেই। কাজে জয়েন করেই দু-দিনের ছুটি নিয়েছে। কলকাতার মেয়ে নয়। ডায়মন্ড-হারবারের। খালিহাতে এসেছিল চাকরির সন্ধানে। আমি চাকরি দেওয়ায় ডায়মন্ড-হারবার চলে গেছে গতকাল। আগামীকাল ফিরে আসবে ওর জামাকাপড় ইত্যাদি নিয়ে।

— কী নাম তার? বাড়িতে তার কে কে আছে?

— কল্যাণী দাসী। বিবাহিতা। স্বামী খেতে দেয় না, মদ্যপ। বাড়িতে মা আছে, ছোট ভাই আছে। এত কথা জানতে চাইছেন কেন স্যার?

— যেহেতু একমাত্র সেই হচ্ছে আননোন ফ্যাক্টর এবং মিসিং পার্সন! অবশ্য তার চেয়ে বেশি সন্দেহজনক আরও একজন আছেন, যিনি বুড়োটাকে মুক্ত করে নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে যেতে পারেন।

— কে? কে স্যার? কে আমার এমন সর্বনাশটা করল, স্যার?

— আপনার ওয়াইফ। ধনঞ্জয় বা বিলাসের কাছে টাকা খেয়ে। আপনাকে না জানিয়ে। অথবা আপনার সাহচর্যে, সহায়তায়—

— প্রভু জগন্নাথের দিব্যি, স্যার।

— বারে বারে প্রভু জগন্নাথকে পেড়ে ফেলছেন কেন? তিনি ঠুঁটো বলে?

নিত্যানন্দ নিজের দু-হাত দু-কানে ঠেকালো।

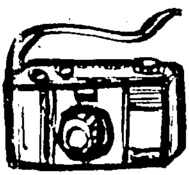

আট

শুক্রবার নির্দিষ্ট সময়ে আদালত বসার পর ঘোষিত হল : শ্রীসত্যানন্দ সেনের অছি-নিযুক্তিকরণ সংক্রান্ত মামলার শুনানী শুরু হচ্ছে।

বিচারক ভাদুড়ী আদালতের উপর নজর বুলিয়ে নিয়ে বললেন বাদী ও বিবাদীপক্ষের কাউন্সেলার আদালতে উপস্থিত আছেন দেখা যাচ্ছে। আদালতনিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ডক্টর কৈলাশনাথ দাশগুপ্তও হাজির হয়েছেন। সর্বাগ্রে আমি ডক্টর দাশগুপ্তের সাক্ষ্যটা গ্রহণ করব। তিনি ব্যস্ত মানুষ, হয়তো অনেক অসুস্থ মানুষ অথবা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় চেম্বারে বসে আছেন। আপনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ান, ডক্টর!

দত্ত অ্যান্ড দত্ত সলিসিটার্স ফার্মের সিনিয়ার সলিল দত্ত চট করে উঠে দাঁড়ান। একটি বাও করে বলেন, ইফ দ্য কোর্ট প্লীজ, ডক্টর দাশগুপ্তের এজাহার গ্রহণের পূর্বে আমরা একটি 'গ্রিভান্স' আদালতের সামনে মূভ করতে চাই ধর্মাবতার...

— কী বিষয়ে আপত্তি?—জানতে চাইলেন বিচারক।

— শ্রীমতী স্মরণিকা দত্ত — যাঁকে কেউ-কেউ স্মরণিকা 'সেন' নামে চেনে...এইটুকুই বলেই সলিল দত্ত জিরাফীয় ভঙ্গিতে উদ্গ্রীব হয়ে কোর্টের চারিদিকে খুঁজে কী যেন দেখেন। তারপর নিজের বক্তব্যে ফিরে আসেন — তিনি অনুপস্থিত মনে হচ্ছে, তা যাক, তাঁর তরফের অ্যাটর্নি মিস্টার পি. কে. বাসু আদালতের আদেশনামাকে অগ্রাহ্য করে গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের শ্রীসত্যানন্দ সেনের অ্যাকাউন্ট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে নিয়েছেন।

বিচারকের ভ্রূকুঞ্চন হল। পর্যায়ক্রমে দুই আইনজীবীর দিকে দেখে নিয়ে সলিল দত্তকেই প্রশ্ন করেন, সেটা কী করে সম্ভব? আপনারা ঐ ব্যাঙ্কের উপর কোর্ট-অর্ডার সার্ভ করেননি?

— করেছিলাম, য়োর অনার।

— তাহলে আপনার মক্কেলের স্বাক্ষর ছাড়া কী করে টাকা তোলা সম্ভব?

— সহযোগী শ্রীসেনের স্বাক্ষর-করা সেই সওয়া লক্ষ টাকার চেকটা সুযোগমতো ভাঙিয়ে নিয়েছেন।

— ঐ অ্যাকাউন্টে অত টাকা ব্যালেন্স ছিল?

— ছিল না। মাত্র পাঁচশ টাকা ব্যালেন্স রেখে আমরা বাকি টাকা অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে রাকেশ জৈন নামে একজন ব্যবসায়ী ঐ অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেন।

— ব্যাঙ্ক তা আপনার মক্কেলকে জানায়নি?

— জানিয়েছিল হুজুর। কিন্তু সে চিঠি পেয়ে ব্যাঙ্কে উপস্থিত হয়ে আমার মক্কেল দেখেন যে, সহযোগী তার পূর্বেই ঐ সওয়া লক্ষ টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন।

জজ-সাহেব ধমক দেন, আপনার কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আপনি বলছেন, অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স ছিল পাঁচশ টাকা, তারপর জমা পড়ল পঞ্চাশ হাজার, আর উইথড্রয়াল হল সওয়া লক্ষ? এই কথা বোঝাতে চান?

— আজ্ঞে না, য়োর অনার! আমাকে সবটা গুছিয়ে বলতে দিন...

সলিল দত্ত অতঃপর আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ দিলেন। রাকেশ জৈনের পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা পড়ার পর বাসু-সাহেবের নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা জমা পড়ে। অ্যাকাউন্টটি সওয়া লক্ষ টাকায় টৈ-টম্বুর হলে মিস্টার পি. কে. বাসু ঐ চেকখানি ভাঙিয়ে নেন। দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে অ্যাডভোকেট দত্ত বলেন, সহযোগী মিস্টার বাসু এবং ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার মিস্টার রঙ্গনাথন যোগসাজস করে আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে টাকাটা উইথড্র করেছেন। ধর্মাবতার, আমরা বিচার চাই...

বাসু তাঁর সহযোগীর বক্তৃতায় কর্ণেন্দ্রিয়কে সজাগ রেখেছিলেন, কিন্তু আঁতিপাঁতি করে তিনি আদালত কক্ষে খুঁজছিলেন দুটি পরিচিত মুখ। পৈ-পৈ করে বলে দেওয়া সত্ত্বেও স্মরণিকা সময়ে আদালতে হাজিরা দেয়নি। ওর জেঠু নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাবার খবরটুকু পর্যন্ত তাকে জানানো যায়নি। কাল রাত এগারোটা পর্যন্ত টেলিফোন বেজেই গেছে। টুকু বাড়ি ছিল না। বেমক্কা অনেক টাকা পেয়ে কি সে টাকা ওড়াচ্ছে? এদিকে কৌশিক ধানবাদ থেকে ফিরে এসেছে সে খবর পেয়েছেন, কিন্তু এখনো তার রিপোর্ট পাননি, দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। হঠাৎ চিন্তাধারায় বাধা পেলেন জজ-সাহেবের প্রশ্নে, আপনি কি এ বিষয়ে কিছু বলবেন, মিস্টার বাসু?

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। শ্রাগ করে বললেন, আমি এ পর্যায়ে কী বলতে পারি, য়োর অনার? সহযোগী কতকগুলি 'ফ্যাক্টস্' দাখিল করেছেন, ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত। অভিযোগ তো কিছু পেশ করেননি। ব্যাঙ্ক বা আমি কী-জাতীয় বে-আইনি কাজ করেছি আগে শুনি। তারপর তো আমার বক্তব্য?

জজ-সাহেব সলিল দত্তের দিকে ফিরে জানতে চান, আদালতের কোন স্পেসিফিক আদেশ লঙ্ঘিত হয়েছে?

— প্রথমত ঐ সওয়া লক্ষ টাকার চেকটা ব্যাঙ্ক অনার করল কেন?

বিচারক বললেন, ঐ চেকটি আমানতকারী সই করেছিলেন কোর্ট-অর্ডারের আগে। বস্তুত আপনার

মক্কেলের তরফে আপনি আদালতে অছি-নিযুক্তিকরণ আবেদন করারও পূর্বে। কোর্ট-অর্ডারে কোথাও বলা হয়নি যে, সেই তারিখের পূর্বে শ্রীসত্যানন্দ সেন যেখানে যে স্বাক্ষর করেছেন তা 'নাল-অ্যান্ড-ভয়েড' করা হল। চেক ছ' মাস পর্যন্ত ভ্যালিড থাকে। ফলে তিনি যদি কোর্ট-অর্ডারের আগে তাঁর ভাইঝিকে সওয়া লক্ষ টাকার...

— স্মরণিকা ওঁর ভাইঝি নয়, ধর্মাবতার...

জজ-সাহেব 'অ্যাডমনিশ' করেন। মৃদু ধমকের পর্যায় সেটা। বলেন, ছেলেমানুষের মতো আদালতের কথায় বাধা দেবেন না, কাউন্সেল! আপনার জানা থাকা উচিত, স্বোপার্জিত অর্থ মিস্টার সেন সে সময় রাস্তার ভিখারিকেও দিতে পারতেন।...যাহোক, যে কথা বলছিলাম, চেক ছ' মাস ভ্যালিড থাকে। সুতরাং ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে যদি টাকা থাকে তাহলে ব্যাঙ্ক কেন পেমেন্ট করবে না?

— কিন্তু আগের দিন যখন ঐ চেক আর শ্রীসেনের চিঠিখানি আদালতে দাখিল করা হয় তখন ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার মিস্টার রঙ্গনাথন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন ঐ চেকটির সূত্র ধরেই মহামান্য আদালত শ্রীসেনকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলে ধরে নিয়েছিলেন।

— ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার কী বুঝতে পেরেছিলেন সেটা প্রশ্ন নয়। আদালত নিযুক্ত অছি ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিতে পারতেন যে, ঐ চেকটি যেন অনার না করা হয়। সে অধিকার তাঁর ছিল, কিন্তু তা তিনি প্রয়োগ করেননি। ফলে ব্যাঙ্কের কী অন্যায় হল?

— দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক টাকাটা 'পেয়ী'কে দেয়নি ধর্মাবতার। দিয়েছিল মিস্টার বাসুকে।

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে ফিরলেন। বাসু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আইনত ব্যাঙ্ক 'পেয়ী'কেই টাকাটা দিয়েছে। প্রথম কথা, চেকের পিছনে শুধুমাত্র পেয়ীর স্বাক্ষর আছে, আর কারও সই নেই। ফলে ব্যাঙ্ক-রেকর্ডস্ অনুযায়ী পেমেন্ট পেয়েছে স্মরণিকা সেন, পেয়ী!

সলিল দত্ত গর্জে ওঠেন, আপনি বলতে চান, আপনি নিজে হাতে টাকাটা নেননি? আপনি বলতে চান, ঐ সময় 'পেয়ী' স্মরণিকা সেন ব্যাঙ্ক প্রেমিসে উপস্থিত ছিল?

বাসু শান্ত গলায় বিচারককে সম্বোধন করে বলেন, য়োর অনার, সহযোগী আদালতের কর্মপদ্ধতির এলিমেন্টারি সূত্রগুলোও জানেন না। প্রথম কথা : ওঁর জানা নেই, আদালতে উকিলে-উকিলে বাক-বিতণ্ডা হয় না। দু-পক্ষই আদালতকে সম্বোধন করে কথা বলে। তাই ধর্মাবতারকে অনুরোধ করছি, আমার সহযোগীকে ভারতীয় আইনের ঐ এলিমেন্টারি ধারাটি বুঝিয়ে দিতে ; অ্যার্টনি-হোল্ডার ক্লায়েন্টের তরফে যে-কোন এজেন্সির কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে পারে। ব্যাঙ্ক থেকেও। সে আন্সারেব্‌ল্ শুধুমাত্র তার ক্লায়েন্টের কাছে। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার জানতেন যে, পি. কে. বাসু শ্রীমতী স্মরণিকা সেনের অ্যাটর্নি-হোল্ডার!

বিচারক বার-দুই মাথা নেড়ে দত্তের দিকে ফিরে বললেন, ব্যাঙ্ক বা কাউন্সেলার কোন বে-আইনি কাজ করেননি, কোন ভাবেই আদালতের কোন আদেশ লঙ্ঘন করেননি। আগেই বলেছি, আপনার মক্কেলের উচিত ছিল ব্যাঙ্ককে লিখিত নোটিস দেওয়া — যেন, ঐ সওয়া লক্ষ টাকার চেকটা না অনার করা হয়। সে অধিকার আদালত আপনার মক্কেলকে দিয়েছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে তিনি তা প্রয়োগ করেননি।

— কিন্তু যে অ্যাকাউন্টে মাত্র পাঁচশ টাকা ব্যালেন্স পড়ে আছে তা থেকে সওয়া লক্ষ টাকার চেক ভাঙানো যেতে পারে তা আমার মক্কেল কেমন করে আন্দাজ করবেন?

বিচারক বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন, মক্কেল আন্দাজ না করলেও তাঁর অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির সেটা আশঙ্কা করা উচিত ছিল। এনি ওয়ে — আপনি যদি ইচ্ছুক থাকেন এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। 'প্রাইমা ফেসি' আমি কোনও কেস দেখতে পাচ্ছি না।

ডক্টর দাশগুপ্তের দিকে ফিরে বলেন, নাউ ডক্টর, আপনি শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ সেনকে পরীক্ষা করে দেখেছেন?

— আজ্ঞে না?

— কেন? দেখেননি কেন?

— যেহেতু নির্দিষ্ট স্যানিটেরিয়ামে তাঁর দর্শন পাইনি। তিনি ওখানে নেই।

— তাহলে তিনি কোথায় আছেন?

— তা তো আমি জানি না।

— এটা কেমন করে হতে পারে?

— তাও আমি জানি না, য়োর অনার! তবে সরেজমিনে তদন্ত করে আমি কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেছি, তা থেকে কতকগুলি সিদ্ধান্তেও এসেছি।

— কী সূত্র এবং কী সিদ্ধান্ত?

— ঐ তথাকথিত স্যানিটেরিয়ামটি একটি কাঁটা-তারে ঘেরা এলাকা। সেখানে কিছু রুগ্ন অথবা অসুস্থ অথবা বয়স্ক মানুষকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে আটকে রাখার ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক — নিত্যানন্দ রথ — তিনি 'ডক্টর' উপাধি ব্যবহার করেন বটে কিন্তু আমার সন্দেহ আছে, তিনি কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি আদৌ পেয়েছেন কিনা। তবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য তিনি লাইসেন্স-প্রাপ্ত। মানসিক রোগ ও রোগীর বিষয়ে তাঁর এলিমেন্টারি জ্ঞানের অভাব!...যাহোক, আমরা কিছু এভিডেন্স পেয়েছি, যা থেকে অনুমান করা যায় শ্রীসত্যানন্দ সেনকে ঐ রেস্ট-হাউসের সতের নম্বর কেবিনে একটা লোহার খাটের সঙ্গে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ওখানে আবাসিকদের কী ঔষধ বা কী পথ্য দেওয়া হয় তার কোনও চার্ট থাকে না, রেকর্ড থাকে না ; কিন্তু তাদের খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা আছে। যাই হোক, ঐ রেস্ট-হাউসের স্বত্বাধিকারী মিস্টার রথ আমাকে বলতে পারেননি — রজ্জুবদ্ধ শ্রীসেন কীভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারেন, তবে তাঁর মতে শ্রী সেন দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য ছাড়াই ওখান থেকে পালিয়ে গেছেন।...আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, একটি অসুস্থ বৃদ্ধ, যাঁকে মানসিক অস্থিরতার কারণে সর্বদা ঘুমের ঔষধ খাওয়াতে হচ্ছে — তিনি কীভাবে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করলেন? কীভাবে হাসপাতালের পোশাক পালটে জামা-কাপড় গুছিয়ে একাই পালিয়ে গেলেন? তাঁর পকেটে একটি পয়সা ছিল না, অথচ দেখা যাচ্ছে...

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন কাউন্সেলার সলিল দত্ত : ইফ দ্য কোর্ট প্লীজ, আমি সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে, সাক্ষী তাঁর সীমানা লঙ্ঘন করছেন। তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন না, বরং তিনি গোয়েন্দা-কাহিনীর পাঠকের মানসিকতা নিয়ে কিছু কনক্লুশন পেশ করছেন মাত্র। তিনি মহামান্য আদালত-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ, একথা অনস্বীকার্য! তবে মনস্তত্ত্ব-বিষয়ে, গোয়েন্দা হিসাবে নয়...

জজ-সাহেব ভাদুড়ী দত্তকে বলেন, সবার আগে বলুন, মিস্টার সত্যানন্দ সেন বর্তমানে কোথায় আছেন?

— আমি জানি না, য়োর অনার!

— অত সংক্ষিপ্ত জবাব তো গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, লার্নেড কাউন্সেলার। আপনার মক্কেলের সবকিছুর জন্যই আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। আদালত শ্রীসত্যানন্দ সেনের তরফে আপনার মক্কেলকে অছি নিযুক্ত করার অর্থ এ নয় যে, সেই বৃদ্ধের সম্পত্তির উপর অধিকারটুকুই অর্পিত হচ্ছে, সেই মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আপনার মক্কেলের উপর অর্পিত হয়েছে!

— আমি স্বীকার করছি হুজুর! কিন্তু আমার মক্কেল, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের বন্ধু শ্রীবিলাসসিং যাদব — এঁরা কেউই জানেন না — কী করে কী হল। শ্রীসেনকে একটি মানসিক আরোগ্য-নিকেতনে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এ-কথা ঠিক নয় যে, সেটা একটা কাঁটা-তারে-ঘেরা বন্দীশালা! এ-কথাও সত্য নয় যে, শ্রীসেনকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হত! দাদার এই অন্তর্ধানে আমার মক্কেল শ্রীচৌবে মর্মাহত। তিনি পুলিশে সংবাদ দিয়েছেন। প্রাইভেট গোয়েন্দাও নিযুক্ত করেছেন। আজ সন্ধ্যায় টি. ভি.-তে শ্রীসেনের ফটো-সমেত নিরুদ্দেশের ঘোষণাও করা হবে। তবে এই প্রসঙ্গে আমি আরও নিবেদন

করতে চাই, ধর্মাবতার, যে, সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গেই পুলিশ ইতিমধ্যে যোগাযোগ করতে পেরেছে, শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম...

— কে তিনি? — জানতে চান বিচারক ভাদুড়ী।

— শ্রীমতী স্মরণিকা দত্ত, যিনি মিস্ স্মরণিকা সেন এই পরিচয়ে ঐ বাড়িতে দীর্ঘদিন বৃদ্ধকে শোষণ করেছেন। পুলিশ প্রাথমিক সংবাদ পায় যে, তিনি যদু কলোনীতে, বেহালায়, তাঁর বান্ধবী শ্রীমতী গীতা করের ফ্ল্যাটে অতিথি হিসাবে আছেন। কিন্তু পুলিশ গিয়ে সংবাদ পায় গত দু'দিন ধরে তিনিও নিরুদ্দেশ। উপরন্তু শ্রীযুক্ত সেনের একটি অ্যাম্বাসাডার গাড়ি — যেটা দীর্ঘদিন রিপেয়ারশপে পড়েছিল, সেটাও আমার মক্কেলের অজ্ঞাতসারে ডেলিভারি নিয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা — তিনি তাঁর তথাকথিত জেঠামশায়ের বিষয় অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন বলে নিজেকে জাহির করা সত্ত্বেও আজ আদালতে অনুপস্থিত। তদুপরি আমাদের সংবাদ : আমার সহযোগী লার্নেড কাউন্সেলও জানেন না, তাঁর মক্কেল বর্তমানে কোথায়!

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন : মিস্টার বাসু?

বাসু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে আদালতের দ্বারপথে ব্যস্তসমস্ত হয়ে টুকু প্রবেশ করছে। তার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, খেয়াল নেই।

বাসু নির্বিকারভাবে বললেন, সহযোগী বলেছেন, আমার মক্কেল আদালতে অনুপস্থিত, তিনি কোথায় আছেন তা তিনি জানেন না। আমার মনে হয় তাঁর অবিলম্বে কোন চক্ষু-চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার...

ইতিমধ্যে স্মরণিকা বাসু-সাহেবের পাশের সীটে বসেছে। হাত দিয়ে সিঁথিটা ঠিক করে নিচ্ছে। তার মাথার চুল এখনো উস্‌কো-খুস্‌কো। বাসু-সাহেব তার দিকে দৃকপাত মাত্র না করে একই সুরে বলে চলেছেন, আমরা জানি না শ্রীসত্যানন্দ যে কীভাবে ঐ স্যানিটেরিয়াম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন অথবা বর্তমানে কোথায় আছেন।... আমি এবং আমার মক্কেল মঙ্গলবার আদালত শেষ হবার পর শ্রীসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছিলাম। আমরা সেখানে পৌঁছাই বিকাল পাঁচটা চল্লিশে। ভিজিটিং আওয়ার্স সাড়ে-পাঁচটায় শেষ হয়ে গেছে এই অজুহাতে আমাদের সতের নম্বর কেবিনের আবাসিকের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। তাই আমরা জানি না, তিনি সেখানে তখন ছিলেন কিনা। পরদিন বিকালে ভিজিটিং আওয়ার্সে এলে রুগীর দেখা পাব কিনা প্রশ্ন করায় আমাদের বলা হল যে, ডক্টর রথ 'নো-ভিজিটার্স' বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন। এরপর গতকাল বিকাল চারটে-দশের সময় ডক্টর কৈলাশনাথ দাশগুপ্ত আমাকে ঐ শান্তিধাম স্যানিটেরিয়াম থেকে টেলিফোন করে জানান যে, শ্রীসেনকে ওখানে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে যাই। পৌঁছাই চারটে বেজে পঁয়তাল্লিশে। পুলিসে খবর দেবার আগে আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই যে, শ্রীসেন ওখানে কোথাও লুকিয়ে নেই। তাই ডক্টর দাশগুপ্ত এবং আমি একটা প্রাথমিক তদন্ত করি। ডক্টর দাশগুপ্ত সে-কথাই তাঁর এজাহারে বিস্তারিত বলছিলেন। সহযোগী তাতে আপত্তি করেছেন এই অজুহাতে যে, তাঁর এজাহার মনস্তত্ত্ববিদের মতো নয়, গোয়েন্দা-কাহিনীর পাঠকের কন্‌ক্লুশন। সহযোগী বুঝতে পারেননি তিনি প্রকারান্তরে আদালত অবমাননা করছেন। ডক্টর দাশগুপ্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'সরেজমিনে তদন্ত করে আমি কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেছি, তা থেকে কতকগুলি সিদ্ধান্তেও এসেছি।' এ-কথা বলে তিনি থামামাত্র মহামান্য আদালত প্রশ্ন করেন 'কী সূত্র এবং কী সিদ্ধান্ত?' ফলে লার্নেড কাউন্সেলের ঐ মন্তব্যটি ভ্রান্ত। ডক্টর দাশগুপ্ত আদালত-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ; আদালত তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, তারই জবাব তিনি দিচ্ছিলেন।...সে যাই হোক, মোট কথা, একনম্বর : আমার মক্কেল আদালতে উপস্থিত। দু-নম্বর : শ্রীসত্যানন্দ সেনের জিম্মাদারী ছিল আমার সহযোগীর মক্কেলের উপর। দেখা যাচ্ছে তিনি বৈমাত্রেয় দাদার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টাকা কখন কোথায় যাচ্ছে শুধু তাতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, গোটা দাদাটি কখন কোথায় আছেন তা জানেন না।

জজসাহেব বললেন, শ্রীসত্যানন্দ সেন নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় মামলার আদ্যোপান্ত রূপান্তর ঘটে

গেছে। এটি বর্তমানে একটি 'মূট'-কেস! আদালতের এক্তিয়ার থেকে কেসটা পুলিশের এক্তিয়ারে চলে গেছে। পুলিস বিভাগের সঙ্গে আদালত যোগাযোগ করবেন। উভয় কাউন্সেলারকে আদালতের নির্দেশ : শ্রীসত্যানন্দ সেন কোথায় আছেন তা জানতে পারলেই যেন তৎক্ষণাৎ আদালতকে জানান। তখন ডক্টর কৈলাশনাথ দাশগুপ্ত তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করে রিপোর্ট দাখিল করবেন।

আগামী শুক্রবার সকাল দশটায় আবার এই কেসের শুনানির দিন ধার্য হল।

স্মরণিকাকে জনান্তিকে নিয়ে এসে বাসু-সাহেব ওকে আদালতের একটা নির্জন ছোট ঘরে বসালেন। বললেন, তোমার ব্যাপারটা কী বল তো? কাল শান্তিধাম থেকে ফেরার পথে শ্রীসেনের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার খবরটা তোমাকে জানাতে গেলাম, যদু কলোনিতে পৌঁছে দেখি গীতার বাড়িতে তালা ঝুলছে।

— বুঝেছি, কাল সন্ধ্যায় তো? এই সাড়ে ছ'টা নাগাদ? গীতা কলকাতার বাইরে গেছে, আর আমি একটু বেরিয়েছিলাম।

— একটু — বেরিয়েছিলে? রাত এগারোটা পর্যন্ত আট-দশবার টেলিফোন করেছি। প্রতিবারই নো রিপ্লাই।

— হবেই তো! টেলিফোন লাইনটা যে সন্ধ্যা নাগাদ খারাপ হয়ে গেল। অন্য কোথাও বেজেছে। এককামরার ফ্ল্যাট, নাহলে আমি শুনতে পাব না, এ কখনো হয়?

— বাজে কথা বল না টুকু! রাতে তুমি অন্য কোথাও ছিলে। কোথায়?

— বাঃ! আমি আবার কোথায় থাকব? গীতার বাড়িতেই ছিলাম—

— ছিলে না। আদালতে আসার পথে আজ সকালেও আমি খোঁজ নিতে গেছিলাম। যথারীতি তালা ঝুলছিল।

স্মরণিকা হঠাৎ তার ম্যানিকিওর করা নখগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়।

— তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?

এবার চমকে চোখে-চোখে তাকায় বলে আছে, কেন বলুন তো?

— তুমি সিংজীর রিপেয়ার-শপ থেকে মিস্টার সেনের অ্যাম্বাসাডার গাড়িখানা ডেলিভারি নিয়েছ?

— আপনি কেমন করে জানলেন?

— আমি কেমন করে জেনেছি সেটা বড় কথা নয়, তুমি নিয়েছ কিনা!

— হ্যাঁ, নিয়েছি। অন্যায় হয়েছে কিছু?

— হয়নি? তুমি জান না — কোর্ট-অর্ডারে মিস্টার সেনের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হয়েছে ঐ ধনঞ্জয় চৌবে?

— বাঃ! তাহলে আপনি ঐ সওয়া লাখ্ টাকার চেকটা ভাঙালেন কী করে?

— তর্ক কর না। সেটা কোর্ট-অর্ডার হবার আগে সই করা চেক।

— গাড়িটাও তো কোর্ট-অর্ডার হবার আগে গ্যারেজে গেছে। সিংজী আমাকে চেনে। কতবার ওর গ্যারেজে ঐ গাড়ি রিপেয়ার করিয়েছি। আপনি টাকা দিলেন, তাই গাড়িটা ছাড়িয়ে আনলাম। এতে এত রাগ করছেন কেন?

বাসু দশ সেকেন্ড পর্যন্ত একজোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি মেলে ওকে দেখলেন। তারপর প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে নিম্নস্বরে বললেন, তোমার জেঠু কোথায়?

আঁতকে উঠল স্মরণিকা : বাঃ! আমি তা কেমন করে জানব?

— কেমন করে জানবে তা জানি না। কিন্তু তুমি যে জান, তা জানি। নাহলে এতবড় খবরে তুমি বিচলিত হচ্ছ না কেন?

— বাঃ! বিচলিত হচ্ছি না মানে? জেঠু ওখান থেকে হারিয়ে গেলেন...কেউ জানে না তিনি কোথায়!...এ কি কখনো হয়? চৌবেকাকু জেঠুকে সরিয়ে ফেলেছে। নাহলে ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে যাবে যে...

ঠিক কখনই রুদ্ধদ্বারে কে যেন 'নক' করল। ওঁরা কথা বলছিলেন আদালতের একটি ছোট্ট ঘরে, যেখানে উকিলেরা তাদের সাক্ষী বা আসামীদের সঙ্গে জনান্তিকে কথা বলার সুযোগ পায়। বাসু উঠে গিয়ে পাল্লাটা খুলে দিলেন : ইয়েস?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে একজন কোর্ট-পেয়াদা। সেলাম করে বললে, স্যার, আপনার একটা টেলিফোন আছে। পেশকারবাবু বললেন, জরুরী ফোন। আসুন।

বাসু স্মরণিকাকে বললেন, তুমি চুপটি করে এখানে বসে থাকবে। আমাকে না বলে কোথাও আবার চলে যেও না, বুঝেছ? আমি জরুরী ফোন-কল'টা শুনে এক্ষুনি ফিরে আসব।

আদালতের সকলেই এই সিনিয়ার ব্যারিস্টার-সাহেবকে চেনে, শ্রদ্ধা করে। শুধু বয়স বা অভিজ্ঞতার জন্য নয়, তাঁর আশ্চর্য সাফল্যের জন্য। নিশ্চিত হারের মুখ থেকে বহুবার বহু আসামীকে বাঁচিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বে।

পেশকার নমস্কার করে বললে, ঐ ফোনটা, স্যার...

বাসু টেলিফোনের কথা-মুখে শুধু বললেন : বাসু।

— আপনার মক্কেল শেষমেশ আদালতে পৌঁছেছে?

কণ্ঠস্বরে চিনতে পারেন। কৌশিক। সে তাহলে কলকাতায় ফিরেছে। সে সব প্রশ্ন না করে উনি শুধু বললেন, হ্যাঁ।

— আপনার কাছে-পিঠে লোক আছে? খোলা কথা বলতে অসুবিধা আছে?

— আছে।

— তাহলে একতরফা শুধু শুনে যান। 'হাঁ-না' জবাব দিয়ে।

— বলো?

— আপনি কি ওকে জেরা করছিলেন এতক্ষণ?

— হ্যাঁ।

— ও কি স্বীকার করেছে যে, গত দু'দিন ও গীতা করের বাড়িতে ছিল না।

— করেনি, কিন্তু আমি জানি।

— ও কি স্বীকার করেছে, সিংজির রিপেয়ার শপ...

— করেছে।

— আপনি ওকে ছেড়ে দিন। জেরা করবেন না। ওকে যেতে দিন।

— কিন্তু ওর আচরণ রীতিমতো সন্দেহজনক। দু-একটি ব্যাপার...

— ওকে ছেড়ে দিন মামু, এক্ষুনি। পুলিশ ওকে খুঁজছে! দিস্ ইজ মোস্ট আর্জেন্ট...

বাসু বলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও! একটা সন্দেহ জাগছে। তুমি কি বলতে চাও, আমি এখানে ডায়মন্ড-হারবারের কল্যাণী দাসীকে আটকে রেখেছি?

— প্লীজ মামু! কোন নাম উচ্চারণ করবেন না। ওকে ছেড়ে দিন। হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে দিন! বলেই লাইনটা কেটে দিল।

বাসু প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন সেই একান্ত-কক্ষে। তার দরজাটা ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল। ফ্যানটা ঘুরছে। ভিতরে কেউ নেই। বাসু চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়েন। ধীরেসুস্থে পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বার করে আপন মনেই বললেন, আগেই বোঝা উচিত ছিল। অনেকগুলো সূত্র ছিল। প্রথমত কল্যাণী দাসী চাকরি পাওয়ার আগেই মিসেস রথ পালিয়ে গেছে। ফলে তাকে মিসেস রথ দেখেনি। মিস্টার রথ দেখেছে, চিনতে পারেনি। আর দারোয়ানটা তাই ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল — নার্স দিদিমণি ওঁর গাড়িতে এসেছেন কিনা। একমাত্র দারোয়ানই স্মরণিকাকে দু-দিন দেখেছে। পূর্বদিন বাসু-সাহেবের সঙ্গে, পরের দিন বোধহয় রথ দারোয়ানকে ডেকে মেয়েটাকে চিনিয়ে দিয়েছিল নবনিযুক্ত নার্সরূপে। আর তাই সেই নার্সদিদিমণির সঙ্গে একজন প্যান্ট-শার্ট-পরা বৃদ্ধকে

হাসপাতালের বাইরে যেতে দেখে দারোয়ানের কোনও সন্দেহ হয়নি। স্মরণিকা নিশ্চয় শান্তিধাম থেকে কিছুটা দূরে গাড়িটা পার্ক করেছিল। সবচেয়ে বড় ক্লু : জেঠু হারিয়ে যাওয়ায় ওর তো আবার সেই অবস্থা হবার কথা, "শী মাস্ট সূন অর আটার ক্রাই।"

তা তো হয়নি!

বাসু পায়ে-পায়ে ফিরে এলেন পেশকারের টেবিলে। জানতে চাইলেন, ভাদুড়ী-সাহেব চলে গেছেন কিনা।

— আজ্ঞে না। এইবার উনি বাড়ি ফিরবেন।

— ওঁকে একবার বলুন তো — আমি মিনিট-পাঁচেকের জন্য দেখা করতে চাই। পেশকার টেলিফোনে কথা বলে ওঁকে জানালো, যান ভিতরে যান, স্যার। বাসু-সাহেব পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই ভাদুড়ী-সাহেব বলেন, আসুন বাসু-সাহেব, কী ব্যাপার?

— একটু আগে প্রকাশ্য আদালতে আমি একটা স্টেটমেন্ট করেছি, যা সে-সময়ে নির্ভুল ছিল, কিন্তু এখন অবস্থাটা একটু পাল্টে গেছে। আমার মনে হল, ব্যাপারটা আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য।

মিস্টার ভাদুড়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটি মুহূর্ত। যেন ওঁর মনের কথা পড়ে নিতে চান।

তারপর বললেন, কাউন্সেলার! আপনি ভাল ভাবেই জানেন যে, এটা একটা 'হাড্ডাহাড্ডি' মামলা। কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি সংক্রান্ত। ফলে আমি চাই না আপনি জনান্তিকে আমাকে এমন কোন কথা বলে বসেন যেটা বলা আপনার পক্ষে এবং যেটা শোনা আমার পক্ষে প্রফেশনাল এথিক্সে বারণ!

সদানন্দ ভাদুড়ী ওঁকে প্রথম ঘরে আহ্বান করেছিলেন 'বাসু-সাহেব' সম্বোধনে, কিন্তু এখন সম্বোধন করলেন 'কাউন্সেলার' বলে। ফলে বাসুও জবাবে বললেন, আমি জানি, য়োর অনার।

দুজনেই নীরব। শেষে জজ-সাহেব বলেন, অলরাইট। শুধু এটুকু বলুন : প্রকাশ্য আদালতে আপনার কোন 'স্টেটমেন্ট'টা?

— আমি ঘোষণা করেছিলাম, 'মিস্টার সেন এখন কোথায় আছেন তা আমরা জানি না।'

— আপনি বলতে চান ঐ স্টেটমেন্টটা ঠিক নয়?

— সাব্‌জেকটিভ বিচারে আমার জ্ঞানমতে সে-সময়ে ঠিক ছিল, কিন্তু অবজেকটিভ বিচারে এখন ঠিক নয়!

একটু চিন্তা করে ভাদুড়ী-সাহেব, অর্থাৎ এখন আপনি জানেন, বর্তমানে মিস্টার সত্যানন্দ সেন কোথায় আছেন?

— নিশ্চয় না। তাহলে কোর্ট-অফিসার হিসাবে তা আমি পুলিসকে, আপনাকে এবং ডক্টর দাশগুপ্তকে জানিয়ে দিতাম। মিস্টার সেন আমার ক্লায়েন্ট নন।

পুনরায় নীরবতা। ন্যায়াধীশের নিরপেক্ষতা আর মানুষী কৌতূহলের একটা দ্বন্দ্ব।

দ্বিতীয়েরই জয় হল। বললেন, তাহলে কী জন্যে এসেছেন?

— আমি মনে করি — এইমাত্র আমি কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেছি যার সম্বন্ধে কোর্ট-অফিসার হিসাবে আপনাকে অবহিত করা আমার কর্তব্য।

— কিন্তু আমি তো পুলিস নই। জনান্তিকে সেসব শোনা আমার পক্ষে ঠিক হবে না।

বাসু হেসে বলেন, তাহলে গুড-নাইট, য়োর অনার!

— না, দাঁড়ান! আমি বরং দু-একটি প্রশ্ন করি। আপনি 'হাঁ-না'-র মধ্যে সীমিত করে তার জবাব দিন।

— বলুন?

— আপনার স্টেটমেন্টে ঐ 'আমরা' শব্দটুকুই কি ভুল?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— ওটা 'বহুবচন' না হলে ভুল হত না, কেমন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— অলরাইট! আপনি বলুন! কী 'ক্লু' পেয়েছেন ঐ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে?

— পর্শু ঐ শান্তিধামে একটি আন-আইডেন্টিফায়েড আনট্রেইন্ড-নার্স চাকরিতে বহাল হয়। তার বয়স, চেহারা ইত্যাদি আমার ক্লায়েন্টের মতো। মিস্টার সেন নিরুদ্দেশ হওয়ার ঠিক পর থেকে সেই নবনিযুক্ত নার্সকে ওখানে আর কেউ দেখেনি। দ্বিতীয়ত, আমার মক্কেল আমার অজ্ঞাতসারে একটা রিপেয়ার-শপ থেকে মিস্টার সেনের একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি ডেলিভারি নিয়েছে। তৃতীয়ত, আমার মক্কেলের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। চতুর্থত, তার কাছে হাজার-পঞ্চাশ টাকা আছে; সর্বোপরি, মিস্টার সেনের অন্তর্ধানে আমরা সবাই চিন্তিত, আতঙ্কিত, অথচ আমার মক্কেল...

— বুঝেছি! এই সূত্রগুলি আপনি কতক্ষণ আগে আবিষ্কার করেছেন?

— ধরুন মিনিটপাঁচেক। আমি আমার মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার আগেই ছুটে এসেছি আপনাকে জানাতে।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন ভাদুড়ী-সাহেব।

বাসু-সাহেব নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর গম্ভীর হয়ে ভাদুড়ী বলেন, কাউন্সেলার! এসব বিষয়ে জনান্তিক আলোচনা প্রফেশনাল এথিক্সে বারণ! কোর্ট-অফিসার হিসাবে যা-যা করণীয় আপনি তা নিশ্চয় করবেন, আমি জানি। তবে এ প্রসঙ্গে একটা ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য। আপনি এই তথ্যটুকু আমাকে আজ না জানালে সারারাত আমার নিদ্রা হত না।...অমন করে তাকিয়ে কী দেখছেন মিস্টার বাসু? বিচারক হলেও আমি তো মানুষ? পঁচাত্তর বছর বয়সের ঐ রকম একজন বৃদ্ধ...কিন্তু একটা কথা আমার বোধগম্য হয়নি বাসু-সাহেব...

— সেটা কী?

— খবরটা আন্দাজে বুঝে নিয়ে আমি যে রকম খুশিয়াল হয়েছি, খবরটা 'ডিডিউস' করে আপনি তো তেমন হননি?

— আজ্ঞে না, হইনি। কারণ যা ঘটে গেছে আমি সে-সব কথা নিয়ে চিন্তা করছি না আদৌ। যা ঘটতে পারে তাই ভেবেই আজ সারারাত আমার নিদ্রা হবে না।

— যা ঘটতে পারে! কী ঘটতে পারে?

— ধরুন কাল ভোররাত্রে আমি যদি 'হোমিসাইড' থেকে একটা টেলিফোন পাই যে, শহরতলীর একটা হোটেলে মিস্টার সেনের ডেড বডি পাওয়া গেছে, আর আমার মক্কেলের হেপাজতে পাওয়া গেছে সদ্যকৃত স্বহস্তলিখিত একটি উইল, যাতে শ্রীসেন তাঁর সর্বস্ব আমার মক্কেলকে দিয়ে গেছেন! তাহলে?

জজ-সাহেব ভাদুড়ী নির্বাক তাকিয়ে থাকেন ওঁর দিকে।

নয়

— তুমি কি সত্যিই তাই বিশ্বাস কর?

— কী?

— শ্রীসেনের খুন হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে? আর টুকুর হেপাজতে পাওয়া যাবে ঐরকম একটা উইল?

কথা হচ্ছিল রাত্রে ডিনার টেবিলে। কৌশিক আর সুজাতা এখনো ফেরেনি। টেলিফোন করে জানিয়েছে ওদের ফিরতে রাত হতে পারে। তাই নিয়মমতো ঠিক সাড়ে আটটায় কম্বাইন্ড-হ্যান্ড শ্রীমান বিশে ওঁদের দুজনের নৈশাহার টেবিলে সাজিয়ে দিয়েছে। এক-পায়ে-খাড়া দাঁড়িয়ে আছে প্যান্ট্রির

দোরের কাছে। বাসু-সাহেব আজ হাত দিয়ে খাচ্ছেন। রাতে প্রায়ই কাঁটা-চামচ ব্যবহার করেন না। রাতে ওঁদের ভাত রান্না করা হয় না, হাতে-গড়া রুটি। ছুরি-কাঁটায় তাতে জুৎ হয় না।

বাসু-সাহেব দু-হাতে রুটিটাকে জরাসন্ধ-বধ করতে করতে বললেন, আমি দৈবজ্ঞ নই, রানু। তবে ঐ জাতের আশঙ্কা আছে বই কি। আর বাস্তবে যদি তা ঘটে যায়, তবে বার-অ্যাসোসিয়েশনে সবাই দারুণ খুশি হবে। কারণ তোমার কর্তার আনব্রোকন-রেকর্ডটার গঙ্গালাভ ঘটবে!

— কেন? — বিস্তারিত জানতে চাইলেন রানী।

বাসু-সাহেব তাঁর অভ্যস্ত কায়দায় বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন :

বড়িশা-বেহালার স্যানিটেরিয়াম থেকে সত্যানন্দ সেনকে অপহরণ যে স্মরণিকা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না এটা পুলিসে সহজেই প্রমাণ করবে। প্রথম দিন যখন বাসু-সাহেব ঐ স্যানিটেরিয়ামের নোটিস-বোর্ডে কর্মখালির বিজ্ঞাপনটা পড়ছিলেন তখন তাঁর পাশে দাঁড়ানো টুকুও তা নিশ্চয় পড়েছে। নিত্যানন্দ রথ আর তাঁর দারোয়ান ছাড়াও ঐ প্রতিষ্ঠানের অনেকে সনাক্ত করতে পারবে যে, স্মরণিকাই কল্যাণী দাসী সেজে চাকরিটা নিয়েছিল। আর পরদিন থেকেই সে নিরুদ্দেশ। ঠিক যে সময় বৃদ্ধ সত্যানন্দও নিরুদ্দেশ হয়েছেন। হয়তো সিংজীর গ্যারেজ থেকে ডেলিভারী নেওয়া অ্যাম্বাসাডারে পাওয়া যাবে ওঁদের দুজনের টিপছাপ — ঐ বৃদ্ধের এবং স্মরণিকার। আর সেটাই কনক্লুসিভ প্রুফ!

— কেন? কনক্লুসিভ প্রুফ কেন?

— যেহেতু গাড়িটা রিপেয়ার করার পর স্প্রে-পেন্টিং করা হয়েছে। সে-কাজ যখন সম্পন্ন হয় তখন মিস্টার সেন হয় ছিলেন তাঁর বাড়িতে রোগশয্যায় অথবা স্যানিটেরিয়ামে। ফলে তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ঐ গাড়িতে পড়তে পারে না, যদি না ঐ গাড়িতেই স্মরণিকা তাঁকে অপসারিত করে থাকে। তাই নয়?

রানীদেবী যুক্তিটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

— দ্বিতীয়ত লক্ষ্য করে দেখ, স্মরণিকার চরিত্রে একটা দারুণ কন্‌ট্রাডিকশন — অপ্রত্যাশিত বৈপরীত্য। মেয়েটির প্রকৃত স্বরূপ আদৌ বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম সাক্ষাতে মনে হয়েছিল সে সরলা সংসার-অনভিজ্ঞা। কিন্তু পরে নানান ঘটনায় দেখা যাচ্ছে ঐ 'অবলা কামিনী রে' একটা ভেক মাত্র। মেয়েটির বুদ্ধি ক্ষুরধার, উদ্ভাবনী প্রতিভাও যথেষ্ট। আমার চোখেও ধুলো দিয়ে চুপিসাড়ে তার জেঠুকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আরও একটা আশঙ্কার কথা, চৌবে আর বিলাসসিং-এর শিরে সংক্রান্তি। প্রচণ্ড একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তারা। ডাক্তার দাশগুপ্ত যদি সেনকে পরীক্ষা করবার সুযোগ পান তাহলে শতকরা শতভাগ সম্ভাবনা : প্রমাণিত হবে ওরা দুজন একটা ক্রিমিনাল কন্সপিরেসি করেছিল — অভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র। একটি সুস্থ সবল বৃদ্ধকে পাগল প্রতিপন্ন করে তার সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টা। ঐ সঙ্গে নিত্যানন্দ রথ এবং তার চ্যালা-চামুণ্ডার দলও ধরা পড়ে যাবে। এরা সবাই — অন্তত আমার ধারণায় — ক্রিমিনাল টাইপের। ফলে এদের মধ্যে যে কেউ অথবা যে কোন দু'তিনজন যৌথভাবে ষড়যন্ত্র করে বৃদ্ধকে খুন করে ফেলতে চাইবে। যদি অবশ্য আমি বা পুলিসের আগে তারা বৃদ্ধের সন্ধান পায়। এবং তারা খুনটা এমন কায়দায় করতে চাইবে যাতে সন্দেহটা বর্তায় স্মরণিকার উপর। তাহলে এক ঢিলে তিন-তিনটে পাখি! এক নম্বর : ওদের ক্রিমিনাল কন্সপিরেসিটা আর প্রমাণ করা যাবে না। দু-নম্বর : সত্যানন্দ সেনের সম্পত্তি চৌবেতে বর্তাবে...

— কিন্তু মিস্টার সেন যদি মুক্তি পাবার পর স্বহস্ত-লিখিত একটি উইল তৈরী করে তাঁর সব কিছু টুকুকে দিয়ে যান?

— সেটাই হবে তিন নম্বর পাখি! সেক্ষেত্রে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচালেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হাত থেকে মক্কেলকে বাঁচাতে পারব না। উইলটা কিছুতেই কার্যকরী করা যাবে না, যদি সত্যানন্দ সেন খুন হয়ে যান। প্রথমত, তিনি যে সুস্থ-মস্তিষ্কের এটা প্রমাণিত হয়নি ; দ্বিতীয়ত উইলের বেনিফিশিয়ারি যাবজ্জীবন জেল খাটছে। ঐ উইলটাই হবে টুকুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ! খুন করার মোটিভ!

রানী বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি ক্রমাগত আ-ডাক কু-ডাক ডাকছ!

— সেটাই যে আমার স্বভাব রানু। জাজ্ ভাদুড়ীও ঐ অভিযোগ করেছিলেন — জানতে চেয়েছিলেন, কেন আমি তাঁর মতো খুশিয়াল হয়ে উঠতে পারছি না।

ঠিক তখনই একটা গাড়ি এসে থামল বাইরের গেট-এ।

বিশে বললে, ওঁয়ারা এসে পড়লেন, মনে লাগে!

বাসু বললেন, কারেক্ট! আমারও তাই 'মনে লাগে'। তুই বরং 'ওঁয়াদের' জন্যে আর দুটো প্লেট দিয়ে যা।

একটু পরেই ডাইনিং হলে এল ওরা দুজন। বেসিনে হাত ধুয়ে বসে গেল ডাইনিং টেবিলে। বিশে তার আগেই প্লেট সাজিয়ে দিয়েছে।

বাসু জানতে চাইলেন, গাড়িটা এল কোত্থেকে? কিনলে নাকি?

— আজ্ঞে না। 'রেন্ট-আ-কার সার্ভিস'-এর। জবাব দিল কৌশিক, প্লেটে খাবার তুলে নেবার অবকাশে।

— চালায় কে? বেটার-হাফ না ওয়ার্স-হার্ফ?

কৌশিকের চট্-জলদি জবাব, দুজনেই। এ যুগের দাম্পত্য-জীবনে ডিভিশন অব্ লেবার নেই।

— জানি। এ যুগে সন্তান হবার সময় 'লেবার-পেইন'-এর আধাআধি কর্তা সহ্য করে। তাহলে সুজাতা কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারে আজকাল?

— ভিড়ের রাস্তা হলে আমিই স্টিয়ারিঙে বসি। টানা ফাঁকা রাস্তা হলে ও।

— সুজাতা বুঝি এখনো গুরুমারা-চেলা হয়ে উঠতে পারেনি?

এটা ঠেশ দিয়ে বলা কথা। প্রাকবিবাহ-জীবনে সুজাতা কৌশকের কাছেই ড্রাইভিং শিখেছিল। সেই অতীত বার্তার একটা তির্যক ইঙ্গিত।

সুজাতা বললে, আজ মামুর সব কথাই বাঁকা-বাঁকা ঠেকছে। হলটা কী? মেজাজ শরিফ নয়?

রানী বললেন, ক্লায়েন্ট যখন কাউন্সেলারের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়, তখন কি মেজাজ ঠিক থাকে?

বাসু সে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে প্রশ্ন করেন, তা 'রেন্ট-আ-কার'-এর খরচটা মেটায় কে?

কৌশিকের সপ্রতিভ জবাব : আপনি!

অর্থাৎ বাসু-সাহেব যে কমিশন দেবেন তা থেকেই 'সুকৌশলী' ভাড়া মেটাবে।

বাসু বলেন, অ! তার মানে গাড়িটা তোমাদের প্রমোদভ্রমণের জন্য নয়? তা কী কী খবর ইতিমধ্যে সংগৃহীত হল, একটু নমুনা শুনি?

কৌশিক সবিস্তারে তা দাখিল করে। বাসু-সাহেবকে স্বীকার করতে হল এতটা সাফল্য তিনি নিজেও প্রত্যাশা করেননি।

কৌশিক অল্প কদিনের ভিতর ধানবাদ থেকে জেনে এসেছি চৌবে আর বিলাসসিং যাদব আদৌ বন্ধু নয়। যদিও তারা একসঙ্গে একই গাড়িতে — না, ট্রেনে নয়, মটোরগাড়িতে — ধানবাদ থেকে এসেছে। গাড়িটা ধনঞ্জয় চৌবের — স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। বিলাস ছিল এক ইউনিয়ানের পাণ্ডা। ইলেকশন, পার্টিবাজি আর রাজনীতি করে বেড়াতো। আর চৌবে ছিল একটি কারখানার দক্ষ ফিটার-প্লাম্বার। কী অপরাধে তার চাকরি যায়। শ্রমিক ইউনিয়ন চৌবের কেসটা নিয়ে লড়েনি। কারণ ধনঞ্জয় চৌবেকে শ্রমিক ইউনিয়ন সুনজরে দেখতো না। তারও কারণ : বেমক্কা কিছু ক্যাশ টাকা খোয়া যায়। কারখানার নয়, ইউনিয়নের টাকা এবং রাজনৈতিক দলের টাকা—সবটাই কালো টাকা, সাদা নয়। অধিকাংশের ধারণা, যে-সময় তহবিল তছরুপ হয়, তখন ধনঞ্জয় ছিল ইউনিয়নের এক পাণ্ডা। কিন্তু সে ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে নেই। কী ভাবে আশি হাজার টাকার ঘাটতি হল এটা কিছুতেই বোঝা গেল না। ঐ সময়েই চৌবে সেকেন্ড-হ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়িটা কেনায় সন্দেহটা তার উপরে বর্তায়। নাহলে চাকরি খুইয়ে সে গাড়িটা কিনবে কেন? তবে অনেকের ধারণা, টাকাটা যে কে, কী ভাবে হাতিয়েছে তা বিলাসসিং

যাদব জানে। তার হেপাজতে নাকি কিছু অকাট্য এভিডেন্সও আছে। শ্রমিক ইউনিয়ন থানা-পুলিশ করেনি। কালোটাকা গচ্চা গেলে চোরের-মায়ের কান্না ছাড়া উপায়ই বা কী। ক্রমশ ধানবাদে চৌবের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠছিল। বৈমাত্রেয় দাদার জনডিস্ হয়েছে শুনে সে হাতে স্বর্গ পেল। চাটি-বাটি গুটিয়ে সস্ত্রীক চলে এল কলকাতায় ; কিন্তু ছিনে-জোঁকটিকে তাড়াতে পারল না। বিলাসসিং আঠার মতো সেঁটে থাকল। ধানবাদ থেকে অনেকটা রাস্তা ড্রাইভ করতে হবে, তাই ধনঞ্জয় ওকে প্রায় বাধ্য হয়ে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছে! তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে বিলাসসিং মহানন্দে চৌবের অ্যাকাউন্টে খায়-দায়-মদ্যপান করে। খোদায় মালুম : নগদ ব্ল্যাকমেইলিং করে কিনা।

কলকাতায় এসে ধনঞ্জয় এক নূতন সুযোগের সন্ধান পেল। স্মরণিকা যে সেন-পরিবারভুক্ত নয় এটা জানা ছিল। ওরা স্বামী-স্ত্রী একটা নতুন পরিকল্পনা করল। উদ্যোগী হয়ে স্মরণিকাকে পাঠিয়ে দিল বিলেতে। চৌবে কলকাতায় এসেছিল এই বিশ্বাসে যে, তার মতো দক্ষ মিস্ত্রি একটা কাজ নিশ্চয় জুটিয়ে নিতে পারবে। এখন দেখল, মাঝে-মাঝে ঠ্যাঙের উপর তোলা ডান ঠ্যাঙটা বদলে বাঁ ঠ্যাঙ করা ছাড়া বাকি জীবনে তাকে আর কোন কাজ করতে হবে না।

অবশ্য এ-সবই শোনা কথা। গুজব। কৌশিকের চাক্ষুষ যেটুকু তা এই—

আজ ভোরবেলা সে ধানবাদ থেকে ফিরেছে। নিউ আলিপুরে পৌছে শুনল মামু আর সুজাতা আদালতে বেরিয়ে গেছেন। ও 'রেন্ট-আ-কার সার্ভিস'-এর একটা গাড়ি ভাড়া করে—এটা সে প্রায়ই নেয়—সোজা চলে আসে আদালতের দিকে। কথা ছিল আদালত বসার আগেই সে বাসু-সাহেবকে ধানবাদে সংগৃহীত তথ্যগুলি পেশ করবে। কিন্তু সেটা সম্ভবপর হল না। আদালত-প্রাসাদের প্রায় একশ মিটার দূরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে ওর সমস্ত কর্মসূচী বদলে গেল।

কৌশিকের নজরে পড়ল, ট্রামরাস্তার ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় একখানা ঝক্‌ঝকে অ্যাম্বাসাডার পার্ক করা আছে। ঝক্‌ঝকে বলতে — সদ্য স্প্রে-পেন্টিং করা। গাড়িতে দ্বিতীয় যাত্রী নেই। ড্রাইভারের সীট থেকে নেমে দাঁড়াচ্ছে স্মরণিকা।

কৌশিকের পক্ষে অবাক হওয়া স্বাভাবিক। মাত্র দিন কয়েক আগে অর্থাৎ ধানবাদ রওনা হওয়ার পূর্বে সে জেনে গেছে স্মরণিকা কপর্দকহীনা। ট্যাক্সির ভাড়া মেটানোর মতো আর্থিক সংস্থানও তখন তার ছিল না। সেই অবস্থায় মামুর নির্দেশে সে মেয়েটিকে তার বান্ধবীর বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসে। পরদিন ভোরের ট্রেনে সে ধানবাদ চলে যায়। ফলে বাসু-সাহেব কী কায়দায় সওয়া লক্ষ টাকার চেকটা ভাঙাতে সক্ষম হন তা ও জানতো না। তাই অমন একখানা গাড়ি থেকে স্মরণিকাকে নামতে দেখে কৌশিকের অবাক হওয়া স্বাভাবিক। তবে নাকি কোন কিছুতেই গোয়েন্দাদের অবাক হতে নেই, তাই কৌশিকও কিছুমাত্র বিচলিত হল না। কিছু দূরে গাড়িটা পার্ক করে লক্ষ্য করতে থাকে। দেখে, ঐখানে গাড়ি থেকে নেমে স্মরণিকা দ্রুতপদে আদালতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ধীর গতিতে ড্রাইভ করে কৌশিকও তার পিছন-পিছন চলতে থাকে। আদালতের সামনে পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে নামতেই সুজাতা এগিয়ে আসে। সে দূর থেকে কৌশিককে দেখতে পেয়েছিল। সুজাতাই সংক্ষেপে সব খবর ওকে জানায়। এক নম্বর : সওয়া লক্ষ টাকার চেক ভাঙানোর কথা। দু নম্বর : সেন মশায়ের আজব অন্তর্ধান। তিন নম্বর : স্মরণিকা রিপেয়ার-গ্যারেজ থেকে সেন মশায়ের একটি অ্যাম্বাসাডার গাড়ি ডেলিভারি নিয়েছে। এবং চার নম্বর বাসু-সাহেবের সন্দেহ, বড়িশা : বেহালার স্যানিটেরিয়াম থেকে সেন-মশায়ের অন্তর্ধানের সঙ্গে অজ্ঞাতকুলশীলা কল্যাণী দাসীর যোগাযোগ আছে।

কৌশিক তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, বাস্তবে কী ঘটেছে! এটাকে তোমরা গুরুমারা-চেলার কেরামতি বলতে পার না। একথা ঠিক, বাসু-সাহেব এ পর্যায়ে তা আন্দাজ, করতে পারেননি। কিন্তু কৌশিক দু-দুটো বাড়তি ক্লু পেয়েছিল। স্মরণিকা ঐ অ্যাম্বাসাডার চড়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত সে ড্রাইভিং জানে।

মোটকথা, কৌশিক বুঝতে পারে, স্মরণিকাই বৃদ্ধ সত্যানন্দ সেনকে ঐ 'শান্তিধাম' থেকে সরিয়ে

ফেলেছে। এবং ঐ গাড়ি করে তাঁকে কোনও নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দিয়ে এখন আদালতে এসেছে কেসটা শুনতে। তা যদি হয়, তাহলে মেয়েটির গতিবিধির ওপর হয়তো পুলিশে নজর রেখেছে। তখনো না হলেও অনতিবিলম্বে পুলিশ ঐ মেয়েটিকে পাকড়াও করবে। তাই সে আদালত-সংলগ্ন একটি পাব্লিক বুথ থেকে মামুকে ফোন করে। তাঁকে অনুরোধ করে টুকুকে ছেড়ে দিতে।

বাসু-সাহেব ইতিমধ্যে হাত ধুয়ে ন্যাপকিনে মুছে নিয়েছেন। পাশপকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করতে করতে বলেন, গুড-ওয়ার্ক! 'রেন্ট-আ-কার'-এর এক্সপেন্সেস্ স্যাংশন্‌ড্।

— না, মামু, আমি তো রঙের টেক্কাখানা এখনো নামাইনি!

— তাই নাকি! রঙের টেক্কার পিঠ এখনো তোলনি?

— না। আজ সন্ধ্যার রিপোর্টটা শুনুন। কেন এত রাত হল ফিরতে।

পাইপটা ধরাতে ধরাতে বাসু বলেন, শোনাও।

আদালতে বাসু-সাহেব যখন কৌশিকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন, তখনই স্মরণিকা সরে পড়ে। নিঃশব্দে আদালত-প্রাঙ্গণ ছেড়ে বার হয়ে যায়। কৌশিকের মিনিটতিনেক দেরি হয়ে যায় টেলিফোনে কথা শেষ করতে। লাইন কেটে দিয়ে আদালতের বাইরে এসে দেখে সুজাতা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কৌশিক ট্রামরাস্তার ধারে পার্ক করা গাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। ঐ শতখানেক মিটার হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠতে স্মরণিকার যেটুকু সময় লাগল তার আগেই কৌশিক সেখানে পৌছে যায়। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ওকে ফলো করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। বহু দূর থেকেও নতুন রঙ করা গাড়িটাকে চেনা যাচ্ছিল।

স্মরণিকা চিড়িয়াখানার দিকে মোড় নেয়। মাঝেরহাট ফ্লাইওভার পার হয়ে বেহালার দিকে চলতে থাকে। সেটাই স্বাভাবিক। ও এখন আছে গীতা করের বাড়িতে। যদু কলোনিতে। কিন্তু ম্যান্টন রোডের মোড়ে সে বাঁয়ে বাঁক নিল না। ডায়মন্ড-হারবারের দিকেই চলতে থাকে। ও কি বড়িশা-বেহালায় যাচ্ছে? শান্তিধামে? কেন? না, তাও না! সে রাস্তাটাও পার হয়ে ও আরও উজানে চলতে থাকে। দক্ষিণে। আরও মাইল আট-দশ এগিয়ে অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা বাঁদিকে মোড় নিল। এখানে একটা নতুন কারখানা কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে। বেশ জমকালো ব্যাপার। জি. জি. সি. এল। অর্থাৎ গ্লোবাল গ্যাস অ্যান্ড কেমিকাল্‌স্ লিমিটেড। কারখানা, স্টাফ কোয়ার্টার্স, বেশ কিছু দোকানপাটও। চওড়া পিচের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে বাতি। লোডশেডিং হলেও সে বাতি নেবে না। কারণ তা বিজলি-বাতি আদৌ নয়, গ্যাস-বাতি। কারখানায় প্রস্তুত গ্যাসে জ্বলে। যেমন জ্বলত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে শহর কলকাতাতেও — এস্‌প্লানেড, রেড রোড আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছেপিঠে।

সামনের গাড়িটা একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সামনে দাঁড়ালো। টুকু নেমে এল। কৌশিক প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে গাড়িটা পার্ক করল। টুকু কী সব বাজার করে একটা বড় ব্যাগ হতে বের হয়ে এল প্রায় আধঘণ্টা পরে। স্টার্ট দিলে গাড়িতে। এখানে ডায়মন্ড-হারবার রোডের মতো গাড়ির ভিড় নেই। কৌশিক দূরত্বটা বাড়িয়ে দিল। টুকু দু-একটা বাঁক ঘুরে এসে থামল একটা মোটেলের সামনে। এখানে যে একটা মোটেল গড়ে উঠছে তা জানাই ছিল না কৌশিক অথবা সুজাতার।

রানু জানতে চান : 'মোটেল' কী?

বাসু শাঙ্কর-ভাষ্য দাখিল করেন : মোটরিস্টদের হোটেল। ইয়োরোপে, আমেরিকা বা জাপানের সর্বত্র তা পথের দুধারে ছড়ানো। নিচে গ্যারেজ, উপরে শয়নের ব্যবস্থা। সচরাচর এক-কামরা য়ুনিট, সিঙ্গল অথবা ডব্‌ল্-বেড। সংলগ্ন টয়লেট আবশ্যিক। রান্না বা খাওয়া-দাওয়ার জন্য গ্যাস বা ইলেকট্রিক স্টোভ, ফ্রিজ, হট-কেস কোথাও থাকে, কোথাও নয়।

কৌশিক জানায়, এখানে ঐ মোটেলে রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা বোধহয় নেই। অবশ্য তাতে অসুবিধাও কিছু নেই। মোটেলের বিপরীতেই একটা রেস্তোরাঁ আর 'বার'।

স্মরণিকা মোটেলের সামনে গাড়িটা পার্ক করল। তিন-নম্বর গ্যারেজটা খুলে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে

দিল। তারপর গাড়ি লক্ করে বেরিয়ে এল। বাজার করা ব্যাগটা হাতে নিয়ে নয় কিন্তু। গ্যারেজের তালা খোলাই রইল। এবার ও এগিয়ে গেল রেস্তোরাঁর দিকে। তার দুটি অংশ। পাশাপাশি নিয়নবাতির সাইনবোর্ডে : 'চাইনীজ ফুড' আর 'তন্দুরী অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফুড'।

টুকু প্রথমটিতে ঢুকল। প্রায় দশ মিনিট পরে যখন বার হয়ে তখন তার হাতের কার্টন-প্যাকেটে ফিতে বাঁধা চাইনীজ ফুড। এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। নামিয়ে নিল বাজারের থলিটা। এক হাতে ঐ ব্যাগ অপর হাতে খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে দিব্যি খোশমেজাজে হিন্দি পপ মিউজিক গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দ্বিতলে। বেশ বোঝা যায়, তার গতিবিধির উপর কেউ নজর রাখতে পারে এটা তার মনেই আসেনি।

সুজাতা ড্যাশ-বোর্ড-এর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। রাত সাড়ে আটটা। কৌশিককে বলে, ও এখানেই রাতটা কাটাবে মনে হচ্ছে। হয়তো দুখানা ঘর নিয়েছে। অথবা ডবল্‌বেড রুমে জেঠুর সঙ্গে।

কৌশিক বলে, সেক্ষেত্রে ও গ্যারেজ বন্ধ করে উপরে উঠত না কি?

— নাও হতে পারে। সচরাচর রোলিং-শাটারগুলো সহজে নামতে চায় না। হয়তো এদের অ্যাটেন্ডেন্ট গ্যারেজ বন্ধ করে দেবে এটাই ও প্রত্যাশা করছে। ও রাতে কোথায় থাকল সে খবরে আমাদের কী আগ্রহ? আমরা মোটমাট জানতে চাই, সত্যানন্দ সেন কোথায় আছেন। তা যখন জানা হয়ে গেছে তখন তড়িঘড়ি ফিরে চল।

কৌশিক বুঝতে পারে। সত্যিই আর কিছু করণীয় নেই। ওরা ফিরে আসে।

বাসু বলেন, জায়গাটা নিউ আলিপুর থেকে কত মাইল দূরে?

— তা ধরুন মাইল পনের-কুড়ি।

— এত রাতে ফাঁকা রাস্তায় কুড়ি মাইল পথ আসতে তোমাদের পৌনে দু-ঘণ্টা লাগল? কে চালাচ্ছিল? বেটার-হাফ না ওয়ার্স?

কৌশিক কৈফিয়ৎ দেয়, ফেরার পথে তারাতলা রোডের কাছাকাছি একটা চাকা পাংচার হয়ে গেল যে!

— অ! তাহলে এক কাজ কর। এখন রাত দশটা চল্লিশ। টুকুর যদু কলোনির ফ্ল্যাটে ফোন কর তো একবার। আমি জানতে চাই, রাতটা টুকু কোথায় কাটাচ্ছে।

সুজাতার খাওয়া শেষ হয়েছিল। উঠে গিয়ে ফোন করল। একবার মাত্র রিঙিং টোন হতেই ও-প্রান্তে কেউ রিসিভারটা তুলে বললে, হ্যালো?

নিঃশব্দে সুজাতা এ-প্রান্তের যন্ত্রটা হস্তান্তরিত করল। বাসু বললেন, কে? গীতা?

— আজ্ঞে না, মেসোমশাই। আমি টুকু।

— বটে! আমার কণ্ঠস্বর শুনেই চিনতে পারলে?

— না তো! কণ্ঠস্বর শুনে নয়। আমি যে সারাটা দিন আপনার টেলিফোনের প্রত্যাশায় আছি!

— সারাটা দিন! মানে?

— আয়াম রীয়ালি সরি, মেসোমশাই। আদালতে আপনি বলে গেলেন চুপটি করে বসে থাকতে। অথচ ঠিক তখনি আমার মনে পড়ল, গাড়িটা বে-জায়গায় পার্ক করে এসেছি। একজনের গ্যারেজের সামনে। সে ভদ্রলোক যদি গাড়ি বার করতে বা ঢোকাতে চান তা হলে পারবেন না। তাই আপনাকে না জানিয়েই...মানে, আমি কী বলব? রীয়ালি ভেরি ভেরি সরি।

— আদালত থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছিলে?

— কোথায় আবার? এখানেই সোজা ফিরে এলাম।

— রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ফোন করলাম, কেউ তো ধরল না?

— সাড়ে সাতটায় তো? তা তো হবেই। গীতা নেই। দিল্লী গেছে। তাই আমি রান্নাবান্নার মধ্যে যাইনি। সামনের হোটেলে খেতে গেলাম।

— কী খেলে? চাইনীজ ফুড?

— আজ্ঞে? মনে হল ও-প্রান্ত এ-প্রশ্নে একটু ঘাবড়ে গেছে।

— টেলিফোনে সয়াসস্ আর ভিনিগার-এর গন্ধ এখনো পাওয়া যাচ্ছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি: কী খেলে রাতে? চাও মিঙ্, চিলি-চিকেন, ফ্রায়েড প্রন জাতীয় কিছু?

— দারুণ গেস্ করেছেন তো! আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই খেয়েছি।

— শোন। কাল সকাল আটটায় আমি তোমার ওখানে যাব। তার আগে কোথাও বেরিও না। নাকি ভোরবেলা কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?

— কী যে বলেন, মেসোমশাই! আমি কি আপনার মতো 'বিজি'? তা আপনি কেন কষ্ট করে এখানে আসবেন? আমিই আপনার বাড়িতে যেতে পারি। দশটা নাগাদ গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কে একবার যেতে হবে।

— দশটা নাগাদ যে-কোন চুলোয় যেও। সকাল আটটায় তোমাকে যেন যদু কলোনির ফ্ল্যাটে পাই। ও.কে.?

— ঠি' আছে, ঠিক আছে। তাই হবে। এত রাগ করছেন কেন?

দশ

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে কৌশিক প্রশ্ন করল, কোন্ গাড়িখানায় যাওয়া হবে? আর কে কে যাবে?

বাসু বলেন, দু' খানা গাড়িই যাবে। আমরা তিনজনই।

— কেন? তিনটি প্রাণী, দু'খানা গাড়ি কেন? — জানতে চায় সুজাতা।

— সে-কথা বললে তোমার মামিমার ধমক খাব। উনি এখনি বলবেন, এই সাতসকালে আমি আডাক-কুডাক ডাকছি। কিন্তু আমার মন বলছে, আজই একটা কিছু ঘটতে চলেছে। প্রয়োজনে যাতে আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি, তাই দু' খানি গাড়িই দরকার। মিস্টার সেনকে কোনও নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়ে ডক্টর দাশগুপ্তকে খবর না দেওয়া পর্যন্ত আমার এ উত্তেজনা থামবে না। আমরা এই মুহূর্তে প্রচণ্ডভাবে ভাল্‌নারেবল্।

ঠিক আটটার সময় দু'খানা গাড়ি এসে থামল যদু কলোনিতে, গীতা করের বাড়ির সামনে। 'কলবেল' বাজাতে হল না। গাড়ির শব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল স্মরণিকা। ঘরোয়া পোশাক নয়, সে তৈরী হয়েই ছিল। বোধ হয় স্থির করেছিল কথাবার্তা শেষ হলেই গাড়ি নিয়ে বার হবে। ওঁদের তিনজনকে দেখে আপ্যায়ন করল, আসুন, আসুন মেসোমশাই। বসুন।

ওঁরা বসতে না বসতেই প্রশ্ন করে, গীতা নেই, আমিই গৃহকর্ত্রী। কী খাবেন বলুন? চা না কফি?

বাসু বলেন, স্থির হয়ে বস দিকিন। জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।

চুপ করে বসে পড়ে সামনের মোড়াটায়। হাত দুটি কোলের উপর রেখে ওঁর মুখের দিকে তাকায়। যেন ব্রতকথা শুনছে ভক্তিভরে! বলে, বলুন?

— তোমাকে কেউ কখনো বলে দেয়নি যে, ডাক্তারের কাছে রোগ আর সলিসিটারের কাছে ফ্যাক্ট লুকিয়ে রাখতে নেই? তাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা?

টুকু মুখটা নিচু করে হাতের বালাটাকে পাকাতে থাকে।

— কী? চুপ করে আছ যে? আমার কাছ থেকেও লুকাচ্ছ কেন?

— কী লুকাব? আপনি তো সবই জানেন। জানেন না? পুলিশে হয়তো ডায়মন্ড-হারবারে কল্যাণীকে খুঁজছে। কিন্তু আপনি তো বুঝতেই পেরেছেন সব কিছু?

— আমার কাছ থেকে কেন গোপন করতে চাইলে, বল তো?

— আমার সাহস হয়নি। আমার আশঙ্কা ছিল, আপনি হয়তো রাজি হবেন না। আপনার 'প্রফেশনাল এথিক্স' বাধা হয়ে দাঁড়াবে!

বাসু একটু থমকে গেলেন। কথাটা ভাববার। সত্যই আদালত আদেশ করেছে ডক্টর দাশগুপ্ত রোগীকে পরীক্ষা করবেন, এ সময় তিনি নিশ্চয় ওভাবে সত্যানন্দ সেনের অপসারণ অনুমোদন করতেন না। বললেন, ঠিক আছে। আমি যা যা জানতে চাইছি তার জবাব দাও তো? সতের নম্বর কেবিনে মিস্টার সেনকে কী অবস্থায় দেখতে পেলে? চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে তিনি বাঁধা ছিলেন?

— হ্যাঁ। ওরা এত জোরে বেঁধেছিল যে উনি পাশ ফিরতেই পারছিলেন না, মাথা নাড়াতে পারছিলেন না। হাত দুটিও বাঁধা। মুখে মাছি বসলেও তাড়াবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর।

— তুমি চামড়ার স্ট্র্যাপটা কাটলে কেমন করে?

— রান্নাঘর থেকে একটা ধারালো ছুরি নিয়ে গেছিলাম। মাংসকাটা ছুরি।

— উনি তোমাকে চিনতে পারলেন?

— আশ্চর্য! হ্যাঁ, পারলেন। আমি যখন যা বলেছি, তাই মেনে নিয়েছেন। জামাকাপড় বদলে তাঁকে নিয়ে আসতে কোনই অসুবিধা হয়নি।

— দারোয়ান আপত্তি করেনি? দারোয়ান কি তোমাকে চিনত কল্যাণী দাসী হিসাবে?

— না। কিন্তু জেঠুকে নিয়ে যখন চলে এলাম তখন দারোয়ান গেট-এর কাছে ছিল না। কোথায় ছিল আমি জানি না।

— তাঁকে এখানে নিয়ে এলে না কেন?

— আমার আশঙ্কা ছিল ওরা এখানে আসতে পারে। ঐ জেঠুর রিস্তেদারেরা। আমার অ্যাড্রেস-বইতে গীতা করের ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার লেখা আছে। অ্যাড্রেস-বইটা আমার ঘরের টেবিলে পড়ে আছে।

— তোমার জেঠুকে কোথায় রেখে এসেছ?

স্মরণিকা নয়ন নত করল। শুধু মাথাটা নাড়ল ডাইনে-বাঁয়ে।

— বলবে না? আমাকেও বলবে না?

— আজ্ঞে না। হপ্তাখানেক সময় আমাকে দিতেই হবে। তিনি যেখানে আছেন সেখানে কেউ তাঁর সন্ধান পাবে না। দিন-সাতেকের মধ্যে জেঠু ঐ শকটা কাটিয়ে উঠবেন। আমি নিশ্চিত। তখন আপনি ডক্টর কৈলাশনাথকে ডেকে আনবেন। তার আগে নয়।

— তুমি ওঁকে কিছু টাকাপয়সা দিয়েছ?

— হ্যাঁ। আপনি আমাকে যা দিয়েছিলেন সবটাই তাঁকে দিয়েছি। আমার হাতখরচের জন্য একখানা ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট্ নিজের কাছে রেখেছি। আজই সেটা ভাঙাবো। পাঁচ হাজার টাকার।

বাসু ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করেন। বলেন, ওঁর এখন যা শারীরিক আর মানসিক অবস্থা তাতে চল্লিশ হাজার টাকা তাঁর কাছে রেখে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করনি।

— আপনাকে আর একটা কথা বলা হয়নি, মেসোমশাই.....

— কী কথা?

— জেঠু একখানা সাদা কাগজে একটা উইল করেছেন। তার আদ্যন্ত তাঁর নিজের হাতে লেখা। তারিখ গত কালকের। তিনি তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর আমাকে দিয়ে গেছেন। এবং কারও প্ররোচনায় যে তিনি উইলটি লেখেননি তারও উল্লেখ আছে। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, দুজনকে দিয়ে সাক্ষী হিসাবে সই করিয়ে নিতে।

বাসু-সাহেবের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললেন, আদালতে তোমার জন্ম-সংক্রান্ত যে-সব কথা উঠেছিল সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে?

— না, হয়নি। আমার মনে হয় এখনো তার সময় হয়নি। বাই-দ্য-ওয়ে, উইলে তিনি আমাকে

ভ্রাতুষ্পুত্রী বলে উল্লেখ করেননি কিন্তু।

— উইলটা কোথায়? তোমার কাছে?

— হ্যাঁ।

— ওটা আমাকে দিয়ে দাও। আমার কাছে ওটা থাকবে।

— জেঠুও তাই বলেছেন। নিন।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কাগজখানা সে বাসু-সাহেবকে দিল। উনি মিলিয়ে দেখলেন। তারিখ, সই, শেষ উইলের স্বীকৃতি। কারও প্ররোচনা ব্যতিরেকে। বললেন, উনি যে এই উইলটা করেছেন আর আমি যে সেটা গচ্ছিৎ রেখেছি এটা কাউকে বলবে না, বুঝেছ? আমি এ জাতের উইল পছন্দ করছি না। কারণ এটা ইনকমপ্লিট। আইনত সিদ্ধ নয়, তাছাড়া একবার যখন একটি আদালত তাঁকে 'ইনকম্পিটেন্ট' বলেছে তখন সর্বপ্রথমেই প্রমাণ করা দরকার যে তিনি 'কম্পিটেন্ট'। আমাদের প্রথম কাজ ডক্টর দাশগুপ্তকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া।

স্মরণিকা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, সরি, স্যার! উনি এখনো স্বাভাবিক হতে পারেননি। যে সব ওষুধ, ইনজেকশন তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার প্রভাব কাটতে চার-পাঁচদিন লাগবেই। তার আগে ডক্টর দাশগুপ্ত ওঁকে পরীক্ষা করলে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবেন।

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, কী বক্‌ছ পাগলের মতো? ডক্টর দাশগুপ্তের চিকিৎসায় উনি অনেক তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন।

আবার মাথা নাড়ল মেয়েটি, না, স্যার, আমি রাজি নই।

— অলরাইট! তোমাকে রাজি হতে হবে না। তুমি শুধু আমাদের সঙ্গে এস দিকিন!

— কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

— চুলোর দোরে! এস।

প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখা গেল দু'খানি গাড়ি ডায়মন্ড-হারবার রোড দিয়ে দক্ষিণে চলেছে। সামনের গাড়িতে পিছনের সীটে স্মরণিকা আর সুজাতা। চালক বাসু-সাহেব। পিছনের 'রেন্ট-আ-কার'-এ কৌশিক একা। গাড়ি দু'খানা জি. জি. সি. এল. ফ্যাক্টরির কাছাকাছি এসে গতিবেগ কমিয়ে ফেলল। স্মরণিকার চোখে পাতাটি পড়ল না। সে সামনের দিকে তাকিয়ে নির্বাক বসে আছে। গাড়ি বাঁয়ে বাঁক নিল। গেট পার হয়ে কিছু দূরে বাঁ-হাতে সেই মোটেল। কিন্তু তার সামনে একটা জটলা। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন মানুষ ভিড় করেছে। ফ্যাকটরির সিকিউরিটি তাদের সামলাচ্ছে। আর রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের একটি জীপ। বাসু-সাহেব মোটেলের সামনে থামলেন না। একটু এগিয়ে গাড়িটা বাঁয়ে পার্ক করলেন। ঠিক পিছন-পিছন এসে থামল কৌশিকের গাড়িখানা।

বাসু পিছন ফিরে স্মরণিকাকে বললেন, হল? ঐ দেখ তোমার পাকামো করার ফল!

স্মরণিকা বিহ্বলের মতো পিছন ফিরে মোটেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভিড়ের ভিতর কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। বাসু বলেন, এখনো বুঝতে পারনি? যেভাবে আমি ঐ মোটেলটাকে খুঁজে বার করেছি ঠিক সেইভাবেই তোমার জেঠুর রিস্তেদারেরা সেটা খুঁজে বার করেছে। তারা পুলিসে খবর দিয়েছে। পলাতক প্যাগলটাকে ধরে নিয়ে যেতে ঐ জীপ এসেছে। তোমার মতো নির্বোধের উপযুক্ত...

হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে স্মরণিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সুজাতা ধমক দেয় ; আহ্, আপনি থামুন তো মামু!

— আই নো! আই নো! এখন সান্ত্বনার বাক্য শোনানো উচিত।

হঠাৎ পিছনের গাড়ি থেকে কৌশিক ছোট্ট একটা হর্ন দিল।

বাসু পিছন ফিরে দেখলেন।

— হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো! বাসু-সাহেব এ-পাড়ায় কী মনে করে?

ইন্সপেক্টার বরাট। বহুবার বহু কেস-এ মুখোমুখি হতে হয়েছে। হোমিসাইড-বিভাগের অভিজ্ঞ

কর্মচারী। বাসু তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে আসেন, যাতে পিছনের দুই আরোহিণীকে বরাট না লক্ষ্য করে। তাদের মধ্যে একজন বর্তমানে রোরুদ্যমানা — বরাটের সন্দেহ হতেই পারে। বলেন, গুড মর্নিং মিস্টার বরাট! এখানে এত ভিড় কেন?

বরাট একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বলে, আমার প্রথম প্রশ্নের জবাবটা মুলতুবি আছে ব্যারিস্টার-সাহেব। তার জবাবটা আগে শুনি। আপনি সাত-সকালে জি. জি. সি. এল. ক্যাম্পাসে কী মনে করে?

— আমার এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে। মোটেলের সামনে ভিড়টা কিসের?

বরাট ওঁর বক্তব্যের শেষার্ধকে পাত্তা দিল না। প্রথমার্ধ বিষয়েই তার কৌতূহল। বললে, কে আপনার মক্কেল? কী নাম? জি. জি. সি. এল.-এর স্টাফ?

বাসু কথা বলতে বলতে একটু দূরে সরে আসেন। স্মরণিকাকে সামলে নেবার সুযোগ দিতে। বললেন, মিসেস্ বরাট আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেলে...

বরাটের গলায় সিগ্রেটের ধোঁয়া আটকে যায়। কোনক্রমে কাশতে কাশতে বলে, হোয়াট? কী বকছেন পাগলের মতো? ওয়াইফের সঙ্গে আমার ঝগড়া হল কবে?

— না, তাই বলছি। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি আর কি। অর্থাৎ আপনাদের দাম্পত্য-জীবন নিয়ে আমার কৌতূহল জাগাটা ঠিক নয়। জাগলেও সেটা আমার দমন করা উচিত। ঠিক যেমন, আমার ক্লায়েন্টের নাম, সে কোথায় চাকরি করে এইসব বৃত্তান্ত...

— যাক মশাই। আপনাকে আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, আপনার মক্কেল কি কোনও হোমিসাইড কেস-এ ফেঁসেছে?

— কী কেস?

— হোমিসাইড? খুন? কাল রাত্রে এই মোটেলে এক ভদ্রলোক বেমক্কা খুন হয়ে গেছে। চীনে খাবারের সঙ্গে কেউ কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বেচারীকে ঘুম পাড়িয়েছে। তারপর দরজা-জানলা বন্ধ করে গ্যাস-স্টোভটা খুলে দিয়ে কেটে পড়েছে। পাশের ঘরের ভদ্রলোক গ্যাসের গন্ধ পেয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দেন। ওঁরা গ্যাস বন্ধ করে দরজা-জানলা সব খুলে দেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে!

— 'যা হবার হয়ে গেছে'! মানে?

— ঐ সাধুভাষায় যাকে বলে 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি' আর কি! তাই আপনাকে দেখেই আমার সন্দেহ হল, আমরা একই কেস-এ এসেছি নাকি? আপনি এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেই কোনও মক্কেলের স্বার্থে আসেননি তো?

বাসু বললেন, বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টর বরাট, মোটেলে যে একজন মানুষ খুন হয়েছে এ-কথা আপনার কাছে এইমাত্র শুনলাম। লোকটার পরিচয় জানা যায়নি?

— গেছে, নাম এবং ঠিকানা। লোকটির নাম সত্যানন্দ সেন। যা হোক, আপনি যখন অন্য কেস-এ এসেছেন তখন আর আপনাকে আটকাবো না।

কে বলবে ওঁর ষাট বছর বয়স! তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসেন চালকের আসনে। তৎক্ষণাৎ স্টার্ট দেন। লম্বা একটা চক্কর মেরে ফের ডায়মন্ড-হারবার রোড-এ। পিছন থেকে শোনা যায় সুজাতার কণ্ঠস্বর : গাড়িটা দাঁড় করান মামু। ও ফেইন্ট হয়ে গেছে।

পরপর দু'খানি গাড়ি ডায়মন্ড-হারবার রোডের পাশে দাঁড়ালো। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এল স্মরণিকার। পাথরের মূর্তির মতো সে বসে রইল পিছনের সীটে।

গাড়ি দু'খানি ফিরে এল যদু কলোনিতে। সুজাতার হাত ধরে, বস্তুত তার কাঁধে ভর দিয়েই, স্মরণিকা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুলল। চারজনেই বসলেন। বাসু বললেন, আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমি কয়েকটা কথা জেনে নিতে চাই...

কৌশিক উঠে গিয়ে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

— আমি তোমার কাছে সহজ সরল প্রত্যুত্তর শুনতে চাই স্মরণিকা। তুমি নিজেকে তৈরী করে নাও।

অসীম মনোবল মেয়েটির। বললে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কী জানতে চান, জিজ্ঞেস করুন।

— করছি। তার আগে বলি, তোমার-আমার কথোপকথন একটা বিশেষ জাতের। তুমি আমাকে কী বলেছ তা পুলিস জানতে চাইতে পারবে না। আদালত জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। কিন্তু সুজাতা বা কৌশিক তোমার কাউন্সেল নয়। ফলে, তুমি যদি চাও তাহলে ওদের চলে যেতে বলি।

— ওঁদের চলে যাবার কোন প্রয়েজন নেই।

— তোমার নেই। আমার আছে। তোমরা দুজন গাড়িতে গিয়ে বস।

বিনা বাক্যব্যয়ে ওরা দুজন ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। বাসু দরজাটা বন্ধ করে ওর দিকে ফিরে বললেন, তোমার জেঠুর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কোনও হাত আছে?

— কী বলছেন আপনি?

— আজেবাজে কথা বল না। 'ইয়েস' অর 'নো'?

— নিশ্চয় নেই। তাঁকে আমি বাবার মতো দেখতাম। তাঁর সেবা করতে আমি তো কোনদিন কার্পণ্য করিনি। ওরাই তো আমাকে জোর করে বিলেত পাঠিয়েছিল।

— তা ঠিক। কিন্তু কেসটা ক্রমে ক্রমে অনিবার্য ভাবে তোমার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। তোমার অজ্ঞাতসারেই। প্রথম কথা, তোমাদের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। উনি উইল করে — সুস্থ মস্তিষ্কে উইল করে — তোমাকে কিছু না দিয়ে গেলে তুমি এক কানাকড়িও পেতে পার না। তোমার জেঠুর বৈমাত্রেয় ভাই আদালতে আবেদন করেছে যে, তুমি ছলে-বলেকৌশলে সম্পত্তিটা গ্রাস করতে চাও। সওয়া লক্ষ টাকার চেকটা তারা প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেছে। এই অবস্থায় আদালত একজন কনজারভেটর নিযুক্ত করল। তোমার জেঠুকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। আর তুমি সেখান থেকে তাঁকে অপহরণ করে এনে তুললে একটা মোটেলে। পরদিন দেখা গেল তোমার কাছে একটা উইল, তাতে সত্যানন্দ সেন তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে যাচ্ছেন এবং তারপর চব্বিশ ঘণ্টা না কাটতেই তিনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। কী বলবে এবার?

স্মরণিকা কিছু বলতে গেল। পারল না। তার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল। দাঁতে দাঁত দিয়ে সে নির্বাক বসেই রইল।

— তুমি কাল তাঁকে চাইনীজ-ফুড এনে দিয়েছিলে?

জবাবটা জানা ছিল। দেখতে চাইলেন, ও স্বীকার করে কিনা। তাই করল।

— তোমার কাছে কোনও ওষুধ ছিল?

একটু দেরি হল জবাবটা দিতে। তারপর স্বীকার করল। বিলেত যাবার আগে স্মরণিকা সত্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। জেঠুর জনডিস-এ সেবা করতে করতে। ওর ঘুম হত না। তখন ডাক্তার ওকে ঘুমের ওষুধ দেন। রোজ রাত্রে খেতে বসার আগে সে একটা করে বড়ি খেত। ওর ভ্যানিটি ব্যাগেই ছিল তেমন ওষুধের একটা পাতা। কাল জেঠুকে খাবারটা দিয়ে ও যখন যদু কলোনিতে ফিরে যেতে চাইল তখন সত্যানন্দ বলেছিলেন, ঘুমের বড়ি ছাড়া তাঁর ঘুম আসে না। টুকু তাই ঐ এক পাতা ঘুমের ওষুধ ওঁকে দেয়। বলে, একটা বা দুটোর বেশি যেন তিনি না খান।

— কী ওষুধ? — জানতে চান বাসু।

— কাম্পোজ।

ঠিক তখনি দরজায় কে যেন সন্তর্পণে টোকা দিল। বাসু উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। সুজাতা আর কৌশিক প্রবেশ করল ঘরে। কৌশিক বললে, মামু, একটা কথা বলতে এলাম। ঐ কাগজখানার কথা গোনাগুনতি ঠিক পাঁচজনে জানতে পেরেছে। একজন মারা গেছেন। বাকি চারজনের মধ্যে আপনারা

দুজনে যদি সে-কথা ভুলে যেতে রাজি থাকেন এবং এখনি কাগজটা পুড়িয়ে ফেলেন তবে আমরাও তা ভুলে যাব। আমরা দুজন।

— ঐ উইলটা।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার মক্কেলের বিরুদ্ধে ঐটেই সবচেয়ে মারাত্মক এভিডেন্স। হত্যার মোটিভ!

বাসু ধীরে ধীরে দুদিকে মাথাটা নাড়লেন।

— কেন নয়? আর তো কেউ জানে না?

— তা জানে না। কিন্তু তাতে আমি রাজি হতে পারি না। দুটি কারণে। দুটি নয়, তিনটি কারণে। এক নম্বর, প্রফেশনাল এথিক্সে আমি সজ্ঞানে কোন এভিডেন্স নষ্ট করতে পারি না। দু নম্বর, তুমি একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিটেকটিভ। তোমাকেও প্রফেশনাল কারণে এ-কাজে বাধা দেওয়া আমার উচিত। আর সবচেয়ে বড় হেতু — আমি চিরকাল দেখেছি কৌশিক, 'সত্য' — নিছক 'সত্য' হচ্ছে আইনজীবীর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আমরা, উকিলেরা — এটা বিশ্বাস করি না। তাই অর্ধসত্য নিয়ে লড়তে যাই, আর হারি। দোষ দিই অদৃষ্টকে!

ঠিক তখনই বাইরে থেকে কে যেন কড়া হাতে কড়া নাড়ল।

কৌশিক দরজার ছিটকিনিটা সরিয়ে দিল।

ঘরে প্রবেশ করল ইন্সপেক্টর বরাট আর তার সহকারী রবি বসু।

খোলা দরজার মাঝখানে পাথরের মূর্তির মতো ইন্সপেক্টার বরাট দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর গলাটা সাফা করে বলল, এখানেও আপনি?

রবি পরিচয় করিয়ে দিতে যায়, উনি, মানে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু—

বরাট ধমকে ওঠে, থাম তুমি! মাসির কাছে মেসোর কিস্‌সা! আধঘণ্টা আগেই ওঁর সঙ্গে মুলাকাৎ হয়েছে।

তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, একই প্রশ্ন আবার করছি ব্যারিস্টার সাহেব, সাতসকালে এখানে কী মনে করে?

— একই জবাব, মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বরাট ঘরের বাকি তিনজনকে একনজর দেখে নিয়ে বলল, আপনার মক্কেলদের নাম যদি এই ঠিকানার স্মরণিকা দত্ত ওরফে স্মরণিকা সেন হয়, তাহলে তাঁর সত্যিই একজন সলিসিটরের প্রয়োজন। ইনিই কি স্মরণিকা দেবী?

— হ্যাঁ, তাই। কেন?

— তাহলে আমি দুঃখিত, ওঁকে অ্যারেস্ট করতে হবে আমাকে।

— অ্যারেস্ট! কেন? কীসের চার্জ-এ?

— সত্যানন্দ সেন-এর হত্যাপরাধে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল কেন সাতসকালে জি. জি. সি. এল. ক্যাম্পাসে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর শুভাগমন ঘটেছিল।

বাসু টুকুর দিকে ফিরে বললেন, সে-ক্ষেত্রে তুমি থানায় গিয়ে কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না, টুকু। আমার অনুপস্থিতিতে। এমন কি আজকে কী বার, এখন কটা বেজেছে তাও নয়! বুঝলে? ভারতীয় সংবিধান...

— জাস্ট এ মিনিট, জাস্ট এ মিনিট ব্যারিস্টার-সাহেব। আমি এখনি আপনার মক্কেলকে অ্যারেস্ট করছি না। ওঁর কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেবার আছে। আপনার আপত্তি নেই তো?

— আছে এবং নেই। আপনি যখন ইতিপূর্বেই জানিয়েছেন যে স্মরণিকাকে ঐ হত্যাপরাধে অ্যারেস্ট করতে পারেন তখন আমার মক্কেল হয়তো সব প্রশ্নের জবাব দেবে না। অন্তত যে প্রশ্নের জবাব দিতে আমি নিষেধ করব সে প্রশ্নের জবাব ও দেবে না। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন...

বরাট গুছিয়ে বসল। ইন্সপেক্টার রবি বোস বয়সে এবং সিনিয়ারিটিতে বরাটের জুনিয়ার। তাছাড়া

বাসু-সাহেবকে সে শ্রদ্ধা করে (হেতুটা 'ঘড়ির-কাঁটা'য় প্রাপ্তব্য) ; তাই বাসু-সাহেব যখন দাঁড়িয়ে আছেন, তখন সেও সোফায় বসল না।

বরাট স্মরণিকাকে প্রশ্ন করে, গতকাল সকালে আপনি জি. জি. সি. এল. কমপ্লেক্সের মোটেলে তিন-নম্বর ঘরটা নিজ নামে বুক করেন?

স্মরণিকা বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে, আপত্তির কোন লক্ষণ না দেখে বলে, করি।

— তার মানে ওদের রেজিস্টারে 'স্মরণিকা সেন'এর স্বাক্ষর আপনার?

— হ্যাঁ, তাই।

— সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি আপনার...আই মীন, তাঁকে আপনি ছেলেবেলা থেকে জেঠু নামে ডেকে এসেছেন? তিনি সত্যানন্দ সেন?

টুকু নজর করে দেখল বাসু-সাহেবের মুণ্ডুটা গ্র্যান্ড-ফাদার-ক্লকের পেন্ডুলামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মাথাটা দুদিকে দুলছে।

বললে, জবাব দেব না।

— কাল রাত্রে আপনি আপনার জেঠুকে কিছু চাইনীজ ফুড কিনে এনে দিয়েছিলেন, ঐ সংলগ্ন রেস্তোরাঁ থেকে?

টুকু বাসু-সাহেবের দিকে দেখে নিয়ে বলল, জবাব দেব না।

বরাট বলল, এ-সব কথা অস্বীকার করে কী লাভ স্মরণিকা দেবী? জেঠুর জন্য দোকান থেকে খাবার কিনে আনা তো কোনও অপরাধ নয়; তাছাড়া চীনে-দোকানের সেল্‌স্‌-কাউন্টারে মেয়েটি তো আপনাকে সনাক্ত করবেই। মাত্র কাল রাত্রের ঘটনা। ফলে এসব সত্য-কথা চেপে যাওয়ায় আপনার অপরাধ-প্রবণ মনের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠছে না কি?

টুকু তার উকিলের দিকে একনজর দেখে নিয়ে নীরব রইল।

বরাট উঠে দাঁড়াল। বাসুর দিকে ফিরে বলল, আপনি কি আপনার মক্কেলকে নিয়ে অনুগ্রহ করে অকুস্থলে একবার আসতে পারেন?

বাসু বললেন, পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু আপনার যদি উদ্দেশ্য হয়, সেই চীনা-দোকানের সেল্‌স্‌-কাউন্টারের মেয়েটিকে দিয়ে ওকে সনাক্তকরণের চেষ্টা, তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি। ওভাবে পুলিস-কেস-এ আইডেন্টিফিকেশন হয় না, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি।

রবি বোস এবার কথা বলে ওঠে, না স্যার। মিস সেনকে দিয়ে আমরা ডেড বডিটা সনাক্ত করাতে চাই? তাতেও কি আপনার আপত্তি?

বাসু সিনিয়ার অফিসার বরাটের দিকে ফিরে বললেন, তার আগে আমরা জানতে চাই মৃতদেহটা কখন আবিষ্কৃত হয়েছে, আর মৃতের নাম যে সত্যানন্দ সেন তো কেমন করে জানা গেছে।

বরাট আপত্তি করল না। রবি বসুর দিকে ফিরে বলল, তুমিই বল, বাসু।

শোনা গেল, মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছে গতকাল রাত পৌনে এগারোটার সময়। মোটেলের দুই-নম্বর ইউনিটের আবাসিক প্রবীর ঘোষাল নৈশাহারের সন্ধানে সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় গেছিলেন। তিনি শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। জি. জি. সি. এল.-এর সাপ্লায়ার। গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। রাতটা এখানে কাটিয়ে যেতে চাইলেন। নৈশাহার সেরে ফিরে এসে তাঁর মনে হল পাশের ঘর থেকে গ্যাস-লীকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি মোটেলের ম্যানেজারকে খবর দেন। ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে ঘর খুলে ওঁরা দেখেন, তিন-নম্বর ঘরের আবাসিক জুতো-জামা পরে খাটে শ্বাসবন্ধ হয়ে পড়ে আছেন। দরজা-জানলা খুলে দেওয়া হয়। একটা টেবিল ফ্যান এনে ঘরের দূষিত বাতাস বিতাড়নের চেষ্টা হয়। ডাক্তার আসেন। তিনি ঐ তিন-নম্বর ঘরের আবাসিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ আসে রাত বারোটায়। দেখা যায়, তিন-নম্বর ঘরটি তাঁর 'আঙ্কেল'এর জন্য বুক করেছেন মিস স্মরণিকা সেন, গতকাল সকাল ছয়টায়।

গাড়ির নম্বর W B F 9852। অ্যাম্বাসাডার। মোটেল-ম্যানেজারের বিবৃতি অনুসারে ঝক্‌ঝকে রঙ করা। গাড়িটা গ্যারেজে ছিল না। পুলিশ অত রাত্রে কিছুই করতে পারে না। ঘরটা সীল করে দিয়ে চলে যায়, একজন পাহারাদারকে বসিয়ে। পরদিন, অর্থাৎ আজ ভোর বেলা, পুলিশ আবার আসে। পুলিশ-ফটোগ্রাফার ফটো নেয়। স্মরণিকা সেন-এর সন্ধান পাওয়া যায় না, গাড়িখানাও না-পাত্তা। তবে তল্লাসী করে দেখা যায়, মৃতের ব্রীফকেস-এ একটা লেটারহেড প্যাড আছে। তা থেকেই জানা যায় , মৃতের নাম সত্যানন্দ সেন। তিনি নিউ আলিপুরের বাসিন্দা। লেটার-হেডে তাঁর বাড়ির ফোন-নাম্বারও ছিল। বরাট ফোন করে। ফোন ধরেন এক ভদ্রমহিলা। তিনি নাকি ঐ সত্যানন্দ সেনের ভাইয়ের স্ত্রী। ভাই বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ। শয্যাশায়ী। তাই ঐ মহিলাই সব কথা বললেন। জানালেন যে, সত্যানন্দ মানসিকভাবে অসুস্থ। একটা মেন্টাল-হোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। পুলিশে ডায়েরি করা হয়েছে। টি. ভি.-তে নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে প্রচারও হয়েছে। ঐ ভদ্রমহিলাই যদু কলোনির এই ঠিকানাটা সরবরাহ করেন এবং জানান যে, এই ঠিকানায় শ্রীস্মরণিকা সেন ওরফে দত্ত থাকেন — যাঁর বিরুদ্ধে সত্যানন্দের সম্পত্তি গ্রাসের বিষয়ে মামলা নাকি আদালতে ঝুলছে। তিনি সত্যানন্দ সেনকে চেনেন। দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে রবি বলে, মৃতদেহটি মর্গে অপসারণের জন্য ওখানেই পড়ে আছে। অ্যাম্বুলেন্সও এসেছে। কিন্তু মৃতদেহ রিম্যুভ করার আগে কেউ 'আইডেন্টিফাই' করলে ভাল হয়। এ তো বেওয়ারিশ মড়া নয়। আপনি কি মিস্ সেনকে নিয়ে...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, সত্যানন্দের ঐ বৈমাত্রেয় ভাই বা তার স্ত্রী এসে কেন মৃতদেহ সনাক্ত করছেন না? নিকটতম আত্মীয় বলে সম্পত্তিটা তো ওরাই দখল করতে চায়?

বরাট বলে, অত বিস্তারিত আমি জানি না, ব্যারিস্টার সাহেব। অন্তত এই স্টেজে। ঐ ভদ্রমহিলা টেলিফোনে বললেন যে, তাঁর স্বামী — মানে মৃতের বৈমাত্রেয় ভাই, অসুস্থ — অ্যাকুট ডায়েরিয়া — আর উনি নিজে নার্স, শুশ্রূষা করছেন। তাই ওঁরা আসতে পারছেন না...

— ও বাড়িতে আরও একজন তো আছে: বিলাসসিং যাদব। সে মিস্টার সেনকে বিলক্ষণ চেনে। তাহলে সে কেন আসছে না?

বরাট বললে, মিস্টার বাসু, বিলাসসিং যাদবের নাম আমি জীবনে প্রথম শুনলাম। সে ও-বাড়িতে আছে কিনা, থাকলে সে আসতে পারবে কিনা, তা আমার জানা নেই। কিন্তু আপনার মক্কেল কেন মৃতদেহটা সনাক্ত করতে পারবেন না সেটা জানতে পারি কি?

— অল রাইট! লেট্‌স গো!

আবার ডায়মন্ড-হারবার রোডে গাড়ির প্রসেশান। এবার তিনখানা। সবার আগে পাইলট-কার : পুলিশের জীপ। তার পিছনে বাসু-সাহেবের গাড়ি। তার পিছনের সীটে সুজাতা আর স্মরণিকা। সবার পিছনে কৌশিকের গাড়ি। মোটেলের সামনে সার দিয়ে গাড়িগুলো দাঁড়ালো। কৌতূহলী জনতার ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। দুজন কন্সটেবল আর কারখানার সিকিউরিটি-ম্যান দাঁড়িয়ে আছে। মোটেলের পিছনদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা অ্যাম্বুলেন্স।

ওঁরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে আসতেই মোটেল থেকে এগিয়ে এল ম্যানেজার আর অদূরের রেস্তোরাঁ থেকেও কেউ কেউ। তাদের ভিতর একটি মেয়ে — চীনা-রক্ত থাকতে পারে ধমনীতে, চ্যাপটা মুখ, হনুজোড়া অ্যাম্বিশাস — স্মরণিকার দিকে তর্জনী তুলে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বলে ওঠে, শী ইজ দ্য ওমান! বরাট তাকে ধমক দেয়, ডোন্ট টক্ ননসেন্স! দিস্ ইজ নট যোর টাইম!

মেয়েটি থমকে যায়। বাসু-সাহেব রবির দিকে ফিরে বললেন, দেখলে তো? এই জন্যেই আমার আপত্তি ছিল। তোমার সিনিয়ার পার্টনার কায়দা করে ঐ চীনা মেয়েটিকে আর একবার দেখিয়ে দিল, যাতে আইডেন্টিফিকেশনের সময় সে এই মেয়েটিকেই সনাক্ত করে!

রবি বোস কী বলবে ভেবে পায় না। বরাট এ মন্তব্য শুনতে না পাওয়ার ভান করল। সে পথ দেখিয়ে ওঁদের এগিয়ে নিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সটার দিকে। তার ওপারে, জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে একটি

স্ট্রেচার মাটিতে নামানো। তার উপরে একটি মৃতদেহ। আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা। বরাট অতিরিক্ত বিনয় দেখিয়ে বললে, আসুন স্যার, এই যে এইদিকে...

সুজাতা টুকুর কানে কানে বলেল, মনকে শক্ত কর টুকু। ভেঙে পড়লে চলবে না। জেঠুকে সনাক্ত করেই পেছিয়ে আসবে। কোন বাড়তি কথা বলবে না। ভয় নেই, আমি ধরে থাকব তোমাকে।

ওঁরা মৃতদেহের কাছে এগিয়ে গেলেন। বরাট স্ট্রেচারের ও-পারে চলে গেল। স্মরণিকা সবার আগে, তার বাহুমূল দৃঢ়ভাবে ধরে পাশেই দাঁড়িয়েছে সুজাতা। ঠিক পিছনেই বাসু-সাহেব, কৌশিক আর রবি। ম্যাজিশিয়ান যে কায়দায় কাপড়ের ঢাকা সরায় তেমনি ক্ষিপ্রহাতে বরাট মৃতদেহের সাদা চাদরটা সরিয়ে নিল।

টুকু একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। তারপরেই সে বলে উঠল : এ কে? এ কে?

— 'এ কে' মানে? তোমার জেঠু সত্যানন্দ সেন নন? জানতে চাইল বরাট। বাসু ঝুঁকে পড়লেন। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ নিশ্চয় নয়, মৃতের বয়স ষাটের কম।

টুকু বলে ওঠে, না-না-না। এ তো বিলাসসিং যাদব।

বাসু স্বগতোক্তি করে ওঠেন : গুড় গড়!

বরাট ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে : বিলাসসিং যাদব? সে কে? নামটা কোথায় শুনেছি!

— চৌবে কাকুর বন্ধু। — কোনক্রমে বলল টুকু।

— তিনিই বা কে। ঐ চৌবে-কাকু?

টুকু এ-পাশে ফিরল। সুজাতাকে বললে, এখান থেকে সরে চলুন। আমার কেমন যেন গা-গুলাচ্ছে।

রবি ওদের পথ করে দিল। বাসু বললেন, লুক হিয়ার, মিস্টার বরাট! যে মারা গেছে তার নাম বিলাস-সিং যাদব। আমার মক্কেল তাকে আইডিন্টিফাই করেছে। বলেছে, সে তার চৌবে-কাকুর বন্ধু। চৌবে হচ্ছেন সেই ভদ্রলোক, যাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আপনি টেলিফোনে কথা বলেছেন।

— ঐ বিলাস সিং এখানে, এই তিন-নম্বরে এল কেমন করে?

— আপনি কাকে ঐ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছেন মিস্টার বরাট? আমাকে, না আমার মক্কেলকে — নাকি নিজেকেই?

বরাট বোধহয় শুনতে পেল না। আপন মনে বললে, আর তাহলে সত্যানন্দ সেন কোথায়?

বাসু এবার সে-কথার জবাব দিলেন না। বললেন, আমরা ফিরে যাচ্ছি যে-যার বাড়িতে। আশা করি আমাদের কাজ শেষ হয়েছে!

বরাটের হঠাৎ কী খেয়াল হয়েছে, সে হন্তদন্ত হয়ে মোটেলের দিকে এগিয়ে গেল। রবি বোস তখন স্মরণিকাকে বললে, ঠিক আছে, আপনি বাড়ি যেতে পারেন। তবে দু-তিন দিন কলকাতার বাইরে যাবেন না! আপনাকে যেন খোঁজ করলে পাই।

স্মরণিকা বলে, তার মানে? কী বলতে চাইছেন? কেন?

রবি সপ্রতিভাবে বললে, আপনার জেঠু, সত্যানন্দ সেন কোথায় আছেন তা জানেন?

— না।

— আপনি মোটেলে চেক-ইন করেছিলেন, অফিশিয়ালি চেক-আউট করেননি কিন্তু। ওদের রেজিস্টারে সই দিয়ে যাবেন।

স্মরণিকা বললে, সই দিইনি, কিন্তু ঘরটা ভেকেন্ট করে দিয়েছি।

— কারেক্ট! গ্যারেজটাও! জেঠু কোথায় তা তো জানেন না, কিন্তু জেঠুর গাড়িটা? W. B. F. 9852? যেটা ড্রাইভ করে আপনি চেক-ইন করেন।

টুকু বাসু-সাহেবের দিকে তাকায়। বাসু বললেন, তোমার যদি জানা থাকে তবে পুলিসকে বলে দাও। ওদের সঙ্গে সব সময়েই সহযোগিতা করতে হবে।

স্মরণিকা বললে, যদু কলোনির কাছে ডায়মন্ড-হারবার রোডের উপর নিহাল সিং-এর রিপেয়ার গ্যারেজে। গীতার বাড়িতে গ্যারেজ নেই বলে আমি সিংজীর সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি। রাতে গাড়িটা ওখানে

থাকে।

— ও. কে.! চাবিটা?

— সেটাও সিংজীর কাছে।

— ঠিক আছে। গাড়িটা আমরা 'সীজ' করছি।

এবার বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, আপনারা যেতে পারেন, স্যার। আপনার মক্কেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নেই, কিন্তু তিনি কখন কোথায় থাকছেন তা যেন আপনাকে জানিয়ে রাখেন। প্রয়োজনে যেন তাঁকে পাওয়া যায়।

— কেন বল তো বাপু? তোমরা কি ওকেই সন্দেহ করছ?

রবি হাসল। বলল, আপনাকে আর আমি কী বোঝাব, স্যার? আপনি নিজেই জানেন যে, আপনার মক্কেল সন্দেহের অতীত নন। আইনের চোখে ঐ অ্যাম্বাসাডার গাড়িখানা চোরাই মাল, আইনের চোখে সত্যানন্দ বে-আইনি চোরা-পথে হাসপাতাল থেকে অপহৃত হয়েছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমি দেখতে পাচ্ছি এবং আপনি নিশ্চয় তা আরও ভালভাবে পাচ্ছেন : সত্যানন্দ সেন নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় আপনার মক্কেল এবারেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছেন না। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বলেছি, "এবারেও।" ঠিক গতবারের মতো! নয় কি? গোটা কেসটা যে আমার জানা, স্যার!

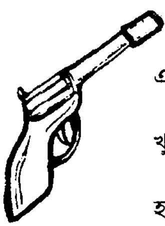

এগারো

— ইন্সপেক্টার বরাট যখন মৃতের মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিচ্ছিল তখন তুমি খুব নার্ভাস ফীল করছিলে, না টুকু?

— ঠিক নার্ভাস নয় সুজাতাদি, একটা মিশ্রিত অনুভূতি। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল কোথাও একটা কিছু ভুল হয়েছে। মৃত লোকটা জেঠু নয়, হতে পারে না।

— কেন? কেন এমন মনে হল?

ওরা কথা বলছিল গাড়ির পিছনের সীটে। ফেরার পথে। ড্রাইভারের আসনে বাসু-সাহেব ব্যাক-ভিয়ু-মিররটা একটু সরিয়ে-নড়িয়ে দিলেন, যাতে স্মরণিকার মুখখানা দেখা যায়। কৌশিক তার গাড়ি নিয়ে ঐ জি. জি. সি. এল. ক্যাম্পাসে রয়ে গেছে। পুলিশ তদন্তের পরে পরিস্থিতিটা সমঝে নিতে। সম্ভব হলে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে। টুকু বলল, আমার প্রথম খটকা লাগে ঐ ব্রীফ-কেস-এর কথাটায়। তারপর জেঠুর লেটার-হেডের খবরটায়।

বাসু অস্ফুটে আপন মনে একটা স্বগতোক্তি করেন : এক্সেলেন্ট!

পিছনের আসনে কথোপকথনরত ওদের তা কানে যায় না।

সুজাতা জানতে চায়, কেন?

— আমি জেঠুকে হাসপাতাল থেকে সরাসরি ঐ মোটেলে অপসারণ করি। তখন তাঁর কাছে কিছু ছিল না — স্রেফ খালি-হাত। ওঁকে ঘরে রেখে পই-পই করে বারণ করে দিয়ে যাই, যাতে উনি ঘরের বাইরে না আসেন। খাবার আর পানীয় জল ওঁর নাগালের মধ্যে রেখে দিয়ে আসি। আদালতে আসার পথে গ্রিন্ডলেজ-ব্যাঙ্ক থেকে ঐ ব্যাঙ্ক-ড্রাফটগুলো ক্যাশ করে নিই। আবার আদালত থেকে ফেরার পথে এই লোকাল মার্কেট থেকেই ওঁর জন্য কিছু সওদা করি : শেভিং সেট, মাথার তেল, টুথব্রাশ, পেস্ট, একটা গেঞ্জি, পাজামা-টি-শার্ট। আর কিনে আনি চীনে-খাবার। চাও মিঙ আর চিলি-চিকেন জেঠুর প্রিয় খাবার। উনি চাইছিলেন আমরা দুজনে খাবারটা ভাগ করে খাই। আমি রাজি হইনি। বেশি রাত্রে একা ডায়মন্ড-হারবার রোডে ড্রাইভ করতে সাহস হচ্ছিল না। তাই একটা কার্টনে অর্ধেকটা খাবার তুলে নিয়ে আমি যদু কলোনিতে ফিরে আসি। সুতরাং ওঁর ঘরে ব্রীফ-কেস কেমন করে আসবে? আর আমার

অজ্ঞাতসারে সারাদিনে কেউ যদি এসে থাকে, ভুলে একটা ব্রীফ-কেস ফেলে গিয়ে থাকে, তাহলে তার ভিতর জেঠুর লেটার-হেড প্যাড আসবে কেমন করে?

বাসু-সাহেব গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে দাঁড় করালেন।

সুজাতা জানতে চায়, কী হল? ইঞ্জিনে কিছু ট্রাব্‌ল্ দিচ্ছে?

— দিচ্ছে। গাড়ির এঞ্জিনে নয়, আমার মাথার ভিতর। এই মওকায় টুকুকে কয়েকটা প্রশ্ন করে নিতে চাই। তুমি এক কাজ কর তো সুজাতা : সামনের ঐ পাঞ্জাবী হোটেলে বলে এস, তিন-পেয়ালা চা এই গাড়িতে পাঠিয়ে দিতে। 'স্পেশাল চায়ে'।

সুজাতা বুঝতে পারে, চা-তৃষ্ণা জেগেছে বলে নয়, উনি টুকুকে এমন কিছু প্রশ্ন করতে চান, যা 'প্রিভিলেজড কন্‌ভার্সেশন', যা তৃতীয় ব্যক্তির শোনা বারণ। বিনা বাক্যব্যয়ে সে এগিয়ে যায় হোটেলটার দিকে।

— এবার সংক্ষেপে বল তো টুকু, হাসপাতাল থেকে রওনা হবার পর ঠিক কী কী ঘটেছে? আমি বুঝে নিতে চাই, ঐ বিলাসসিং যাদব কেমন করে তোমার পাত্তা পেল। তোমাকে কি ঐ হাসপাতাল থেকে কেউ ফলো করছিল?

— করে থাকলে তা আমি টের পাইনি। আমি যখন হাসপাতাল থেকে বের হই তখন সবে সূর্য উঠছে। লোকজনের চলা-ফেরা শুরু হয়নি। দারোয়ান গেট-এ ছিল না। হাসপাতাল থেকে গাড়িটা বেশ কিছুটা দূরে পার্ক করেছিলাম — ধরুন একশ গজ। এটুকু পথ জেঠু আমার হাত ধরে হেঁটেই চলে এলেন। ত্রিসীমানায় অন্য গাড়ি পার্ক করা ছিল না। মোটেলটার অবস্থান আমার জানা ছিল। সেখানে এসে যখন পৌঁছলাম তখনো বেশ সকাল। তিন-নম্বর ঘরখানা নিজের নামে বুক করি। জেঠুকে নিয়ে ঘরে উঠে যাই। ওদের মোটেল-ঘরে রান্নাবান্নার কোনও আয়োজন নেই। মানে 'কিচেনেট' নেই। এক কেটলি জলও গরম করে নেবার ব্যবস্থা নেই। একটা প্লাগ-পয়েন্ট অবশ্য আছে। তাই ঐ রেস্তোরাঁতে চা আর খাবারের অর্ডার দিয়ে আসি। ওরা মোটেলে সার্ভ করে, সার্ভিস চার্জ নিয়ে। বাথরুমে সাবান, তোয়ালে, গীজার আছে। আমি জেঠুকে স্নান করিয়ে দিই। স্নানান্তে আবার সেই একই পোশাক পরতে হয় তাঁকে। আমি নিজেও স্নান করে নিই গরমজলে। ততক্ষণে জেঠু বেশ স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছেন। ওঁকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে যাওয়াটা অমানুষিকতা। কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যায় টি. ভি.-তে ওঁকে 'নিরুদ্দিষ্ট মানুষ' হিসাবে দেখানো হয়েছে। তাই জেঠুকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করি। তিনি বুঝতে পারেন এবং আমাকে কথা দেন সারাটা দিন উনি ঘরের বাইরে আসবেন না। রেস্তোরাঁ থেকে কিছু চিকেন-স্যান্ডুইচ, সিদ্ধ ডিম আর এক গ্লাস দুধ এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখলাম। বললাম, দুপুরে তাই খেতে। আমার ভ্যানিটি-ব্যাগে একটা পেপার-ব্যাক থ্রিলার ছিল, সেটা ওঁকে পড়তে দিয়ে গেলাম। আর ওঁর কোটের ইনসাইড পকেটে আপনার দেওয়া টাকাও ভরে দিলাম...

— এটা কেন করলে টুকু? ওঁর শারীরিক আর মানসিক যা অবস্থা...

— দুটো কারণে করলাম, মেসোমশাই। একটা সাইকলজিকাল, একটা প্রাকটিকাল। জেঠুকে তো জন্ম থেকে চিনি। 'রেডি ক্যাশ' না থাকলে তিনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন। আমাদের স্টিল-আলমারিতে সব সময় পাঁচ-সাত হাজার টাকা নগদে থাকত। এমনকি দশ-বারো বছর আগে, যখন দেড়-দু-হাজারে গোটা সংসারযাত্রা নির্বাহ হত। তাছাড়া ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্টে সব সময় থাকে লাখ-টাকার উপর। অকারণে। স্বল্পমেয়াদী আমানত করাতেও ওঁর মত হত না। তাই আমার মনে হল, পকেটে টাকা থাকলে সারাটা দিনে উনি মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন। দ্বিতীয় কথা, আমার আশঙ্কা ছিল যে-কোন সময় আমাকে পুলিশে ধরতে পারে — কল্যাণী দাসীর ছদ্মবেশে জেঠুকে অপহরণ করার অপরাধে। সেক্ষেত্রে ওঁর কাছে টাকা না থাকলে উনি কেমন করে আত্মরক্ষা করবেন? তাই আদালতে যাবার আগেই ওঁকে টাকাটা দিয়ে গেলাম...

— বুঝলাম। যা হোক, এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বিলাস সিং যাদব তোমার গতিবিধির উপর নজর

রেখেছিল। ঠিক কোন স্টেজ থেকে জানি না, কিন্তু সে আন্দাজ করেছিল — যেটা আমিও করিনি — তুমি ওঁকে অপহরণ করবে। ফলে তোমার অজ্ঞাতসারে সে তোমাকে অনুসরণ করে। তুমি তিন-নম্বর কামরা বুক করার পর সে দুই-নম্বর ঘরখানা বুক করে।

— সেক্ষেত্রে ওরা পুলিসে খবর দিয়ে জেঠুকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করল না কেন?

— 'ওরা' মানে?

— ঐ বিলাসসিং আর চৌবে-কাকু?

— তুমি ধরে নিচ্ছ কেন যে, বিলাসসিং ঐ চৌবে-কাকুর জ্ঞাতসারে এখানে এসেছিল? মোটেল-ম্যানেজার প্রাথমিক এজাহারে বলেছে, বিলাসসিং যাদব যে গাড়িখানা নিয়ে এসেছিল সেটা অ্যাম্বাসাডার। অর্থাৎ চৌবের 'স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড' নয়। সে স্বনামে ঘরটা বুক করেনি ; কিন্তু অ্যাম্বাসাডার গাড়িটার নম্বর গোপন করতে পারেনি : WBC 0732। কৌশিককে বলেছি, রেজিস্ট্রেশন কার নামে তার পাত্তা নিতে। সে যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে বিলাসসিং তার ব্রীফ কেস-এ সেন-মশায়ের লেটার-হেড প্যাডটা নিয়ে এসেছিল। সম্ভবত তাঁকে দিয়ে জোর করে কিছু লিখিয়ে নিতে। ভয় দেখিয়ে। সেই লেটার-হেড প্যাডের সূত্র ধরেই পুলিস ধরে নিয়েছিল মৃতের নাম সত্যানন্দ সেন। আর বিলাসসিং যাদবের নামটা ইন্সপেক্টর বরাট আগে কখনো শোনেনি ; কারণ ব্ল্যাকমেলার বিলাসসিং ঘরটা 'বুক' করে ছদ্মনামে। এ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। এখন আমাদের দুটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে হবে। প্রথম সম্ভাবনা : ধনঞ্জয় চৌবে কোনক্রমে চোরের উপর বাটপাড়ি করতে পেরেছে। তা যদি করে থাকে, অর্থাৎ চৌবে যদি সত্যানন্দকে এখান থেকে অপহরণ করে থাকে, তাহলে আমাদের সমূহ সর্বনাশ। কারণ আবার তাহলে ঐ বিষৌষধ আর ইনজেকশন চলতে থাকবে, যতদিন না সত্যানন্দ একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান। তখন ওরা তাঁকে পথে ছেড়ে দেবে। পুলিসে তাঁকে উদ্ধার করলেও আর জানা যাবে না, কী-ভাবে তিনি বদ্ধ উন্মাদ...

কথার মাঝপথেই থেমে পড়েন বাসু-সাহেব। দেখেন, আঁচলে মুখ লুকিয়ে টুকু নিঃশব্দে কাঁদছে। শব্দ হচ্ছে না, কিন্তু ওর পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠছে। বাসু ড্রাইভারের সীট থেকে একটা হাত ওর পিঠে রাখলেন। বললেন, মনকে শক্ত কর, টুকু। উই মাস্ট ফাইট ব্যাক্‌। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাস্তবে তা ঘটেনি। ঘটতে পারে না...

অশ্রুআর্দ্র মুখখানা তুলে টুকু প্রশ্ন করে, কেন?

— কারণ ব্যাপারটা চৌবের কাছে এত সহজ হত না। প্রথমবার চৌবে আর যাদব যৌথভাবে ওঁকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিল। এবার তা নয়। ওরা দুজন দু-পক্ষে। সত্যানন্দও এবার দৃঢ় প্রতিবাদ করতেন। দৈহিক ক্ষমতায় না হলেও চিৎকার-চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করার ক্ষমতা তাঁর নিশ্চয় ছিল। ছিল না?

— তা ছিল। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা?

— দ্বিতীয় সম্ভাবনা, তোমার জেঠু স্বেচ্ছায় মোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

— কিন্তু কেন? তিনি তো জানতেন, আমি ফিরে আসব?

টুকুর চোখে চোখ রেখে উনি বলেন, তার একমাত্র সম্ভাব্য হেতু : সত্যানন্দ সেনই বিলাস সিং যাদবকে হত্যা করেছেন...

— তা কেমন করে সম্ভব? জেঠু বৃদ্ধ, বিলাস...

— লুক হিয়ার! বাস্তবে কী ঘটেছে তা তুমিও জান না, আমিও জানি না। ধর, ঘটনা যদি এইখাতে বয়ে থাকে? বিলাসসিং আন্দাজ করেছিল যে তুমি জেঠুকে অপহরণ করবে। ধরা যাক, তুমি যখন কল্যাণী দাসী সেজে ওখানে চাকরির সন্ধানে যাও তখন বিলাস ছিল ঐ সতের নম্বর কেবিনে। সে সেখান থেকে তোমাকে দেখতে পায়। বুঝতে পারে তোমার উদ্দেশ্য। বস্তুত সেও চাইছিল সত্যানন্দকে অপহরণ করতে। চৌবের স্বার্থে, নিজেরও — যাতে ডক্টর কৈলাশনাথ তোমার জেঠুকে পরীক্ষা করতে না

পারেন। যখন সে দেখল যে, তাদের কাম্য কাজটুকু তুমিই করে দিতে প্রস্তুত তখন সে খুশিই হল। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খেলে তার আপত্তি নেই। বিলাস মনস্থ করল খবরটা চৌবের কাছে গোপন রাখবে। সত্যানন্দের কাছ থেকে মোটা হারে ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকা নিতে থাকবে। ধরা যাক, শান্তিনীড়ের দারোয়ানকে সে টাকা দিয়ে রাজি করালো। তাই তুমি যখন তোমার জেঠুকে নিয়ে পালিয়ে আস তখন দারোয়ান গেট-এ ছিল না। বিলাস সিং ছিল তোমার অপহরণ প্রতীক্ষায়, তোমার অলক্ষ্যে! হল? এ পর্যন্ত কোনও অসঙ্গতি কি তোমার নজরে পড়েছে?

— আজ্ঞে না। এমন হওয়া অসম্ভব নয়।

— তুমি সকাল সাতটায় মোটেলের তিন নম্বর ঘরটা 'বুক' করলে। ধরা যাক, ঠিক তার পরেই বিলাসসিং ছদ্মনামে 'বুক' করল ঠিক পাশের ঘরখানা। দিনের বেলা বহু লোকজনের যাতায়াত। সে সুযোগের অপেক্ষায় সারাটা দিনমান নিজের ঘরেই স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকল। এমনকি রেস্তোরাঁয় খেতে পর্যন্ত গেল না। পাছে তোমার বা তোমার জেঠুর মুখোমুখি পড়ে যায়। তারপর তুমি রাত আটটা নাগাদ চাইনীজ ফুড রেখে যদু কলোনিতে ফিরে যাবার পর বিলাস এ-ঘরে এসে 'নক্' করল। তুমিই ফিরে এসেছ মনে করে সত্যানন্দ দরজা খুললেন। ঘরের ভিতরে এল বিলাস...বল, ঘটনা যদি এই খাতে বয়ে থাকে তাহলে কী হতে পারে?

— আপনিই আন্দাজ করুন।

— বিলাস আদৌ চৌবের বন্ধু নয়। সে ধানবাদ থেকে কলকাতা এসেছে টাকার লোভে। ধনঞ্জয়কে শোষণ করতে। ধরা যাক, সে তোমার জেঠুকে বলল, নগদ এক লক্ষ টাকা পেলে সে ধনঞ্জয়কে খবরটা জানাবে না। নাহলে সে পুলিসে খবরটা জানিয়ে দেবে। পুলিস আবার ওঁকে ধরে নিয়ে যাবে সেই শান্তিনীড়ে। ধরা যাক, সত্যানন্দ বললেন, তাঁর কাছে নগদ টাকা নেই, চেকও তিনি কাটতে পারছেন না আদালতের আদেশে। তাহলে কীভাবে তিনি টাকাটা দেবেন? এইসব কথাবার্তার সময় হঠাৎ বিলাস-এর নজর পড়ল খাবারের প্যাকেটটার দিকে। অথবা সে হয়তো লুকিয়ে দেখেছিল তোমাকে দোকান থেকে চাইনীজ খাবারের প্যাকেটটা আনতে। সে অভুক্ত, ঘরের ভিতর সারাটা দিনমান আত্মগোপন করে আছে। এখন সে বৃদ্ধের নৈশাহারটা গোগ্রাসে গিলতে থাকে। ধরা যাক, সুযোগমতো সত্যানন্দ ঐ ঘুমের ট্যাবলেটগুলো ওর খাবারে মিশিয়ে দিলেন। তাহলে কী হবে? একটু পরে বিলাসের প্রচণ্ড ঘুম পাবে। সে চেয়ার ছেড়ে বিছানায় গিয়ে বসবে। ধরা যাক, সত্যানন্দ ওর সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দেন — কীভাবে তিনি মুক্তিপণটা দিতে সক্ষম হবেন। বিলাস হয়তো একটু পরে পা দুটি লম্বা করে দেবে। শেষমেষ ঘুমিয়ে পড়বে...আমার ধারণা তাই যদি ঘটে থাকে, তাহলে তোমার জেঠু ঘুমের ওষুধটা ওর খাবারে মিশিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তির বাসনায়, হত্যার ইচ্ছা নিয়ে নয়। কিন্তু প্রত্যাঘাতের ক্ষমতাহীন শয়তানটাকে দেখে হয়তো উনি লোভ সামলাতে পারেননি। হয়তো তীব্র প্রতিশোধ-স্পৃহা...অথবা হয়তো বুঝেছিলেন — ঐ শনিগ্রহ চিরটা জীবন ওঁর পিছন পিছন ঘুরবে...ইন ফ্যাক্ট, আমরা তো জানি না — অসহায় পেয়ে ইতিপূর্বে ঐ বৃদ্ধের উপর বিলাসসিং কী জাতের পৈশাচিক অত্যাচার করেছে। তাই সত্যানন্দ ঘর ছেড়ে যাবার আগে গ্যাস-পাইপের চাবিটা খুলে দিয়ে যান।

স্মরণিকা ধীরে-ধীরে দু-দিকে মাথা নাড়ল — 'না'-য়ের ভঙ্গিতে।

— কেন নয়? কী অসঙ্গতি দেখলে? — জানতে চাইলেন বাসু।

— এ সলুশন জেঠুর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। গায়ে মশা বসলে জেঠু চাপড় মারতেন না, হাত নেড়ে মশাটাকে উড়িয়ে দিতেন।

— সে ক্ষেত্রে হত্যাপরাধ আর একটিমাত্র লোকের উপর বর্তায়।

— সে কে?

— তুমি।

— আমি? না মেসো! সুযোগ পেলে আমি হয়তো তা করতাম। কিন্তু তারও অনেক আগেই আমি

যদু কলোনিতে ফিরে গেছি।

— জাস্ট আ মিনিট! এইমাত্র তুমি বললে, 'সুযোগ পেলে আমি হয়তো তা করতাম'! তার মানে কী? ধর সুযোগ পেলে ; ঘরে তুমি আর যাদব — জেঠু তার অনেক আগেই পালিয়ে গেছেন। আর যাদব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ক্ষেত্রে তুমি ওকে ওইভাবে হত্যা করতে পারতে?

স্মরণিকা ম্লান হাসে। বলে, ও একটা কথার কথা বলে ফেলেছি, মেসো। মানুষ খুন করা কি অত সহজ?

— দ্যাট্‌স্ নট্ দ্য পয়েন্ট। আমি অ্যাকাডেমিকাল ডিস্কাশন করছি এখন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে, তোমার ঐরকম ইচ্ছে হল, তাহলে তুমি কি বিলাসকে ঐভাবে হত্যা করতে পারতে? ফিজিকালি?

— কেন পারব না?

— তোমার মনে হচ্ছে না, কাজটা করা অসম্ভব হত তোমার পক্ষে?

— হতই তো! যেহেতু মানুষ খুন করার মানসিকতা...

— আহ্! আবার উল্টো-পাল্টা কথা! ফিজিকালি, বাস্তবে, ঐভাবে বিলাসকে খুন করার ক্ষমতা তোমার ঐ মুহূর্তে ছিল কি?

স্মরণিকা প্রতি-প্রশ্ন করে, কেন থাকবে না? ঠিক কী জানতে চাইছেন...

— তুমি ইতিপূর্বেই বলেছ, ঘরে 'কিচেনেট' নেই। বলেছ এক কেটলি জল গরম করবার ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। তার মানে গ্যাস-স্টোভ বা গ্যাস-বার্নার ঐ ঘরের ত্রিসীমানায় ছিল না...

— বাই জোভ! তাই তো! তাহলে কী ভাবে...

— মনে আছে নিশ্চয়, বরাট বলেছিল : ঘরের দরজা জানলা খুলে দেওয়া হয়। ইউনিটটা এয়ার-কন্ডিশন করা, জানলা সহজে খোলা যায় না। বরাট আরও বলেছিল, প্রবীর ঘোষালের জবানবন্দী অনুসারে একটা পোর্টেবল ফ্যান বসিয়ে দূষিত গ্যাস বিদূরণ করা হয়!

— ইয়েস! বাট্ দ্যাট্‌স্ ইম্পসিব্‌ল্। তা তো ঘটতে পারে না। গ্যাস-স্টোভ তো ঘরে ছিল না! গ্যাসের পাইপ তো ত্রিসীমানায় ছিল না?

ঠিক তখনই ফিরে এল সুজাতা।

তার পিছন-পিছন ট্রে-তে করে তিন গ্লাস স্পেশাল-চা হাতে একটি ছোকরা।

বারো

কৌশিক যখন নিউ-আলিপুরের ডেরায় ফিরে এল তখন পড়ন্ত বিকেল। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। স্মরণিকাকে ওবেলাতে তার বান্ধবীর বাসাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। আহারাদি সেরে সুজাতাও কোথায় বেরিয়ে গেছে। ওঁরা কর্তা-গিন্নি বাইরের বারান্দায় এসে বসেছেন। বিশে চায়ের জল চাপিয়েছে। ঠিক সময়েই ফিরে এল কৌশিক। গাড়িটা পোর্টিকোতে রেখে নেমে এল। একখানা বেতের চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে, অনেক খবর সংগ্রহ করে এনেছি, মামু। বিস্তারিত শুনবেন, না চুম্বকসারটুকু প্রথমেই বাৎলে দেব?

বাসু-সাহেব জবাব দেবার আগেই রানীদেবী বলে ওঠেন, স্নান তো হয়নি, দুপুরের খাওয়াটা হয়েছে? না হলে...

কৌশিক হাত নেড়ে বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, মামী। খালি-পেটে টিকটিকিগিরি করার মানুষই আমি নই। লাঞ্চ করেছি ঐ মোটেলের সংলগ্ন রেস্তোরাঁতে, প্রবীর ঘোষালের সঙ্গে।

— প্রবীর ঘোষাল? নামটা চেনা-চেনা লাগছে! — বলেন রানীদেবী।

বাসু বললেন, হ্যাঁ, নামটা আমার কাছে শুনেছ। শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। অর্ডার সাপ্লায়ার। তিনিই মৃতদেহটা প্রথম আবিষ্কার করেন।

তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাবটা মুলতুবি আছে। তুমি বিস্তারিত বর্ণনার আগে তোমার সংগৃহীত সংবাদের চুম্বকসারটুকু প্রথমে পেশ কর দিকিন।

— তাহলে প্রথমেই আপনাকে একটা সাজেস্‌শান দেব, মামু। আপনি এ-কেসে হাতটা ধুয়ে ফেলুন। আপনার মক্কেলকে বলুন : হয় অপরাধ স্বীকার করে সাজা নিতে অথবা অন্য কোনও ল-ইয়ারের দ্বারস্থ হতে।

বাসু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বলেন, বুঝলাম। এবার একটু বিস্তারিত শোনাও। প্রথম কথা, অটোপ্সি-সার্জেনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে?

— এত শিগ্গির? না, মামু। অন্তত আমি জানি না। তবে মনে হয় প্রাথমিক সন্দেহটাই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে। টেবিলে অর্ধভুক্ত চাও-মিঙের প্যাকেট পাওয়া গেছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় তাতে 'কাম্পোজ'-চূর্ণ পাওয়া গেছে। শতকরা নিরানব্বই-ভাগ সম্ভাবনা ঐ চাও-মিঙ খেয়ে বিলাসসিং ঘুমিয়ে পড়ে। তখন তাকে বন্ধ ঘরের মধ্যে রেখে গ্যাসটা খুলে দিয়ে হত্যাকারী নিঃশব্দে চলে যায়, দরজাটা টেনে দিয়ে।

— 'গ্যাসটা খুলে দিয়ে' মানে? ঐ ঘরে গ্যাস-স্টোভ ছিল? গ্যাস-বার্নার ছিল?

— না, ছিল না। তবে মোটেলটা এয়ার-কন্ডিশন করা। সেন্ট্রাল-হীটিং সিস্টেম। ঐ ঘরগুলোর পিছন দিয়ে দেওয়াল বরাবর একটা পঁচিশ এম. এম. গ্যাল্‌ভানাইজড গ্যাস-পাইপ গিয়েছে। তা থেকে একটা রিডিউসিং টি-জাংশনের মাধ্যমে নাইনটিন এম. এম. পাইপে গ্যাস বাথরুমে ঢুকেছে। তাতে গীজারের জল গরম করা হয়। ইলেক্‌ট্রিসিটিতে নয়, গ্যাসে। যেহেতু ওরা কারখানায় গ্যাস তৈরী করে। সে যাই হোক, সেই মেইন এক ইঞ্চি পাইপ থেকে ঐ টী-জাংশানের কাছে একটা শর্ট-পাইপ দিয়ে কানেকশন করা ছিল। আপনার মক্কেল সেই শর্ট-পাইপের প্যাঁচ খুলে...

বাসু-সাহেব ধমকে ওঠেন, তুমি পার? গাসকেট-জোড়াই একটা থ্রি-ফোর্থ ইঞ্চ্‌ গ্যাল্‌ভানাইজড্ পাইপের প্যাঁচ আল্‌গা করে ফেলতে?

— আমি তো বটেই, সুজাতাও পারে। মামীও পারবেন, এই হুইল চেয়ারে বসে-বসেই, যদি গ্যারেজ থেকে তাঁর টুল-বক্সটা কেউ নিয়ে আসে, যাতে অ্যাডজাস্টেব্‌ল্ রেন্‌চ্‌টা রাখা থাকে। আপনার মক্কেলের গাড়িতে নিশ্চয় তা ছিল।

বাসু বলেন, তবে টুকু কেন? কেন নয় ধনঞ্জয়? কেন নয় প্রবীর ঘোষাল? অথবা সত্যানন্দ?

— ভিন্ন ভিন্ন হেতুতে, মামু। ধনঞ্জয় চৌবে শয্যাশায়ী, অ্যাকিউট ডায়েরিয়া। শুধু মিসেস্ চৌবে নয়, ও বাড়ির দারোয়ান যোগিন্দর সিংও বলেছে, মালিক গতকাল সারাদিন বাড়ি ছেড়ে বার হয়নি। তার অ্যালেবাই পাক্কা। দ্বিতীয়, প্রবীর ঘোষাল? তার কোনও মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তৃতীয়ত সত্যানন্দ সেন। তিনি বেলা এগারোটা থেকে অনুপস্থিত। মোটেলে আদৌ ছিলেন না।

— কী করে জানলে?

— দুপুরে প্রবীর ঘোষালের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে খেতে।

প্রবীর ঘোষাল চার-নম্বর ইউনিটে ছিল। পাশের ঘরে যখন একজন বৃদ্ধ একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন তখনি তার নজরে পড়েছিল। সে ঐ ইউনিটে দু-তিনদিন ধরে আছে। 'এরিয়ার বিল' পাস করানোর ধান্দায়। সে লক্ষ্য করেছিল, মেয়েটি দশটা নাগাদ বেরিয়ে গেল বুড়োকে ঘরে একলা রেখে। তারপর সে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেলা এগারোটা নাগাদ সে একবার গাড়ি নিয়ে বেহালার দিকে যায়। তখন হঠাৎ ওর নজরে পড়ে ঐ বৃদ্ধ বাস-স্ট্যান্ডে একা দাঁড়িয়ে আছেন। কলকাতা যাওয়ার বাসস্ট্যান্ডের কাছে। প্রবীর তার গাড়ি নিয়ে ঘনিয়ে আসে। বৃদ্ধকে প্রশ্ন করে, কোথায় যাবেন আপনি?

বৃদ্ধকে যেন কিছু একটা তাড়া করেছে। সভয়ে গাড়ির চালকের দিকে ফিরে বললেন, দমদম এয়ারপোর্ট।

— আপনার নাতনী কোথায়?

— নাতনী? ও টুকু? সে গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন গেছে।

— ঠিক আছে। আপনি উঠে আসুন। তারাতলার মোড় পর্যন্ত আপনাকে লিফ্‌ট্‌ দিতে পারব।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান। যেন তাঁকে যে বাঘটা তাড়া করেছে, তার হাত থেকে পালাতে চান।

প্রবীর আরও জানিয়েছে, এরপর সে বৃদ্ধকে দেখেনি। বস্তুত তাঁর নাতনী — মানে 'টুকু' নামের ঐ মেয়েটিকেও নয়। রাত সওয়া দশটা নাগাদ ডিনার খেয়ে যখন নিজের ইউনিটে ফিরে আসে তখন পাশের ঘর থেকে গ্যাসের গন্ধ পায়। ও সেই ঘরের সামনে গিয়ে 'নক্' করে। কেউ সাড়া দেয় না। তখন ও ম্যানেজারকে খবর দেয়। ম্যানেজার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজাটা খোলে...

বাসু জানতে চান, ওদের সব দরজায় কি 'ইয়েল-লক'?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিলে আর বিনা চাবিতে বাইরে থেকে খোলা যায় না।

বাসু নীরবে পদচারণা শুরু করেন। বাড়ির চারজন বাসিন্দাই জানেন পিছনে হাত দিয়ে এই নীরব পদচারণার অর্থ : উনি গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছেন। অভিজ্ঞতা বলে, এই সময় সেই নীরবতা ভঙ্গ করলে ধমক খেতে হয়। আজ কিন্তু কৌশিকের সবুর সইল না। বলে বসে, আমার কী ধারণা বলব, মামু?

'প্রত্যাশঙ্কিত' প্রতিক্রিয়া হল না। বাসু ক্ষেপে গেলেন না, বা ধমক দিয়েও উঠলেন না. নীরবে ইজিচেয়ারে এসে বসে বললেন, বল?

— কাল আমি আর সুজাতা দেখেছি, মিস্ সেন সন্ধ্যানাগাদ তাঁর জেঠুর জন্যে বাজার করেছেন। তারপর রেস্তোরাঁয় গিয়ে চাইনীজ-খাবার বানিয়ে কার্টনে করে নিয়ে দোতলায় উঠেছেন। রাত তখন আটটা পাঁচ। মিনিট দশেক অপেক্ষা করে সওয়া আটটা নাগাদ আমরা ফিরে আসি। কেমন তো? আমরা ধরে নিয়েছিলাম তার অর্থ — সওয়া আটটা নাগাদ ওঁরা দুজনেই খাবার ভাগ করে খাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে তা তো নাও হতে পারে। হয়তো ঘটনা ঘটেছিল এই রকম : দরজায় নক্ করতে ভিতর থেকে দরজা খুলে দেওয়া হল। ঘরটা অন্ধকার। স্মরণিকা অন্ধকারের মধ্যেই প্রশ্ন করে, 'আলো জ্বালোনি কেন জেঠু?' ঠিক তখনই আলোটা জ্বলে ওঠে। এবং দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। টুকু দেখে ঘরে তার জেঠু নেই এবং বিলাসসিং যাদব আছে! তা হতে পারে না?

বাসু বলেন, পারে, যদি আমরা ধরে নিই — এক : প্রবীর ঘোষাল সত্য কথা বলেছে। দুই : সত্যানন্দ যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যাননি অথবা চাবিটা দরজায় লাগিয়ে রেখে-গেছিলেন এবং তিন...

— আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার কাছে ঐ তিন-নম্বর যুক্তিটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। আমি যা কল্পনা করেছি বাস্তবে তা ঘটে থাকলে এটা অনুমান কার যায় যে, বিলাসসিং টুকুকে প্রস্তাব দেয় নগদ প্রাপ্তির বিনিময়ে সে তার জেঠুকে চৌবের কবল থেকে উদ্ধার করে দেবে। এটাও অনুমান করতে পারি, টুকু রাজি হবার ভান করে। দুজনে চীনে খাবার ভাগ করে খায়। টুকু কায়দা করে ঘুমের ওষুধটা বিলাসের খাবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, আর সে ঘুমিয়ে পড়লে গাড়ি থেকে অ্যাডজাস্টেব্‌ল্ রেন্‌চ্‌টা নিয়ে এসে গ্যাসটা খুলে দেয়। তারপর দরজাটা টেনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যদু কলোনিতে ফিরে আসে, ধরুন আন্দাজ নয়টা, সাড়ে নটায়। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে কাল রাত দশটা চল্লিশে যখন আপনি ফোন করেন তখন তার পক্ষে এমন সহজভাবে কথা বলা কি সম্ভবপর?

বাসু ইজিচেয়ার ছেড়ে আবার উঠে পড়েন। পদচারণা করতে করতে বলেন, অনেক — অনেকগুলো অসঙ্গতি আছে। অনেকগুলি মিথ্যে কথা আমরা শুনেছি। ঠিক কোন্-কোন্‌টি না জানলে...

— কী কী অসঙ্গতি?

প্রথম কথা : প্রবীর বলেছে সত্যানন্দ এগারোটার সময় দমদমে চলে গেছেন। অথচ টুকু বলছে, রাতে ফিরে এসে সে জেঠুকে দেখেছে। দ্বিতীয় কথা, চাওমিঙ-এর মাঝখানে 'কাম্পোজ'-এর বড়ি থাকলে তা টের পাওয়ার কথা...

— না, মামু। যে ওটা মিশিয়েছে সে সুচারুরূপে কাজটা সম্পন্ন করেছে। কাম্পোজের বড়িগুলোর খুব মিহিভাবে গুঁড়ো করে নেওয়া হয়েছিল...

— কী ভাবে? ওখানে খল-নুড়ি রাখা ছিল নাকি?

— আজ্ঞে না। তবে বাথরুমে সেলোফেন কাগজ-মোড়া একটা স্টেরিলাইজড্ প্লাস্টিকের মগ ছিল। আর নতুন টুথব্রাশটার একটা শক্ত স্বচ্ছ খাপ ছিল। হত্যাকারী সেই দুটির সাহায্যে কাম্পোজ-এর বড়িগুলোকে গুঁড়ো করে নিয়েছিল। মগটা তার 'খল', টুথব্রাশের শক্ত কভারটা তার 'নুড়ি'! ল্যাবরেটরি-টেস্টের দরকার নেই — সাদা চোখেই ফিকে গোলাপী আভা দেখা যাচ্ছে। পুলিশ সে দুটি 'সীজ' করে নিয়ে গেছে। যাবার সময় রবি আমাকে সেটা দেখিয়ে বলল, কী মনে হয় কৌশিকবাবু, এই আজব 'খলনুড়ি' অর্ধোন্মাদ সত্যানন্দ সেনের মাথা থেকে বার হতে পারে?

বাসু বলেন, এটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না? বিলাস সিং-এর চোখের সম্মুখে ঐভাবে কাম্পোজ গুঁড়ো করা?

কৌশিক জবাব দিল না।

বাসু বললেন, তৃতীয় কথা, টুকু একবার বলল, আদালতে যাবার আগে সে তার জেঠুকে টাকাটা দিয়ে যায়। আর একবার সুজাতাকে বলল, আদালতে আসার আগে সে গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক থেকে ড্রাফ্‌ট্‌গুলো ভাঙায়। দুটো স্টেটমেন্ট একই সঙ্গে সঠিক হতে পারে না। যদি প্রথমটা ঠিক হয়, অর্থাৎ আদালতে আসার আগে সে জেঠুকে টাকা দিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা নগদ টাকা নয়। ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট্। যদি রাত আটটায় দিয়ে আসে, তাহলে তা হয়তো নগদ চল্লিশ হাজার টাকা। দুটো জিনিসে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বৃদ্ধের পকেটে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা যদি থাকে তাহলে হত্যার মোটিভ ও হত্যাপরাধীর সম্ভাব্য রেঞ্জ বদলে যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে : টুকু অমন উল্টোপাল্টা স্টেটমেন্ট করল কেন? তা থেকেই মনে পড়ছে, রবি বোস যাবার সময় যে কথা গেল : আপনার মক্কেল এবারও বিচলিত হচ্ছে না কেন?...ভাল কথা, ঘরটা কি পুলিস সীল করে রেখেছে?

— না মামু। মৃতদেহ অপসারণের পর ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। বহু ফটো নিয়েছে। ফিঙ্গার-প্রিন্টের জন্য ডাস্টিং করেও ফটো নিয়েছে। তারপর বেলা তিনটা নাগাদ ঘরটা রিলিজ করে দিয়েছে —

— তার মানে আমি ইচ্ছে করলে এখন ঘরটা 'বুক' করতে পারি? ঐ তিন-নম্বর ঘরটা?

— না পারেন না, মামু। ঘরটা অলরেডি বুকড্!

তারপর সহাস্যে যোগ করে, বাট্ বাই সুকৌশলী। ইয়েস, মামু! আমার মনে হল আপনি একবার স্বচক্ষে দেখতে চাইবেন। তাই পুলিশে ঘরটা রিলিজ করামাত্র আমি সেটা আমার নামে বুক করেছি।

— ভেরি গুড! দেন গেট আপ! চল এখনি যাব।

— চা-টা না খেয়েই?

ঠিক তখনই ট্রেতে তিন কাপ চা নিয়ে শ্রীমান বিশুর প্রবেশ।

কিন্তু শান্তিতে চা-পান ওঁর কপালে নেই। ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু তুলে নিয়ে বললেন, ইয়েস, বাসু স্পিকিং।

— আমি স্মরণিকা বলছি, মেসো। গীতার ফ্ল্যাট থেকে। আমার সামনের চেয়ারে বসে আছেন ইন্সপেক্টর বরাট। উনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন। ওঁর অনুমতি পাওয়ায় আপনাকে ফোন করছি।

— অ্যারেস্ট! বরাট তোমাকে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেখিয়েছে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, নির্দিষ্ট অপরাধে। বিলাসসিং যাদবকে হত্যা করার অপরাধে। আপনি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চান?

— না। ওঁর সঙ্গে কথা হবে আদালতে। তোমাকেই আমার একটা কথা বলার আছে, টুকু। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। কোনও প্ররোচনাতেই পুলিশের কাছে কোনও জবানবন্দি দেবে না, কোনও কথার জবাব দেবে না। থানা-অফিসার যদি বলে, 'আমার হাতঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে, আপনার রিস্টওয়াচে কটা বাজে, মিস সেন?' তুমি জবাবে বলবে : 'আস্ক মাই সলিসিটার প্লীজ! উকিলের অনুপস্থিতিতে আমি কোনও প্রশ্নের জবাব দেব না।' পারবে?

— পারব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

— অলরাইট। দু-এক দিনের মধ্যেই জেল-হাজতে তোমার সঙ্গে দেখা করব। বেস্ট অব লাক্!

টেলিফোনটা স্বস্থানে নামিয়ে মিনিটখানেক চুপ করে বসে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, কৌশিক, তুমি একটা ওভার-নাইট ব্যাগে পাজামা টুথব্রাশ শেভিং সেট-মেট ভরে নাও। তোমাকে ঐ মোটেলে ফিরে যেতে হবে। রাত্রে ওখানেই থাকবে।

কৌশিক মাথাটা চুলকায়। তার ব্যাজার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে রানী বলে, কেন? কৌশিক কেন ওখানে গিয়ে থাকবে?

বাসু বুঝে ওঠেন, ওর আপত্তিটাই বা কিসের? সেখানেও ডানলোপিলোর বিছানা, অ্যাটাচড্ বাথরুম, মায় ঘরটা এয়ার-কন্ডিশন করা। ওর যাতায়াতে যে পেট্রল পুড়বে তাও আমার অ্যাকাউন্টে...

— তাহলে তুমি নিজে গিয়েই থাক না বাপু?

— তা কি পারি না? তাও থাকতে পারি। তবে বুড়োমানুষটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে...

কৌশিক আগবাড়িয়ে বলে না, না, মামু! আমি যাচ্ছি। ওখানেই রাতে থাকব। শুধু বলুন...

— তুমি থাম তো দেখি! — রানী ধমকে ওঠেন কৌশিককে। বাসুকে বলেন, বয়েস হয়েছে বলেই তোমাকে যেতে বলছি। কৌশিক কচি বউটাকে ফেলে...

বাসু একটা হাত বাড়িয়ে রানীকে মাঝপথে থামিয়ে দেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। একপাক পায়চারি করে ফিরে এসে বলেন, আই গেট দ্য পয়েন্ট। শোন কৌশিক, তোমার সঙ্গে সুজাতাও যাবে। তোমরা দুজনেই রাতে ওখানে থাকবে। ঐ সংলগ্ন চাইনীজ হোটেলে দুজনে নৈশাহার করবে : চাওমিঙ, চিলি-চিকেন আর ফ্রায়েড-প্রন। সবই আমার এই কেস-অ্যাকাউন্টে। তার পর রাতটা ঐ ঘরে দুজনে কাটাবে। সকালে, এই ধর নয়টা নাগাদ, আমি যাব। তখন কথা হবে।

কৌশিক বলে, আপনি যা-যা বললেন, তা অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হবে। কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন, মামু, ঘরটা পুলিশে 'চিরুনি-তল্লাসী' করেছে। তারপর 'পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ-ঘা' পর্যায় শেষ হবার পর মোটেল কর্তৃপক্ষ এসে ঘরটা ফিনাইল দিয়ে ধুয়েছে, মুছেছে, মুর্দার ব্যবহৃত বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সব বদলেছে। অ্যাশ-ট্রে, ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেট...

— আই নো! আই নো! তবু আমি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে চাই! তোমাদের আপত্তি আছে?

কৌশিক 'শ্রাগ' করল। বাসু রানীদেবীর দিকে ফিরে গম্ভীর স্বরেই বললেন, ম্যাডামেরও নিশ্চয় আপত্তি নেই এ ব্যবস্থায়? ভাগ্নে-ভাগ্নীর এই হনিমুন অ্যানিভার্সারিতে?

রানী মুখ টিপে হাসলেন শুধু।

তের

ওরা যা প্রত্যাশা করেছিল তা ঘটল না। বাসু-সাহেব চতুষ্পদী—বলা যায়, শার্লক-হোমী'— ভঙ্গিতে সারাটা ঘর ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস সহযোগে পরীক্ষা করলেন না। মোটামুটি দেখে নিয়ে বললেন, বেশ ঘর।

বাথরুমটাও একনজর পরিদর্শন করে এসে বললেন সেই গ্যাস-পাইপের জোড়াইটা কোথায়?

কৌশিক দেখিয়ে দিল। বাসু এবার তার সামনে উবু হয়ে বসলেন। ব্রীফকেস খুলে বার করলেন একটা টর্চ আর মস্ত বড় একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস। সুজাতা টর্চটা ধরল, বাসু প্রায় পাঁচ-মিনিট ধরে জোড়াইস্থলটি পরীক্ষা করলেন। জানতে চাইলেন, কে জুড়েছে আবার? জান?

কৌশিক বলে, আগেই তো বলেছি, মামু। মোটেল-ম্যানেজার এসেই স্টপ-ককটা বন্ধ করে দেয়। তাতে মেইন পাইপে গ্যাস-সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশের পরিদর্শন ও ফটো তোলা হয়ে গেলে ফ্যাকটারির প্লাম্বার এসে ওটা জোড়াই করে দিয়ে যায়।

বাসু বললেন, হুঁ! এবার তোমরা দুজনে পরীক্ষা করে দেখ।

নির্দেশমতো একে একে দুজনেই দেখল। বাসু জানতে চাইলেন, কী দেখলে?

— কী আবার দেখব? একটা গ্যাল্‌ভানাইজড্ শর্টপাইপ।

— হুঁ। কিন্তু তার গায়ে সূক্ষ্ম দাগ আছে, নয়? যা থেকে বেশ বোঝা যায়, অতি সম্প্রতি কেউ একটা রেঞ্চ দিয়ে ওটা জুড়েছে। অন্তত পাইপটা রঙ করার পরে।

— 'অতি সম্প্রতি' বলছেন কেন? ছয় মাস আগেও হয়ে থাকতে পারে?

— না পারে না। অ্যাডজাস্টেবল্ রেন্‌চ্-এর গ্রিপ্ যেখানে হয়েছে সেই অতিসূক্ষ্ম কাটা দাগে কোনও ধুলো জমেনি।

— তা হবে।

— 'তা হবে' নয়, কৌশিক, তাই! এ-সব নজর করতে শেখ। আর তা যদি পছন্দ না হয় তাহলে প্রফেশন ছেড়ে দিয়ে চাকরিবাকরি ধর। কবিতা-টবিতা লিখে রোজগারের চেষ্টা দেখ।

কৌশিক ছাত্রজীবনে কবিতা লিখত। সে চুপ করে ধমকটা হজম করল। প্রসঙ্গটা বদলাতে সুজাতা বলল, কফি বলে আসব, মামু?

— না। তুমি বরং নিচে যাও। আমার গাড়িতে একজন লোক বসে আছে। তার নাম বিদ্যাধর পণ্ডা। তাকে ডেকে নিয়ে এস।

— আপনার গাড়িতে? বিদ্যাধর পাণ্ডা?

— 'বিদ্যাধর' নয় 'বিদ্যাধরঅ' — শেষ অক্ষরটা স্বরান্ত। আর পাণ্ডা নয়, 'পণ্ডা'। যাও, কুইক।

একটু পরেই বিদ্যাধর পণ্ডাকে নিয়ে সুজাতা ফিরে এল। বছর চল্লিশের বেঁটে-খাটো মানুষ। কৃষ্ণকায়, মুখে বসন্তের দাগ, গায়ে আলোয়ান, হাতে একটা বড় র‍্যাশনব্যাগ। তাতে ওর যন্ত্রপাতি। কৌশিককে দেখে বলল, নমস্কার আইজ্ঞা।

কৌশিক দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়।

বাসু বললেন, বিদ্যাধরঅ আমার বহুদিনের পরিচিত। ওর শ্যালককে একবার পুলিসে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে...

বিদ্যাধর কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল। বাসু-সাহেব না থাকলে ওর শ্যালক মদনের নির্ঘাত জেল হয়ে যেত। গরিব মানুষ — কী বা ফী দেবে? বাকী জীবনের জন্য কেনা হয়ে আছে বিদ্যাধরঅ।

বাসু বললেন, এই শর্ট-পীসটা আমার চাই বিদ্যাধরঅ। কিন্তু এমন ভাবে খুলে নিতে হবে যাতে ওতে রেন্‌চ্-এর দাগ না পড়ে।

বিদ্যাধর শর্ট-পীসটা পরীক্ষা করল। বুঝিয়ে বলল যে, তা করতে হলে ঠিক ঐ মাপের আর একটা

শর্ট-পীস বাজার থেকে কিনে আনতে হবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি, পাকাপুট্টি, জুট সবই আছে। নতুন শর্ট-পীসটা পেলে মিনিট-পনেরর ভিতরেই ওটা খুলে আনা যাবে। আর রেন্‌চ্ দিয়ে বাগিয়ে ধরার আগে একটা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে নিলে...

বাসু পকেট থেকে একটা 'শ্যাময়-লেদার' বার করে ধরে বললেন, এতে হবে?

মিশিমাখা একসার দাঁত বার করে বিদ্যাধর বললে, আপনি প্রভু জগন্নাথ বটেন! ভকত যখন যেটি মাঙ্গিবে...

মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিয়ে বাসু বলেন, কৌশিক, তুমি বিদ্যাধরঅকে বাজাকে নিয়ে যাও। এখানকার লোকাল বাজারে পাবে না। য়ুনিক পার্কের মোড়ের কাছাকাছি একটা স্যানিটারি গুড্‌স্-এর দোকান আছে। 'তারা স্টোরস্'। সেখান থেকে নিয়ে এস। সুজাতা, তুমিও ওর সঙ্গে যাও।

কৌশিক ভাবল একবার প্রশ্ন করে, সুজাতাকে নিয়ে যেতে হবে কেন? ঐ তিন ইঞ্চি লম্বা, পৌনে একইঞ্চি ব্যাসের অতি ক্ষুদ্র গ্যাল্‌ভানাইজড্ পাইপটা কি এতই ভারি হবে যে, দুজনে ধরাধরি করে তা গাড়িতে তুলতে পারবে না? তৃতীয়জনের প্রয়োজন হবে? কিন্তু সুজাতা চোখের কী ইঙ্গিত করায় থমকে গেল। ঘরের চাবিটা রেখে কৌশিক ওদের দুজনকে সঙ্গে করে ওর সেই 'রেন্ট-আ-কার' গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়ির শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর বাসু গাত্রোত্থান করলেন। পণ্ডার র‍্যাশন-ব্যাগের যন্ত্রপাতি মেঝেতে উবুড় করে ঢেলে ফেললেন। হ্যাঁ, তুরপুন আছে, স্ক্রু-ড্রাইভার, রেন্‌চ্, হাতুড়ি সব কিছুই আছে। বড় অ্যাড্‌জাস্টেব্‌ল্ রেন্‌চ্‌টা ব্রীফ-কেস-এ তুলে নিলেন। চাবিটাও। তারপর দরজা টেনে দিয়ে নেমে এলেন নিচে। কৌশিকের গাড়িটা ততক্ষণে বোধ করি ডায়মন্ড-হারবার রোডে উত্তর-মুখো ছুটেছে। বাসু নিজের গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের সীটে উঠে বসলেন। ওঁর পিঠের দিকে একটা সাদা ধবধবে বড় তোয়ালে ঝোলানো থাকে। সেটা পেড়ে নামালেন। ঐ তোয়ালেতে বিদ্যাধরের রেন্‌চ্‌যন্ত্রটা ড্রাইভারের সীটের পাশে রেখে দিলেন।

লোকজনের যাতায়াত বেশ আছে। কিন্তু উনি কিছু চুরি করছেন না। নিজের জিনিস নিজে গ্রহণ করলে তাকে হাত-সাফাই করা বলে না। বাসু-সাহেব গাড়ির টুল-বক্স থেকে নিজের যন্ত্রটা ব্রীফ-কেস-এ উঠিয়ে নিলেন। আকারে আর আয়তনে সেটি বিদ্যাধরের যন্ত্রের হুবহু সহোদর, তবে অল্পতর ব্যবহারের জন্য কিছু বেশি চক্‌চকে। অ্যাড্‌জাস্টেব্‌ল্ রেন্‌চ্।

ব্রীফ-কেস হাতে উঠে এলেন তিন-নম্বর য়ুনিটে। ঘরে ঢুকে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। এবার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসলেন কাজ করতে।

'কাজ'টা বিচিত্র। ধারালো বাটালির সাহায্যে হাতুড়ির ঘায়ে ওঁর নিজের অ্যাড্‌জাস্টেব্‌ল্ রেন্‌চ্-এর দু-একটা দাঁত ফেলে দেওয়া। নিপুণ হাতে কাজটি সেরে, পরীক্ষা করে, সন্তুষ্ট হয়ে সব কিছু যন্ত্রপাতি আবার ঐ র‍্যাশন-ব্যাগে ভরে দিলেন। বিদ্যাধর যেখানে তার থলিটা রেখে গেছিল ঠিক সেখানেই সেটা থাকল, শুধু তার নিজস্ব বড় রেন্‌চ্-এর পরিবর্তে বাসু-সাহেবের ফোগ্‌লা রেঞ্চ যন্ত্রটা বসানো রইল।

ঘর বন্ধ করে এবার উনি গেলেন সংলগ্ন চাইনীজ রেস্তোরাঁয়। এক-পট কফি নিয়ে জমিয়ে বসলেন।

সেই প্রায়-চীনা মেয়েটি এগিয়ে এসে জানতে চাইল কফির সঙ্গে আর কিছু চাই কিনা। বাসু জানালেন, তাঁর বয়স হয়েছে, অসময়ে 'আর কিছু' খেলে সহ্য হয় না। তারপরে আচমকা প্রশ্ন করে বসেন, তুমিই তো কাল সকালে সেই মেয়েটিকে চিনতে পেরেছিলে, নয়? তোমার তো আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা!

শেষ পংক্তিটা প্রকারান্তরে 'কম্‌প্লিমেন্টস্'। মেয়েটি বললে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। মাত্র একদিন আগেকার ঘটনা। আর তা ছাড়া, এখানে তো রেলের টিকিট-কাউন্টারের মতো ক্রমাগত খদ্দের আসে না। মানুষজনকে দেখলে মনে থাকে।

— তা বটে। তা এখানে তোমরা থাক কোথায়? রোজ কলকাতা থেকে যাতায়াত করতে হয় নাকি?

— না, স্যার। রেস্তোরাঁটা আমার এক কাকা 'লীজ' নিয়েছেন। ওঁরা — মানে কারখানার কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য কোয়ার্টার্স অ্যালট করেছেন।

বাসু ওর সঙ্গে ক্রমে আলাপ জমিয়ে নিলেন। এখন খদ্দেরের ভিড় নেই। ব্রেকফাস্ট খানেওয়ালারা বিদায় হয়েছে, লাঞ্চার্থীরা এখনো আসেনি। উনি কথা প্রসঙ্গে মৃত বিলাসসিং যাদব এবং প্রবীর ঘোষাল সম্বন্ধে তত্ত্বতালাশ নিলেন। মেয়েটি জানালো, বিলাসসিংকে সে জীবিত অবস্থায় দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না তবে মিস্টার ঘোষাল তিন-চারদিন ছিলেন। সকাল্ বিকাল আসতেন। তিনি বোধহয় চলে গেছেন।

বাসু জানতে চান, ঐ মেয়েটি — সেই যে তোমার কাছ থেকে রাত্রে খাবার কিনতে এসেছিল— তার সঙ্গে একজন বুড়ো-মত লোকও ছিল, নয়?

— হ্যাঁ, শুনেছি ছিল। আমি তাঁকে দেখিনি। মিস্টার দত্ত বলেন, ছিল।

— 'মিস্টার দত্ত' কে?

— মোটেলের ম্যানেজার।

দাম মিটিয়ে অগত্যা মিস্টার দত্তের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু এখানে চিঁড়ে ভিজল না। দত্ত সরাসরি বললেন, সেদিন আপনাকে দেখেছি। আপনি কে? কী জন্য এসব জানতে এতটা পেট্রল পুড়িয়ে এসেছেন?

বাসু তাঁর নামাঙ্কিত একটি ভিজিটিং কার্ড বার করে দিলেন।

দত্ত সেটি উল্টেপাল্টে দেখে ওঁকে ফেরত দিয়ে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি। আপনিই সেই লোক!

— কোন লোক?

— ঐ পুলিস ইন্সপেক্টার যাঁর কথা বলে গেস্ল্। সাবধান করে গেস্ল, এক ব্যারিস্টার-সাহেব দু-একদিনের মধ্যেই আসবেন। ভাব জমাবার চেষ্টা করবেন। সিগ্রেট অফার করবেন, চাই কি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাইয়েও দেবেন। তাঁর কাছে মুখ খুললেই তিনি একটি 'সমন' ধরিয়ে দেবেন! ব্যস! হয়ে গেল! ছোট এবার আদালতে সাক্ষী দিতে! আমি ওর ভিৎরি নেই, মশাই!

বাসু ফিরে এলেন। ঠিক তখনই কৌশিকের গাড়িখানা এসে ভিড়ল। ওরা তিনজনে নেমে এল গাড়ি থেকে। বাসু কৌশিকের হাতে ঘরের চাবিটা ধরিয়ে দিলেন।

একটু পরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ওঁরা কাজে বসলেন।

'কাজ' অবশ্য এবার করল একা বিদ্যাধর। ওঁরা তিনজনে নীরব দর্শক। বিদ্যাধর প্রথমেই স্টপ-ককের প্যাঁচ ঘুরিয়ে গ্যাসের সাপ্লাইটা বন্ধ করে দিল। তার অর্থ ডান পাশের সব ঘরে গীজারগুলো অকেজো হয়ে গেল। কিন্তু তা টের পেতে আবাসিকদের দশ-পনের মিনিট সময় লাগবে। এয়ার-কন্ডিশনিংও যে বন্ধ হয়ে গেছে তা তৎক্ষণাৎ বোঝা যাবে না। 'শ্যাময়-লেদার'-এ জড়িয়ে সাবধানে বিদ্যাধর ঐ 'শর্ট-পীসটা' প্যাঁচ ঘুরিয়ে বার করে নিল। বাসু হাত বাড়িয়ে 'শ্যাময়-চামড়া' সমেত ছোট্ট পাইপের টুক্রোটা নিলেন। সযত্নে পকেটে রাখলেন। বিদ্যাধর বললে, সি ন্যাতাটো দিঅ আজ্ঞে। নতুন পীসটো জোড়াই করিবা হেবে।

বাসু বললেন, এখন আর ন্যাকড়া জড়াবার দরকার নেই। দাগ পড়ে তো পড়ুক। নাও তাড়াতাড়ি কাজটা খতম কর, পণ্ডা।

পণ্ডার কী-যেন খেয়াল হল। টর্চটা তুলে নিয়ে হাতের যন্ত্রটাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। যন্ত্র বলতে, বাসু-সাহেবের গাড়ি থেকে সদ্য-আমদানি বড় অ্যাডজাস্টেব্‌ল্ রেন্‌চ্। যেটিকে বাসু সযত্নে ফোগ্‌লা করে ওর ব্যাগে ভরে দিয়েছিলেন। পণ্ডার মুখে অতি দ্রুত কয়েকটি ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। বিস্ময়-কৌতূহল-উপলব্ধি-ক্রোধ!

অস্ফুটে স্বগতোক্তি করলে, শড়া হড়ামিকো বচ্চা!

কৌশিক বিস্মিত হয়ে বলে, এ কী! খিস্তি করছ কাকে?

পণ্ডা লজ্জা পেল। দু-হাত দু-কানে ছোঁয়ালো। বুঝিয়ে বলল, ওটা স্বগতোক্তি মাত্র — ঠিক স্বগতোক্তি নয়, গালাগালটা মদনার প্রতি প্রযোজ্য। অবশ্য 'মদন' ওর শ্যালক — তাকে 'শড়া' বলার অধিকার বিদ্যেধরের আছে। আর বাকি গালটুকু দেবারও যথেষ্ট হেতু আছে!

বুঝিয়ে বলে, মদ্‌না ওরই মতো প্লাম্বার মিস্ত্রি। ভবানীপুরের গাঁজা-পার্কের কাছাকাছি উড়িয়া-পাড়ায় থাকে। আগের দিন দুপুরে সে ভগ্নিপতির কাছ থেকে বড় রেন্‌চ্‌ চেয়ে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় ফেরৎও দিয়ে যায়। এখন দেখা যাচ্ছে যন্ত্রটার দুটো দাঁত ফোগ্‌লা।

আবার নেড়ে-চেড়ে দেখে বলে, সেইটা মোর রেনচু হবা না পারে!

বাসু ধমকে ওঠে : সেসব তোমাদের শালা-ভগ্নিপোতের ব্যাপার। এখন কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ কর দিকিনি।

বিদ্যাধর পুনরায় ঐ শ্যাময়-লেদারটা প্রার্থনা করে। বলে, না হলে পাইপে ফোগ্‌লা দাঁতের দাগ পড়ে যাবে।

বাসু আবার ধমকে ওঠেন, পড়ে পড়ুক! পাঁচ-মিনিটের মধ্যে কাজ খতম কর, বিদ্যাধর। আমার জরুরি কাজ আছে।

বিদ্যাধর আর বাক্যবিনিময় না করে ঐ ফোগ্‌লা রেন্‌চ্‌-এর সাহায্যেই শর্ট-পীসটা এঁটে দিল। এবার গ্যাস-লাইনের স্টপ-কক খুলে দিতে আর কোন অসুবিধা হল না।

ওঁরা সদলবলে ফিরে এলেন। প্রথম গাড়িতে বাসু-সাহেব, বিদ্যাধরকে নিয়ে। পরের গাড়িটায় কৌশিক চেক-আউট করে।

বিদ্যাধরের অনুরোধমতো তাকে ভবানীপুরে গাঁজা-পার্কের কাছে নামিয়ে দিলেন। গাড়িটা পার্ক করে বিদ্যাধরের হাতে একটা একশ' টাকার নোট ধরিয়ে দিতে গেলেন যখন, তখন সে প্রবল আপত্তি করল। তার বক্তব্য — ওর শ্যালক মদনের বেকসুর খালাসের ব্যাপারে উপযুক্ত 'ফী' সে দিতে পারেনি। এখন মজুরি সে কিছুতেই নিতে পারে না। বাসুও নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, মদন সেবার সত্যিই অপরাধী ছিল না, ফলে বাসু-সাহেব সত্যধর্মের জন্য লড়াই করেছেন। এটা তাঁর কর্তব্য ছিল। এজন্য ফী নেওয়াটাই তাঁর পক্ষে অন্যায়। তবে নাকি এটাই তাঁর পেশা, তাই যারা আর্থিকভাবে সমর্থ তাদের কাছে উনি 'ফী' নিয়ে থাকেন। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিছু কিছু উদ্ধৃতি শুনিয়ে 'নিষ্কাম কর্ম' কাকে বলে তা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বিদ্যাধর ঘন-ঘন মাথা নাড়ল।

বাসু বললেন, আমরা নিজেরা ভুল করি আর অন্য লোককে দায়ী করি। সেবার যেমন মদনাকে অহেতুক পুলিশে ধরে ছিল...

বিদ্যাধর মেনে নিল, ইটো যথার্থ বলিছেন, আজ্ঞে!

— কিম্বা এই যে তুমি একটু আগে মদনাকে গালমন্দ করলে, হয়তো দোষটা তার নয়। তোমার যন্ত্রের দাঁত সে ফেলেনি...

বিদ্যাধর তার মিশিমাখা দাঁত বার করে বললে, না, আজ্ঞে! ইটো মদ্‌নার বজ্জাতি বটে...

বাসু একটা বিশ টাকার নোট ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এক প্যাকেট ইন্ডিয়া-কিং সিগ্রেট কিনে আন তো পণ্ডা?

বিদ্যাধর রাস্তাটা পার হয়ে দোকান থেকে সিগ্রেট কিনে আনতে গেল। ওর বড় র‍্যাশন ব্যাগের থলিটা সীটে পড়ে ছিল। বাসু তার গর্ভ থেকে ওঁর নিজের ফোগলা যন্ত্রটা বার করে আনলেন, আর তোয়ালে জড়ানো যন্ত্রটা তোয়ালে খুলে সেখানে ঢুকিয়ে দিলেন।

একটু পরে বিদ্যাধর সিগ্রেট নিয়ে যখন ফিরে এল তখন বাসু বললেন, ঐ ঘরে একটা খুন হয়েছে, পণ্ডা। যে লোকটা খুন করেছে তাকে ধরবার জন্য আমি এই শর্ট-পীসটা সংগ্রহ করে রাখলাম, বুঝেছ? তুমি কাউকে বলবে না তোমাকে দিয়ে আমি এ-কাজটুকু করিয়ে দিয়েছি। কেমন?

বিদ্যাধর দু-হাত তার দু-কানে ঠেকালো।

— আর মদনার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কর না। সে তোমার যন্ত্রের দাঁত ভাঙেনি! বুঝলে? বাড়ি গিয়ে আগে ভাল করে নিজের যন্ত্রটা পরীক্ষা করে তারপর মদনার সঙ্গে ঝগড়া কর! কেমন?

বিদ্যাধর ঘাড় চুলকাতে থাকে। কথাটা তার পছন্দ হয় না।

চৌদ্দ

সাতটা দিন কেটে গেছে তারপরে।

অনিবার্যভাবে সাতটা সূর্যোদয় ও সাতটি সূর্যাস্ত অতিক্রান্ত, কেউ নজর করে দেখুক বা না দেখুক। কিন্তু আমাদের কাহিনী যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে স্মরণিকা সেনের তরফে জামিনের একটি আবেদন করা হয়েছিল। সেটি নাকচ করা হয়েছে। সত্যানন্দ সেনের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে জানা গেছে, বিলাসসিং যাদব যে গাড়িখানা নিয়ে মোটেলে এসে উঠেছিল সেটি 'রেন্ট-এ কার' সার্ভিসের। বিলাসের ড্রাইভিং লাইসেন্স, ট্রেড-ইউনিয়নের আইডেন্টিটি কার্ড ও কাগজপত্র দেখে গাড়িটি ভাড়া দিতে আপত্তি করেননি গাড়ির মালিক। মৃতদেহ যখন আবিষ্কৃত হয় তখন গাড়িটা গ্যারেজে ছিল না। পরদিন সেটা পাওয়া যায় দমদম এয়ারপোর্টে, প্রাইভেট গাড়ি পার্কিং-এর চিহ্নিত এলাকায়।

ধনঞ্জয় চৌবেকে জেরা করে পুলিশে কিছু সূত্র বার করতে পারেনি। হ্যাঁ, ধনঞ্জয় বিলাসকে চেনে, মানে চিনত। তারা একই সঙ্গে ধানবাদ থেকে কলকাতা আসে। বিলাস মাস-দুই-তিন ঐ সত্যানন্দের বাড়িতে ছিল। তার পার্টির কী-সব কাজ করত। বিস্তারিত ধনঞ্জয় বা তার স্ত্রী জানে না। জানার কথাও নয়, তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল না। ঘটনার কদিন আগে বিলাসসিং কোথায় যেন চলে যায়। সত্যানন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরই নাকি বিলাস ও বাড়ি ছেড়ে দেয়।

উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রবি বসু একদিন গোপনে দেখা করতে এসেছিল, বাসু-সাহেবের সঙ্গে। তার বক্তব্য : 'ভারতের সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।' আরক্ষা-বিভাগ সমেত।

অর্থাৎ অধস্তন কর্মচারী রবি বসুর ধারণা অপরাধটা স্মরণিকা সেন আদৌ করেনি। অনেক ভেবেচিন্তে সে অন্য সমাধানে এসেছে। প্রথম কথা, যে পদ্ধতিতে হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটা স্মরণিকার পক্ষে খাপ খায় না। ঘুমন্ত শত্রুটাকে দেখে যদি হত্যার অভিলাষ আদৌ জাগে, তাহলে খণ্ডমুহূর্তের উত্তেজনায় স্মরণিকার মতো মেয়ের পক্ষে ওর গলা টিপে ধরাই স্বাভাবিক হত। ঐ অবস্থায় তাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে নিচে গিয়ে গাড়ি থেকে রেঞ্চ বার করে আনার কথা তার মাথায় আসত না। পিছনের ঐ পাইপটা যে গ্যাসের, রেঞ্চের সাহায্যে তা যে খোলা যায়, এসব কথা সেই মারাত্মক মুহূর্তে তার মনে পড়া প্রত্যাশিত ঘটনা নয়। দ্বিতীয়ত, রাত দশটায় ঐভাবে একটা নিষ্ঠুর খুন সুচারুরূপে সম্পন্ন করে টুকুর বয়সী একটি তরুণীর পক্ষে ডায়মন্ড-হারবার রোড ধরে একা ড্রাইভ করে এসে সাড়ে-দশটায় যদু কলোনিতে পৌঁছানো এবং তৎক্ষণাৎ গব্‌গব্ করে এক প্যাকেট চাওমিঙ চিলি-চিকেন ভক্ষণ করাও সম্ভবপর নয়। হ্যাঁ, অর্ধভুক্ত চাওমিঙের প্যাকেটটা ওর ফ্ল্যাটবাড়ির ময়লা-ফেলা টিন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার গায়ে ঐ চীনেরেস্তোরাঁর বিজ্ঞাপন।

রবি বসুর অনুমান : অপরাধটা করেছেন স্বয়ং সত্যানন্দ সেন। তাঁর পাকা মাথা। ঠাণ্ডা মাথা। তাই মৃতের পকেট থেকে ধীরে-সুস্থে চাবিটা নিয়ে গ্যারেজ খুলে 'রেন্ট-আ-কার' সার্ভিসের গাড়িটা বার করেন রাত দশটা নাগাদ। গ্যাস-পাইপটা তিনিই খুলে দেন। তারপর সোজা ড্রাইভ্ করে চলে যান দমদম এয়ারপোর্ট। ওঁর পকেটে তখন নগদ চল্লিশ হাজার টাকা। হ্যাঁ, নিউ আলিপুর-শাখার গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক খাতাপত্তর দেখে বলেছে, ঘটনার দিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ শ্রীমতী স্মরণিকা সেন ব্যাঙ্কড্রাফ্ট্গুলি ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে রাত এগারো সাড়ে এগারোটা নাগাদ সত্যানন্দ যখন পার্কিং প্লেসে

গাড়িটা রেখে এয়ারপোর্ট এলাকায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর পকেটে নগদ প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা। না, ইন্টার-ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে তিনি যাননি। সেটা নিরর্থক হত। ওঁর কাছে পাসপোর্ট-ভিসা ছিল না। কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর যে কোন প্লেন ধরে এই মহান উপদ্বীপের যে কোন প্রান্তে চলে যাওয়ার কোনও বাধা ছিল না। হয়তো পরদিন ভোরের যে কোন প্লেনে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, গুজরাট থেকে গুয়াহাটি।

ভেবে দেখ তোমরা, বিলাস সিং যাদব সত্যানন্দেরই শত্রু। আর কারও নয়। স্মরণিকা তাকে প্রায় চিনতই না। আর যে অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন সে কথা মনে পড়ায়, সত্যানন্দ ক্ষণিক উত্তেজনায়, প্রতিশোধকামনায় ক্ষিপ্ত হয়ে...

কিন্তু হলে কী হবে? রবি বসু অধস্তন পুলিশ-কর্মচারী। মূল-গায়েনরা কীর্তনের যে-পদ গাইবেন রবির মতো দোহারকি তার ধুয়ো ধরে থাকে মাত্র। বড় কর্তারা তারা-উদারার খেল দেখাবেন, ও শুধু পোঁ ধরে থাকবে। তাই সে গোপনে সাক্ষাৎ করেছিল বাসু-সাহেবের সঙ্গে। এমন কাণ্ড সে আগেও করেছে। এটুকু ঝুঁকি নিতে রবি পিছপাও নয়।

বাসু রাজি হয়েছেন। তাঁর মক্কেল যদি খালাস পায় তাহলে রবিকে সাহায্য করতে তাঁর আপত্তি কী? শর্ত হয়েছে : রবি যেসব সূত্র সংগ্রহ করবে গোপনে জানিয়ে যাবে, আর বাসু যদি অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারেন, এমন কি সত্যানন্দ হলেও — তাহলে সবার আগে রবিকে গোপনে সেটা জানিয়ে দেবেন। অপরাধীকে চিহ্নিত এবং গ্রেপ্তার করার কৃতিত্ব লাভ করবে রবি বসু।

রবির সংগৃহীত সংবাদ : অটোপ্সি-রিপোর্ট প্রত্যাশিত বার্তা। অর্থাৎ চীনে-খাবারের সঙ্গে কাম্পোজ খাইয়ে বিলাসকে ঘুম পাড়ানো হয়। খাদ্য জীর্ণ হতে সবে শুরু করেছিল। এই সময় শ্বাসরোধ হয়ে লোকটা মারা যায়। ওর ফুস্‌ফুসে ঐ বিশেষ গ্যাসের ক্ষীণ অস্তিত্বও প্রমাণিত। আহার গ্রহণের একঘণ্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় কথা : ঐ ঘরে যে-সমস্ত লেটেন্ট ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেকগুলিই সনাক্ত করা গেছে : স্মরণিকা, বিলাস সিং, প্রবীর, ম্যানেজার প্রভৃতি। কিন্তু আরও দুটি ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে, যার হদিস মেলেনি। একটি সম্ভবত সত্যানন্দের। দ্বিতীয়টি কার? ঐ ঘরের পূর্বতন বাসিন্দার হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কারণ পূর্বতন বাসিন্দা চেক-আউট করার পর ঘরটা ঝাড়-পোঁছ করার প্রথা আছে। সেটি আততায়ীর হওয়ার সম্ভাবনা। রুম-সার্ভিসের ব্যবস্থা ওখানে নেই। সংলগ্ন রেস্তোরাঁ থেকে অবশ্য খাবার ঘরে আনা হয় ; কিন্তু সেখানকার কারও ফিঙ্গার-প্রিন্টের সঙ্গে ঐ টিপছাপ মিলছে না।

আজ বেলা দুটোর সময় প্রাথমিক কেসটা উঠবে। লাঞ্চ রিসেস্-এর পরে। সেশনস্-জাজ ঘোষের আদালতে। বাসু গাড়ি নিয়ে শেষবারের মতো তাঁর মক্কেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বেলা দশটা নাগাদ।

লোহার জালতির দু-পাশে দুজন। মেট্রন বসে আছে দূরে। শ্রুতিসীমার বাইরে কিন্তু দৃষ্টিসীমার নয়। বাসু বললেন, দেখা যাচ্ছে, তোমাকে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে উকিলের কাছ থেকে তোমার কোন কিছুই গোপন করা উচিত নয়!

— কেন, কী গোপন করছি আমি?

— গোপন কিছু করছ কিনা জানি না ; কিন্তু তোমার জেঠুকে খুঁজে বার করার যে প্রয়াস আমি চালিয়ে যাচ্ছি তাতে সাহায্যও করছ না।

টুকু কপালের উপর থেকে চুলের গোছাটা সরিয়ে দিয়ে ওঁর চোখে-চোখে তাকালো। বলল, মেসো! খোলাখুলিই বলি — আমি আপনাকে সবরকম ভাবে সাহায্য করতে রাজি ; কিন্তু জেঠুর ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কথা আমি বলব না।

— এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে, উনি তোমার জেঠু নন, তোমাদের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই...

— জানি! কী করব? সেটা আমার হাতের বাইরে। জন্মের জন্য আমি দায়ী নই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মেসো — এ দুনিয়ায় একমাত্র তিনিই আমার আপনজন। তাঁকে 'জেঠু' বলে ডেকেছি বরাবর ; কিন্তু তিনি বাস্তবে আমার বাবার মতোই।

— আচ্ছা, ঐ ব্যাপারটার কোন ফয়শালা হয়েছে? ভেবে বার করতে পেরেছ? তুমি কখন টাকাটা জেঠুর পকেটে দিয়েছ? সকালে না রাত্রে? ক্যাশ-সার্টিফিকেট না নগদ টাকা?

— হ্যাঁ, সেটা মনে পড়েছে। সকালে দিয়ে যাইনি। তা যদি বলে থাকি, তবে ভুল বলেছি। ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ সার্টিফিকেটগুলো দিনের বেলা ভাঙাই আর রাতে যদু কলোনিতে ফিরে আসার আগে টাকাটা ওঁকে দিয়ে আসি।

— মোটেলটার এয়ার-কন্ডিশনিং বা ইলেক্‌ট্রিসিটির বদলে গ্যাস ব্যবহার করার বিষয়ে কি জেঠুর সঙ্গে তোমার কোন কথা হয়েছিল?

টুকু ওঁর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলল, এ-প্রশ্নের জবাব আমি দেব না, মেসো! এ প্রশ্ন কেন করছেন তা বুঝতে পারার মতো সাধারণ বুদ্ধি আমার আছে।

বাসু বললেন, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, টুকু। তোমার জেঠু আমার মক্কেল নন। আমার একমাত্র লক্ষ্য তোমাকে বাঁচানো। বুঝেছ?

— বুঝেছি।

— এখানেই তোমাকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে। জজ-সাহেব জামিন মঞ্জুর করেননি।

— শুনেছি। ওটা ক্রমশ অভ্যাস হয়ে যাবে।

— আচ্ছা চলি।—বাসু উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ টুকুও লাফিয়ে উঠল। লোহার জালতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অস্ফুটে বলল, কেন এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না, মেসো? আমার বয়েস কম, আমার সহ্য-ক্ষমতা বেশি — দৈহিক আর মানসিক। দশ-বিশ বছরের জেল হলেও আমি সেটা সইতে পারব। কিন্তু এই...এই বাস্টার্ড মেয়েটাকে যিনি এতদিন বুক দিয়ে আড়াল করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি এ আঘাত সইতে পারবেন না। তাঁকে এ আঘাত আমি সইতে দেব না! কিছুতেই দেব না।

বাসুর ইচ্ছে হল ওর মাথায় একটা হাত রাখেন। সে ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ নেই। আসামী আর তার উকিলের মাঝখানে লোহার জালতি।

বেলা সাড়ে-এগারোটা নাগাদ ফিরে এলেন নিউ আলিপুরে। আহারাদি সারতে। দুপুরে আবার আদালতে যেতে হবে। কৌশিক-সুজাতা কেউই বাড়ি নেই। বিশ্বনাথ টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। বাসু যন্ত্রটা তুলে নিয়ে বললেন, ইয়েস, বাসু স্পিকিং...

ও-প্রান্তবাসিনী নিশ্চিন্ত হতে চাইল, 'বাসু' মানে মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল?

— দ্যাটস্ ইট! কে বলছেন?

— আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আপনার একজন 'ফ্যান'। মানে... আপনার সব ক্রিমিনাল কেসই আমি খুঁটিয়ে পড়ি। আমি বহু দূর থেকে ট্রাঙ্ক লাইনে কথা বলছি। একটা জরুরী খবর আপনাকে জানাতে চাই...

— বলুন?

— 'বলুন' নয়, 'বল'। আমি আপনার মেয়ের বয়সী।

— ও সব ফর্মালিটি ছেড়ে কাজের কথাটুকু বল। আজ দুপুরে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কেস আছে, আমার সময় কম...

— জানি স্যার। সেই কেস সম্বন্ধেই...আপনি যে বৃদ্ধটিকে খুঁজছেন...দমদম এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাঁকে ট্রেস করা যায়...

বাসুর মুঠি নিজের অজ্ঞাতসারেই শক্ত হয়ে ওঠে। যেন শক্ত হাতে রিসিভারটা ধরে থাকলে আচমকা

লাইন কেটে যাবার আশঙ্কা থাকে না। বলেন, ইয়েস, সেই বৃদ্ধ কোথায়?

— আমার হোটেলে। এখানে। মাত্র দশফুট দূরে।

— তোমার হোটেলে? কোথায় সেটা?

— দার্জিলিঙে-এ। হোটেল কুঞ্জুজ।

— তোমার নাম?

— মিসেস্ হেনা মণ্ডল।

— ঐ হোটেলের মালিক তুমি?

— ইন এ ওয়ে। পার্টনারশিপ বিজ্‌নেস।

— লুক হিয়ার হেনা! আমাদের প্রফেশানে নানান রকম কাণ্ড ঘটে। আমাকে দুটো বিকল্প সম্ভাবনাই যাচাই করে দেখতে হবে। তুমি কিছু মনে কর না যেন। এক নম্বর : হতে পারে, তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী। আমার ভালোর জন্যই গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে ট্রাঙ্ক-কল করছ। দু-নম্বর : তুমি আমার শত্রুপক্ষ। বিপথে চালনার জন্য বিপক্ষের পয়সায় আমাকে ট্রাঙ্ক-কল করছ।

— অল রাইট! আমি কিছু মনে করব না। আপনি কী ভাবে...

— বল্‌ছি। সেই বৃদ্ধটির নাম উচ্চারণ কর না। হেতুটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। তুমি কি জান, দমদমে প্লেন ধরতে যাবার আগে তিনি কোথায় ছিলেন?

— জানি না। কিন্তু আপনার এই কেসটা কাগজে যেটুকু বার হচ্ছে সব পড়েছি। তাছাড়া ক'দিন আগে সন্ধ্যাবেলা টি. ভি.তে...

— আই নো! আই নো! তুমি লাইন কেটে দাও। আমি 'টেলিফোন-অ্যাসিস্টেন্স' থেকে দার্জিলিঙ-এর 'হোটেল কুঞ্জুজ'-এর নম্বর সংগ্রহ করে তোমাকে পি. পি. কল করব। তবে টেলিফোনের যা অবস্থা, তোমাকে ধরতে পারব কিনা জানি না। যাই হোক, আমি একটা চান্স নেব। কাল সকালের ফ্লাইটে আমি বাগডোগরা যাচ্ছি, ওখান থেকে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিঙ। তুমি যদি আমার মিত্রপক্ষের হও তাহলে অশেষ উপকার করলে। আর যদি শত্রুপক্ষের হও তাহলেও প্রকারান্তরে উপকারই করলে — একদিনের জন্য দার্জিলিঙে ঘুরে এলে শরীরটা শান্ত হবে। মাথাটা খুলবে।

— থ্যাঙ্কু, স্যার। 'শত্রু-শিবির' বা 'মিত্র-নিবাস' যাই হোক, আপনি হোটেল কুঞ্জুজ-এ অতিথি হবেন কিন্তু।

— থ্যাঙ্কস্ তো আমিই দেব। তবে অত্যন্ত দুঃখিত, ঠিক এখনই দিতে পারছি না। ওটা মুলতুবি রাখতে হচ্ছে। তবে হোটেল কুঞ্জুজ-এই উঠব।

ও-প্রান্তবাসী হেসে উঠল।

— হাসছ কেন?

— হাসছি এজন্য যে, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না — আমি শত্রপক্ষের, না মিত্রপক্ষের! অথচ আমি আপনার কথাবার্তায় ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনি ভেজাল নন, টেলিফোনে যা শুনেছি তা টিপিক্যাল পি. কে. বাসুর ডায়ালগ।

লাইনটা কেটে দিল ও-প্রান্ত থেকে।

পনের

সেশন্‌স-জাজ ঘোষ বিচারকের আসনে বসে দেখে নিলেন বাদী ও বিবাদী পক্ষের উকিলেরা উপস্থিত কিনা। তারপর ঘোষিত হল : বিলাসসিং যাদবের হত্যা মামলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম শ্রীস্মরণিকা সেন ওরফে শ্রীস্মরণিকা দত্তের মামলা শুরু হচ্ছে।

পাব্‌লিক প্রসিকিউটরের তরফে ট্রায়াল ডেপুটি শ্রীহরেন মল্লিক ইতিপূর্বেই ওকালতনামা দাখিল করেছেন। উঠে দাঁড়িয়ে একটি 'বাও' করে তিনি বলেন, আদালত অনুমতি করলে আমি একটি প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে কেসটা শুরু করতে পারি।

জজ-সাহেব ঘোষ বললে, এ জাতীয় প্রাথমিক হিয়ারিঙে প্রারম্ভিক ভাষণ নিষ্প্রয়োজন।

হরেন মল্লিক বললেন, কেসটা যেহেতু জটিল, অনেক শাখা-প্রশাখায় কিছুটা দুর্বোধ্য, তাই আমাদের মনে হচ্ছিল একটি প্রারম্ভিক ভাষণ আদালতের কাজ সুবিধা করে দেবে।

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের আপত্তি নেই।

ঘোষ-সাহেব বললেন, ঠিক আছে। তবে অনুগ্রহ করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন।

হরেন মল্লিক আবার একটি 'বাও' করে বললেন, আমার মনে থাকবে, য়োর অনার। অত্যন্ত সংক্ষেপেই কেসটা নিবেদন করি : প্রতিবাদী শ্রীমতী স্মরণিকা দত্ত ওরফে সেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে করতেন যে, তিনি নিউ আলিপুরের বাসিন্দা শ্রীসত্যানন্দ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। আজন্ম স্মরণিকা দেবী ঐ বাড়িতেই মানুষ হয়েছেন ঐ পরিচয়ে। তিনি তাঁর জেঠার দেখাশোনা করতেন। বর্তমানে শ্রীসেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। শারীরিক ও মানসিক ভাবে অশক্ত। সেই সুযোগে প্রতিবাদী শ্রীমতী সেন ধীরে ধীরে বৃদ্ধের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করবার একটি পরিকল্পনা করেন। এই সময়ে ঘটনাচক্রে শ্রীসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীধনঞ্জয় চৌবে সস্ত্রীক ধানবাদ থেকে কলকাতায় আসেন। তাঁদের সঙ্গে আসেন শ্রীচৌবের বন্ধু শ্রীবিলাসসিং যাদব। ওঁরা এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন : বৃদ্ধ সত্যানন্দের অবস্থা দেখে! আলমারির চাবি, ব্যাঙ্কের খাতাপত্র সব কিছুই ইতিমধ্যে অসহায় বৃদ্ধের কাছ থেকে প্রতিবাদী কব্জা করে ফেলেছেন...

বিচারক শ্রীঘোষ বাধা দিয়ে বলেন, আপনি ওটা কী বললেন তখন? প্রতিবাদী 'মনে করতেন' যে, তিনি ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী? ডিড য়ু সে দ্যাট?

— ইয়েস, য়োর অনার। আমি সেকথাই বলেছি। সে প্রসঙ্গে এখনি আসব। এই পর্যায়ে শ্রীচৌবে প্রতিবাদিনীকে বলেন মাস দু-তিনের জন্য বিশ্রাম নিতে। একথা স্বীকার্য যে, 'তথাকথিত জেঠুর' সেবা করতে করতে মেয়েটি সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছিল। শ্রীচৌবে উৎসাহ করে প্রতিবাদিনীর পাসপোর্ট-ভিসা তৈরী করায়। লন্ডনে তার এক রিস্তেদারের বাড়িতে গেস্ট-হিসাবে প্রেরণ করে। এর কিছুদিন পরে শ্রীচৌবের আশঙ্কা হয় যে, শ্রীসত্যানন্দ সেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ঐ প্রতিবাদিনীকে দিয়ে যেতে চান। শ্রীসেন ঐ মেয়েটির প্রভাবে এমনই মোহগ্রস্ত যে, দু-হাতে টাকা দিতেন। মোটা অঙ্কের চেক কেটে মেয়েটিকে ফুর্তি করতে দিতেন...

— 'মোটা অঙ্কের চেক' বলতে কী বোঝাতে চান?

— শেষ চেকটি, যেটা দেখে শ্রীচৌবে আর স্থির থাকতে পারলেন না, সেটা ছিল সওয়া লক্ষ টাকার।

— কত টাকার? — মনে হল নিজের কানকেও বিশ্বাস করছেন না বিচারক।

— আজ্ঞে হ্যাঁ, নিউ-আলিপুরে গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের উপর এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার একটা বিয়ারার চেক। 'পেয়ী' ঐ স্মরণিকা!

জজ-সাহেবের আর ধৈর্যরক্ষা করা সম্ভবপর হল না। জানতে চাইলেন, ঐ মেয়েটি কি ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী?

— আজ্ঞে না, য়োর অনার। সেন পরিবারের সঙ্গে ওঁর কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। ওঁর গর্ভধারিণী হচ্ছেন স্বর্গগতা শান্তিরানী দত্ত। তিনি ছিলেন শ্রীসত্যানন্দের বাড়ির গভর্নেস। প্রতিবাদিনীর পিতৃপরিচয়

আমরা জানি না। শ্রীসত্যানন্দ সেন ওঁকে ভাইঝির মতো মানুষ করেন এবং মিথ্যা করে প্রতিবাদিনীকে বলেন যে, তিনি তাঁর জেঠামশাই। সে যাই হোক, প্রতিবাদিনীর বিদেশ যাত্রার পরেই শ্রীসেনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। শারীরিক এবং মানসিক। ওঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তখন তাঁকে একটি মানসিক হাসপাতাল বা স্যানিটেরিয়ামে স্থানান্তরিত করেন। একই সঙ্গে শ্রীচৌবে অশক্ত বৃদ্ধের জন্য একজন 'কনজারভেটর' নিযুক্তির জন্য আদালতে আবেদন করেন এবং একটি কোর্ট-অর্ডারে সেটি কার্যকরীও হয়...এই পর্যায়ে প্রতিবাদিনী বিলেত থেকে ফিরে আসেন। বৃদ্ধের সম্পত্তি-গ্রাসের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে তিনি এক হীন চক্রান্ত করেন। যে প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধ চিকিৎসাধীন ছিলেন সেই 'শান্তিধামে' নাম ভাঁড়িয়ে একটা চাকরি যোগাড় করেন...

জজ-সাহেব ঘোষ বলেন, এ-কথা প্রমাণ করতে পারবেন?

— পারব, য়োর অনার। 'শান্তিধাম স্যানিটেরিয়াম'-এর অন্তত সাতজন সাক্ষী প্রতিবাদিনীকে সনাক্ত করবে যে, তিনি 'কল্যাণী দাসী'র ছদ্মনামে ওখানে চাকরি নিয়ে ঢুকেছিলেন এবং পরদিনই বৃদ্ধকে অপহরণ করে সরিয়ে ফেলেন। শ্রীমতী স্মরণিকা বৃদ্ধকে ডায়মন্ড-হারবার রোডে অবস্থিত একটা মোটেলে নিয়ে যান। স্বনামে একটি ঘর বুক করেন। বৃদ্ধকে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দু-তরফা। প্রথমত, আদালত ইতিমধ্যে ডক্টর কৈলাশনাথ দাশগুপ্তকে নিযুক্ত করেছেন শ্রীসত্যানন্দ সেনকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে। ডক্টর দাশগুপ্ত সে-কাজ সম্পন্ন করলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হত যে, শ্রীসত্যানন্দ সেন একটি মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। যাকে বলা হয় : 'সেনাইল ডিমেনশিয়া'। প্রতিবাদিনীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ডাক্তারী পরীক্ষায় উনি মানসিকভাবে অসুস্থ প্রমাণিত হবার পূর্বেই তাঁকে দিয়ে একটা উইল তৈরী করিয়ে নেওয়া। সে যাই হোক, আমরা 'সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স' থেকে প্রমাণ করব যে, শ্রীচৌবের বন্ধু স্বর্গত বিলাসসিং যাদব কোনক্রমে জানতে পারে প্রতিবাদী কোথায় বৃদ্ধকে লুকিয়ে রেখেছেন। সে একটি গাড়ি ভাড়া করে ঐ মোটেলে হানা দেয় ; কিন্তু তার পূর্বেই প্রতিবাদিনী শ্রীসেনকে সুকৌশলে কোনও অজ্ঞাতস্থানে সরিয়ে ফেলেন। বিলাসসিং ওখানে পৌঁছে বৃদ্ধের দেখা পায় না। সে প্রতিবাদিনীকে বলে, এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া তাঁর অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে। প্রতিবাদিনী ঐ সময় কিছু চাইনীজ ফুড কিনে এনে সবে খেতে বসেছিলেন, তিনি বিলাসসিংকে খাদ্যের ভাগ নিতে আমন্ত্রণ করেন। বিলাস রাজি হয়। দুজনে খাবার ভাগ করে খেতে খেতে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু এই অবকাশে প্রতিবাদিনী বিলাসের খাদ্যাংশে কিছু কাম্পোজ ট্যাবলেট মিশিয়ে দিতে সক্ষম হন। বিলাস অনতিবিলম্বেই ঘুমিয়ে পড়ে। তখন প্রতিবাদিনী নিজের গাড়ির অ্যাডজাস্টেব্‌ল্ রেন্‌চ্ যন্ত্রটা নিয়ে এসে একটি গ্যাস-পাইপের জোড়াই খুলে দিয়ে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে পালিয়ে যান। ঘুমন্ত বিলাসের কিছু করার ছিল না। বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে মারা যায়।

এবারও ধৈর্যহারা হয়ে জজ-সাহেব প্রশ্ন করেন, সেই বৃদ্ধ, অর্ধোন্মাদ সত্যানন্দ সেন বর্তমানে কোথায়?

— তাঁর সন্ধান কেউ জানে না, য়োর অনার। পুলিশ তাঁকে খুঁজে পায়নি। হয়তো তিনি জীবিত নেই। পুলিশ প্রতিবাদিনীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। বস্তুত তাঁর উকিলের পরামর্শে তিনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃত। অথচ মজার কথা এই যে, আমরা দেখ্‌ছি : নিরুদ্দেশ হবার অব্যবহিত পূর্বে শ্রীসত্যানন্দ সেন — যিনি 'সেনাইল ডিমেনশিয়ার' অর্ধোন্মাদ রুগী — তিনি একটি স্বহস্ত-লিখিত উইলে পাকা-বয়ানে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ঐ রক্তের-সম্পর্ক-বহির্ভূত প্রতিবাদিনীকে নির্ব্যূঢ়-স্বত্বে দান করে গেছেন!

জজ-সাহেব ঘোষ অগ্নিদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখলেন প্রতিবাদিনীর দিকে। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, য়ু মে প্রসীড উইথ দ্য কেস!

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। সবিনয়ে জানতে চাইলেন, প্রতিবাদিনীর তরফে আমি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে পারি কি? কেস শুরু হবার আগে?

— নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি যদি তাই চান — বললেন সেশনস্ জাজ।

বাসু তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ শুরু করেন :

— সহযোগী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রারম্ভিক ভাষণে এই কেসটার জটিলতা সরল করে দেবেন। কিন্তু আমরা দেখছি, তিনি একটি সরল 'কেস'কে বাগ্‌বিস্তারের মাধ্যমে জটিল করে তুলেছেন। আমরা এখানে সমবেত হয়েছিলাম এই বিশ্বাসে যে, আমাদের মূল লক্ষ্য বিলাসসিং যাদব নামে এক ব্যক্তির হত্যায় স্মরণিকা সেনের হাত থাকতে পারে কিনা তাই যাচাই করা। সহযোগীর ভাষণে ঐ হত্যাকাণ্ড এবং তাতে প্রতিবাদিনীর ভূমিকার কথা ছিল সামান্যই—ওঁর বক্তব্যের সিংহভাগ অধিকার করে আছে কপোল-কল্পনায় ঘটনার বিকৃতি ঘটিয়ে স্মরণিকার চরিত্রহননের প্রচেষ্টা। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে সে-সব প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে—

— আমরা প্রমাণ করব : শতাব্দীর একপাদকাল — মানে দীর্ঘ পঁচিশ বছর, শ্রীধনঞ্জয় চৌবে তাঁর বৈমাত্রেয় দাদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। কিন্তু যেই মাত্র শুনলেন যে, দাদার সম্পত্তিটা লোভনীয় হয়েছে অমনি তিনি সস্ত্রীক এখানে এসে খুঁটি গেড়ে বসলেন। আমরা প্রমাণ করব : এই পঁচিশ বছরের ভিতর দুই ভাইয়ের পত্রালাপ ছিল না, এমন কি বিজয়ায়, নববর্ষে বা দেওয়ালীতে দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ভিতর কুশল বা পত্র বিনিময় হয়নি ; কিন্তু শ্রীধনঞ্জয় চৌবে তাঁর দাদার পঁচিশ বছর পূর্বেকার একটি বিশেষ পত্র — যাতে স্মরণিকার জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে বৈমাত্রেয় ভাইকে গোপনতা রক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলেন — সেই চিঠিখানি সযত্নে পঁচিশ বছর ধরে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। তাতে ন্যাপথলিন আর ডি.ডি.টি.-পাউডারের গন্ধ। অর্থাৎ শ্রীচৌবে জানতেন, ঐ পত্রখানি একটি মারাত্মক দলিল ! স্মরণিকাকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রয়োজনে একদিন-না-একদিন সেটা কাজে লাগবে। মাস তিন-চার আগে কলকাতা এসে যখন দেখলেন শ্রীসেন সুস্থ মস্তিষ্কে ঐ মেয়েটিকেই — সে ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী হোক-বা-না-হোক — তাঁর সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যেতে চান, তখন চৌবে-দম্পতি একটি নারকীয় পরিকল্পনা ফাঁদলেন। প্রতিবাদিনীকে বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। দেখা যাচ্ছে, স্মরণিকা বিলেত যাবার অব্যবহিত পরে — ঠিক যখন শ্রীচৌবের স্ত্রী, মিসেস্ চৌবে, বৃদ্ধের সেবাযত্নের ভার নিলেন তার পরেই — শ্রীসত্যানন্দ সেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। শারীরিক ও মানসিক ভাবে।...আমরা আরও প্রমাণ করব যে, সত্যানন্দ আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার স্ত্রী — যিনি একজন ট্রেইন্ড-নার্স, এবং যিনি স্মরণিকাকে দূরে পাঠানোর পর ওঁকে নানারকম ইনজেকশন-ঔষধ দিয়ে চলেছেন — তাঁর সেবাযত্নে উনি দুদিনেই বদ্ধোন্মাদ হয়ে যাবেন...

হরেন ঘোষাল উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, অবজেকশন, য়োর অনার ! এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা !

বাসু বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, আমি তো কোনও অভিযোগ আনিনি। আমি বলেছি, শ্রীসত্যানন্দ সেন ঐরকম আশঙ্কা করেছিলেন। 'আশঙ্কা'টা সত্যও হতে পারে, নাও পারে। কিন্তু সত্যানন্দ যে ঐরকম আশঙ্কা বাস্তবে করেছিলে, তার প্রমাণ আমি দেব। রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে 'ভীতি'টা মিথ্যা হয়ে যায় না !

দায়রা জাজ বলেন, 'অবজেকশন ওভাররুল্‌ড্'। প্রারম্ভিক ভাষণে এ-জাতীয় 'অবজেকশন' আদালত বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। য়ু মে প্রসীড, মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল !

বাসু বলতে থাকেন, ঐরকম আশঙ্কা হওয়ায় তিনি প্রতিবাদিনীকে একটি সওয়া-লক্ষ টাকার চেক পাঠিয়ে আদেশ করেন টাকাটা ভাঙিয়ে আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে। ওঁর বৈমাত্রেয় ভাই ও ভাই-বউ যদি ওঁকে 'ইন্‌কম্পিটেন্ট'-রূপে প্রমাণ করতে চান, তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কব্জা করে নেন, তাহলে যাতে প্রতিবাদিনী ওঁকে উদ্ধার করতে পারেন।...কিন্তু এসব আলোচনা বর্তমান 'কেস'-এর সঙ্গে খুব একটা সম্পর্কযুক্ত নয়। আমরা বিলাসসিং যাদবের মৃত্যু কেমন করে হল সে বিষয়েই এখানে অনুসন্ধান করতে বসেছি। আমরা প্রমাণ করব : ঘটনার দিন প্রতিবাদিনীর অনুপস্থিতিতে বিলাসসিং বৃদ্ধের কাছে আসে। সত্যানন্দকে বলে যে, সে একাই জানতে পেরেছে 'শান্তিধাম' থেকে পালিয়ে এসে উনি কোথায় লুকিয়ে আছেন। ধনঞ্জয় অথবা পুলিশ তা জানে না। বিলাস প্রস্তাব দেয়, তাকে নগদ এক লক্ষ টাকা দিলে সে

গোপনতা রক্ষা করবে, নচেৎ সে পুলিশে খবর দেবে, যাতে আবার ঐ বৃদ্ধকে শান্তিধামের খাটে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। আমরা প্রমাণ করব : ঐ সময় মরিয়া হয়ে শ্রীসত্যানন্দ সেন ওর খাবারে কাম্পোজ-ট্যাবলেট মিশিয়ে দেন, যাতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। এ-ছাড়া ওর হাত থেকে মুক্তির আর কোনও পথ খুঁজে পাননি অসহায় বৃদ্ধ। বিলাস সিং খাবারটা খেয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। সত্যানন্দ সেই সুযোগই খুঁজছিলেন। তার বহু পূর্বেই প্রতিবাদিনী ঘটনাস্থল ত্যাগ করে গেছে, নাহলে যে গাড়িতে তিনি ঐ মোটেলে এসেছিলেন সেই গাড়িতেই সত্যানন্দ নিশ্চয় পালাবার চেষ্টা করতেন। তখন বাধ্য হয়ে বিলাস সিং-এর পকেট হাতড়ে 'রেন্ট-আ-কার সার্ভিসের' গাড়ির চাবিটি উদ্ধার করেন। সেই গাড়ি চালিয়ে উনি স্বেচ্ছায়, নিজের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় দমদম এয়ারপোর্টে চলে যান। ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স-এর একটি টিকিট কেটে কলকাতা ত্যাগ করে যান। পরদিন পুলিশ ঐ মটোর-গাড়িটা এয়ারপোর্টের পার্কিং-লটে উদ্ধার করে। আমরা প্রমাণ করব : সত্যানন্দের মোটেল ত্যাগের পরে একজন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ঘরে প্রবেশ করে। নিদ্রিত বিলাস সিংকে দেখতে পায়। সে বিলাস সিং-এর মৃত্যুকামী। সে গ্যাস-পাইপের প্যাঁচটা খুলে দিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে নিঃশব্দে চলে যায়।

বিচারক প্রশ্ন করেন, এটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?

— ইয়েস, য়োর অনার। যদিও আমার দায়িত্ব শুধু এটুকুই প্রমাণ করা যে, গ্যাস-পাইপের প্যাঁচ যে খণ্ড-মুহূর্তে খোলা হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রতিবাদিনী অকুস্থল থেকে অন্তত সাত-মাইল দূরে—যদু কলোনিতে!

ঘোষ-সাহেব মিনিটখানেক স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর হরেন ঘোষালের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আপনার এক নম্বর সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

প্রথম সাক্ষী : প্রবীর ঘোষাল।

যথারীতি শপথ গ্রহণ করে সাক্ষীর মঞ্চ থেকে প্রবীর নিজের নাম, পরিচয়, পেশা ইত্যাদি জানালেন। জানালেন যে, ঘটনার দিন-তিনেক আগে থেকেই তিনি দুই-নম্বর ঘরে বাস করতেন। তিনি ঐ কারখানার সাপ্লায়ার। কিছু 'এরিয়ার-বিল'-এর হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে তাঁকে ওখানে দু-তিন দিন থাকতে হয়। বললেন, যে, ঘটনার দিন প্রতিবাদিনী মিস্ সেন এবং একজন বৃদ্ধ যখন মোটেলে আসেন তখন তিনি দেখেছিলেন। ওঁরা ঠিক পাশের তিন-নম্বর ইউনিটটা ভাড়া করেন। তখন সকাল ছয়টা সওয়া ছয়টা হবে। তারপর সারাদিনই এখানে-ওখানে ঐ বৃদ্ধ এবং তরুণীকে তিনি দেখেছেন। ওঁর ধারণা হয়েছিল ওঁরা দাদু ও নাতনী। বৃদ্ধের সঙ্গে দু-একটি কথাও হয়। তা থেকে জানতে পারেন, প্রতিবাদিনীর ডাকনাম 'টুকু'। সে যাই হোক, রাত দশটা-সওয়া দশটায় প্রবীর নিজে মোটেল-সংলগ্ন চীনা রেস্তোরাঁয় নৈশাহার করতে যান। আহারাদি করে ফিরে আসেন ঠিক এগারোটায়। তাঁর মনে আছে, কারণ তিনি ঘড়ি দেখেছিলেন। নিজের দু-নম্বর ইউনিটের দরজা খুলবার সময় তিনি 'গ্যাস'-এর গন্ধ পান। প্রবীর দু-তিনদিন ঐ মোটেলে আছেন, তিনি ভাল-ভাবেই জানেন যে, মোটেল-ইউনিটে কোনও কিচেনেট বা গ্যাস-স্টোভ নেই। তাঁর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার কথা। তিনি নিচে নেমে আসেন। কোন লোকজন তাঁর নজরে পড়ে না। বাইরের বাতাসে গ্যাসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আবার দ্বিতলে উঠে যান। এবার তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়, গন্ধটা ঐ তিন-নম্বর ইউনিট থেকেই আসছে। বারকতক কলবেল বাজান। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কাও দেওয়া হল। কিন্তু কারও সাড়া পাওয়া যায় না। তখন তিনি মোটেল-ম্যানেজারকে খবর দেন।

— তখন ঠিক কয়টা? — প্রশ্ন করেন হরেন ঘোষাল।

— আমি ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজে মনে হয় এগারোটা পাঁচ-সাত হবে।

হরেন ঘোষাল বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, য়োর উইটনেস!

বাসু প্রশ্ন করেন, আপনি বলেছেন, পাশের ঘরে অর্থাৎ তিন-নম্বর ইউনিটে এক বৃদ্ধ এবং তরুণী উঠেছেন তা আপনি সকাল ছয়টার সময় লক্ষ্য করেন। এবার বলুন : ঐ বৃদ্ধকে শেষ কখন দেখেন

এবং কোথায় দেখেন?

— ঐদিন বেলা চারটে নাগাদ, ডায়মন্ড-হারবার রোডের বাসস্ট্যান্ডে।

— আপনার সঙ্গে তাঁর কি কোন কথোপকথন হয়েছিল? হয়ে থাকলে কী কথোপকথন হয়েছিল?

প্রবীর ইতিপূর্বে কৌশিককে যা বলেছে তারই পুনরাবৃত্তি করল। বেলা চারটের সময় সে তারাতলা-মোড়ের কাছে বৃদ্ধকে নামিয়ে দেয়। তারপর সেখান থেকে তিনি কী করে দমদম যান, আদৌ যান কিনা, তা সে জানে না। প্রবীর আরও জানালো, বৃদ্ধের সঙ্গিনীকে — পরে জেনেছে সেই হচ্ছে ঐ প্রতিবাদিনী শ্রীমতী স্মরণিকা — সে দুপুরে বা বিকেলে দেখেনি।

পরবর্তী সাক্ষী মোটেলের ম্যানেজার সুশীল দত্ত। তার সাক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হল মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে রাত এগারোটা নাগাদ। ডাক্তারবাবু অফিশিয়ালি তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এগারোটা সাতে। এত শীঘ্র সেটা সম্ভবপর হয়েছিল এজন্য যে, মোটেলের অন্য একটি ইউনিটে ছিলেন একজন ডাক্তার যিনি চেঁচামেচি শুনে উঠে আসেন। দত্তের জবানবন্দীতে দুটি গাড়ির নম্বর, কে-কখন এসেছে তা জানা গেল। স্মরণিকা তার অ্যাম্বাসাডার গাড়ি ও বৃদ্ধ সহযাত্রীকে নিয়ে চেক-ইন করে সকাল ছয়টা বেজে তিন-মিনিটে। চার-নম্বর ইউনিটটি ভাড়া নেয় শঙ্করপ্রসাদ দোবে। পরে প্রমাণিত হয়েছে, তার আসল নাম বিলাসসিং যাদব। তার চেক-ইন টাইম সকাল ছয়টা সাতাশ।

বাসু সুশীল দত্তকে জেরা করলেন না।

সরকার পক্ষের তৃতীয় সাক্ষী ডক্টর অতুলকৃষ্ণ সান্যাল।

তাঁর মতে বিলাসসিং যাদব শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে অক্সিজেনের অভাবে। মৃত্যুসময়ে সে অঘোরে ঘুমে অচেতন ছিল, কারণ তার পাকস্থলীতে অর্ধজীর্ণ খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে 'কাম্পোজ'-নামে একটি ঘুমের ওষুধ ছিল। ডাক্তার সান্যালের মতে মৃত্যুর সময় রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটা।

হরেন ঘোষাল বাসুকে বললেন, য়ু মে ক্রস হিম নাউ।

বাসু প্রশ্ন করেন, আপনি বলেছেন মৃত্যুর সময় রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটা। এটা কী-ভাবে নির্ধারণ করলেন? রিগার-মর্টিস্ দেখে? নাকি ওঁর পাকস্থলী বা অন্ত্রে অর্ধজীর্ণ খাদ্যের রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে?

— দ্বিতীয় পদ্ধতিতে।

— মৃতের পাকস্থলী ও অন্ত্রে কী-জাতীয় খাদ্য আবিষ্কার করেছেন?

— আমার মনে হয়েছে তা চাও-মিঙ এবং চিলি-চিকেন। আর কাম্পোজ।

— মৃতব্যক্তির পাকস্থলী ও অন্ত্রে যে অর্ধজীর্ণ খাদ্য পাওয়া যায় তা পরীক্ষা করে কি বলা যায় যে, ওটা 'চাও-চাও', না 'চাও-মিঙ' অথবা 'ফুয়ো-মিঙ-চাও'? এবং প্রোটিন-অংশটা 'চিলি-চিকেন' অথবা 'ফ্রায়েড-চিকেন উইথ চিলি'?

ডঃ সান্যাল একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। ভেবে নিয়ে বললেন, 'চাও-চাও', 'চাও-মিঙ' আর 'কুয়োমিঙ-চাও'-এর পার্থক্য ঠিক কী, তা আমি জানি না। পাকপ্রণালী বা রন্ধনবিদ্যায় আমি বিশেষজ্ঞ নই। আমি ঐ নামগুলি বলেছি এজন্য যে, শুনেছি এই খাবারগুলি ঐ তিন-নম্বর ইউনিটে আনা হয়েছিল।

— আই সী! তার মানে বিশেষজ্ঞ হিসাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল নয়! লোকের কথায়, হেয়ার-সে রিপোর্টের ভিত্তিতে আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন?

ডঃ সান্যাল রুখে ওঠেন : এগুলোকে 'হেয়ার-সে' রিপোর্ট বলে না। মৃতের নাম যে 'বিলাস', প্রতিবাদিনীর নাম যে 'স্মরণিকা', এক হিসাবে এও তো শোনা কথা। এমন কি আমার নাম যে 'অতুলকৃষ্ণ' তাও তো ঐ হিসাবে হলফ নিয়ে বলতে পারব না, যেহেতু আমার নামকরণের সময়...

— দ্যাটস্ অল! দ্যাটস্ অল্! এবার বলুন, খাদ্য গ্রহণের কতক্ষণ পরে মৃত্যু হয়েছে?

ডঃ সান্যাল প্রতিপ্রশ্ন করেন, কী জানতে চান? খাদ্য-গ্রহণের শুরু থেকে সময়টা ধরব, না খাদ্য-গ্রহণ সমাপ্তির পর?

— খাদ্য-গ্রহণ সমাপ্তির পর?

— আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

— আহার করতে ওঁর কতক্ষণ লাগে বলে মনে হয়? জাস্ট য়োর গেস্!

— মিনিট পনেরো।

— এবার বলুন, খাদ্য-গ্রহণের শুরু থেকে ধরলে তার কতক্ষণ পরে মৃত্যু হয়েছে?

হরেন ঘোষাল বলে ওঠেন, অবজেকশন, য়োর অনার! সহযোগী অহেতুক আদালতের সময় নষ্ট করছেন!

বিচারক বাসুর দিকে তাকাতে বাসু বলে ওঠেন, নো, য়োর অনার। আমি দেখাতে চাইছি, বর্তমান সাক্ষী পুলিশের একটি বিশেষ থিয়োরীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ব-সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বিশেষজ্ঞ হিসাবে মহামান্য আদালতকে সত্য-নির্ধারণে সাহায্য করতে নয়। আমি যখন প্রশ্ন করলাম, খাদ্য-গ্রহণের কতক্ষণ পরে মৃত্যু হয়েছে তখন ওঁর প্রতিপ্রশ্ন ছিল 'খাদ্য-গ্রহণের শুরু থেকে সময়টা ধরব, না সমাপ্তির পর'? এ-প্রশ্ন যিনি জিজ্ঞাসা করছেন তিনি নিশ্চিয় তাঁর অসংখ্য রোগীকে ব্লাড-সুগার করাতে নির্দেশ দেন, 'আহারের দুইঘণ্টা পরে ব্লাড দেবেন'। ব্যাখ্যা করে বলেন না, শুনুন মশাই, সময়টা আহার্য-গ্রহণের শুরু থেকে ধরবেন না, আঁচানোর পর থেকে ধরবেন। আমি যখন ব্যাখ্যা করে বললাম, আহার্য-গ্রহণের পর থেকে সময়টা ধরতে, তখন ওঁর জবাব হল 'আধঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট'। এখন আমি জানতে চাই, এবার ওঁর জবাব কী হবে? সেই আন্দাজিক্যালি 'আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট?' অথবা পনের-মিনিট এদিক-ওদিকে যোগ করা? সেই উত্তর থেকে বোঝা যাবে সাক্ষী অকপটে তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে আদালতকে সাহায্য করতে প্রস্তুত অথবা পুলিশ যেভাবে সাক্ষ্য দিতে বলেছে...

বিচারক ঘোষ বলেন, অবজেকশন ওভাররুলড। অ্যানসার দ্যাট কোশ্চেন।

ডঃ সান্যাল বললেন, আন্দাজে ঐ রকমই বলা যেতে পারে, আধঘণ্টা থেকে পৌনে একঘণ্টা।

— আহার-কার্য শুরু থেকেও তাই, সমাপ্তি থেকেও তাই? পনের মিনিট গ্যাপ্? তাহলে কেন জানতে চেয়েছিলেন, শুরু থেকে বলবেন না সমাপ্তি থেকে?

হরেন ঘোষাল আবার দাঁড়িয়ে উঠেছে দেখে বলেন, অল রাইট! আই উইথড্র! ও প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না আপনাকে। এবার বলুন ডাক্তার সান্যাল, আপনার সুচিন্তিত অভিমত মৃত্যু রাত দশটার আগে হতে পারে না, কেমন তো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।

— আমি যদি বলি মৃত্যু হয়েছে, দশটা বাজতে পাঁচে?

— 'দশটা' মানে 'দশটা বাজতে পাঁচ' হতে পারে বৈকি!

— না, তাহলে চলবে না। আপনি এক্সট্রিম্ লিমিটটা বিশেষজ্ঞ হিসাবে দয়া করে ঘোষণা করুন।

ডক্টর সান্যাল বললেন, সাড়ে নয়টার আগে কিছুতেই নয়।

— ধরুন, নয়টা আঠাশ?

ডক্টর সান্যাল রুখে ওঠেন, না!

— নয়টা উনত্রিশ?

— এ কি মাছের বাজার পেয়েছেন নাকি? বলছি তো, না!

— নয়টা একত্রিশ?

হরেন ঘোষাল আবার দাঁড়িয়ে ওঠেন : অব্জেকশন য়োর অনার! সহযোগী ক্রমাগত অহেতুক আদালতের সময় নষ্ট করছেন। সাক্ষী বিশেষজ্ঞ হিসাবে ইতিপূর্বেই বলেছেন — এক্সট্রিম লিমিট সাড়ে নয়টা। তারপর...

— অব্জেকশান সাসটেইনড্।

— দ্যাটস্ অল, য়োর অনার! আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

এরপর হরেন ঘোষাল একের পর এক সাক্ষী মঞ্চে তুলতে থাকেন। প্রথমেই ডক্টর নিত্যানন্দ রথ। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বর্ণনা দিলেন কীভাবে প্রতিবাদিনী কল্যাণী দাসীর পরিচয়ে শান্তিধাম স্যানিটেরিয়ামে চাকরি নেয়, এবং ডায়মন্ড-হারবার থেকে জামা-কাপড় আনতে যাবার ছুতো করে ছুটি নিয়ে সরে পড়ে। যাবার সময় সত্যানন্দ সেনকে অপহরণ করে। নিত্যানন্দের মতে — শ্রীসত্যানন্দ যে অসুখে ভুগছিলেন তার নাম 'সেনাইল ডিমেনশিয়া'র প্রাথমিক অবস্থা। তিনি আশা করেছিলেন ডক্টর কৈলাশনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ডায়াগনসিস্ কনফার্ম করবেন। প্রতিবাদিনী মাঝখান থেকে রুগীকে অপহরণ করায় সেটা করা যায়নি।

বাসু-সাহেব তাঁকে ক্রস-এগজামিন আদৌ করলেন না।

পরবর্তী সাক্ষী পুলিশ ল্যাবরেটারির একজন রসায়নবিদ। তাঁকেও ক্রস করলেন না বাসু-সাহেব। তাঁর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হল তিন-নম্বর ইউনিটে প্রাপ্ত বাথরুমের মগের ভিতর দিকে এবং একটি টুথপেস্টের খোলের বাইরের দিকে কাম্পোজ ঔষধের চূর্ণ পাওয়া গেছে। বেশ বোঝা যায়, কেউ ঐ মগটাকে 'খল' আর টুথপেস্টের শক্ত খোলটাকে 'নুড়ি' হিসাবে ব্যবহার করে কাম্পোজ ট্যাবলেট গুঁড়ো করেছিল।

বাসু নিমীলিত নেত্রে এইসব সাক্ষীর বক্তব্য শুনে গেলেন। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তিনি নিদ্রাভিভূত। মোটকথা কাউকেই উনি ক্রস করলেন না। তার পরবর্তী সাক্ষী মঞ্চে উঠে শপথ নিতেই সোজা হয়ে বসলেন বাসু-সাহেব।

ইন্সপেক্টর বরাট শপথ নিয়ে তার প্রাথমিক তদন্তের বর্ণনা দিল। স্থানীয় থানা টেলিফোন পায় রাত এগারোটা বাইশে। বরাট একজন জুনিয়ার ও দুটি কন্সটেব্‌ল নিয়ে অকুস্থলে উপনীত হয় রাত বারোটা সতেরোয়। অত রাত্রে তারা বিশেষ কিছু করতে পারে না। প্লাম্বারের সাহায্যে শর্ট-পীসটা এঁটে দিয়ে স্টপ-ককের চাবি খুলে দিয়ে, আর ঘরটা তালাবন্ধ করে ফিরে আসে। পরদিন খুব ভোরে ওরা আবার যায়। লেটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে। মোটেলের রেজিস্টারের ফটো কপি করে। মৃতদেহ সনাক্ত করায় এবং অপসারণ করে। বরাট আরও জানায়, মৃতদেহ সনাক্ত হবার আগেই প্রতিবাদীর উকিল দুখানা গাড়ি নিয়ে অকুস্থলে হাজিরা দেন। তার সঙ্গে বাসু-সাহেবের কী কথোপকথন হয়েছিল সে-কথাও বিস্তারিত জানায়। স্বীকার করে যে, বাসু-সাহেবের গাড়ির পিছনের সীটে দুজন মহিলা ছিলেন। কিন্তু বরাট তাদের লক্ষ্য করে দেখেনি। না, সে হলপ নিয়ে বলতে পারবে না যে, ওদের মধ্যে একজন ঐ প্রতিবাদিনী! সেই মেয়েটির বয়স কত, কী পোশাকে ছিল, কী করছিল সে ইত্যাদি হরেন ঘোষালের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবেই বরাট জানালো : তার মনে নেই। সে লক্ষ্য করে দেখেনি। তবে তার আধঘণ্টা পরে যদু কলোনীতে ঠিকানা খুঁজে-খুঁজে গীতা করের বাসায় উপস্থিত হয়ে যখন সে মিস্টার পি. কে. বাসুকে প্রতিবাদিনীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে তখন তার সন্দেহ হয়েছিল — ঐ মেয়েটিকেই সে আধঘণ্টা আগে দেখেছে! না — একথা সে হলপ নিয়ে বলতে পারবে না — এ তার আন্দাজ মাত্র।

ইন্সপেক্টর বরাটের দীর্ঘ জবানবন্দি শেষ হবার পর বাসু উঠে দাঁড়ালেন তাকে ক্রস-একজামিন করতে : ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি আপনার জবানবন্দিতে বলেছেন যে, ঐ তিন-নম্বর ঘরে একটি গ্যাস-পাইপের প্যাঁচ খুলে দেওয়ায় বদ্ধ ঘরে অক্সিজেনের অভাবে বিলাসসিং মারা যায়। তাই না?

— হ্যাঁ, তাই বলেছি আমি।

— এবং আপনার বিশ্বাস বিলাসসিং ঘুমিয়ে পড়ার পর পাইপটা খোলা হয়। তাই তো?

— নিশ্চয়। বিলাস জেগে বসে আছে আর দেখছে তার চোখের সামনে কেউ গ্যাস-পাইপ খুলছে, যাতে সে মরতে পারে — এমন কল্পনা করা কি সঙ্গত?

— তা নয়, আমি ভাবছিলাম : বিলাস যদি নিজেই পাইপটা খুলে দিয়ে থাকে তাহলে সে তা করেছে ঘুমিয়ে পড়ার আগে...

— নিজেই পাইপটার প্যাঁচ খুলে দিয়েছে? কেন?

— ধরা যাক। আত্মহত্যা করতে?

বরাট হাসল। বিজয়ীর হাসি। বললে, যে অস্ত্রের সাহায্যে মৃত্যু ঘটানো হয় সেই অস্ত্রটি যখন অকুস্থলে খুঁজে পাওয়া যায় না তখন আমরা আত্মহত্যার সম্ভাবনাটাকে বাতিল করে থাকি, স্যার।

— অস্ত্র? এখানে তো ছোরা-ছুরি-রিভলভারের মাধ্যমে হত্যা করা হয়নি!

— তা হয়নি। তবে একটা 'অ্যাডজাস্টেব্‌ল্‌ পাইপ-রেন্‌চ্‌'-এর প্রয়োজন ছিল অনিবার্য। খালি হাতে ঐ পাইপ কেউ খুলতে পারে না।

— আহ্‌ ইয়েস! 'অ্যাডজাস্টেব্‌ল্‌ পাইপ-রেন্‌চ্‌'। তার সাহায্য ছাড়া ঐ পাইপের জোড়াই খোলা যায় না। তাই নয়?

— হ্যাঁ, তাই।

— খুব জোর লাগে নিশ্চয়? দৈহিক শক্তির কথা বলছি!

বরাট হাসল। বলল, তা লাগে। তবে যদি জানতে চান যে, একজন বিশ-পঁচিশ বছরের সুস্থ-সবল তরুণীর দৈহিক ক্ষমতায় তা সম্ভব কিনা, তাহলে...

— না, ইন্সপেক্টর! আমি সে-কথা জানতে চাইনি আদৌ। আমি বরং জানতে চাইছি : খুব জোর দিয়ে ঘোরাতে হলে অ্যাডজাস্টেব্‌ল্‌-রেন্‌চ্‌টাকে খুব কষে সাঁটতে হবে। ফলে পাইপে তার দাঁতের দাগ থেকে যাবার কথা। তাই না?

— হ্যাঁ, তাই।

— সেই রকম দাগ দেখতে পেয়েছিলেন বলেই আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আততায়ী একটি 'অ্যাডজাস্টেব্‌ল্‌-রেন্‌চ্‌'-এর সাহায্যে ঐ শর্ট-পীসটা খুলে ফেলেছিল। তাই নয়?

— ঠিক তাই।

— ও. কে.! আপনি কি ক্লোজ-আপ অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে ঐ শর্ট-পাইপটার দাগের ফটোগ্রাফ নিয়েছিলেন?

— ফটোগ্রাফ? ফটো নেব কেন?

— নিয়েছিলেন কিনা তাই শুধু জানতে চাইছি। 'কেন' করবেন সেটা পরের কথা।

— না, নিইনি।

— তার মানে বাজার থেকে ঐ মাপের একটি শর্ট-পীস কিনে এনে আপনি লাগিয়ে দেন আর সেই 'দাগী' শর্ট-পীসটিকে এভিডেন্স হিসাবে সংগ্রহ করেন?

— আজ্ঞে না। তা করতে যাব কেন?

— আবার আপনি 'কেন-কেন' করছেন! আমি যা জানতে চাই শুধু তার জবাব দিন। আপনি কি ঐ দাগগুলো মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করেছিলেন?

— মাইক্রোস্কোপ! কেন? আই মীন : না, করিনি!

— কোন বড় ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে?

— আজ্ঞে না, মশাই। খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল 'রেঞ্চ' দিয়ে চেপে ধরায় পাইপে দাগ পড়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেউ সেটা সম্প্রতি প্যাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলেছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়াই তা দেখা যাচ্ছিল।

— আপনি কি কর্নেল চার্লস অগাস্টাস লিন্ডবার্গ-এর নাম শুনেছেন?

বরাট নির্বাক তাকিয়ে আছে দেখে লাফিয়ে ওঠেন হরেন ঘোষাল : অব্‌জেকশন, য়োর অনার। ইন্‌কম্পিটেন্ট, ইম্মেটিরিয়াল অ্যান্ড অ্যাবসার্ড! নো ফাউন্ডেশন হ্যাজ বিন লেইড!

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে ফিরলেন। বাসু-সাহেব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন : কর্নেল লিন্ডবার্গ একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈমানিক। উনিশশ সাতাশ সালে একা একটা প্লেন নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারী পাড়ি দিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন। তাঁর এক বছর বয়সের পুত্রকে একজন অপহরণ করে কয়েক লক্ষ ডলার 'র‍্যানসম মানি' দাবী করে। মাস্টার লিন্ডবার্গ ছিলেন দোতলার ঘরে। তাই অপহরণকারী একটি কাঠের

মই নিয়ে এসে বাইরে থেকে জানলা খুলে ঘরে ঢোকে। ঘটনাচক্রে মইটা ভেঙে যায়। অপহরণকারী লিন্ডবার্গের শিশুটিকে নিয়ে এবং মইটাকে ফেলে পালিয়ে যায়।...পরে মার্কিন গোয়েন্দা-বিভাগ ঐ কাঠের মই-য়ের সূত্র থেকে আবিষ্কার করে আততায়ী কোন কাঠগোলা থেকে মইটা কিনেছিল।

জজসাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন। বলেন, সেটা কেমন করে?

— প্রতিটি টাইপরাইটারের, প্রতিটি রিভলভারের যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে তেমনি প্রতিটি করাত-বাটালি-প্লেনযন্ত্রেই তা থাকে কিনা তা বিজ্ঞান এখনো জানে না ; কিন্তু যন্ত্রে যদি কোনও 'ডিফেক্ট' থাকে — ভাঙা দাঁত থাকে — তবে তা টের পাওয়া যায়।...যুক্তির খাতিরে ধরা যাক তিন-নম্বর ইউনিটের শর্ট-পীসে কোন দাঁতের দাগ নেই এবং পুলিশ প্রতিবাদিনীর যে গাড়িটা সীজ করেছে তার ভিতর বড় রেঞ্চ-যন্ত্রটার একটা দাঁত ভাঙা। তাহলে আমরা ডিফেন্সের তরফ থেকে বলতে পারব : প্রতিবাদিনী তার গাড়ির যন্ত্র ব্যবহার করে ঐ পাইপ খোলেনি।

ঘোষ সাহেব বললেন : আ! নাউ আই রিমেম্বার! চার্লস লিন্ডবার্গের শিশু-অপহরণকারী শেষমেশ ধরা পড়ে আর তার ডেথ্-সেন্টেন্স হয়!

— ইয়েস, য়োর অনার! এবং পুলিশ যেসব যুক্তি দেখিয়েছিল তার অন্যতম ছিল ঐ ভাঙা মইয়ে ব্যবহৃত প্লেন-যন্ত্রের ফোগলা দাঁতের দাগ!

জজসাহেব সম্মতিসূচক শিরশ্চালন করে বললেন, অবজেকশন ওভাররুলড্। আনসার দ্যাট কোশ্চেন!

বরাট অকপট জবাব দিল : ইয়েস স্যার, আপনি যখন প্রশ্ন করেন তখন আমি জানতাম না কর্নেল লিন্ডবার্গ কে ; কিন্তু এখন আমি তা জানি। সেটা কথা নয়, কথা হচ্ছে : আমি স্বীকার করছি — ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হিসাবে ঐ পাইপের টুকরোটা আমারা সংগ্রহ করা উচিত ছিল। যাহোক সে ত্রুটি এখনো শোধরানো যায়—

বাসু হেসে বললেন, যায় না ইন্সপেক্টার! এতদিন পরে আপনি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না: পুলিসে সীজ করা গাড়ির ভিতর থেকে রেঞ্চটা কেউ বদল করেনি! এনি ওয়ে, দ্যাটস্ অল য়োর অনার!

জাস্টিস ঘোষ ক্যালেন্ডার দেখে বললেন, শনি-রবি বাদ দিয়ে সোমবার সকাল দশটায় আবার আদালত বসবে। আসামীকে জেনানা জেল-হাজতে রাখতে হবে।

আদালত ভাঙার আগে বাসু-সাহেব এগিয়ে গিয়ে মেট্রনকে বললেন, আসামীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলার আছে।

— ইয়েস স্যার। আসুন এদিকে...

নির্জন ঘরে ওকে বসিয়ে বাসু বললেন, তোমাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই, টুকু...

— বলুন, তবে জেঠু সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের জবাব আমি যে দেব না সে-কথা তো আগেই বলেছি।

— হ্যাঁ, মনে আছে আমার। জেঠু সম্বন্ধে নয়, সূর্যের সম্বন্ধে।

— কীসের সম্বন্ধে?

— সূর্য। দ্য সান্! এক নম্বর প্রশ্ন : মাউন্ট আবুতে একটা সানসেট পয়েন্ট আছে। তুমি কি কখনো সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখেছ?

টুকু অবাক হল। সংক্ষেপে বলল, না।

— 'বিবেকানন্দ রকে' বসে একই দিনে সমুদ্র থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখেছ?

টুকু রীতিমতো বিস্মিত। বলল, দেখেছি। জেঠুর সঙ্গে ছেলেবেলায় কন্যাকুমারী বেড়াতে গেছিলাম। তখন। সেকথা কেন?

— কোন হোটেলে উঠেছিলে?

— তা আমার মনে নেই।

— টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখেছ কখনো? দার্জিলিঙে?

— দেখেছি। এবার মনে আছে কোন্ হোটেলে উঠেছিলাম।

— কোন হোটেলে?

— হেনাদির হোটেলে। হোটেল কুঞ্জ।

— আর কোনার্কের সূর্যমন্দির?

— না দেখিনি। এসব কথা কেন জানতে চাইছেন?

বাসু জবাব দিলেন না। বললেন, সোমবার সকালে দেখা হবে।

টুকু জানতে চায়, কেসটা কেমন বুঝছেন?

— খুব ভাল। বেকসুর খালাস না হবার কারণ নেই।

— আপনি কি জেঠুর সন্ধান করছেন এখনো?

বাসু ব্রীফ-কেসটা হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, শর্ত হয়েছিল, তোমার জেঠুর বিষয়ে আমরা কোন কিছু আলোচনা করব না। আমাদের আলোচনার কেন্দ্র-বিন্দুতে ছিল : সূর্য! তাই নয়? বেস্ট অব লাক!

আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ির দিকে এক-পা এগিয়ে যেতেই অগ্রসর হয়ে এল রবি বসু।

— রবির কী খবর ?

রবি ঘনিয়ে এসে নিম্নস্বরে বললে, আপনি ঠিকই ধরেছেন : প্রবীর ঘোষাল জি. জি. সি. এল. থেকে শ্রীরামপুরে ফেরার পথে নিজের বাড়ি না গিয়ে প্রথমে তার ব্যাঙ্কে যায়। যে ব্যাঙ্কে তার ভল্ট আছে। সুতরাং এমন সন্দেহ করা অসঙ্গত নয় যে, বিলাস ঐ বৃদ্ধের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা কেড়ে নেয়। আর পালাবার সময় সে-কথা খেয়াল ছিল না অর্ধোন্মাদ সত্যানন্দের। হয়তো তিনি দরজাটা টেনে দিয়ে যেতেও ভুলে যান। তা যদি ঘটে থাকে...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, অবভিয়াস্‌লি। প্রবীর ঘুমন্ত-বিলাসের পকেট হাতড়ে চল্লিশ হাজার টাকা উদ্ধার করে। নিজেই পাইপটা খুলে দেয়। দরজাটা টেনে দেয়। মিনিট দশেক পরে ম্যানেজারকে খবর দেয়।

— কিন্তু প্রবীর তো মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ম্যানেজারকে ডাকে...

— তার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী। সে যে অনেক আগে রেস্তোরাঁ থেকে ফিরে আসেনি তারই বা প্রমাণ কী?

— তা বটে।

বাসু বলেন, যে-কয়জনকে নজরবন্দী রাখতে বলেছি তা রাখা হচ্ছে তো?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ!

— ডিপার্টমেন্টাল ফর্মালিটিতে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে আমার অ্যাকাউন্টে 'শ্যাডো' এমপ্লয় করবে। তিন-শিফটে। প্রতিটি মুহূর্তে ওরা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে যেন জানতে পারি আমি। বিশেষ করে আগামী বাহাত্তর ঘন্টা।

— আগামী বাহাত্তর ঘন্টা? আপনি কি, স্যার, আশা করছেন আগামী সোমবারই মামলার ফয়শালা হয়ে যাবে?

— তা তো যাবেই। এমন কি আগামী সোমবারের মধ্যে আসল ঘুঘুটি ফাঁদে পড়বেন।

— আপনি তাকে চিনতে পেরেছেন?

— প্রথম দিন থেকেই। তবে কনভিকশন হবার মতো এভিডেন্স এতদিন যোগাড় করতে পারিনি।

— এতদিনে পেয়েছেন?

— আমি পাইনি। তুমি পেয়েছ। না হলেও ইতিমধ্যে পেয়ে যাবে! আয়াম শ্যিওর। আফটার অল,

কৃতিত্বটা তো তোমারই!

ফেরার পথে ওরা তিনজনই ছিলেন গাড়িতে। সুজাতা জানতে চায়, আপনি তো নিত্যানন্দকে কোন জেরা করলেন না, মামু?

— সেটা পণ্ডশ্রম হত। টুকু যে তার জেঠুকে অপসারণ করেছিল সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তার সঙ্গে এই হত্যার কী সম্পর্ক?

কৌশিক জানতে চায়, সেদিন ঐ বিদ্যাধর পাণ্ডা...আয়াম সরি, বিদ্যাধর পণ্ডা — যে শর্ট-পীসটা খুলে আপনাকে দিয়েছিল সেটার...

বাসু বললেন, ওসব ফাল্‌তু কথা থাক। তুমি এই সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মোড়ে নেমে যাও। কাল সকালে ফ্লাইটে আমরা দুজন — তুমি আর আমি, বাগডোগরা যাব আর পর্শু আমরা তিনজন ফিরে আসব। টিকিটগুলো কেটে নিয়ে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরে এস বরং।...

মানিব্যাগ খুলে উনি একশটাকার একতাড়া নোট গুণতে থাকেন। কৌশিক অনিবার্য প্রশ্নটা না করে পারে না, যাব দুজনে, ফিরব তিনজন। তৃতীয় ব্যক্তির নামটা যে জানা দরকার, মামু, বুকিং করতে হলে।

— থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছেন : শ্রীসত্যানন্দ সেন।

— সে কী! কেমন করে জানলেন উনি বাগডোগরায় আছেন?

— 'বাগডোগরায়' নয়, দার্জিলিঙে আছেন। হোটেল কুঞ্জ!

— তাই বা জানলেন কেমন করে?

— এইমাত্র টুকু যে বলল : হেনাদির হোটেলে উঠে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখেছিল ওরা!

কৌশিক আর সুজাতার দৃষ্টি-বিনিময় হল।

বাসু বললেন, অমন করুণভাবে তাকাচ্ছ কেন ওর দিকে? একদিন পরেই তো ফিরে আসবে। একটা দিন কি ঐ কচি বউটা একা থাকতে পারবে না? ওকেও নিয়ে যেতাম, কিন্তু রানু যে তাহলে...

— কী যে বলেন! — কৌশিক পালিয়ে বাঁচে।

ষোলো

— ক্রস-এক্সামিন করুন স্যার, দেখুন আমি শত্রুদলের না বন্ধু দলের?

বাসু পাইপটা ধরাতে ধরাতে বললেন, সেটা ভেরিফাই করার পর প্লেনের টিকিট কেটেছি, হেনা। এখন বল, উনি কোথায়?

— দোতলার সাতনম্বর ঘরে। ওঁকে জানাইনি যে, আপনি আসছেন।

— ভালই করেছ। উনি কীভাবে এখানে এলেন? এখন কেমন আছেন? শারীরিক ও মানসিক?

—শারীরিক দুর্বল। মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, কদিনে প্রভূত উন্নতি হয়েছে ওঁর। আর কীভাবে এলেন? শেষের কবিতার ভাষায় সেটা 'আগমন নয়, আবির্ভাব'!

— কী রকম?

কথা হচ্ছিল হোটেল কুঞ্জ-এ। 'রিসেপশন হল'-এ নয়। মালকিন শ্রীমতী মণ্ডলের সুইটের ড্রইংরুম। রুদ্ধদ্বার কক্ষে। কফি পান করতে করতে। হেনা বর্ণনা দিল সত্যানন্দের প্রথম আবির্ভাবের।

যেদিন বিলাস সিং খুন হয় তার পরদিন বিকাল নাগাদ একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় দার্জিলিঙে, হোটেল কুঞ্জ-এর সামনে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলে, তার বৃদ্ধ যাত্রীটি সকালের ফ্লাইটে বাগডোগরায় নেমেছেন। কোথা থেকে এসেছেন তা সে জানে না। স্রেফ খালি হাত। ট্যাক্সি-ড্রাইভার এয়ারপোর্ট-এ এসেছিল যাত্রীর খোঁজে। বৃদ্ধ ঘটনাচক্রে ওর ট্যাক্সিতেই উঠে বসে বলেন, চলো দার্জিলিঙ। হোটেল কুঞ্জ।

ড্রাইভার জানতে চায় : আপ্‌কা সামান?

— না, মালপত্র কিচ্ছু নেই। চলো।

ড্রাইভার সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। বলে, ট্যাক্সি ভাড়া আপ্‌কা পাস্ হ্যয় — না?

বৃদ্ধ পকেট থেকে একশ' টাকার দুখানা নোট বার করে ওর হাতে ধরিয়ে দেন। ড্রাইভার তার ভাষায় বলে, পাঙ্খাবাড়ি পার হলে আপনার শীত করবে না? গরম জামাকাপড় তো কিছু আনেননি? অথচ দার্জিলিঙ যাচ্ছেন?

বৃদ্ধ বিহ্বল হয়ে পড়েন। ট্যাক্সিওয়ালার করুণা হয়। জানতে চায়, বৃদ্ধের সংসারে কে-কে আছেন, কেন তিনি দার্জিলিঙ যেতে চান। তাতে বৃদ্ধ বলেন, তাঁর অনেক টাকা আছে। আত্মীয়-স্বজনেরা সে-টাকা কেড়ে নিতে চায়, তাই উনি পালিয়ে এসেছেন। এরপর ট্যাক্সি-ড্রাইভার শিলিগুড়ির বাজার থেকে বৃদ্ধের জন্য একটা পুরোহাতা সোয়েটার আর টুপি কিনে দেয়। বৃদ্ধই টাকা দেন। বিকালে যখন সে ওঁকে হোটেল কুঞ্জ-এ পৌঁছে দেয়, তখন তিনি পিছনের সীটে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন।

হেনা ওঁকে চিনতে পারে। বছর-কয়েক আগে ওঁর ভাইঝিটিকে নিয়ে এই হোটেলে উঠেছিলেন। দিন-দশেক ছিলেন। তাছাড়া পূর্বদিন সন্ধ্যায় এঁকে টি. ভি.তে নিরুদ্দিষ্ট হিসাবে দেখেছে বলেও ওর মনে পড়ল। টি. ভি.-তে বলা হয়েছিল তিনি বিকৃতমস্তিষ্কের।

তারপর থেকে উনি এই হোটেলে আছেন। লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন না। সকাল-বিকাল সামনের রাস্তায় কিছুটা পায়চারি করেন। চড়াই-উৎড়াই ভাঙতে কষ্ট হয়। তাই প্রায় সর্বক্ষণ হোটেলেই থাকেন। টি. ভি. দেখেন। বই পড়েন। হেনার সঙ্গে কিন্তু অনেক কথা বলেন। হেনা কায়দা করে ওঁর বর্তমান সমস্যার কথা একদম ওঠায়নি। কারণ সংবাদপত্র পাঠে সে জানে যে, সত্যানন্দ সেনকে অপ্রকৃতিস্থ প্রমাণ করতে ওঁর একদল রিস্তেদার বদ্ধপরিকর। পরে কাগজে যখন দেখল যে, ওঁর ভাইঝি কী একটা খুনের মামলায় আটক পড়েছে আর পি. কে. বাসু তার উকিল, তখন বৃদ্ধকে না জানিয়ে সে বাসু-সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে।

একটু পরে ওঁদের দুজনকে নিয়ে হেনা মণ্ডল দ্বিতলের সাত নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। কল-বেল বাজালো। বৃদ্ধ টুক-টুক করে এগিয়ে এলেন। দরজাটা খুলে বললেন, হেনা নাকি? এস।

হেনা বললে, আমার সঙ্গে আরও দুজন গেস্ট আছেন। তাদের মধ্যে একজনকে আপনি চেনেন। কী? চিনতে পারছেন?

বাসু হাত দুটি জোড় করে নমস্কার করলেন। বললেন, আমি কলকাতায় নিউ আলিপুরে থাকি। ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। আমার নাম পি. কে. বাসু।

— আপনি...আপনিই ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু।

— আজ্ঞে হ্যাঁ!

— আপনি কেমন করে জানলেন যে,...যাক ও-কথা। আসুন ভিতরে আসুন।

বাসু ঘরের ভিতর ঢুকলেন। হেনা কিন্তু ঢুকল না। বাইরে করিডোরে বার হয়ে এল। পিছন-পিছন কৌশিকও। নিঃশব্দে সে দরজাটা টেনে দিল। ওর মনে হল, হয়তো বাসু ওঁকে এমন কোন প্রশ্ন করবেন যার জবাব দিতে বৃদ্ধ ইতস্তত করবেন তৃতীয় ব্যক্তির সামনে।

বাসু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। সত্যানন্দ খাটে উঠে বসলেন। কম্বলটা টেনে নিলেন পায়ের উপর। বাসু বললেন, আপনাকে অনেক-অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। আমি জানি। টুকু সব কথা আমাকে বলেছে।

বৃদ্ধ বললেন, ওর হাতে একটা উইল পাঠিয়েছি। সেটা কি আপনি পেয়েছেন? আমার যথাসর্বস্ব আমি টুকুকে দিয়ে যেতে চাই...

বাসু বলেন, পেয়েছি। কিন্তু সেটা কার্যকরী করায় একটু অসুবিধা আছে।

— অসুবিধা? কী জাতের অসুবিধা? অলরাইট! এখন সেটা নাকচ করে আমরা একটা নতুন উইল করতে পারি। হেনা তার উইটনেস্ থাকবে। আপনি দার্জিলিঙের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তারকে কল দিন।

আপনিই উইলের ড্রাফট তৈরি করুন।

— না, মিস্টার সেন। সেজন্য নয়। টুকুর বড় বিপদ যাচ্ছে এখন।

বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, টুকুর বিপদ? অসুখ-বিসুখ?

— আজ্ঞে না। শরীর তার সুস্থই আছে।

— তবে কী জাতের বিপদ?

— টুকু বর্তমানে জেল-হাজতে আটক আছে। জামিন পায়নি।

বৃদ্ধ পুরো এক মিনিট ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, কী হয়েছে খুলে বলুন। কিসের চার্জ?

— খুনের। বিলাসসিং যাদবের হত্যাপরাধে।

— বিলাসসিং? লোকটা মরে গেছে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— ঈশ্বর তাহলে আছেন? ন্যায়-বিচার এখনো হয়? কিন্তু ওটা কী বললেন? 'হত্যাপরাধ'? পাষণ্ডটা কি খুন হয়েছে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— কে খুন করেছে আন্দাজ করা যাচ্ছে না?

— পুলিসের বিশ্বাস টুকু করেছে!

— টুকু করতেই পারে না। কী-ভাবে খুনটা হয়েছে? গুলিবিদ্ধ হয়ে, না ছোরায়?

— দুটোর একটাও নয়।

সত্যানন্দ একটু ইতস্তত করলেন। তারপর প্রশ্ন করেন, কোথায় খুনটা হয়েছে?

— জি. জি. সি. এল-এর মোটেলে। তিন-নম্বর ইউনিটে।

সত্যানন্দ দীর্ঘসময় নীরব রইলেন। তারপর গা থেকে কম্বলটা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। স্পষ্টভাষে বললেন, ওয়েল, আই গেস্ আই উড বেটার ফেস্ দ্য মিউজিক!

— তার মানে? — বাসুও উঠে দাঁড়িয়েছেন।

— তার মানে, বিলাসসিং যাদবের মৃতদেহ যদি ঐ তিন-নম্বর ইউনিটে আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, তবে আমিই খুন করেছি!

— কী ভাবে?

— তার খাবারে এক মুঠো ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে।

— আপনি আদ্যোপান্ত খুলে বললে আমার সুবিধা হয়, মিস্টার সেন।

— বিস্তারিত বলার বিশেষ কিছু নেই। সাত-সাতটা দিন আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছি ঐ অশান্তিধামে...

— আমি কিছু কিছু আন্দাজ করেছি।

— আজ্ঞে না। করেন নি। করা যায় না! যার জুতোয় কাঁটাটা উঠেছে একমাত্র সেই শুধু টের পায়। লুক হিয়ার, স্যার : আমি বৃদ্ধ। কখনো কখনো সব এলোমেলো হয়ে যায়, চিন্তার পারম্পর্য থাকে না। অবস্থা এতটা খারাপ হত না...ঐ ওরা ক্রমাগত ওষুধ আর ইন্‌জেকশন দিয়ে...আবার ভাববেন না যে, আমি একটা 'সেনাইল ওল্ড ফুল্'! নিজের কারবার আমি আজও নিজে চালাতে পারি। বিজনেস লেটার ডিকটেট্ করি...। ভাবতে পারেন? আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দশ লক্ষের উপর, অথচ ওরা আমার পকেটে একটা পাঁচ-নয়া পর্যন্ত রাখল না। শান্তি স্বর্গে গেছে, বেঁচেছে... কিন্তু আর সবাইকে ওরা তাড়াল। প্রথমে টুকুকে। তারপর নবীন, বিশ্বনাথ, মতির-মা, ঠাকুর সিং প্রত্যেককে। আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেল একটা জেলখানায়। সেখানে খাটের সঙ্গে ওরা চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখত...

বাসু ওঁর হাত ধরে তাঁকে আবার বসিয়ে দিলেন। বললেন, এসব কথা আমি জানি, মিস্টার সেন। টুকু আপনাকে সেই নরক থেকে উদ্ধার করল। একটা মোটেল নিয়ে এল। তারপর কী হল বলুন?

— টুকু সন্ধ্যারাত্রে প্যাকেটে করে চাইনীজ-ফুড নিয়ে এল। আমি বললাম, আয়, দুজনে ভাগ করে খাই। ও রাজি হল না। আধখানা খাবার রেখে আর বাকি আধখানা একটা প্যাকেটে বেঁধে নিয়ে ও চলে গেল। ঠিকই করেছে সে। অত রাত্রে ডায়মন্ড-হারবার রোড দিয়ে ওর বয়সী একা মেয়ের ড্রাইভ করা ঠিক নয়। সে যাই হোক, টুকু চলে যাওয়ার পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই কেউ দরজায় নক্ করল। আমার মনে হল, কোন কারণে টুকুই ফিরে এসেছে। ছিটকানি খুলে উঁকি দিয়ে দেখতে গেলাম—বিলাস জোর করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। একগাল হেসে কী বলল জানেন? বলল, হমাকে খুন করতে হিঞ্ছা জাগছে তো সেন-সা'ব, লেকিন খুন তো করা যাবে না, মেহ্মানকে খিলানাই তো ধরম হ্যয়। নিকালিয়ে বহ্ চাইনিজ ফুড!

বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন একে-একে। টুকু দু-প্যাকেটে খাবার এনেছিল। একটায় চাও-মিঙ, একটায় চিলি-চিকেন। দুটো মিশিয়ে ফেলে আর তারপর দুপাত্রে ভাগ করে। এসব ঘরের মধ্যে করে না। পাছে ঘরটা নোংরা হয়। বাথরুমে একটা গ্লাসটপ টেব্‌ল্ আছে। তার উপরেই ভাগাভাগি করে একটা প্যাকেট নিয়ে যায়, একটা বাথরুমের ঐ টেবিলেই রাখা ছিল।

তাই ঘরে ঢুকেই সেটা নজরে পড়েনি ক্ষুধার্ত বিলাস সিং-এর। সে প্রস্তাব দেয় : দুই লক্ষ টাকা নগদে পেলে সে ধানবাদে ফিরে যাবে। বলে, তার কাছে ধনঞ্জয় চৌবের মৃত্যুবাণ আছে। সে যদি ধনঞ্জয়কে শাসিয়ে যায় তাহলে ধনঞ্জয় পালাবার পথ পাবে না। সে-ক্ষেত্রে সত্যানন্দ আবার স্বরাষ্ট্রের সম্রাট হয়ে বসবেন এবং ওঁর সঞ্চিত সম্পত্তি — 'মাইনাস দু লাখ টাকা' — ভোগ করতে পারবেন, টুকুকে দান করতেও পারবেন। আর যদি তিনি স্বীকৃত না হন, তাহলে বিলাস পুলিশে খবর দেবে। সত্যানন্দকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে সেই নরকে।

বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধি খুলে যায়। সত্যানন্দ ভাব দেখান যে, তিনি রাজি। কিন্তু বলেন, নগদ দু-লক্ষ টাকা তিনি যোগাড় করবেন কোত্থেকে? ঐ সময় বিলাস পুনরায় তাগাদা দেয় : চাইনীজ খাবার কোথায় আছে?

সত্যানন্দ তখন বাথরুমের দিকে যান। বিলাস আপত্তি করে না। উনি বাথরুমে ঢুকেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন। বিলাস দরজার ওপাশ থেকে নানান কটুকাটব্য করতে থাকে। বলে, ঠিক আছে, তুমি বাথরুমেই বন্দী থাক। কাল সকালে স্মরণিকা এলে তাকেই আমি ধরিয়ে দেব। সেও জেল খাটবে — হাসপাতাল থেকে রুগীকে অপহরণ করার অপরাধে।

ইতিমধ্যে রুদ্ধদ্বার বাথরুমের ভিতর সত্যানন্দ কাম্পোজ ট্যাবলেটগুলো মিহি করে গুঁড়ো করেছেন। মিহি করে খাবারে মিশিয়ে দিয়েছেন। বিলাস যখন ভয় দেখালো যে, টুকুকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে তখন উনি দরজা খুলে দিলেন।

সত্যানন্দ এই সময় বলে ওঠেন, বিলিভ মি, ব্যারিস্টার-সাহেব! আমি ঐ খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছিলাম বটে, কিন্তু খাবারটা ওকে নিজে হাতে তুলে দিইনি। ওই বরং সেটা কেড়ে নিয়ে খেতে শুরু করল। বেশ বোঝা যায় যে, সে সারাদিন অভুক্ত ছিল।

— তখন রাত কত হবে?

— আমি জানি না। আমি ঘড়ি দেখিনি।

— তারপর?

— তারপর আমরা দুজনেই শোবার ঘরে চলে আসি। বিলাস নানান উদ্ভট পরিকল্পনা করতে থাকে।

— যেমন?

— ও আমার চেক বইটা চুরি করে নিয়ে আসবে। আমি তাকে একটা ব্যাকডেটেড চেক দেব, অর্থাৎ কোর্ট আমাকে ইনকম্পিটেন্ট ঘোষণা করার আগেকার তারিখের। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে নয়। অন্য

কোনও ব্যাঙ্কে। আমি কালক্ষেপ করবার জন্য একটা আষাঢ়ে গল্প ফাঁদি। বলি যে, আমার একটা গোপন অ্যাকাউন্ট আছে। সেখানে প্রায় পৌনে দুইলাখ টাকা আছে। ও যদি পৌনে দুই লাখে রাজি হয়...এই সময় ও আমার পকেট হাতড়ায়। টুকুর দেওয়া টাকা কেড়ে নেয়। বলে, ঠিক আছে তাতেই ও রাজি। বেশ বুঝতে পারি, ইতিমধ্যে ঘুমের ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে। বিলাস খাটে উঠে বসে। ওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি বালিশটা ওর দিকে ঠেলে দিলাম। ও বলল, 'কাল সুবে ফয়শালা হোগা'।...মোটকথা ও ঘুমিয়ে পড়লে ওর পকেট থেকে আমার টাকা আর ওর গাড়ি আর গ্যারেজের চাবিটা তুলে নিয়ে আমি বেরিয়ে আসি।

— দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে?

— তা আমার মনে নেই। মোটকথা ঘুমের ওষুধের ওভার-ডোজে যদি বিলাসসিং মারা গিয়ে থাকে, তবে সেজন্য আমিই দায়ী, যদিও খাবারটা আমি তাকে হাতে তুলে দিইনি। সে কেড়ে নিয়েছিল আমার কাছ থেকে...

বাসু বললেন, মিস্টার সেন, ঘুমের ট্যাবলেট বেশি পরিমাণে খেয়ে বিলাসসিং মারা যায়নি। সে যখন ঐ ঘরে ঘুমন্ত, তখন অন্য কেউ একটা গ্যাস পাইপের কানেকশন খুলে দেয়। তাতেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে...

— গ্যাস-পাইপ! ওখানে গ্যাস-পাইপ কোথা থেকে আসবে? গ্যাস-স্টোভ তো ওর ধারে কাছে ছিল না।

— না, তা ছিল না। কিন্তু সে-সব কথা আপনাকে পরে বুঝিয়ে বলব। আপাতত আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিন দেখি। কিছু কিছু জটিলতা আছে যা আপনিই শুধু পরিষ্কার করে দিতে পারেন। প্রথম প্রশ্ন, টুকু বলেছে যে, সে আপনাকে বারণ করে গেছিল ঘরের বাইরে আসতে। আপনি কি মনে করতে পারেন টুকু সকালে বেরিয়ে যাবার পর আপনি মোটেল ছেড়ে বাইরে গেছিলেন কিনা?

বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। টুকু সকালে বেরিয়ে যাবার পর আমি জানলার ধারে বসে বসে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিলাম। টুকুই দিয়ে গেছিল। হঠাৎ জানলা দিয়ে নজরে পড়ল বাইরে একটা লোক ঘোরা-ফেরা করছে। হুবহু বিলাসসিং যাদবের মতো দেখতে। লোকটা পাশ ফিরে ছিল। তাই মুখটা ঠিক দেখতে পাইনি। কিন্তু আমার মনে হল : ও বিলাসসিং! আমার প্রচণ্ড ভয় হল। আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে উঠে আমি যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। আমার মনে হল, পালাতে না পারলে এখনি বিলাস আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ঐ জেলখানার খাটে আবার স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখবে। তাই...তাই...

— হ্যাঁ, বলুন। তাই আপনি কী করলেন? মোটেল ছেড়ে পালিয়ে গেলেন?

— হ্যাঁ। লোকটা দৃষ্টির আড়ালে সরে যেতেই আমি উঠে পড়ি। টেবিলে কিছু খুচরো নোট আর পয়সা ছিল। সকালে টুকু যে খাবার আনিয়েছিল তারই ভাঙানি টাকা। আমি না গুণেই সে টাকা মুঠো করে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেলাম।

— কোথায় যেতে চেয়েছিলেন?

— এখানেই আসব ভেবেছিলাম। এই হেনার হোটেলে । দার্জিলিঙে।

— তারপর?

— বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলাম। এক ভদ্রলোক লিফ্‌ট্‌ দিলেন। নামিয়ে দিলেন তারাতলার মোড়ে। তখন আমার খেয়াল হল, আমার কাছে যে টাকা আছে তাতে দার্জিলিঙে আসা যায় না। তারাতলার মোড়ে মনে হল, আমি অহেতুক ভয় পেয়েছি। ঐ লোকটা বিলাসসিং নয়। ওরা যে ওষুধ ইন্‌জেকশন দিয়েছিল তার প্রভাব কাটেনি বলেই এসব 'হ্যালুসিনেশান' দেখছি। তাই ওখান থেকে উল্টোদিকে বাস ধরে আবার মোটেলে ফিরে আসি।

— সন্ধ্যাবেলা টুকু যখন মোটেলে ফিরে এল তখন তাকে এসব কথা বলেননি?

— না। কী লাভ? ওটা তো হ্যালুসিনেশন — আতঙ্কে দিবাস্বপ্ন দেখা!

— এবার বলুন, স্মরণিকা কি সত্যিই আপনার ভাইঝি নয়?

— না।

— সে আপনার বাড়ির গভর্নেস শান্তি দত্তের মেয়ে?

— হ্যাঁ, তাই।

— ঐ সুহাস দত্ত কোনদিন ফিরে আসেননি?

বৃদ্ধ মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, কে সে? ঐ সুহাস দত্ত কার নাম?

— আপনার অফিসের কর্মচারী? টুকুর বাবা?

বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সুহাস দত্ত নামে আমার কোনও কর্মচারী কোনদিন ছিল না। মনে পড়ছে, ঐ নামটা আমি কল্পনা করেছিলাম — শান্তির স্বামী ছিল একটা মদ্যপ, রেসুড়ে, পাষণ্ড। শান্তিকে সে ব্রথেলে বেচে দিতে চেয়েছিল। আমি তাকে উদ্ধার করি। কাশী থেকে কলকাতায় নিয়ে আসি। পাষণ্ডটা আর কোনদিন শান্তিকে খুঁজে পায়নি।

— তার নাম কি? স্মরণিকার বাবার?

— তার নামটার কোন প্রয়োজন নেই, বাসু-সাহেব। টুকুর বাবার নাম সত্যানন্দ সেন।

— কী বলছেন, মিস্টার সেন!

— আজ্ঞে, হ্যাঁ। শান্তিকে আমি ভালবাসতাম। সে আমার বাড়ির হাউস-কীপার ছিল, কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদায়। যে আমলের কথা, তখনো হিন্দু কোড বিল পাস হয়নি। শান্তিকে বিবাহ করার পথ আমি খুঁজে পাইনি। ঘটনাচক্রে ঐসময় একটা দুর্ঘটনায় আমার ভাই আর ভাইবউ মারা যাওয়ায় আমি টুকুকে আমার ভাইঝি সাজাই। কিন্তু ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে কথাটা গোপন করার উপায় ছিল না। সে জানত, আমার ছোটভাই সত্যপ্রিয়র কোন সন্তানাদি ছিল না। তাই ধনঞ্জয়কে মিথ্যে করে সুহাস দত্তের আষাঢ়ে কাহিনীটা জানাই!

বাসু বললেন, বুঝলাম। আপনি তৈরী হয়ে নিন। আমার সঙ্গে কাল কলকাতা ফিরবেন।

সতের

সোমবার বেলা দশটায় বিচারক ঘোষ ঘোষণা করলেন : পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম স্মরণিকা সেনের মামলা শুরু হচ্ছে।

হরেন ঘোষাল চট করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা বাও করে বলে, য়োর অনার! শুক্রবার মামলা যখন মুলতুবি হয় তখন ইন্সপেক্টর বরাটের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হচ্ছিল। ইফ দ্য কোর্ট প্লীজ, আমি ইন্সপেক্টর বরাটকে আর কয়েকটি ডাইরেক্ট প্রশ্ন করতে চাই।

বাসু বললেন, আমাদের আপত্তি নেই, য়োর অনার!

ইন্সপেক্টর বরাট সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালো। পূর্বদিনই তার হলফ নেওয়া ছিল।

হরেন ঘোষাল বললেন, এর আগের দিন সহযোগী ডিফেন্স-কাউন্সেল ঐ মোটেলের গ্যাস-পাইপ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। আপনি সে সময় জানিয়েছিলেন, ঐ দাগী শর্ট-পীস পাইপটি মোটেলেই লাগানো আছে। আমি জানতে চাই, বর্তমান অবস্থাও কি তাই?

— আজ্ঞে না। শুক্রবার আদালত বন্ধ হবার পর আমি ঐ মোটেলেই যাই এবং একজন প্লাম্বারের সাহায্যে ঐ ছোট পাইপটি খুলে আনি। সেটি আমি আজ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

— আপনি বলতে চান, তার পূর্বে বাজার থেকে ঐ মাপের একটি শর্টপীস কিনে সেখানে লাগিয়ে দিয়ে এসেছেন?

— ইয়েস, স্যার।

— এই পাইপটি খুলবার সময় কি আপনি যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছেন, যাতে খুলবার

সময় কোন নতুন দাগ না পড়ে?

— ইয়েস, স্যার। 'শ্যাময়-লেদারে' পাইপের টুকরোটা জড়িয়ে নিয়েছিলান।

বাসু আপত্তি জানান : অবজেকশন য়োর অনার অন দ্য গ্রাউন্ড দ্যাট নো প্রপার ফাউন্ডেশান হ্যাজ বিন লেইড!

জজ এতটু ঝুঁকে পড়ে বলেন, কী বলতে চাইছেন? শুক্রবার আপনিই তো বলেছিলেন যে, পাইপের টুক্‌রোটা এভিডেন্স হিসাবে গ্রাহ্য হওয়া উচিত!

— তা বলেছিলাম। কিন্তু প্রসিকিউশন কী-ভাবে প্রমাণ করবেন যে, এটাই সেই পাইপের টুকরো? ইতিমধ্যে সাত-দশদিন কেটে গেছে। হয়তো চার-পাঁচজন আবাসিক ও ঘরে বাস করেছেন...

ঘোষ সাহেব বললেন্ ও! দ্যাটস্ এ টেকনিক্যালিটি! — তারপর বরাটের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, এমন কোন সূত্র কি আপনার নজরে এসেছে যাতে আশঙ্কা হতে পারে যে, ঐ পাইপের টুক্‌রোটা ইতিমধ্যে কেউ বদল করেছে?

— আজ্ঞে না। কোনমতেই না।

— আপনি প্রথমবার ঐ পাইপে 'রেঞ্চ'-এর সূক্ষ্মদাগ দেখতে পেয়েছিলেন একথা পূর্বেই বলেছেন। এবারও কি পাইপটা খোলার আগে সেই দাগগুলি দেখতে পেয়েছিলেন?

— ইয়েস স্যার!

— ভেরি ওয়েল! আদালত ঐ পাইপের টুক্‌রোটাকে এভিডেন্স হিসাবে গ্রহণ করছেন।

হরেন ঘোষাল যেন এক গোলে জিতছে। বললে : ক্রস একজামিন!

বাসু প্রশ্ন করেন, ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি কি পাইপটা খুলে এনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন?

— আজ্ঞে না, দেখিনি। অন্য একটি মার্ডার কেস-এ আমি শনি-রবি দুদিনই খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া আমার মনে হল, আপনিই ও বিষয়ে বেশি আগ্রহী। আপনিই প্রথমে দেখুন।

বাসু পকেট থেকে একটি বড় অতসীকাচ বার করে পাইপের টুকরোটাকে পরীক্ষা করলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। দুটি বস্তুই তিনি ইন্সপেক্টর বরাটের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, আপনি এবার দেখুন। ভাল করে দেখুন!

বরাট হাত বাড়িয়ে পাইপের টুকরো আর ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করল। বেশ দেখা যায়, সেও গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ।

— কিছু দেখতে পেলেন?

বরাট নড়ে-চড়ে বসল। তারপর স্বীকার করল : রেন্‌চ্-এর একটা দাঁত ভাঙা ছিল।

— যার অর্থ, যে রেঞ্চ দিয়ে ওটা খোলা হয়েছিল সেটা কোনক্রমে খুঁজে পেলে একটা মারাত্মক এভিডেন্স লাভ করবে পুলিস!

বরাট লজ্জিতভাবে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার আগে খেয়াল করা উচিত ছিল।

— প্রতিবাদিনীর যে গাড়িটি 'সীজ' করেছেন তার অ্যাডজাস্টেব্‌ল্ বড় রেন্‌চ্‌টা কি আপনি আদালতে এনেছেন?

— আজ্ঞে না।

— সেটা আনাবার ব্যাবস্থা করবেন কি?

বরাট অসহায়ভাবে হরেন ঘোষালের দিকে তাকিয়ে দেখল।

ঘোষাল কিছু বলার আগেই বিচারক বললেন, সেটা আনতে পাঠান। দেখবেন, যেন কোনক্রমেই সাবস্টিটুশন না হয়!

ঘোষাল বলল, প্রসিকিউশন রেস্টস্, য়োর অনার!

জজ প্রশ্ন করেন, প্রতিবাদীর কোন সাক্ষী আছে?

— আছে, য়োর অনার! প্রতিবাদীর এক নম্বর সাক্ষী : শ্রীসত্যানন্দ সেন।

— হোয়াট!!—আঁৎকে ওঠে হরেন ঘোষাল।

বাসু তার দিকে ফিরে বললেন, কী হল? চমকে উঠলেন কেন? আমি বলেছি : আমার এক নম্বর সাক্ষী শ্রীসত্যানন্দ সেন।

নকিব সে-নাম ঘোষণার আগেই ট্রায়াল ডেপুটি হরেন ঘোষাল লাফিয়ে ওঠে, ইফ দ্য কোর্ট প্লীজ, এটা প্রসিকিউশনের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত! আমি ব্যাপারটা পাব্‌লিক প্রসিকিউটরকে জানাতে চাই। পনের মিনিটের রিসেস্ অনুমোদন করুন, হুজুর।

সেশনস্ জজ বাদীর প্রার্থনামতো পনের মিনিটের জন্য মামলা মুলতুবি রাখতে স্বীকৃত হলেন। হরেন ঘোষাল দৌড়ালো আদালতের অপরপ্রান্তে পাব্‌লিক প্রসিকিউটরকে খবরটা দিতে।

বাসু স্মরণিকার কাছে সরে এসে বললেন টুকু, তোমাকে একটা বিরাট ধাক্কা খেতে হবে এক্ষুনি! তা যে কী, তা আমি বলব না। কিন্তু সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত থেকো।

টুকু সে-কথায় কর্ণপাত না করে বলল, এ কী করলেন মেসো! জেঠুকে কেন পাকড়াও করে আদালতে নিয়ে এলেন? ওরা এখনি তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে। আবার সেই শান্তিধামে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখবে!

বাসু মাথাটা নেড়ে বললেন, তুমি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ টুকু? কোর্ট-নিযুক্ত মনস্তত্ত্ব-বিশারদ ডক্টর কৈলাশনাথ ইতিমধ্যে ওঁকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, শ্রীসত্যানন্দ সেন মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি ছাড়া আরও দু-দুজন এক্সপার্টকে দিয়ে আমি দেখিয়েছি। আমি 'ব্লাইন্ড' খেলছি না, টুকু। আমার হাতে তিন-তিনটে টেক্কা! এ-পিঠ আমি তুলবই! এঁরা তিনজনেই বলেছেন, টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে আসা ঝক্‌ঝকে টাকার মতোই উনি উজ্জ্বল, বে-দাগ!

টুকুর চোখ দুটি জলে ভরে আসে। আনন্দে, আবেগে।

— এখানে চুপটি করে বসে থাক। আমি আসছি।

বাসু এ-পাশে সরে আসতেই ঘনিয়ে আসে রবি বসু। তাঁর কানে কানে কিছু বলে। উনি মাথা নেড়ে সায় দেন। বলেন, বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল! যা ঘটবার দেড়-দু ঘণ্টার মধ্যেই ঘটবে কিন্তু। যা দেখবে তার সাক্ষী রাখবে, এভিডেন্স রাখবে!

পনের মিনিট পরে যখন আদালত আবার বসল তখন দেখা গেল ট্রায়াল ডেপুটি হরেন ঘোষালকে সরিয়ে বাদীর পক্ষে মধ্যমণির আসনটি দখল করেছেন পাব্‌লিক প্রসিকিউটর নিরঞ্জন মাইতি স্বয়ং। বিচারক শ্রীঘোষ সেটা লক্ষ্য করে বললেন, আপনি নিজেই এসেছেন দেখছি! বিশেষ কোন কারণ আছে নাকি?

— আছে, য়োর অনার! আমি প্রথমেই আদালতকে জানাতে চাই যে, প্রতিবাদিনী যদি বিলাসসিং যাদবকে হত্যা না করে থাকে তাহলে শ্রীসত্যানন্দ সেনের পক্ষে সে কর্মটি করা অসম্ভব নয়। তাই প্রথম থেকেই আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে বাদীপক্ষের মামলাটা পরিচালনা করতে চাই।

— ভেরি ওয়েল! আপনার প্রথম সাক্ষীকে ডাকুন, মিস্টার বাসু!

বাসুর আহ্বান-মতো বৃদ্ধ সত্যানন্দ সেন সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। শপথবাক্য পাঠ করলেন। কিন্তু বাসু-সাহেবের প্রথম প্রশ্নটি উচ্চারিত হবার পূর্বেই নিরঞ্জন মাইতি বলে ওঠেন, জাস্ট এ মোমেন্ট! আমি চাই, এই সাক্ষীকে প্রথমেই সাবধান করে দেওয়া হোক যে, তিনি একক অথবা বর্তমান প্রতিবাদিনীর সঙ্গে যৌথভাবে বিলাসসিং যাদবের হত্যা-মামলার আসামী হতে পারেন। আমি চাই, আদালত ওঁকে সাবধান করে দিন, এখানে সাক্ষ্যদান-কালে তিনি যা বলবেন তা তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারবে!

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, য়োর অনার! আই অবজেক্ট! মিস্টার পাব্‌লিক প্রসিকিউটার আদালতের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন। সাক্ষী যাতে খোলা-মনে সাক্ষ্য দিতে না পারেন...

মাইতি কর্ণপাতমাত্র না করে একই নিশ্বাসে বলে চলেন, আর তাছাড়া, বর্তমান সাক্ষীর সাক্ষ্য দেবার অধিকারটাই প্রসিকিউশন চ্যালেঞ্জ করছে। তিনি একটি আদালত থেকে 'ইনকম্পিটেন্ট' রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। উনি যে অসুখে ভুগছেন তার নাম : 'সেনাইল ডিমেনশিয়া'!

— আপনার বলা শেষ হয়েছে? — প্রশ্ন করেন বাসু।

— ইয়েস।

— য়োর অনার, আমি আদালতের কাছে আর্জি রাখব : পাবলিক প্রসিকিউটরকে অনুরোধ করতে দুটি বিকল্পের ভিতর যে কোন একটিকে বেছে নিতে। শ্রীসত্যানন্দ সেন যদি 'ইন্‌কম্পিটেন্ট' হন, তাহলে আদালতের পক্ষে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া নিরর্থক। আবার আদালত যদি ওঁকে সাবধান করে দেওয়াই মনস্থ করেন, তবে ধরে নিতে হবে যে সাক্ষী সাবধানবাণী শ্রবণে, প্রণিধানে সক্ষম। তিনি কম্পিটেন্ট। দুধ এবং তামাক দুটোই খাওয়া চলবে না।

দায়রা জজ হাসলেন। সাক্ষীর দিকে ফিরে বললেন, আদালত আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায়, মিস্টার সেন!

— ইয়েস স্যার। করুন?

— আপনি বর্তমানে কোথায় আছেন বলুন তো?

— সাক্ষীর মঞ্চে। স্টেট ভার্সেস স্মরণিকা সেনের মামলায় ডিফেন্স কাউন্সেল আমাকে এক নম্বর সাক্ষী হিসাবে ডেকেছেন, তাই।

— আপনাকে কি কোন আদালত 'ইন্‌কম্পিটেন্ট' রূপে চিহ্নিত করেছে?

— করে থাকলে তা আমার অজ্ঞাতসারে। আমাকে আমার কয়েকজন অর্থগৃধ্নু আত্মীয় জোর করে একটা উন্মাদাশ্রমে ধরে নিয়ে যায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে নানান ঔষধ ও ইনজেকশন দেওয়া হয়। আমি ক্রমে ক্রমে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঠিক জানি না, হয়তো আমি সত্যিই পাগল হয়ে যেতাম। সে যাই হোক, ঐ অবস্থায় কোন আদালত যদি আমাকে 'ইনকম্পিটেন্ট' রূপে চিহ্নিত করে থাকেন তবে তা আমার অজানা।

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি কতদূর জানেন, সংক্ষেপে বলুন?

— সিটি কোর্টের চীফ জাজ সদানন্দ ভাদুড়ীর আদালতে কেসটা চলছিল। তিনি ডাক্তার কৈলাশনাথ দাশগুপ্তকে নিযুক্ত করেন মিস্টার সেনকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট করতে...

হরেন ঘোষাল বলে ওঠেন, কিন্তু ডক্টর দাশগুপ্ত ওঁকে পরীক্ষা করার পূর্বেই শ্রীসেন অপহৃত হন। ঐ প্রতিবাদিনীর কারসাজিতে।

সত্যানন্দ বলেন, ইয়েস, য়োর অনার! প্রতিবাদিনী আমাকে উদ্ধার করে। এ জন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

নিরঞ্জন মাইতি বলে, সাক্ষী ব্যক্তিগতভাবে কার কাছে কৃতজ্ঞ তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আদালতও তা জানতে আগ্রহী নন। আমাদের আর্জি : শ্রীসত্যানন্দ সেন 'ইন্‌কম্পিটেন্ট'। সেনাইল ডিমেনশিয়ার রুগী। তাঁর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতে পারে না।

বাসু আবার উঠে দাঁড়ালেন : য়োর অনার! আদালত-নিযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ ডঃ কৈলাশনাথ দাশগুপ্ত গতকাল আমার বাড়িতে মিস্টার সেনকে পরীক্ষা করেছেন। তাঁকে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং কম্পিটেন্ট-রূপে স্বীকৃতি দিয়ে একটি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সেটি আমি আদালতে নথী হিসাবে এখন পেশ করছি, উইথ আ কপি টু প্রসিকিউশন! এছাড়া আরও দুজন বিশেষজ্ঞ ওঁকে পৃথক ভাবে পরীক্ষা করে 'কম্পিটেন্ট বলেছেন। প্রসিকিউশন এ নিয়ে বিতর্ক চালিয়ে গেলে ঐ সার্টিফিকেটগুলিও আমি অতিরিক্ত নথী হিসাবে দাখিল করব।

বিচারক মাইতিকে প্রশ্ন করেন, আপনার আর কোনও আপত্তি আছে কি?

নিরঞ্জন তাঁর ট্রায়াল ডেপুটির সঙ্গে আলাপ করে বলেন, আমরা আপাতত ঐ আপত্তি উইথড্র করছি,

কিন্তু সাক্ষীকে যেন সাবধান করে দেওয়া হয়, তাঁর বক্তব্য তাঁর বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে।

শ্রী জাস্টিস্ ঘোষ সেই মর্মে সাক্ষীকে সচেতন করে দিলেন। বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে একজন আইনজীবীকে আপনার স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত করতে পারেন।

— আমি তার কোন প্রয়োজন দেখি না, য়োর অনার!

— মিস্টার পি. কে. বাসু কি আপনার পক্ষের উকিল?

— আমি 'কম্পিটেন্ট' এইটুকু প্রমাণের জন্য। মিস্টার পাব্লিক প্রসিকিউটর যে খুনের মামলার কথা বললেন সে মামলার জন্য নয়।

— আপনি আপনার স্বার্থ দেখবার জন্য কোনও উকিল দেবেন না, স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এই সাক্ষ্য আপনার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারে জেনেও সাক্ষ্য দিচ্ছেন! তাই তো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।

— ভেরি ওয়েল! আপনি জেরা শুরু করতে পারেন, মিস্টার বাসু।

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম প্রশ্নটিতেই বোমা ফাটালেন : প্রতিবাদিনীর সঙ্গে আপনার কি কোনও রক্তের সম্পর্ক আছে, মিস্টার সেন?

বৃদ্ধ সাক্ষী একবার জজ-সাহেব ঘোষের মাথার উপর প্রলম্বিত জাতির জনকের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে বললেন, আছে। প্রতিবাদিনী আমার কন্যা।

— আপনার 'কন্যা'? একটু জোরে বলুন, যাতে আদালত শুনতে পান!

বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার একই কথা উচ্চারণ করলেন।

বাসু বলেন, একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

— বলব। প্রতিবাদিনীর গর্ভধারিণী স্বর্গতা শান্তিরানী দত্ত দীর্ঘদিন আমার বাড়িতে 'হাউস-কীপিং' করেছেন। আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতাম। কিন্তু সে ছিল বিবাহিতা। তার স্বামী ছিল একটা পাষণ্ড। ওকে অর্থের বিনিময়ে ব্রথেলে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল। আমি তাকে উদ্ধার করি। তখনো হিন্দু কোড বিল পাস হয়নি। ওকে বিবাহ করার উপায় ছিল না। আইনত। স্মরণিকাকে ভাইঝি সাজিয়ে মানুষ করি। শান্তিরানীকে আমার সর্বস্বের ওয়ারিশ করে আমি একটি উইল প্রণয়ন করি ; কিন্তু শান্তির মৃত্যু আমার আগেই হয়ে গেল। সেটা নাকচ করে নতুন উইল বানিয়ে টুকুকে সর্বস্ব দিতে চাইলুম। কিন্তু পাকেচক্রে তা হল না। নিজের হল জনডিস। টুকু গেল বিলেত। পরে...

— আপনি কি স্মরণিকাকে সর্বস্ব দিয়ে একটি উইল প্রণয়ন করেছেন?

— করেছি। সেটা তো আপনার কাছেই গচ্ছিৎ আছে, মিস্টার বাসু!

— 'শান্তিধাম' স্যানিটেরিয়ামে কি আপনি স্বেচ্ছায় গিয়েছিলেন?

— আদৌ নয়। আমাকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল...পাগল বানাতে...

— ওরা বলতে?

— ঐ ধনঞ্জয় চৌবে, তার স্ত্রী আর বিলাসসিং যাদব! ঈশ্বর করুণাময়। টুকু যদি আমাকে উদ্ধার না করত তাহলে এতদিনে আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতাম। পাব্লিক প্রসিকিউটর মহোদয় ইতিপূর্বে বলেছেন, এ বিষয়ে ওঁদের কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ সেটাতেই পাবলিকের মাথাব্যথা! ওঁরা 'দুষ্টের পালন ও শিষ্টের শাসন'-এ আগ্রহী বলে!

প্রতিবাদিনী ইতিমধ্যে আঁচলে মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। তার পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। ওদিকে সত্যানন্দ ধীরে ধীরে বর্ণনা করে চলেছেন — কীভাবে তিনি বিলাসকে ঘুম পাড়িয়ে পালিয়ে যান। দর্শকেরা উদগ্রীব হয়ে শুনছে। আদালতে সূচীপতন নিস্তব্ধতা। দীর্ঘ জবানবন্দি শেষ হলে বাসু-সাহেব পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, ক্রস এগ্জামিন?

বিশালকায় নিরঞ্জন মাইতি দাঁড়িয়ে বললেন, ইফ দ্য কোর্ট প্লীজ, শ্রীসত্যানন্দ সেনের এই জবানবন্দী প্রসিকিউশনের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বস্তুত শ্রীসেন ছিলেন একজন নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি, একজন

ইনকম্পিটেন্ট, একজন অপহৃত রোগী। ফলে আমাদের নূতন করে কেস সাজাতে হবে। আদালত যদি এই পর্যায়েই 'নূন-রিসেস্' ঘোষণা করেন তাহলে দুটোর সময় আমরা আবার শুরু করতে পারি।

জজ-সাহেব ঘড়ি দেখে বললেন, তাই হোক। বেলা দুটোয় আবার আদালত বসবে।

বিচারক তারপর খাশ-কামরার দিকে চলে গেছেন।

সত্যানন্দ দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন স্মরণিকার দিকে। চোখের-জলে ভিজে মুখখানা বেচারি কোথায় লুকাবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সুযোগ হয়ে গেল। মুখ লুকালো বাপের বুকে। বাসু সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে রবি বসু এসে ওঁকে জনান্তিকে টেনে আনল। নিম্নস্বরে বলল, আপনার ভবিষদ্বাণীই ফলে গেছে, স্যার! অক্ষরে অক্ষরে!

— কী ঘটেছে সংক্ষেপে বল?

— মিস্টার বরাট যখন কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন স্মরণিকার গাড়ি থেকে অ্যাডজাস্টেব্‌ল্ রেন্‌চ্‌টা আনতে; তখন আরও একজন নিঃশব্দে আদালত-কক্ষ ত্যাগ করে গেল। আমার লোক — যে ওকে পর্শু থেকে 'শ্যাডো' করছে — সেও নিঃসাড়ে বার হয়ে গেল। এইমাত্র ওরা দুজনেই ফিরে এসেছে। আপনার সেই বাস্তুঘুঘুটি চুপ করে গিয়ে বসেছে দর্শকের আসনে। আমার 'নজরদার'ও এইমাত্র ফিরে এসে আমাকে একটি আজব রিপোর্ট দিল।

— সংক্ষেপে বল। সময় খুব কম। — ঘড়ি দেখে বাসু বললেন।

— আপনার 'ঘুঘু' গাড়ি নিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে দক্ষিণে চলতে থাকে। গাড়িতে সে একাই ছিল। সেকেন্ড-হাওড়া-ব্রিজ সাইটের প্রায় নির্জন একটি এলাকায় গাড়িটা পার্ক করে। গাড়ি থেকে নেমে ঘটা করে কানে পৈতে জড়ায়। তারপর একটা জংলা এলাকার দিকে এগিয়ে যায়। ওখানে বোধহয় বিকেলে কোনও আক-মাড়াইওয়ালা এসে আখের রস বেচে। কারণ পাঁচিলের ধারে আখের ছিবড়ে ডাঁই করা। আমার লোক লক্ষ্য করল — কানে 'জনৌ' জড়িয়ে ও যখন আখের ছিবড়ের পাহাড়ের ওপাশে চলে গেল তখন তার হিপ-পকেটে ছিল একটা বেশ বড় অ্যাডজাস্টেব্‌ল্ পাইপ-রেন্‌চ্ ; কিন্তু একটু পরে যখন সে গাড়িতে ফিরে এল তখন তার হিপ-পকেটে রেন্‌চ্‌টা ছিল না!

বাসু-বললেন, গুড-ওয়ার্ক! তোমার লোক কি তারপর রেন্‌চ্‌টা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে?

— আজ্ঞে না। ঐখানে তার সহকারীকে পাহারাদার হিসাবে বসিয়ে রিপোর্ট করতে ফিরে এসেছে।

— দ্যাটস্ গুড! ভেরি, ভেরি গুড! তুমি বরাটকে ডেকে নিয়ে এস দিকিন। বল, আমি ডাকছি। মোস্ট আর্জেন্ট।

মিনিট-খানেকের মধ্যেই ইন্সপেক্টর বরাট এসে ছদ্মবিনয়ের অভিনয় করে বলল, ইয়েস স্যার! বলুন, কী ভাবে আপনার সেবা করতে হবে? আবার কোন মৃতদেহ আবিষ্কার করেছেন নাকি?

বাসু ওর বাহুমূল ধরে আরও দূরে সরে এলেন। নিম্নস্বরে বললেন, মিস্টার বরাট, ও-বেলা আপনি বললেন যে, 'শর্ট-পীস' পাইপটা বদল হয়নি! কথাটা কি ঠিক?

বরাট হেসে বলল, ব্যারিস্টার-সাহেব! এ-প্রশ্নের জবাব তো স্বয়ং জজ-সাহেবই আদালতে দিয়েছিলেন — 'ইটস্ জাস্ট এ টেক্‌নিক্যালিটি!' আপনিও জানেন, আমিও জানি — এটা সেই একই পাইপ। অবশ্য স্বীকার করছি, এই দশদিন আমি ঐ তিন নম্বরে কোনও সেপাইকে পাহারাদার হিসাবে পাঠাইনি। তাই হলপ নিয়ে আমি অনায়াসে বলতে পারলাম : এটা সেই পাইপই।

— আপনি একটা বিরাট ভুল করেছেন, ইন্সপেক্টর বরাট!

বরাটের ভ্রুকুঞ্চন হল। বলল, মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি।

— পাইপটা বদল হয়ে গেছে! আমি জানি।

— আপনি জানেন! কে, কে বদল করেছে?

— আমি।

— আপনি! মানে?

— শুনুন, শুক্রবারে আদালতে যখন ঐ আলোচনা হয় তার আগেই আমি ঐ 'শর্ট-পীসটা' অতি সাবধানে সংগ্রহ করি, পাইপটাকে 'শ্যাময়-লেদারে' জড়িয়ে। যাতে খুলবার সময় কোনও দাগ না পড়ে। আর ওখানে একটা নতুন 'শর্ট-পীস' লাগিয়ে দিই — যেটা আপনি খুলে এনেছেন।

— কেন? কেন এমন কাজ করলেন, মিস্টার বাসু?

— কারণ ঐ শর্ট-পীসটা বদল করে আমি একটা 'দাগী' শর্ট-পীস ওখানে সেঁটে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ তার গায়ে দাঁত-ভাঙা পাইপ-রেন্‌চের দাগ ছিল। ইন্ ফ্যাক্ট, আমার নিজের পাইপ-রেন্‌চ্-এর দাঁত ফেলে তাই দিয়ে এঁটেছিলাম।

— আপনি কী বুঝতে পারছেন, কত বড় বে-আইনী কাজ আপনি করেছেন? একটা হত্যা-মামলার এভিডেন্স আপনি সজ্ঞানে ট্যাম্পার করেছেন!

— না, মিস্টার বরাট, না। শুনুন। আমি এভিডেন্সটাকে সযত্নে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই নিন — এটাই সেই পাইপটা...আপনি যদি মনে করেন যে এটার কোনও 'এভিডেন্টারি ভ্যালু' আছে তাহলে নিন, ব্যবহারে করুন। কিন্তু না, এটা এভিডেন্স হিসাবে কোন কাজে লাগবে না। আপনারও না, আমারও না।

— তাহলে কেন আপনি অমনভাবে হাতসাফাই করলেন?

— কারণ আমি আশা করেছিলাম : ঠিক ঐভাবে যদি আদালতে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হত্যাকারী যে রেঞ্চ্ দিয়ে পাইপটা সেঁটেছিল তার একটা দাঁত ভাঙা — সেটা উদ্ধার করতে পারলে পুলিশ একটা মারাত্মক — বস্তুত 'কনক্লুসিভ' প্রমাণ পেয়ে যাবে, তখনই হত্যাকারী ঘাবড়ে যাবে। সৌভাগ্যবশতই হোক অথবা দুর্ভাগ্যবশত — আমি হত্যাকারীকে চিহ্নিত করেছিলাম অনেক-অনেক দিন আগে। কিন্তু 'কনক্লুসিভ প্রুফ' কিছু ছিল না আমার হাতে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, লোকটা ক্রিমিনাল-টাইপ। ইতিপূর্বেই মোটা অঙ্কের তহবিল তছরূপ করেছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, বিলাসসিং যাদব তাকে ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছে। বিলাসের মৃত্যুতে আর্থিকভাবে সেই সবচেয়ে লাভবান হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তার অ্যালেবাঈ পাক্কা। সে ডিসেন্ট্রিতে ভুগছিল। শয্যাশায়ী। কিন্তু সে ঘটনার প্রমাণ কী? পাড়ার ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন্, স্ত্রী এবং দারোয়ানের সাক্ষী। দারোয়ানটি সদ্যনিযুক্ত—ধানবাদ থেকে আমদানী-করা। ধনঞ্জয় চৌবের দলের লোক।

— ধনঞ্জয় চৌবে? কিন্তু প্রমাণ কী?

— সেটা রবি বোস সাপ্লাই করবে। কৃতিত্বটা রবিরই। ওই তাকে চিহ্নিত করেছে।

বরাট একবার রবি একবার বাসুর দিকে দেখে নিয়ে বললে, আর তাই রবি আমাকে না জানিয়ে সবার আগে আপনার কাছে রিপোর্ট করেছে?

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, ল্যুক হিয়ার, ইন্সপেক্টর। কেসটার ফয়শালা দু-ভাবে করা যায়। আমি চৌবেকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে পাঁচ মিনিটে ফয়শালা করে দিতে পারি। সে-ক্ষেত্রে পুলিস-বিভাগ বে-ইজ্জত হবে বেহুদ্দো! দ্বিতীয়ত, কৃতিত্বটা আপনি আর রবি ভাগাভাগি করে নিতে পারেন। অপরাধীকে চিহ্নিত করার দায় আমার নয়। আমার মক্কেল খালাস পেলেই আমি খুশি।

বরাট গোঁজ হয়ে মিনিটখানেক কী ভাবল। তারপর একগাল হেসে বললে, আই থিংক য়ু আর করেক্ট! কে হত্যা করেছে তা নিয়ে আপনার কেন মাথাব্যথা? আমরাই তাকে ধরি বরং। এস রবি...

বাসু বলেন, আর একটা কথা। মনে রাখবেন, ধনঞ্জয়ের রেঞ্চটার দাঁত ভাঙা নয়। অথচ আপনি হলপ নিয়ে যে পাইপটা আদালতে এক্সিবিট হিসাবে দাখিল করেছেন...

— তাই তো!

— না। আপনি-আমি জানি, কিন্তু ধনঞ্জয় তা জানে না। ওর রেঞ্চ-এর দাঁত ভাঙা কিনা। অথবা শর্ট-পীসটা বদল হয়েছে কিনা। কায়দা করে চেপে ধরলে ধনঞ্জয় ভেঙে পড়বেই। ওর দারোয়ান আর স্ত্রীকে অ্যারেস্ট করুন। আর তাছাড়া একটা মারাত্মক এভিডেন্স তো লুকানো আছে আপনার আস্তিনের

তলায়!

বরাট বিহ্বল হয়ে তাকায়। তার চোখে : প্রশ্ন।

— ইউনিট নম্বর তিনে যতগুলি লেটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে তার দুটি এখনো সনাক্ত করা যায়নি! তাই নয়? মিস্টার সত্যানন্দ সেনের টিপছাপ নিন — কোয়েড্রেটিক ইকোয়েশনের একটা রূট জানা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় যেটি পড়ে থাকবে সেটা হত্যাকারীর। সেটা যদি ধনঞ্জয় চৌবের না হয় তাহলে কেসটা নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের।

ঘড়ি দেখে বললেন, আর মাত্র বত্রিশ মিনিট বাকি আছে। আপনারা রওনা দিন...

বরাট রবিকে ডাকল, কুইক! লেট'স গো!

হুবহু জেমস্ বন্ডের ভঙ্গিতে জীপে লাফিয়ে উঠল বরাট।

আঠারো

ঠিক বেলা দুটোর সময় আদালত বসতেই পাব্‌লিক প্রসিকিউটর নিরঞ্জন মাইতি উঠে দাঁড়ালেন। 'বাও' করে বিচারককে সম্বোধন করে বললেন, ইফ দ্য কোর্ট প্লীজ, বাদীর তরফে সর্বাগ্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আছে!

— প্রসীড! — সংক্ষেপে বললেন বিচারক ঘোষ।

— সর্বাগ্রেই আমি গোয়েন্দা বিভাগকে সামগ্রিকভাবে এবং ইন্সপেক্টর বরাট ও ইন্সপেক্টর রবি বোসকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেছে। হত্যাকারীর নাম ধনঞ্জয় চৌবে। সে পুলিশের কাছে লিখিত স্বীকারোক্তি দাখিল করেছে।... সংক্ষেপে তা এই : বিলাসসিং যাদব দীর্ঘদিন পূর্বে ধনঞ্জয় চৌবের বিষয়ে একটি গোপন বার্তার সন্ধান পায়। সে-কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে চৌবের সামাজিক মর্যাদাহানি হত। এজন্য যাদব গোপনে চৌবের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত—যাকে বলে 'ব্ল্যাকমেলিং'। যাহোক, সে ঘটনা বর্তমান মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। যেটুকু জড়িত তা হচ্ছে এই যে, সেই সূত্র ধরেই বিলাসসিং ওদের সঙ্গে, ওদের গাড়িতেই ধানবাদ থেকে কলকাতায় আসে এবং সেন-মশায়ের বাড়িতে খুঁটি গেড়ে বসে।...বর্তমান মামলার প্রতিবাদিনী যখন শ্রীসেনকে শান্তিধাম থেকে অপসারণের পরিকল্পনা করে তখন বিলাসসিং তা টের পায়। সে ধনঞ্জয়কে কিন্তু জানায় না। গোপনে মিস্ সেনকে অনুসরণ করে ঐ মোটেলে পৌঁছায় এবং ছদ্মনামে চার-নম্বর ইউনিটটি ভাড়া নেয়।...মজার কথা, ধনঞ্জয়ও টের পায় যে, মিস্ সেন সত্যানন্দকে অপহরণের চেষ্টা করছেন আর সেটা বিলাসসিং জানতে পেরেছে। স্মরণিকা দেবীর অলক্ষ্যে বিলাস যেমন ভাড়া করা গাড়িতে ঐ মোটেলে এসে থানা গাড়ে, ঠিক তেমনি বিলাসের অলক্ষ্যে ধনঞ্জয়ও ঐ মোটেলে এসে পৌঁছায় এবং দূরে বসে অপেক্ষা করে। রাত দশটা নাগাদ যখন শ্রীসেন তিন-নম্বর ইউনিট থেকে নেমে আসেন এবং চার-নম্বর গ্যারেজ খুলে বিলাসের ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে চলে যান তখন সে অবাক হয়ে যায়। অবাক হয় এই ভেবে যে, বিলাস কেন চিড়িয়াকে খাঁচা খুলে ভেগে যেতে দিল! সে উপরে উঠে আসে। দেখে তিন-নম্বর ঘরের দরজায় চাবিটা কী-হোলেই আটকানো আছে। চৌবে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। আলো জ্বালে না। পকেট-টর্চের আলোয় দেখে বিলাস অঘোর ঘুমে অচেতন। ধনঞ্জয় চৌবের ধারণা হয়, ঐ অবস্থায় যদি বিলাস মারা যায়, তাহলে হত্যাপরাধ সত্যানন্দ সেন-এর উপর বর্তাবে। তাহলে সে ঐ বিশাল সম্পত্তিটার অধিকার পাবে এবং ব্ল্যাকমেলার বিলাস সিং-এর হাত থেকে ও চিরনিষ্কৃতি পাবে। প্রয়োজন একটি অস্ত্রের। মার্ডার-ওয়েপন। অন্য কেউ হলে হয়তো ঘুমন্ত মানুষটার গলা টিপে ধরত ; কিন্তু ধনঞ্জয় সে-পথে যায়নি। সে দক্ষ মিস্ত্রি! প্লাম্বার মিস্ত্রি! সে নিচে নেমে এসে তার পাইপ-রেন্‌চটা গাড়ি থেকে নিয়ে উঠে যায়। পাইপটা খুলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সরে পড়ে। ...সুতরাং, ধর্মাবতার! প্রসিকিউশন বর্তমান প্রতিবাদিনীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা খারিজ করে দেবার আবেদন পেশ করছে।

নিরঞ্জন মাইতি দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে আসন গ্রহণ করেন।

শ্রী ঘোষের চোখ পিট্-পিট্ করে উঠল প্রশ্নটা করতে : মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল, আপনার কোনও আপত্তি আছে?

বাসু হাসলেন, নান্ হোয়াট্সোএভার, য়োর অনার!

বিচারক বললেন, প্রতিবাদিনীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে গেল। তাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশও দেওয়া হচ্ছে। কোর্ট ইজ অ্যাডজর্নড।

* * *

জজ-সাহেব তাঁর চেম্বারের দিকে রওনা হতেই দর্শকেরা সামনের দিকে ছুটে এল। নবীন, বিশ্বনাথ, ঠাকুর সিং এসেছে আদালতে। রোজই আসে। ওরা এগিয়ে এসে সত্যানন্দকে প্রণাম করল। গীতা কর আর মোতির মা এসে চেপে ধরল টুকুর দুই হাত। তারপর ওরা দু-জন বাপবেটি — এগিয়ে এলেন বাসু-সাহেবের কাছে। টুকু বলল, অনেক অন্যায় জমা হয়ে আছে, মেসো। ক্ষমা চাইবার মুখ নেই। কিন্তু আজ আনন্দের দিনে জেঠুর সঙ্গে...

— জেঠু! জেঠু কে? তোমার সঙ্গে আমার শর্ত হয়েছে না যে, জেঠুর কথা আমরা মুখে আনব না!

টুকু তার বাবার দিকে ফিরল। বৃদ্ধ ওকে বুকে টেনে নিলেন।

বরাট এগিয়ে এসে বাসু-সাহেবের কর্ণমূলে বললে, এক মিনিট!

— ইয়েস!

দুজনে জনান্তিকে সরে এলেন।

— আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই ব্যারিস্টার-সাহেব, কিন্তু গল্পচ্ছলেও যদি কোনদিন কাউকে ঐ পাইপটার কথা বলেন...

— পাগল! কিন্তু রবির উপর যেন রাগ পুষে রাখবেন না!

বরাট একই কথা বলল : পাগল!

ওঁরা যখন হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছেন — ব্যারিস্টার বাসু আর ইন্সপেক্টর বরাট — তখন হঠাৎ দু-তিনটি ফ্ল্যাশ-বাল্ব জ্বলে উঠল। একজন সাংবাদিক এগিয়ে এসে বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে ; ইন্সপেক্টর বরাট আপনাকে কী বলেছিলেন, স্যার?

— উনি বলছিলেন, আমি যদি আমার হাতের তাসগুলো আগে বিছিয়ে দিতাম তাহলে প্রসিকিউশন স্মরণিকাকে আদৌ গ্রেপ্তার করত না! প্রথম হিয়ারিঙেই মামলার ফয়শালা হয়ে যেত।

সাংবাদিকটি প্রশ্ন করে, ঠিক কথা। তা আপনি প্রথমেই ও-কথা পুলিশকে বলে দিলেন না কেন? তাহলে এতদিন সময় নষ্ট হত না!

বাসু বুড়ো আঙুল দিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করলেন।

ওঁর অঙ্গুলিনির্দেশে দেখা গেল সত্যানন্দ চেকবুক খুলে একটা চেক লিখছেন।

বাসু হেসে বললেন, বোকা ছেলে! একদিনে মামলার ফয়শালা হয়ে গেলে কেউ মোটা ফী দেয়?

সত্যানন্দ ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন চেকটা হস্তান্তরিত করতে। শেকহ্যান্ড করতে। সাংবাদিক তার ক্যামেরা বাগিয়ে ধরে বললে, মিস্ সেন, আপনি যদি দুজনের মাঝখানে, অর্থাৎ আপনার জেঠুর এপাশে..

বাসু গর্জে ওঠেন ; অবজেক্শন! ফের জেঠু!